বিশ্বসভ্যতার ধারা

হরিপদ ঘোষাল

৺হরিপ্রিয়া দেবীর

স্মরণে

নিবেদন

সভ্যতার ইতিহাস সম্বন্ধে বহু পুস্তক ইংরেজি ভাষায় লেখা হয়েছে। বর্তমানে টয়েনবির A Study of History অথবা উইল ডুরাণ্টের The History of Civilisation নামক বিরাট গ্রন্থগুলি লেখকদের পাণ্ডিত্য পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট পরিচয় দেয়। আমাদের দেশে ইতিহাসে অভিজ্ঞ পণ্ডিতের অভাব নাই। কিন্তু তাঁদের মধ্যে অনেকে স্কুল পাঠ্য ইতিহাস ছাড়া এই বিষয়ে বিশেষ কোন মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেন না অথবা লিখলেও তার প্রকাশক ও পাঠকের একান্ত অভাব হয়। এইরূপ অবস্থা শোচনীয় সন্দেহ নাই কিন্তু এর কতগুলি কারণও আছে। প্রথমতঃ, বাংলা দেশে অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন শতকরা পনর জন লোকের মধ্যে বিজ্ঞান বা ইতিহাস পাঠ করার উপযুক্ত লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। দ্বিতীয়তঃ, দেশ বিভাগের ফলে দুঃখ দুর্দশা অশান্তি প্রভৃতির জন্য দেশবাসীর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ অনিশ্চয়তা ও উদ্বেগপূর্ণ জীবন অতিবাহিত করছেন। তৃতীয়তঃ, যে কয়জন বিদ্যানুরাগী পাঠক আছেন তাঁদের আর্থিক অনটন পুস্তক ক্রয়ের অনতিক্রম্য অন্তরায় হয়ে উঠেছে। আবার আমাদের মধ্যে যে মুষ্টিমেয় লোকের পুস্তক ক্রয়ের সামর্থ্য আছে তাঁরা পুস্তক ক্রয় করে অর্থের অপচয় করতে চান না।

প্রকাশকগণও পাঠশালা বা স্কুলের বই ছাড়া অনিশ্চিত বিক্রয়ের উপর নির্ভর করে অন্য কোন বই সাধারণতঃ প্রকাশ করেন না। এজন্য তাঁদের দোষ দিয়ে বা দুঃখ করে লাভ নাই। বাংলা ভাষায় লেখা বই ভারতবর্ষ তো দূরের কথা, এমন কি বাংলা ভাষাভাষী পূর্ব পাকিস্তানে কম চলে। এজন্য প্রকাশকগণ বাংলা ভাষায় লেখা পাঠশালা বা স্কুল পাঠ্য পুস্তক ছাড়া অন্য কোন বই ছাপিয়ে ও প্রকাশ করে অযথা অর্থ ও শ্রমের অপব্যবহার করেন না। বর্তমান পুস্তকখানি এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই চার শ' পৃষ্ঠার বই ছাপাতে পাঁচ বৎসরের বেশী সময় লেগেছে। শিশু-পাঠ্য পুস্তক ছাপার ফাঁকে ফাঁকে বইখানি ছাপা হয়েছে। অবস্থাচক্রে পড়ে এর মধ্যে অনেক ভুল ত্রুটি দোষ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। সদাশয় পাঠকগণ এর জন্য যেন লেখককে ক্ষমা করেন। যদি কখন এই বই-এর পুণঃ মুদ্রণ সম্ভব হয় তবে সেই সকল ভুলভ্রান্তি সংশোধিত হবে।

এই পুস্তক খানি মৌলিক বলে স্পর্ধা করতে পারে না অথবা পণ্ডিতদের জন্য এটি লেখা হয়নি। যাঁরা ইংরেজি ভাষায় অনভিজ্ঞ অথবা যাঁরা বিভিন্ন দেশের বিস্তৃত ও বৃহৎ ইতিহাস পাঠ করার অবসর পান না, তাঁরা যদি পুস্তক খানি পাঠ করে কিঞ্চিৎ উপকৃত হন তা হলে আমার শ্রম সার্থক হবে। এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে আমি বহু লেখকের শরণাপন্ন হয়েছি। গ্রন্থ মধ্যে তাঁদের নাম উল্লেখ না করলেও আমি তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ। গ্রন্থ শেষে ব্যবহৃত পুস্তকের যে তালিকাটি সংযোজিত হয়েছে তা ছাড়া আরও অনেক লেখকের রচনা থেকে মাল মশলা সংগৃহীত হয়েছে। তাঁদের নিকটেও আমার কৃতজ্ঞতা কম নয়।

এই পুস্তকে যে বিভিন্ন দেশের, স্থানের ও ব্যক্তির নাম ব্যবহৃত হয়েছে তাদের সুখবোধ্য ও সুখশ্রাব্য করার জন্য চেষ্টা করেছি। ভাষাতত্ত্ববিদের চোখে এ একটি অমার্জনীয় অপরাধ বা ত্রুটি বলে গণ্য হতে পারে কিন্তু পাঠকগণ শব্দতত্ত্ব শেখার জন্য এই পুস্তক পাঠ করবেন না। Zoraster শব্দটির গ্রীক উচ্চারণ জোরা আস্তের গ্রহণ না করে বাঙালি পাঠকের সুবিধার জন্য জোরাষ্ট্রার বলা হয়েছে। Orleans শব্দটির ফরাসি উচ্চারণ অরলেআঁ, Montesque মঁতেঁস্কআ, Charlemagne সাল্‌মিঞ্‌ কিন্তু বাংলায় লেখা ও উচ্চারণের সুবিধার জন্য যদি আমরা অর্লিয়েন্স, মনটেস্‌কিউ সার্লেমেন বলি তা হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যায় না। আসল কথা, যাতে পড়ার লেখার ও বোঝার সুবিধা হয় তাই করা উচিত। বিদেশীকে বাঙালির পোষাকে সজ্জিত করে নিলে সে আপনার লোক হয়ে যাবে, আর বিদেশী থাকবে না।

এই বইখানি ছাপানোর জন্য আমি বহু প্রকাশকের দ্বারস্থ হয়েছি। কেউ বা এর কলেবর দেখে ভয় পেয়েছেন, আবার কেউ বা লাভের সম্ভাবনা নাই দেখে আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছেন। কলকাতার প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক আমার বন্ধু শ্রীগোপাললাল পাল বি এ এই পুস্তকখানির মুদ্রণ ও প্রকাশ করার ভার নিয়ে আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। ভগবান তাঁর মংগল করুন।

উলুবেড়িয়া

২রা মাঘ

১৩৬২ সাল

বিষয় সূচী

অবতরণিকা

যাঁরা বলেন অর্থনীতির ক্ষেত্রে যেমন ছোট ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে পারে, তেমনি রাজনীতি ক্ষেত্রে কতগুলি রাষ্ট্র মিলিত হয়ে সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠিত হতে পারে তাঁদের কথা যুক্তিযুক্ত ও বিচারসহ নয়। শিল্পে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য প্রধান এবং একমাত্র বাঁধন কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও উদ্দেশ্য বিভিন্ন, সুতরাং তাদের মিলনের সম্ভাবনা অল্প। যদি নরনারীর সুখসম্পদ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যোন্নতি, বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধন সকল রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য হত, তাহলে তারা একত্রিত হয়ে বিশ্ব-রাষ্ট্র গঠন করতে পারত। শক্তি বৃদ্ধি ও পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন জাতির উদ্দেশ্য ও কার্য্য হলে তার সংগে অন্য জাতির সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে, তখন তাদের মধ্যে মিলনের যোগসূত্র থাকে না। যদি কোন একটি উগ্র-জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রের বাহুবল ও ধনবল বিশ্বে স্থায়ী একছত্র আধিপত্য স্থাপন করতে সমর্থ হয় কিম্বা যদি পৃথিবীর সকল নরনারী জাতীয়তার ঊর্ধে কোন উদার সর্বজনীন মতবাদ গ্রহণ করে তবেই বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন সম্ভব হতে পারে।

কতগুলি লোকের রাজনৈতিক বা ধর্মীয় মতের ঐক্যে রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক দলের উদ্ভব। দলগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধি সংকীর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করলে দল বা সম্প্রদায়ের বাইরের লোকের ঘৃণা ভয় ও সন্দেহ জন্মে। ফলে তার সম্প্রসারণের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

প্রাচীন কালে ইহুদীরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগৃহীত জাতি ছিল বলে গর্ব অনুভব করত। এজন্য তারা অপর জাতির ঘৃণা ও ঈর্ষা উদ্রেক করেছিল। আধুনিক যুগে শিন্‌টো জাপানের শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে শিক্ষা দেয়। কেবলমাত্র জাপানী ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি তা স্বীকার করে না। নিজের স্থায়িত্ব ও সুখ কায়েম করে নিতে গিয়ে যে প্রতিষ্ঠান অপরের ঘৃণা ঈর্ষা ও সংঘর্ষ প্রভৃতি জাগ্রত করে তার আয়ু অল্প।

উগ্র জাতীয়তাবোধ পৃথিবীতে বহু অনর্থ সৃষ্টি করেছে। জাতীয় পতাকা জাতীয় সভ্যতার প্রতীক না হয়ে হিংসার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইংল্যাণ্ডের জাতীয় পতাকা ইংরেজের মনে নেলসন ও ট্রাফলগার, ওয়েলিংটন

ও ওয়াটারলু, ক্লাইব ও ভারতবর্ষের ছবি ফুটিয়ে তোলে। সে তখন ভাবে না তার সেকস্‌পীয়র, নিউটন ও ড্বারউইনকে। বিশ্বসভ্যতায় গ্রীসের শ্রেষ্ঠদান আলেকজান্দার ও আলকিবাইডিস্‌ নয়, তার শ্রেষ্ঠদান সক্রেটিস প্লেটো আরিষ্টটল হোমার ও ইস্কিলাস্‌, ইটালির শ্রেষ্ঠদান জুলিয়স সিজর নয়, দান্তে ও গ্যালিলিও, জার্মেনির শ্রেষ্ঠদান কাইজার ও হিটলার নয়, গ্যেটে ও কাণ্ট, ভারতের শ্রেষ্ঠদান চন্দ্রগুপ্ত ও সমুদ্রগুপ্ত নয়, বুদ্ধ শঙ্কর গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথ। যিনি যে পরিমাণে মানুষের চিত্তকে কল্যাণের পথে চালিত করেছেন, তিনি সেই পরিমাণে মহৎ এবং যে জাতির মধ্যে জ্ঞানী ও আদর্শবাদী মানুষের সংখ্যা যত বেশী সেই জাতিই প্রকৃতপক্ষে বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে তত উচ্চস্থান অধিকার করেছে।

জাতি বিশেষের সভ্যতার অবদান তার একচেটে সম্পদ নয়। এই অবদান সকল মানুষের সাধারণ সম্পত্তি। জাতিগত অন্ধ-সংস্কার ও গর্ব শ্বেত ও অশ্বেত জাতিদের ভিতর যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে, জাতীয়তাবাদ যে জাতিবিশেষের সভ্যতাকে সকলের উপরে স্থান দিতে চেয়েছে তার প্রধান কারণ অজ্ঞতা। মোহহীন বিচারবুদ্ধির আলোকে অহমিকার অন্ধকার দূর হলে বিশ্বকৃষ্টি বা সার্বভৌম সভ্যতার জন্ম সম্ভব।

স্বার্থের প্ররোচনায় বিভিন্ন জাতি পরস্পরের প্রতি হিংসাশীল। এদের রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনে ঐক্যের আশা অল্প। তবে তারা যদি পরস্পরের সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব বুঝতে ও জানতে চেষ্টা করে, তাহলে তারা পরস্পরকে শ্রদ্ধা করবে এবং শ্রদ্ধাই পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও ন্যায় ব্যবহারের মূল।

কোন দেশের ও জাতির শ্রেষ্ঠতা বিচার করার সময় তাদের সভ্যতা সংস্কৃতি ও ধর্মের কথা মনে পড়ে। আমরা অনেক সময় এই তিনটি বস্তুকে এক কোঠায় ফেলি। এদের ভিতর যে মর্মান্তিক প্রভেদ আছে তা ভুলে যাই। সাধারণতঃ শিক্ষা জ্ঞান দর্শন বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ভিতর সভ্যতা প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সভ্যতা যেন হীরকখণ্ড। হীরকখণ্ডের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্যের মতো সংস্কৃতি সভ্যতার আলো। সংস্কৃতি বা Culture ধর্ম-নিরপেক্ষ ও অনুশীলন লব্ধ। "সভ্য, শিক্ষিত, সমুন্নত মন ও সূক্ষরুচি ও রসবোধসম্পন্ন মানুষের উদার আদর্শগত একটি চারিত্রিক শীল" (নরেন্দ্র দেব—ভারতবর্ষ, পৌষ, ১৩৬২) সংস্কৃতি নামে অভিহিত হয়। সভ্যতা বিচার বুদ্ধির এবং

সংস্কৃতি মানসিক উৎকর্ষের ব্যাপার। ধর্ম বিশ্বাসের বস্তু। মানুষ বুদ্ধির ক্ষেত্রে এক কিন্তু মননের ক্ষেত্রে পৃথক। সুতরাং সাংস্কৃতিক বিভিন্নতাসত্ত্বেও বুদ্ধির ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্নজাতি মিলিত, অন্ততঃ বন্ধু ভাবাপন্ন হতেপারে। এজন্য বর্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহাবস্থান নীতি গৃহীত হয়েছে।

বিভিন্ন আবহাওয়া ও পরিবেশে সভ্যতার বিভিন্ন রূপ দেখা যায় কিন্তু তার অন্তর প্রকৃতি এক। রূপ রঙ গন্ধ ও সুষমার সমাবেশে ফুলের সৌন্দর্য। নানা জাতির নানা সভ্যতার দানে বিশ্ব সভ্যতা পুষ্ট ও সুন্দর হয়ে উঠবে। বিভিন্ন সভ্যতার মহৎ সৃষ্টিগুলির সমন্বয়ে যে মানস-জাগরণ তার নাম বিশ্বসভ্যতা। কোন একটি সভ্যতা অন্য সকল সভ্যতাকে নির্জিত ও উদরস্থ করলে প্রকৃত বিশ্বসভ্যতা সৃষ্টি হবে না। বিভিন্ন জাতির সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের উপর বিশ্ব সভ্যতা-সৌধের প্রতিষ্ঠা নয়। দেশ, জাতি, বর্ণ ও গোষ্ঠি হিসাবে মানুষ তার পৃথকত্ব হারিয়ে ফেলছে, সমগ্র মানব সমাজে আদান-প্রদানের ফলে একটি উদার সাম্য প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। প্রাচীনের একতারার একটি সুরের পরিবর্তে আধুনিক মানুষ চায় বহু মিশ্রিত সুরের ঝঙ্কার।

সভ্যতার উন্নতি বা অবনতি মানুষের বাহুবল বা বিত্তসম্পদের প্রাচুর্য বা দৈন্য নয়। যে পরিস্থিতির ভিতর মানুষের চিন্তা বা ভাবের দৈন্য অভিব্যক্ত, যাতে তার মংগলময়ী বৃত্তি শক্তিহীন ও নির্জীব, সম্ভূতির উপাসনায় তার মন বিকার-গ্রস্ত, যাতে মানবতা বা উদারতার পরিবর্তে পশুত্বের জাগরণ সম্ভব, যেখানে বিষয়ের জঞ্জালে তার চৈতন্য অবলুপ্ত, ক্ষুদ্র স্বার্থের তাড়নায় বৃহত্তর ও মহত্তর স্বার্থ উপেক্ষিত,—যাতে তার বিবেক বিচারবুদ্ধি ও ধর্মভাব মোহগ্রস্ত, সেই বেষ্টনী বিচিত্র আড়ম্বর-আয়োজন সৃষ্টি করলেও, তার বিপুল চাঞ্চল্য সত্ত্বেও সে মানবতায় দেউলে হয়ে গেছে।

পৃথিবীতে এখন চারটি সভ্যতা বর্তমান—ইয়োরোপীয় সভ্যতা, মুসলমান সভ্যতা, হিন্দু সভ্যতা এবং চীনা সভ্যতা। ইয়োরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি প্রাচীন রোমান ও গ্রীক সভ্যতা। মুসলমান সভ্যতা আরবীয় মনোভাব থেকে মুক্ত হয়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতার সংগে মিশে যাচ্ছে। হিন্দু সভ্যতা আর্য ও অনার্যের দানে সমৃদ্ধ হয়ে একটি বিশিষ্ট রূপ নিয়েছে। চীনা সভ্যতা বস্তু-তান্ত্রিক। অধ্যাত্মভাব-প্রবণ হিন্দুসভ্যতা বৌদ্ধধর্মের সূত্রে বস্তুতান্ত্রিক চীনা সভ্যতার সংগে সংযুক্ত হয়ে তাদের মধ্যে কতকটা আত্মিক যোগ স্থাপন করেছে।

কয়েক শত বৎসর এরা উভয়েই ইয়োরোপীয় শক্তি দ্বারা পিষ্ট ও নির্জিত হয়ে এসেছে। উভয়েই এক্ষণে তাদের পৃথক স্বাধীন সত্তা উপলব্ধি করছে।

ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষী লোক এক সাধারণ সভ্যতার অধিকারী। এই সর্বগ্রাসী সভ্যতা ভারত চীন ও ইসলামের সাধনার যা কিছু বৃহৎ ও মহৎ তা আত্মস্থ করে নিয়েছে বটে কিন্তু ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতার আত্মনিষ্ঠভাবকে উদরস্থ করতে পারেনি।

মনুষ্য চরিত্রের ন্যায় সভ্যতারও দু'টি দিক আছে—একটি ইন্দ্রিয়ের, অপরটি অতীন্দ্রিয়ের। ভারতীয় সভ্যতায় ও জীবনে অতীন্দ্রিয় সাধনা মুখ্য স্থান অধিকার করলেও এতে এদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা কতকটা ফলবতী হয়েছিল। নিখিল বিশ্বপ্রপঞ্চের মধ্যে যে দুর্জ্ঞেয় রহস্য নিহিত রয়েছে তাকে দৈনন্দিন জীবনে উপলব্ধি করতে না পারলে পারিবারিক সামাজিক ও জাতীয় জীবন নিছক ইন্দ্রিয় সেবার ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই রহস্যসম্বন্ধে সচেতনভাব জীবনের পূর্ণতার জন্য আবশ্যক। বিশ্বসভ্যতার পূর্ণতাসাধনের জন্য ভারতীয় আধ্যাত্মিক অনুভূতি একান্ত প্রয়োজন।

ধাতুর ন্যায় মানুষের দেহের ওজন ও পরিমাণ, উদ্ভিদের ন্যায় যান্ত্রিক গঠন প্রণালী, সাধারণ জীবের ন্যায় বোধ শক্তি ও চলিষ্ণুতা এবং তার উপর বিচারশক্তি ও আত্মিক জ্ঞান আছে। দৈহিক গঠন ব্যাপারে আমরা বানর ও উদ্ভিদের নিকট আত্মীয়। অধ্যাপক এলিয়ট স্মিথ্ বলেন, মানুষের মগজ শিম্পাঞ্জীর মগজের মতো। কিন্তু তবু মানুষ হিসাবে মানুষ ইতর প্রাণী থেকে ভিন্ন। আমাদের দোষগুণ মানবিক। ইন্দ্রিয়তর্পন সম্ভূতি ও সম্ভোগ জীবনের মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়ালে মানুষ পশুভাবাপন্ন হয়। দেহাত্মবোধ পাশবিক বল ও আত্মিক শক্তির মলিনতা বর্বরতার লক্ষণ। যে জাতি শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া ও দেহ অপেক্ষা মানসিক উৎকর্ষকে, সত্য শিব ও সুন্দরের অভীপ্সাকে উচ্চতর স্থান দিতে কৃপণতা করে, সে জাতি সভ্যপদবাচ্য নয়। দেহ মন ও আত্মার সমবায়ে মনুষ্যপ্রকৃতি গঠিত। স্বাস্থ্যবান দেহ, অনুকূল আর্থিক পরিস্থিতি সুষ্ঠু জীবনের উপযোগী হলেও জীবনের সর্বস্ব নয়। আত্মসেবা আত্মরক্ষা আত্মসুখ ও আত্মগরিমা বর্বরতার লক্ষণ। সমগ্রের জন্য আপন-ভোলা কল্যাণবোধ সভ্যতার নিকষ। যখন ব্যক্তিজীবন বিশ্বজীবনে পরিণতি লাভ করে, যখন প্রাত্যহিক জীবনের সহিত বিশ্বজীবনের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই যথার্থ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।

কোন জাতিই একেবারে বর্বর নয়। এমন কোন জাতি নাই যার দলগত নীতি, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস এবং সামাজিক অনুশাসন, ন্যায়-অন্যায় বোধ বা নীতি ও শিল্পের ধারণা নাই। আমরা বলি, এস্কিমো রেড্ ইণ্ডিয়ান বাসুটো এবং ফিজি দ্বীপের লোকেরা বর্বর কিন্তু গ্রীক রোমান ইংরেজ বা জার্মানদের মতো তাদের ধর্মবিশ্বাস আচার-ব্যবহার ও জীবনধারন প্রণালীর বৈশিষ্ট্য আছে। রাজনৈতিক প্রভুত্ব, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অথবা ধ্বংস বা হত্যার কৌশল ও যন্ত্র উদ্ভাবন আধুনিক সভ্যতার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে। জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয়ের পর জাপান সভ্য বলে আদৃত হয়েছিল কিন্তু যে তাতারগণ সুংবংশকে পরাজিত করেছিল এবং যে গথ ভাণ্ডাল প্রভৃতি জাতিরা রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল তারা ববর অভিহিত হল।

বাষ্পীয় পোত রেলগাড়ী টেলিফোন টাইপ রাইটার এরোপ্লেন আটম বোমার উদ্ভাবন ও ব্যবহার সভ্যতার মাপকাঠি নয়। জড়বিজ্ঞান চর্চায় ও যন্ত্র আবিষ্কারে প্রাচীন ভারত গ্রীস বা মধ্যযুগের ইটালি পশ্চাৎপদ ছিল কিন্তু তারা প্রেয়ের চেয়ে শ্রেয়কে আশ্রয় করেছিল, আত্মিক উৎকর্ষ সাধনে আত্মনিয়োগ করেছিল। এজন্য তারা সভ্য বলে পরিচিত হয়েছে।

আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা অর্থনৈতিক বর্বরতার স্তরে অবস্থিত। সম্ভূতি ও শক্তি নিয়েই এর কারবার, আত্মিক উন্নতি ও মনুষ্য ধর্মের উৎকর্ষ এর কার্য সূচীর অন্তর্গত নয়। বর্তমানে আর্থিক উন্নতি জীবনের শ্রেষ্ঠতম আদর্শ, অর্থনীতি ও শক্তি অর্জন পরম সাধনা।

হেগেল বলেছেন, ইতিহাস পড়ে আমরা এই জ্ঞান লাভ করি যে মানুষ ইতিহাস থেকে কিছুই শেখেনি। চীনা ও ভারতীয় সভ্যতার স্থায়িত্বের কারণ তাদের মনুষ্যধর্ম ও আত্মীকভাব। এই সকল দেশেও যুদ্ধ ও দিগ্বিজয়ী সম্রাট বা রাজার অভাব ছিল না কিন্তু সাম্রাজ্যলিপ্সা তাদের জীবনের উচ্চতম আদর্শকে ম্লান করে দেয়নি। লোভ ও বাহুবলে জগতে প্রতিষ্ঠা লাভের তীব্র কামনা আসিরিয়ার ধ্বংসের কারণ। প্রতিবেশীকে নির্জিত করে বাহুবল প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ গ্রীসের পতন ঘটিয়েছিল। রোম তদানীন্তন পরিচিত জগৎ জয় করেছিল, প্রাচী ও প্রতীচী থেকে কর আদায় করেছিল। রোম ভোগের দ্রব্যে ঐশ্বর্যশালী হয়েছিল কিন্তু মনুষ্যধর্মে রিক্ত হয়ে মৃত্যু বরণ করেছিল। মানবত্তার অভাবে সাম্রাজ্যের পর সাম্রাজ্য, সভ্যতার পর সভ্যতা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ইতিহাসের এই কঠোর ও রূঢ় সত্য উপলব্ধি করার সময় এসেছে।

মানুষের চিত্তনদী উভয়তোবাহিনী, বহতি কল্যাণায়, বহতি পাপায় চ—একটি ধারা কল্যাণের দিকে, অপরটি অমংগলের দিকে প্রবহমান। মানুষ দেব-মর্কট। একদিকে সে দেবতা, অন্যদিকে মর্কট। সে একদিকে হত্যা লুণ্ঠন রক্তপাত ও শোষণ চালিয়েছে, অন্যদিকে আবার সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ বিজ্ঞান শিল্প সাহিত্য ও দর্শন সৃষ্টি করেছে। দেশজোড়া হিংসা ও কুসংস্কারের ভিতর শঙ্কর ও মহাজ্ঞানী তথাগতের আবির্ভাব হয়েছিল, ধর্মান্ধতা ও অজ্ঞতার অন্ধকারে যিশু খ্রীষ্ট ও মহম্মদের জন্ম হয়েছিল, মধ্যযুগের বর্বরতার ভিতর আবিলার্ড ও একুইনাসের অভ্যুদয় সম্ভব হয়েছিল। বিশ্বময় নরমেধ যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ডের ভিতর লেনিন মার্কস্ রোমা রোঁলা রবীন্দ্রনাথ, বার্ণার্ড শ' ও গান্ধীর মংগলময়ী বাণী শোনা গিয়েছিল। মানুষের শুভবুদ্ধি মনুষ্য জাতি ও বিশ্বসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

এই পুস্তকে বিশ্বসভ্যতার যে চিত্র অংকিত হয়েছে তাতে দেখা যাবে কোন্ জাতি মানবধর্ম খর্ব করে প্রাণশক্তির অপচয় করেছে, কোন্ জাতি বৈষম্যের অন্তরালে অন্তরের মহান ঐক্যকে আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছে, কোন্ জাতি জীবন মহাযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ নররূপী নারায়ণের প্রীতিকামনায় উৎসর্গ করেছে, কোন্ জাতি বিষয় কামনার জঞ্জালে তার আত্মিক সত্তা আবৃত করেছে, ইন্দ্রিয় তর্পণে নিজের রিক্ততার বারি ঢেলে দিয়ে তাকে কলুষিত করেছে। ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীর মতো সভ্যতার ধারা সুদূর অতীতের মহোচ্চ শৃংগ শিখরে কবে উদ্ভূত হয়েছিল তা এখনও অজ্ঞাত। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার জন্য মানবযাত্রী কবে চিরবন্ধুর সাধনার পথে প্রথম পদার্পণ করেছিল তা জানা নাই। কিন্তু সভ্যতার শীর্ণ স্রোতরেখা কত উষর মরু-কান্তার ভেদ করে "মহামানবের সাগরতীরের" দিকে ছুটে চলেছে। জানি না কবে মহামানবের বিরাট আত্মা সেই তীর্থোদক পান করে ধন্য ও পবিত্র হয়ে শান্তি লাভ করবেন।

বিশ্বসভ্যতার ধারা

এক

সৃষ্টি-রহস্য

জীবধাত্রী শস্যশালিনী ধরিত্রীর জন্মকথা শুনলে আশ্চর্য হ'তে হয়। বিজ্ঞান তাঁর জন্মের ইতিহাসের দুর্গম রহস্যের উপর আলোকপাত করতে সমর্থ হয়েছে। এক সময় পৃথিবী প্রায় তরল অবস্থায় ছিল। বিগত তিন শত বৎসরের মধ্যে দৃশ্য জগতের বিশালতা সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান বর্ধিত হয়েছে। জ্ঞান বৃদ্ধির সংগে মানুষ তার ক্ষুদ্রতা বুঝতে সমর্থ হয়েছে। এক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রই জানেন পৃথিবী সাত আট হাজার বৎসরের বহু পূর্বেও বর্তমান ছিল। এমন কি, পৃথিবী যে স্মরণাতীত কাল থেকে বর্তমান আছে তা বিশ্বাস করতে আর কাহারও সন্দেহ হয় নি।

আমরা ভূগোলে পড়েছি, পৃথিবীর আকার গোল, এর উত্তর ও দক্ষিণ অংশ কমলা লেবুর মতো একটু চাপা। এর বিষুব রেখা আট হাজার মাইল। খ্রীষ্টের জন্মের দুই হাজার বৎসর পূর্বে বাবিলনে গ্রহ-নক্ষত্রের পর্যবেক্ষণ হ'ত। অনেক জ্যোতিষিক আবিষ্কারের উৎপত্তি বাবিলনে হয়েছিল এবং সে জ্ঞান পশ্চিম দিকে গ্রীস দেশে এবং পূর্বদিকে পারস্যের ভিতর দিয়ে ভারতবর্ষে ও চীনে ছড়িয়ে পড়েছিল। বাবিলনীয়রা অধিমাস গণনার প্রণালী (Metonic cycle) এবং অয়ন চলন (Precession of Equinoxes) আবিষ্কার করেছিল। প্রায় ৫৬০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে আনক্সিমাণ্ডার প্রথম আবিষ্কার করেন যে পৃথিবী নিজের মেরুরেখার চতুর্দিকে আবর্তন করছে এবং দিনরাত্রির কারণ এই। ইনিই প্রথমে পৃথিবীর ব্যাস মাপ করেছিলেন।

বাবিলন ও চীনের জ্যোতিষীরা পৃথিবীকে সমতল ক্ষেত্র বলে মনে করতেন। তাঁদের মতে পৃথিবী স্থিরভাবে মধ্যস্থলে বর্তমান আছে এবং এবং সূর্য চন্দ্র গ্রহ-উপগ্রহ প্রভৃতি তার চতুর্দিকে ভ্রমণ করছে; পঞ্চদশ শতকে

কোপরনিকস্ অনুমান করলেন যে সূর্য মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহসকল সূর্যের চতুর্দিকে বৃত্তাকারে আবর্তিত হচ্ছে। আরও পরে গ্যালিলিও দূরবীক্ষণ যন্ত্র-সাহায্যে কোপরনিকসের মত অভ্রান্ত বলে প্রমাণ করে দিলেন। আরও জানা গেল যে সূর্যকে পরিক্রমণ করে' পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে এবং চন্দ্র নামে আর একটি জ্যোতিষ্ক আমাদের পৃথিবীকে পরিক্রমণ করছে। বুধ শুক্র প্রভৃতি গ্রহ ও উপগ্রহ সূর্য থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থান করে' তাকে আবর্তন করছে। এই রকম লক্ষ লক্ষ মাইলের কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। লক্ষ লক্ষ মাইলের পর শূন্য, মহাশূন্য! ব্যোমের অসীম গর্ভে কোটি কোটি গ্রহ, উপগ্রহ, তারকা বর্তমান আছে। সেই ব্যোম কত বিশাল, কত মহান!

যতদূর প্রমাণ পাওয়া গেছে তাতে মনে হয় একমাত্র পৃথিবীই জীবের বাসভূমি। পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে প্রাণী ও উদ্ভিদ কিছুই নাই। তবে যদি এমন কোন জীব থাকে যে প্রচণ্ড উত্তাপেও প্রাণ ধারণ করতে সমর্থ হয়, তবে সে এই সকল গ্রহে বাস করতে পারে। কিন্তু ইহাও মানুষের কল্পনার অতীত। পৃথিবীর বক্ষ থেকে উর্ধ্বে সাত মাইল এবং নীচে পাঁচ মাইল পর্যন্ত গমনাগমন চলে ও জীবের অস্তিত্বের চিহ্ন পাওয়া যায়।

পৃথিবীর জন্ম। পণ্ডিতরা বলেন, দুই শত কোটি বৎসর পূর্বে বাষ্পময় পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। কোন্ শুভ মুহূর্তে অগ্নিময় ব্যোমের প্রচণ্ড তাণ্ডব লীলার মধ্যে আজিকার এই পৃথিবীর "প্রাণ-নিকেতন" গড়ে উঠেছিল, তা এখনও আমাদের অবিদিত। ক্রমে তরল পৃথিবী জমাট বাঁধল। পৃথিবী-পৃষ্ঠের প্রাচীনতম প্রস্তরের বয়স এক শত বিশ কোটি বৎসর।

স্মরণাতীত কালের আদি যুগে এক অপরূপ শক্তি বর্তমান ছিল। ক্রমে এই শক্তি অনন্ত ব্যোমে গতিরূপে প্রকাশিত হ'ল। একটি তরংগ সৃষ্টি হ'ল। তার ফলে বিদ্যুৎ-কণাসকল উৎপন্ন হ'ল। গতিশীল বিদ্যুৎকণাগুলি ইলেকট্রোণ ও প্রোটন নামে পরিচিত। এই দুই ধর্মের বিদ্যুৎকণার সমাবেশে একটি পরমাণু উৎপন্ন হ'ল। কয়েকটি পরমাণু আবার একত্র মিলিত হয়ে ঘনীভূত হ'ল। ঘনীভূত পরমাণু সমষ্টির নাম অণু। অণুসকল পৃথিবীর জল বায়ু মৃত্তিকা প্রভৃতি জড় পদার্থের স্ব স্ব গুণবিশিষ্ট সূক্ষ্মতম অংশমাত্র। হিন্দু শাস্ত্রে এদের নাম তন্মাত্রা। জড় পদার্থের তন্মাত্রা সকল দু'টি বিপরীতধর্মী বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে অত্যুষ্ণ বাষ্পীয় অবস্থায় বর্তমান থেকে তেজ ও আলোকরশ্মি বিকীরণ

করছিল। এর নাম নীহারিকাময় অবস্থা। সূর্য পৃথিবী ও গ্রহগণ এই জলন্ত অগ্নিপিণ্ডের বিরাট্ গর্ভে শায়িত ছিল। এক একটি নীহারিকা এক একটি বৃহৎ তারকা-পরিবার। এক এক পরিবারের জনসংখ্যা ন্যূনাধিক শত কোটি তারকা। এই বহুদূর প্রসারী প্রকাণ্ড জলন্ত বাষ্পপিণ্ডের খুব নিকট দিয়ে একটি অতি বৃহৎ নক্ষত্র চলে গেল। উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড আকর্ষণের ফলে ঐ অগ্নিপিণ্ডের কতকটা অংশ বিচ্যুত হয়ে গেল। এই বিচ্যুত অংশের আকার পটলের মতো ছিল। এই অংশটি ভেঙে গিয়ে কয়েকটি টুকরায় পরিণত হ'ল। টুকরাগুলি এক একটি গ্রহ। যে অগ্নিপিণ্ড থেকে এরা বিচ্যুত হ'ল, তার নাম সূর্য। বাষ্পীয় অবস্থায় পৃথিবী যখন সূর্যের চতুর্দিকে আবর্তিত হচ্ছিল তখন সূর্যের আকর্ষণের ফলে পৃথিবী-গাত্র থেকে কতকটা অংশ বেরিয়ে গেল। এই অংশ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে লাগল এবং কালক্রমে ঘনীভূত হয়ে চন্দ্র নামে পরিচিত হল। কতকগুলি নেবুলা এখনও ঘনীভূত হয়নি। তাহারা আদি উজ্জ্বল বাষ্পময় অবস্থায় বর্তমান আছে।

তরল বাষ্প কেন্দ্রীভূত হয়ে পৃথিবী ও চন্দ্র সৃষ্টি করার পরেও বিষম বেগে আবর্তিত হচ্ছিল। তাদের গর্ভ তরল ও উষ্ণ ছিল। গন্ধক ও ধাতুমিশ্রিত আকাশে জল অত্যুষ্ণ বাষ্পের আকারে বর্তমান ছিল।

এই ভাবে লক্ষ লক্ষ বৎসর অতিবাহিত হ'ল। ক্রমে অগ্নিময় দৃশ্যের উষ্ণতা হ্রাস হ'ল। লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে' পৃথিবী বর্তমান আকার ধারণ করতে লাগল। বাষ্পীয় অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় আসতে পৃথিবীর প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর লেগেছিল এবং তার পরে তরল অবস্থা থেকে কঠিন অবস্থায় আসতে আরও দশ হাজার বৎসর লাগল। জন্মের পনের হাজার বৎসরের মধ্যে পৃথিবী কঠিন আকার ধারণ করেছিল।

শীতল বায়ুমণ্ডলের বাষ্প মেঘে পরিণত হয়ে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর উপর পতিত হ'ল। তখন মৃত্তিকা ছিল না, তখন ছিল শুধু গলিত ধাতু সদৃশ প্রস্তর। প্রবল বাত্যাক্ষুব্ধ আকাশ, উষ্ণ প্রবল বায়ু, তীব্র প্রাবৃটধারা। প্রস্তরগাত্র-ধৌত রেণু বহন করে বৃষ্টির জল বেগে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে পতিত হ'ল, মেঘজাল ভেদ করে বিপুল আয়তন সূর্য আকাশ-পথে বিচরণ করতে লাগল, ভূমিকম্প পৃথিবীর বিরাট দেহখানাকে ঘন ঘন আন্দোলিত করতে লাগল, প্রবল জলোচ্ছ্বাসে পৃথিবী অবিরাম বিক্ষুব্ধ হতে লাগল। চারিদিকে অবিরাম সংঘাত, বিশ্ব যেন প্রলয়ের লীলাক্ষেত্র। এই ভয়ঙ্কর নাট্যলীলার মধ্যে, সেই

মহা তাণ্ডবের যুগের অবস্থাই ছিল জগতের প্রাকৃত অবস্থা। কিন্তু সেই ভীষণ তাণ্ডবলীলা, সেই প্রলয়নাচন সৃষ্টির চরম কথা নয়। ক্রমে সব আলোড়ন বিলোড়ন, সকল উপদ্রব থেমে গেল, ঝড়ঝঞ্ঝা, অগ্নিবাষ্পের উচ্ছ্বাস শান্তভাব ধারণ করতে লাগল। মহাপ্রলয়ের অন্তরে সৃষ্টির যে সৌন্দর্যলীলা গোপন ছিল, তার আত্মপ্রকাশ হ'ল। দিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল, সূর্য দূরে সরে গেল, তার উত্তাপ হ্রাস হ'ল, চন্দ্রের গতি কমে গেল, বৃষ্টি ও ঝড়ের তীব্রতা শান্তভাব ধারণ করল। ক্রমে পৃথিবী জীববাসের উপযুক্ত স্থানে পরিণত হ'ল। প্রচণ্ডের, সংঘাতের মধ্যে যে শান্তির বীজ, সৃষ্টির যে সৌন্দর্য লুকিয়ে ছিল তার আবির্ভাব ঘটল, প্রচ্ছন্ন কল্যাণ জীবনীশক্তি আকারে বিশ্বজয়ে বহির্গত হ'ল।

পৃথিবীর ক্ষুদ্রতা। সীমাহীন ব্রহ্মাণ্ডের সংগে তুলনা করলে সত্যই আমাদের এই পৃথিবী কতটুকু! আবার এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষ কত ক্ষুদ্র! রজতশুভ্র চন্দ্রের নৈশ গতি ঘণ্টায় দুই হাজার তিন শত মাইল, সূর্য কেন্দ্রের উত্তাপ পাঁচ কোটি ডিগ্রি, লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরে' প্রতিদিন তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টন হিসাবে সূর্যের ওজন হ্রাস হচ্ছে। সূর্যের ব্যাস আট লক্ষ ছেষট্টি হাজার পাঁচ শত মাইল, অর্থাৎ পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০ গুণ, এবং সূর্যের আয়তন পৃথিবীর তের লক্ষ গুণ। নক্ষত্রের সংখ্যা সমুদ্র তীরের সমস্ত বালুকণার সংখ্যার সমান। যদি প্রতি সেকেণ্ডে পঁচিশটি করে নক্ষত্র গণা হয়, তাহলে আকাশের সকল নক্ষত্র গণনা করতে সাত বৎসর লাগবে। এমন অনেক বৃহৎ নক্ষত্র আছে যাদের বিরাট পরিসরের ভিতর দশ লক্ষ সূর্যের স্থান সংকুলান হ'তে পারে। বিশ্বের পরিধি ঘুরে আসতে হ'লে আট লক্ষ মিলিয়ন "আলোক-বৎসর" লাগবে। এক বৎসরে আলো ষাট লক্ষ মাইল অতিক্রম করে। এরই নাম "আলোক-বৎসর"। এক সেকেণ্ডে আলো এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল চলে। পৃথিবীতে আসতে সূর্যরশ্মির আট মিনিট সময় লাগে। সুতরাং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব ৮ × ৬০ × ১৮৬০০০ মাইল। আমাদের নিকটতম তারকা প্রক্সিমা সেণ্টরির দূরত্ব ৪½ "আলোক-বৎসর" অর্থাৎ ৪½ × ৩৬৫ × ২৪ × ৬০ × ১৮৬০০০ মাইল।

প্রতিদিন সূর্যের উত্তাপ কোটি কোটি টন হিসাবে ক্ষয় হচ্ছে। সুতরাং এমন একদিন আসবে যখন সূর্যের পুঁজি শেষ হয়ে যাবে। তার আলো নিভে যাবে। সেদিন পৃথিবীর অবস্থা শোচনীয় হবে—সে দিন নদীর প্রবাহ থেমে যাবে, বায়ুর গতি বন্ধ হয়ে যাবে,—থাকবে শুধু উপরে নীল মেঘনির্মুক্ত আকাশ,

আর নীচে সীমাহীন নিস্তরংগ সমুদ্র। তখন বৃক্ষলতা হারাবে তাদের শ্যামল সঞ্জীবতা, পশুপক্ষী মানুষ পরিণত হবে প্রাণহীন মাংস পিণ্ডে; তখন ঢেকে যাবে বিশ্বজগৎ তামসী রজনীর সূচিভেদ্য অন্ধকারে। এই মহাপ্রলয়ের কল্পনা করতেও শংকা হয়।

দুই

প্রাণের কথা

পৃথিবীর জন্মের কথা রহস্যময়, কিন্তু জড় জগতে প্রাণশক্তির প্রথম আবির্ভাবের কথা অধিকতর রহস্যময়। পৃথিবী ছাড়া ব্রহ্মাণ্ডের আর কোন অংশে জীবের বাস সম্ভব নয়। নীহারিকায় জীবন্ত প্রাণী নাই, তারকায় কোন জীব বাস করতে পারে না। কেবল তারকা প্রদক্ষিণকারী গ্রহই জীবনিবাসের উপযোগী। আবার সব গ্রহই জীবের বাসের পক্ষে অনুকূল নয় জল বুধে বাষ্পাকার, নেপচুনে কঠিন তুষার। কোন কোন গ্রহ এমন তেজোবিকিরণক্ষম পদার্থে নির্মিত যে তাতে জীবের বাস সম্ভব নয়। জীব বাসের জন্য চাই পৃথিবীর মতো একটি গ্রহ।

কিন্তু জড় থেকে চেতনের উদ্ভব অনুকূল পারিপার্শ্বিকের ফলে আপনা-আপনি হয়েছে, না, কতকগুলি ঘটনার হঠাৎ সমাবেশে জীবের উৎপত্তি হয়েছে, প্রাণীতত্ত্ববিৎ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অসমর্থ। জীবলেশশূন্য কোটি নীহারিকা, লক্ষ লক্ষ তারকা আপন আপন জড় শরীরকে ধ্বংস করে মহাশূন্যে আলো ও উত্তাপ বিস্তার করেছিল। তা কি শুধু জীব-সৃষ্টির জন্য? অথবা প্রকৃতির অপর কোন মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে জীবসৃষ্টি কি নিতান্তই একটা আকস্মিক ও তুচ্ছ ঘটনা? এ সকল প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। ক্রমবিকাশবাদ জড় ও প্রাণের, প্রাণ ও চিৎশক্তির প্রভেদ মুছে দিতে চেয়েছে; কিন্তু কি ভাবে অথবা কেন একখানা প্রস্তরখণ্ড একটি ক্ষুদ্র কীটে এবং একটি ক্ষুদ্র কীট ইচ্ছা-অভিরুচি-বুদ্ধিসমন্বিত মানুষে পরিণত হয়েছিল, তা এখনও অবিদিত।

পৃথিবী উষ্ণ অবস্থায় কেবলমাত্র বাষ্প ও বায়ুর আকারে বর্তমান ছিল। তখন জল ছিল না। কিন্তু তার পূর্বে পাহাড় ছিল। আগ্নেয়গিরির উষ্ণ গলিত ধাতুর উপরের অংশ শীতল হ'লে যেমন একটা কঠিন আবরণ সৃষ্টি হয়,

তেমনি পৃথিবীর উষ্ণ তরল পদার্থের উপর পিষ্টকের মতো একটা কঠিন আবরণ সৃষ্টি হ'ল। ইহাই প্রাচীনতম পাহাড়। পৃথিবীর উষ্ণতা হ্রাসের সংগে যুগ যুগ ধরে পাহাড়ের স্তর গড়ে' উঠল। উষ্ণ বাষ্প উষ্ণ জলে পরিণত হ'ল, জল নীচে পাহাড় স্তরের উপর নদীর আকারে প্রবাহিত হ'ল। অথবা অপেক্ষাকৃত নিম্নস্থানে হ্রদ ও সমুদ্রের আকার ধারণ করল। নদীসকল গৈরিক কণা বহন করে' চলায় স্তর সজ্জিত হ'ল। এই সকল পাহাড়ের স্তরে প্রাণবান্ জন্তুর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না।

যুগ বিভাগ। পণ্ডিতরা পৃথিবীর বয়সকে তিনটি দীর্ঘ যুগে বিভক্ত করেছেন —প্রত্নজীবক, মধ্যজীবক ও নব্যজীবক। লক্ষ লক্ষ বৎসরব্যাপী যুগত্রয় কয়েকটি উপযুগে বিভক্ত হয়েছে। প্রথম যুগের সাতটি উপযুগ—আদিম, কাম্ব্রিক, আর্দো-ভিসীয়, সিলিরিউক, ডিভোনিক, অঙ্গারবহ এবং পার্মিক। দ্বিতীয় যুগের তিনটি উপযুগ—এয়াসিক, জুরাসিক ও খটিক। তৃতীয় যুগের সাতটি উপযুগ—প্রাগাধুনিক, অল্পাধুনিক, মধ্যাধুনিক, বহ্বাধুনিক, অন্ত্যাধুনিক, উপাধুনিক এবং আধুনিক।

এক অনির্বচনীয় নাম-রূপহীন শক্তি ইলেকট্রোণ এবং প্রোটন নামে বৈদ্যুতিক শক্তির জননী। এই শক্তিই ক্রমবিকশিত হ'য়ে জড় জগতের সৃষ্টি সম্ভবপর করেছিল। এই শক্তি কি এবং কোথা থেকে এসেছিল, বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেনি। এই অনুপম শক্তিই মানুষের ভিতর অনুভব ও চিন্তা-শক্তিরূপে অভিব্যক্ত হয়েছে। এই শক্তিই গোলাপ ফুলের চোখজুড়ান সৌন্দর্যে বিকশিত, প্রজাপতির অপরূপ রঙে পরিস্ফুট,—সন্ধ্যার কনকবর্ণে, ঊষার গলিত স্বর্ণে, তটিনীর আলোক বিচ্ছুরিত জলে, বসন্ত বাতাসের সুরভি নিশ্বাসে, পূর্ণিমার রজতশুভ্র আকাশে মূর্ত হয়ে ওঠে। এই শক্তিই আবার মাতৃবক্ষে সুমধুর স্তন্যক্ষীর ও অপত্য স্নেহরূপে আত্মপ্রকাশ করে' বিশ্বের পালন ও পোষণ ক্রিয়ার সহায়ক হয়েছে।

চেতনের আবির্ভাব। আধুনিক বিজ্ঞান বলে, জগতের কোন পদার্থ নির্জীব নয়। সজীব এবং নির্জীব পদার্থের মধ্যে প্রভেদ বস্তুগত, গুণ বা ধর্মগত নয়। অনেকে অনুমান করেন, মাটি, জল ও বায়ুর উৎপত্তি হওয়ার পরে পৃথিবী যখন জীববাসের পক্ষে উপযোগী হয়েছিল, তখন সম্ভবতঃ সমুদ্রের কর্দমাক্ত জলের উপর সূর্যরশ্মি পড়ে এক রকম রাসায়নিক ক্রিয়াবলে লালার মত এক প্রকার পদার্থ উৎপন্ন হয়েছিল। এই লালা সর্বপ্রথম জৈব ক্রিয়ার আধার। পরে জীবকোষ জীবাণুতে পরিণত হল। জীবকোষের ভিতর একটি বস্তু আছে।

এর নাম প্রোটোপ্লাজম্‌। একটি কোষ দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে দুইটি কোষ উৎপন্ন করল। তারা আবার প্রত্যেকে দুইভাগে বিভক্ত হ'য়ে ক্রমে অসংখ্য কোষ উৎপাদন করল। এই কোষগুলি থেকে বৃক্ষাদি উদ্ভিদ, পশু কীট পতংগ মনুষ্যাদির দেহ নির্মিত হয়েছে।

প্রাণের আধার প্রোটোপ্লাজম্‌ দৈ বা জেলির মতো একটি ঘন পদার্থ। এর উপরে অতি পাতলা একটি আবরণী আছে। প্রোটোপ্লাজমে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্বুদ থাকে। এই সকল অর্বুদের কতকগুলি জীবদেহের ইন্দ্রিয় গঠনে সাহায্য করে, আবার কতকগুলি কোষের খাদ্যরূপে ব্যবহৃত হয় ও তাদের পোষণ ক্রিয়ায় সাহায্য করে। উচ্চস্তরের জীবদেহে অনেকগুলি কোষ বা সেল (cell) থাকে। কিন্তু অতি নিম্নস্তরের উদ্ভিদ ও এমিবা প্রভৃতি কীটাণুর একটি মাত্র জীবকোষ। প্রথম স্তরের জীবের আবশ্যক নানা প্রকারের। সুতরাং তাদের দেহের গঠনপ্রণালীও অত্যন্ত জটিল। জীবদেহের সেলগুলি বাইরের নূতন উপাদান সংগ্রহ ক'রে বর্ধিত হয়। বৃদ্ধির পরিপূর্ণতায় নূতন সেলের উৎপত্তি। নূতন সেলগুলি জীবদেহের বৃদ্ধি সম্পাদন করে। বাইরের উপাদান সংগ্রহ করার ক্ষমতা কমে গেলে জীবের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে নূতন জীব সৃষ্টির উপায় রেখে যায়। এর নাম জীবের বংশবৃদ্ধি। পৃথিবীতে সুবিধা বা খাদ্যের জন্য জীব অপরের সংগে অনবরত যুদ্ধ করে। এর নাম জীবন-সংগ্রাম। জীবন-সংগ্রামে কোন কোন জীব টিকে যায়। আবার কেউ বা লোপ পায়। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত গুণ জীবের উপর বিশেষ ক্রিয়া প্রকাশ করে। এতে এক জাতীয় জীবের বিশেষত্ব বংশ পরম্পরায় রক্ষা পায়। বংশগত সাদৃশ্য বর্তমান থাকলেও ব্যষ্টিগত প্রভেদ দেখা যায়। সন্তান পিতামাতা থেকে জন্মে, তাদের গুণ ও দেহ উত্তরাধিকারসূত্রে পায়, কিন্তু তার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যও থাকে। একথা প্রত্যেক জাতির জীব-সম্বন্ধে খাটে। এর প্রকাশ জীবজগতের প্রতি স্তরে। অবস্থা পরিবর্তনের সংগে জীবের দেহে ও মনে পরিবর্তন ঘটে। কতগুলি জীবের পক্ষে নূতন পরিবর্তিত অবস্থা অনুকূল হয়। তারা বেশী দিন বাঁচে, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়, তারা সন্তান প্রসব করে। যাদের বেষ্টনী প্রতিকূল, তারা জীবন যুদ্ধে টিকে থাকতে পারে না, শীঘ্র মরে যায়। কতগুলি জীব ক্রমে শক্তিশালী ও বর্ধিত হয়, যারা দুর্বল তারা লুপ্ত ও অদৃশ্য হয়ে যায়।

প্রাণীতত্ত্ববিদদের মতে মানুষ জীবধারার শেষ ও অত্যুত্তম পরিণতি।

ত্রিশকোটি বৎসর পূর্বে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণশক্তির আবির্ভাব ঘটে এবং বুদ্ধিমান্ সামাজিক জীব হিসাবে মানুষ অন্ততঃ ত্রিশ হাজার বৎসর বর্তমান আছে বলে, সে জ্ঞান ও শক্তি অর্জনের বিপুল সুযোগের অধিকারী হয়েছে। নব্যজীবক যুগের শেষভাগে অর্থাৎ অত্যাধুনিক উপযুগ থেকে মানুষের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রস্তর স্তরে জীবাশ্ম থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, মানুষের জন্মের পূর্বে জীবন্ত প্রাণী বর্তমান ছিল। শ্লেটচুণ ও বালির পাথর প্রভৃতির উপর হাড়, খোলা, আঁশ, পায়ের দাগ প্রভৃতি, জলস্রোত ও বৃষ্টির চিহ্ন দেখা যায়। এই ধরণের পাষাণের কথা পৃথিবীর জন্মের ইতিহাস আমাদের শ্রুতি-গোচর করে। এর নাম প্রস্তরলিপির যুগ। এক শত ষাট কোটি বৎসর এই যুগের পরিমাণ বলে' পণ্ডিতরা অনুমান করেন। এমন কি প্রত্নজীবক যুগের শেষভাগে কোন না কোন রকমের প্রাণী বর্তমান ছিল বলে' প্রমাণ পাওয়া গেছে। শামুকের খোলা, সমুদ্রের উদ্ভিদ, চিংড়ি জাতীয় জীব সমুদ্রের কীট-বিশেষের চিহ্ন। ট্রাইলোবাইট নামে সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী প্রত্নজীবক যুগের শেষ দিকে বর্তমান ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে দ্রুতগামী ও শক্তিশালী বৃশ্চিক সমুদ্রে বাস করত। এদের মধ্যে কোন কোন বৃশ্চিক নয় ফুট পর্যন্ত লম্বা ছিল। তখনও কোন ভূচর প্রাণী বা উদ্ভিদ জন্মায়নি এবং মাছ কিংবা মেরুদণ্ডী প্রাণীও দেখা দেয়নি। তবে তখনও "জায়স্ব ম্রিয়স্ব" জাতীয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব যে বর্তমান ছিল, তাতে কোন সন্দেহ নাই। এখনও এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র ও কোমল দেহবিশিষ্ট বহু প্রাণী আছে। জীবজগতের শৈশব অবস্থায় এই ধরণের ক্ষুদ্রাবয়ব অসংখ্য প্রাণী জন্মাত, বাড়ত, বেঁচে থাকত এবং মরে যেত কিন্তু তাদের অস্তিত্বের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না।

ক্রমবিকাশবাদ। নানা জাতীয় উদ্ভিদ ও জীব একদিনেই সৃষ্ট হয়নি। তারা দীর্ঘকাল ধরে ক্রমে বিকাশ লাভ করেছে। এর নাম ক্রমবিকাশবাদ। এই মতে জৈব শক্তি অকস্মাৎ ধরাতলে আবির্ভূত হয়নি, কিংবা হস্তপদযুক্ত বুদ্ধিমান মানুষ কোন এক শুভক্ষণে অবতীর্ণ হয়নি। যে কোন প্রকারে হোক্ না, প্রাণের প্রথম স্পন্দন যুগযুগান্ত ধরে' এক অন্তর্নিহিত শক্তি-প্রভাবে প্রতিকূল অবস্থার সংগে সংগ্রাম করে বর্তমানের উচ্চশ্রেণীর জীবে পরিণত হয়েছে। আমরা বহু প্রাচীনকালের জেলির মতো অস্থিহীন কোমল প্রাণবান্ বস্তুর অতি দূর বংশধর।

এই মতবাদের প্রচারে উনিশ শতকে জ্ঞানের রাজ্যে বিপ্লব ঘটেছিল। এর

প্রচার কর্তার নাম ডারউইন। লামার্ক তাঁর পূর্বগামী। ডারউইন বলেন, অস্তিত্বের জন্ম সংগ্রামে যোগ্যতমের উদ্বর্তন হয়। প্রকৃতি যাদের নির্বাচন করলেন, তারা হ'ল পৃথিবীর কর্তা ও ভোক্তা। যারা বাতিল হ'য়ে গেল, তারা ভারবাহীমাত্র। লামার্ক বললেন, প্রাণী আপনাকে ইচ্ছানুযায়ী বিবর্তিত করতে পারে। প্রকৃতির পরীক্ষা আবহমানকাল চলেছে। যে নির্বাচনের সৌভাগ্য লাভ করল, সে বংশানুক্রমিক অনুবর্ত্তনের অনুসরণ করিল। সুতরাং ইচ্ছা করলেই আমরা বংশের বিবর্তন ঘটাতে পারি, এমন কি অতিমানব হতে পারি। পরিবর্ত্তনশীলা ও পরীক্ষাপরায়ণা প্রকৃতির মানুষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব নাই। যদি আমরা সমাজের কালোপযোগী সংস্কার না করি, তাহলে প্রকৃতি একদিন আমাদের উপর আস্থাহীন হয়ে অন্য কোন প্রাণীকে শ্রেষ্ঠতায় উন্নীত করবে। লামার্ক মানুষকে আশার বাণী শুনিয়েছেন, কিন্তু ডারউইনের হৃদয়হীন সমাচার সে যুগের মনীষীরা মানুষের নবধর্মরূপে গ্রহণ করেছিলেন।

সাধারণভাবে দেখলে আধুনিক সভ্যতা মধ্যযুগের সভ্যতার সন্তান। মধ্যযুগের সভ্যতা পূর্ববর্তী গ্রীক, আসিরিয় ও মিশরীয় সভ্যতার উপাদান গ্রহণ করেছিল। এইভাবে পশ্চাতে অনুসন্ধান করতে করতে আমরা আদিম বর্বরতার যুগে উপস্থিত হই। বর্বর মানুষের দেহ ও মন উলঙ্গ ছিল। তাদের আইন, শিক্ষা, চিন্তা, এমন কি ভাষারও অভাব ছিল। ক্রমে মানুষ নিম্নশ্রেণীর জীবজন্তুর উপর আধিপত্য স্থাপন করল, সমাজ পত্তন করল ও বুদ্ধিবলে প্রকৃতিকে জয় করে, উন্নতির পথে অগ্রসর হ'ল। কিন্তু উন্নতির প্রবাহ সমভাবে অগ্রসর হয়নি, মাঝে মাঝে তার অবরোহণ ঘটেছে। লুপ্ত বা অনুন্নত জাতি বা ব্যক্তির জ্ঞান পরবর্তী জাতির বা ব্যক্তির পৈতৃক সম্পত্তি। পরিবর্তন, বিবর্তন ও বিপ্লবের সাময়িক আঘাতে কোন জাতির অধঃপতন ঘটেছে, কিন্তু তাতে মানব জাতির সভ্যতা লুপ্ত হয়নি, বরং সাময়িক অবনতির সোপান ধরে', বিফলতার দৃষ্টান্তে শিক্ষালাভ করে' মানুষ ক্রমোন্নতির দুর্গম পথে অগ্রসর হয়ে গৌরব অর্জন করেছে। জড় বিজ্ঞানের মতে সৃষ্টি ক্রমিক উন্নতির পথে চলেছে। জড়ের পর জীবন, জীবনের চেতনা, চেতনার পর মন ও বুদ্ধি—বিশ্ব সৃষ্টির আদিতে আগুন-উত্তাপ ছিল, তারপর জলবায়ু, তারপর গাছপালা, তারপর জীবজন্তু এবং সকলের শেষে মানুষ। মানুষ প্রথমে বনমানুষ ছিল, তারপর আদিম অসভ্য মানুষ এবং সর্বশেষ—আধুনিক সুসভ্য মানুষ। বিজ্ঞান-অনুমোদিত উন্নতির সোপান এই।

অপরে বলেন—ক্রমবিবর্তন বাদ কাল্পনিক কথামাত্র। এক অনির্বচনীয় শক্তিবলে মানুষ উচ্চতম গুণের অধিকারী হয়েই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছিল। জড়পদার্থ কখনও প্রাণশক্তি ও চিৎশক্তিতে বিবর্তিত হয়নি। পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন বিদ্যা প্রাণশক্তি সৃষ্টি করতে পারেনি। মানুষ জন্মাবধি মনোময় জীব। তার বৈশিষ্ট্য এইখানে। পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গের মতো সে পূর্বপুরুষের প্রভাব স্বীকার ক'রে নেয় বটে, কিন্তু স্বকীয় অনন্য সাধারণ চেতনা এবং অভিজ্ঞ স্মৃতির নির্দেশে পরিবার ও সমাজ সৃষ্টি করে' স্বরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করে, গোষ্ঠী ও জাতি রক্ষা করার উদ্দেশ্যে বিধি-নিষেধ, আইন-অনুশাসন রচনা করে, এক কথায়, বাঁচতে ও বাড়তে চেষ্টা করে।

জীবনের রূপ পরিবর্তিত হয়েছে, তার ছন্দের পরিবর্তন হয়নি। পশ্চাতে অতীতের তিমিরময় পথে অগ্রসর হলেও আমরা মনুষ্য-সভ্যতার মূল উৎসে পৌঁছুতে পারি না। সুদূর অতীতেও এমন অনেক জাতির সন্ধান পাই, যাদের সভ্যতা ছিল বিরাট্, সংস্কৃতি ছিল সুমহান্, শিল্প ও কারুকার্য ছিল উপাদেয়। অতি আধুনিক কালের সুসভ্য জাতিও অনেক বিষয়ে তাদের সমকক্ষ নয়। মিশরের ভূগর্ভ, গোবি মরুর বালুরাশির তলদেশ, সুমেরিয়া প্রভৃতি স্থানের মৃত্তিকাস্তরের অন্তরালে, পরিত্যক্ত ও দুর্গম মরুকান্তারে উচ্চ সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া যায়। কি ভাবে জড় প্রাণে, প্রাণ চেতনায়, চেতনা মন ও বুদ্ধিতে পরিণত হল, তার কোন প্রমাণ নাই। এজন্য ক্রমবিকাশবাদ গ্রহণযোগ্য নয়।

উচ্চতর জীবের পূর্বপুরুষ নিম্নশ্রেণীর প্রাণী, ডারউইনের এই মত, প্রাণীজগতে সত্য হতে পারে, কিন্তু নিম্নতম সভ্যতা যে উচ্চতর সভ্যতার জনক—তা অসন্দিগ্ধ সত্য বলে গ্রহণ করতে পারা যায় না।

তিন

প্রাণের অভিযান

জীবের ক্রমবিকাশ। মাটি, জল ও বাতাস উৎপত্তি হওয়ার পর পৃথিবীতে প্রাণশক্তির আবির্ভাব হয়েছিল। জলাভূমির কাছে ছোট ছোট গাছপালা ও ঝোপের জন্ম হয়েছিল। পরে উভচর বহু কীটপতঙ্গের সৃষ্টি হল। প্রথমে কেবলমাত্র জলাভূমি ও সমুদ্রতীর জীবের বাসস্থান ছিল। ক্রমে জলজ উদ্ভিদ

উচ্চভূমির দিকে বিস্তৃত হয়ে তরুলতার আকার ধারণ করল। অপর দিকে আবার কীটপতংগ প্রভৃতি কোমল মেরুদণ্ডী জীব সরীসৃপের আকারে পরিণত হ'ল। এদের প্রকাণ্ড উদর এবং চারটি সরু ও দুর্বল পা ছিল। এজন্য তারা কুমীরের মতো কাদায় বাস করত। পরে তারা চারখানি পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতে শিখল। তাদের ভিতর যারা আকারে বড় ছিল, তারা পেছনের দুইখানি পা এবং লেজের উপর ভর দিয়ে সামনের দুইখানি পায়ের সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহ করত। এদের সংগে স্তন্যপায়ী জীবের সাদৃশ্য আছে বলে', এদের নাম থেরিওসোরফা বা স্তন্যপায়ী সরীসৃপ। প্লিসিওসরস্ এবং ইক্‌থিওসরস্ নামে বৃহদাকার সরীসৃপ তিমির মতো সমুদ্রে বাস করত। এক একটি প্লিসিওসরস্ ত্রিশ ফুট লম্বা ছিল। সোমাসরস নামে আর এক জাতীয় সরীসৃপকে সমুদ্রের টিকটিকি বলা যেতে পারে। মেসোজোয়িক যুগের সব চেয়ে বড় সরীসৃপকে ডাইনোসরস বলে। গ্রীক ভাষায় ডাইনো শব্দের অর্থ ভয়ানক এবং সর বা সরস্ অর্থে সরীসৃপ। তাদের মতো অতিকায় জীব আর ছিল না। তারা তিমির মতো বৃহৎ ছিল। তারা লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করত, পেছনের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াত এবং সামনের পায়ের সাহায্যে ঝোপে-জংগলে বড় বড় গাছের পাতা খেত।

ভারতবর্ষেও আমিষভোজী ডাইনোসরসের অস্থি পাওয়া গেছে। জব্বলপুরের কাছে 'বড় সিমলা' পাহাড়ে ডাইনোসর জাতীয় অধুনা লুপ্ত অতিকায় সরীসৃপের অস্থি আবিষ্কৃত হয়েছে। 'ছোট সিমলা' পাহাড়ে যে কয়টি অতিকায় সরীসৃপের অস্থি পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে একটি প্রায় ত্রিশ হাত লম্বা ছিল। আর একটি জানোয়ারের বৃহৎ অস্থি পাওয়া গেছে। তার নাম দেওয়া হয়েছে টাইটানোসরস্।

ডাইনোসর জাতীয় সরীসৃপ থেকে আর এক প্রকার সরীসৃপের জন্ম হয়। এরা দেখতে পাখীর মত ছিল, কিন্তু এদের ডানা ছিল না। এদের পাখী বা পাখীর ঊর্ধ্বতন পুরুষ বলা চলে না।

সরীসৃপ জাতীয় জীব প্রাণশক্তির অভিব্যক্তির দ্বিতীয় স্তরে ছিল। তাদের কোন শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। পৃথিবীর আবহাওয়া পরিবর্তনের সংগে জীবন সংগ্রাম কঠিনতর হয়। শক্তিশালী সরীসৃপের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার অভিপ্রায়ে বহু প্রাণী অপেক্ষাকৃত উঁচু জমির দিকে পালিয়ে যেতে লাগল। পলায়নের চেষ্টা ও আত্মরক্ষার প্রেরণায় তাদের আকৃতি

পরিবর্তিত হতে লাগল। ক্রমে তাদের ডানা বা পালক দেখা দিল। এরাই আদিম পক্ষী জাতীয় জীব।

আদিম যুগের পাখীর ঠোঁট ছিল না। তাদের চোয়ালে দাঁত ছিল। তারা উড়তে পারত না। মেসোজোয়িক যুগের এ সকল প্রাণী শীত সহ্য করতে পারত না, তাদের লোম বা পালক ছিল না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনে বা অন্য কোন অজ্ঞাত কারণে এ যুগের জীব সকল ধ্বংস হয়েছিল।

জীবজগৎ বিভিন্নরূপে ক্রমবিকশিত হয়েছে, কিন্তু আদি কালের সকল জীবজন্তুর বিলোপ হয়নি। যারা পারিপার্শ্বিকের সংগে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে তাদের মধ্যে কোন কোন প্রাণী বংশ রক্ষা করে এসেছে এবং যারা তাতে অকৃতকার্য হয়েছে তারা জীবন-সংগ্রামে পরাজিত হয়ে পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে চিরকালের মতো বিদায় গ্রহণ করেছে। জীবজগতের ক্রম পরিণতি নিরন্তর ঘটছে, কিন্তু তা এত ধীর ও মন্থর যে সহজে ধরা যায় না। আবার কোন জাতীয় জীব পারিপার্শ্বিকের সংগে সংগতি রক্ষা করে আত্মরক্ষা ও বংশ-বৃদ্ধির সুবিধার জন্য পুরাতন স্বভাব পরিবর্তন করেছে এবং নূতন অনুকূল পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েছে।

মৎস্যই সর্বপ্রথম মেরুদণ্ডী জীব। মেরুদণ্ডী এবং অমেরুদণ্ডী জীবের মাঝামাঝি এম্ফিওক্সাস্ নামে এক প্রকার জীব দেখতে পাওয়া যায়। এদের মেরুদণ্ড নাই, কিন্তু 'নোটোকর্ড' নামে স্থূল মাংসের একটি দণ্ড আছে। এই শ্রেণীর কোন একটি জীব থেকেই মেরুদণ্ডী মৎস্যের উৎপত্তি হয়েছিল।

মৎস্য জাতীয় জলচর জীবসকল কান্‌কোর সাহায্যে জলের ভিতর বায়ু সেবন করত, কিন্তু এই ধরণের যন্ত্রের সাহায্যে শুষ্ক ভূমির উপর শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা সম্ভব হল না। ব্যাঙ্ ও কাকলাস্ জাতীয় উভচর প্রাণী প্রথমে জলচর ছিল এবং কান্‌কোর সাহায্যে বায়ু গ্রহণ করত। পরে ফুসফুস্ বর্ধিত হয়ে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণের উপযোগী হ'লে তারা ভূমির উপর বিচরণ করতে সমর্থ হ'ল। তখন কান্‌কো ব্যবহারের প্রয়োজন না হওয়ায় তার আকার ছোট হ'য়ে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন এরা বায়ু সঞ্চালিত ভূমির উপর বাস করতে লাগল, কিন্তু ডিম পাড়ার সময় জলের ধারে ফিরে আসত। জলাভূমি ও উদ্ভিজ্জের যুগে মেরুদণ্ডী জীবসকল উভচর ছিল। তাদের ভূচর বলা যেতে পারে, কিন্তু তারা জলাভূমি ও ভিজা জায়গার কাছে বাস করত। এ যুগের গাছে ফল ও ফুল বা বীজ জন্মাত না।

জলই সকল প্রকার উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্মস্থান। সকল মেরুদণ্ডী প্রাণী, এমন কি মানুষও ডিমের ভিতর জন্মায়। পৃথিবীর উপর মুক্তবায়ু গ্রহণের উপযোগী ফুস্‌ফুস্‌, চোখের পাতা, গ্রন্থি, কর্ণপটহ এবং দেহের প্রায় সমস্ত যন্ত্র ক্রমশঃ বিকাশ লাভ করে। এই যুগের নাম অংগারবহ। এই যুগে উভচর প্রাণী ছিল। সরীসৃপ যুগের পর পক্ষী ও স্তন্যপায়ী জীবের যুগ এসেছিল। প্রথম অবস্থায় স্তন্যপায়ী জীবসকল শাবকের স্তন্যপান করার বয়স অতিবাহিত হ'লে পরস্পরের সংগ ত্যাগ করত, কিন্তু সহজ বুদ্ধি বৃদ্ধির সংগে তারা দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করতে লাগল। সংঘবদ্ধ বা দলবদ্ধ হওয়ার মনোভাব জগতে সমাজ পত্তনের পূর্বাভাস।

সরীসৃপ ও মৎস্য দলবদ্ধ হ'য়ে বাস করে। এর প্রধান কারণ বাহ্যিক অবস্থা। ডিমগুলি একত্র থাকে, ছানা জন্মাবার পরেও তারা এক সংগে থাকে, কিন্তু স্তন্যপায়ী জীব অন্তরের প্রেরণার বশবর্তী হয়ে সংঘবদ্ধ হয় এবং একত্র বাস করে। সম ভাব, সম অবস্থা এবং সম স্থলে বসবাস করার জন্য তারা পরস্পরকে ভালোবাসে। ভালোবাসার স্বর্ণ সূত্র তাদের একত্র বাস করার প্রেরণা যোগায়। সরীসৃপের স্বাভাবিক ইচ্ছা ক্ষুধা তৃষ্ণা ভয় ঘৃণার মূলে প্রেরণা বর্তমান আছে। স্তন্যপায়ী জীব ও পাখীদের ভিতর আত্মশাসনের ক্ষমতা আছে, সামাজিক ভাব আছে. আত্মসংযম আছে, এমন কি মনুষ্যসুলভ ধর্ম আছে। এজন্য তাদের সংগে মানুষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, তাদের পোষ মানাতে পারে, তাদের সংগে ভালবাসার আদান-প্রদান চালাতে সমর্থ হয় এবং শিক্ষা দিয়ে তাদের কার্যোপযোগী করে তুলতে পারে।

কোন্ সুদূর অতীত যুগের উষাকালে গগনবিহারী সূর্য সহস্র বাহু প্রসারিত করে' আঁকাশ-রাজ্যে সৃষ্টির অগ্নিধারা বর্ষণ করেছিলেন, তা আমাদের জানা নাই। তারপর খণ্ড গ্রহসকলের সংঘাত ও মিলনে পৃথিবীর জন্ম হ'ল। পৃথিবীর তরুণ অবস্থায় আগুন জল হাওয়ার তাণ্ডবলীলা চলেছিল। সে নৃত্য-লীলার চরণপাতে আজিকার এই পৃথিবীর প্রাণময় সত্তা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করল। পরে মেরুদণ্ডহীন ত্রিলবাইট সমুদ্রের একচ্ছত্র সম্রাট হ'ল। অস্থিযুক্ত জীব তখনও দেখা দেয়নি। পরে স্থলচর প্রাণীর সৃষ্টি হল। এর কোন বংশ অতিকায় জীবে পরিণত হ'য়ে পৃথিবীর বিভিন্ন যুগে সাম্রাজ্য স্থাপন করল। তারা আবার নতুন প্রাণীর জন্য পথ ছেড়ে দিল। আবার কালের স্রোতে ভেসে গিয়ে তারা লুপ্ত হয়ে গেল। সৃষ্টির চিরন্তন ধারা এই।

চার

মানুষের জন্ম-কাহিনী

মানুষের আবির্ভাব। কেনোজোয়িক যুগে প্রাণীদের বুদ্ধিবৃত্তি আশ্চর্যরূপে বেড়ে উঠল। তাদের পরস্পরের উপর নির্ভরশীলতার ভাব এল। ক্রমে কুৎসিত এবং অতিকায় জন্তুসকল অদৃশ্য হয়ে গেল। জিরাফ উট ঘোড়া হাতী হরিণ সিংহ বাঘ প্রভৃতি সুশ্রী জন্তু আবির্ভূত হল। এ যুগে বিভিন্ন আকারের বানরের জন্ম হল। যবদ্বীপের ত্রিনিল নামক স্থানে এক জাতি বানরের হাড়, মাথার খুলি ও চোয়াল পাওয়া গেছে। এর মাথার খুলি মানুষের মাথার খুলির চেয়ে ছোট, চিমপ্যানজির মাথার খুলির চেয়ে বড়। এর উরুর অস্থি দেখে মনে হয় যে, এই জীবটি মানুষের মতো দাঁড়াতে ও দৌড়তে পারত। অনেক বিষয়ে মানবাকৃতি বানরের সংগে সাদৃশ্য থাকায় একে পিথিক্যানথ্রোপাস্ বা আধা-মানুষ বলা হয়। কেনোজোয়িক যুগের বানরদের বিভিন্ন নাম আছে। এদের পরবর্তী বংশধরের অস্থি পাওয়া যায় না। তবে তার অস্ত্রশস্ত্র তার অস্তিত্বের প্রমাণ দেয়।

বুদ্ধিমান বানর। প্রথম মানুষ আবির্ভূত হওয়ার বহু পরে যুগ পরিবর্তনের ফলে গ্রীষ্মপ্রধান বা নাতিশীতোষ্ণ দেশগুলি হঠাৎ বা ক্রমশঃ শীতপ্রধান হ'য়ে উঠে। এই যুগবিপ্লবের সন্ধিক্ষণে মানুষ যে অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত তা তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। এক লক্ষ বৎসর পূর্বের যে সকল অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলি কোন হস্তপদবিশিষ্ট জীব নির্মাণ করেছিল, কিন্তু ঐ সকল জীব যথার্থ মানুষ নামের উপযুক্ত নয়—তারা ছিল বুদ্ধিমান বানর মাত্র। তাদের মাথার খুলি, দাঁত ও হাড় দেখে মনে হয় যে, তারা বানরজাতীয় মানুষ ছিল। তাদের মাথার খুলি এখনকার বানরের মাথার খুলির চেয়ে বড় ছিল। তারা সোজা দাঁড়িয়ে হাঁটতে পারত। তাদের পাথরের অস্ত্রশস্ত্রে শিল্পবুদ্ধির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ক্রমে পাথরের অগ্রভাগ অন্য পাথরে ঘসে তীক্ষ্ণ করা হ'ত। এর আকার বর্শার মতো ছিল। ধাতু থেকে অস্ত্র নির্মাণ করার পূর্ব পর্যন্ত সময়ের নাম প্রস্তরযুগ। প্রস্তরযুগের দুইটি বিভাগ—প্রত্নপ্রস্তর যুগ এবং নব্যপ্রস্তর যুগ। প্রথম যুগের অস্ত্রশস্ত্রাদি পরবর্তী যুগের অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে বড় ছিল।

হিডেলবার্গ মানুষ। হিডেলবার্গের বালিরাশির ভিতর মনুষ্যবিশেষের চোয়ালের অস্থি পাওয়া গেছে। এর চিবুক ছিল না, কিন্তু চোয়ালের হাড় স্থূল ও ছোট ছিল। এর মুখের ভিতর এত অল্প স্থান ছিল যে এর জিহ্বা সঞ্চালনের উপায় ছিল না। এর চোয়ালের হাড় বড় ছিল এবং বৃহৎ হাত ছুখানি লোমে ঢাকা ছিল। এই অতিকায় দৈত্যের নাম হিডেলবার্গ মানুষ। তখন তীক্ষ্ণধার দন্তযুক্ত হিংস্র ব্যাঘ্র ও লোমে আবৃত দুর্জয় গণ্ডার গভীর অরণ্যে ভ্রমণ করে বেড়াত। এদের দেখে সেই ভীষণদর্শন মানুষও ভয় পেত, পর্বতে ও উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হ'ত এবং প্রস্তরের অস্ত্রের সাহায্যে তাদের বধ করতে চেষ্টা করত। এরা প্রত্নপ্রস্তর যুগের তথাকথিত মনুষ্য।

নিয়েণ্ডারথল মানুষ। প্রায় পঞ্চাশ বা ষাট হাজার বৎসর পূর্বে একপ্রকার মানুষ-বিশেষ জীব বাস করত। তাদের মাথার খুলি ও হাড় এবং অস্ত্র পাওয়া গেছে। তারা কৃত্রিম উপায়ে আগুন উৎপাদন করতে পারত, শীতের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য পর্বতগুহায় বাস করত, চামড়ার কাপড় পরত এবং ডান হাতের ব্যবহার জানত। তাদের কপাল ছোট এবং ভ্রূ দুটি উঁচু ছিল, হাতের বুড়া আঙুল অপর আঙুলের মত সোজা ছিল, তারা ঘাড় বাঁকিয়ে আকাশের দিকে তাকাতে পারত না, মাটির দিকে চেয়ে চলত। তাদের চোয়ালের হাড় ও দাঁত মানুষের মতো ছিল না। তাদের মাথার খুলি মানুষের মাথার খুলির মতো ছিল এবং মগজের পরিমাণ পেছনে ও নীচে অপেক্ষাকৃত বেশী ছিল। তারা বর্তমান কালের মানুষের পূর্বপুরুষ ছিল না। এই লুপ্ত মনুষ্যবিশেষের মস্তক ও অস্থি নিয়েণ্ডারথল ও অন্যান্য স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এজন্য এদের নাম নিয়েণ্ডারথল মানুষ।

এরা ইয়োরোপে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিল। সেকালে ইয়োরোপের ভৌগোলিক অবস্থা ভিন্ন ধরণের ছিল। টেমস্ নদী থেকে রাশিয়া পর্যন্ত বরফে ঢাকা ছিল, ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স একটি অবিভক্ত দেশের অন্তর্গত ছিল, লোহিত সাগর ও ভূমধ্যসাগর বিস্তৃত উপত্যকা ছিল, তার গভীর অংশে কতগুলি হ্রদ ছিল এবং কৃষ্ণ সাগর থেকে দক্ষিণ রাশিয়ার উপর দিয়ে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত একটি বৃহৎ সাগর অবস্থিত ছিল। স্পেন ও ইয়োরোপের অন্যান্য অংশ শীতপ্রধান এবং উত্তর আফ্রিকা নাতিশীতোষ্ণ ছিল। দক্ষিণ ইয়োরোপের শীতপ্রধান উচু স্থানের উপর লোমশ ও অতিকায় ম্যামথ ও গণ্ডার, বৃহৎ আকারের ষাঁড় ও হরিণ ভ্রমণ করত।

ক্রোম্যাগ্নন ও গ্রীমল্ডীর মানুষ। প্রায় ত্রিশ হাজার বৎসর পূর্বে যুগপরিবর্তনের সংগে শীতপ্রধান ইয়োরোপ গ্রীষ্মপ্রধান হ'য়ে উঠল। সে সময়ে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে এক দল প্রাণী ইয়োরোপে এল। তারা অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ছিল, কথা বলতে পারত এবং একসংগে কাজ করত। তারা নিয়েণ্ডারথল মানুষকে গুহা থেকে বিতাড়িত করল, সম্ভবতঃ তাদের ধ্বংস করে দিল। এরা আমাদের পূর্বপুরুষ ছিল বলা যেতে পারে। এদের মাথার খুলি, বুড়া আঙুল, ঘাড় ও দাঁত আমাদের মতো ছিল। ক্রোমাগনন এবং গ্রীমল্ডীর পর্বত গুহায় মানুষের মাথার খুলি ও হাড় আবিষ্কৃত হয়েছে। রোডেশিয়ার মানুষ নিয়েণ্ডারথল মানুষের চেয়ে উচ্চতর। এরাই যথার্থ মানুষ নামের উপযুক্ত।

মানুষের জন্মের ইতিহাস এখনও অজ্ঞাত। যুগ-বিপ্লবের সংগে বহু পরিবর্তন ঘটেছে। আদিম যুগের বহু জীবজন্তু পারিপার্শ্বিকের সংগে নিজেদের খাপ খাওয়াতে প্রাণান্তকর চেষ্টা করেছে। এর ফলে সে অতিরিক্ত পরিমাণে বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল বটে, কিন্তু তাতেও শেষ পর্যন্ত সে টিকে থাকতে পারেনি। বিরাটাকৃতি ডিলোসর, বৃহদাকার উৎসর্পী কূর্ম নর-বানরের সাধারণ পূর্বপুরুষ বলে কথিত আদি জীব কোথায় বিলীন হয়ে গেছে। কিন্তু সেই আদি যুগ থেকে বর্তমান আছে শুধু পিঁপড়ের মত ক্ষুদ্র জীব, গরু ভেড়ার মতো নিরীহ প্রাণী। এরা অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জন করার দিকে ঝোঁকেনি। পিঁপড়ে, উই ও মৌমাছি নিম্নস্তরের প্রাণী বটে, কিন্তু তাদের সহযোগিতার ভাব, স্বার্থত্যাগের প্রবৃত্তি, সমাজ গঠনের কৌশল আশ্চর্যজনক।

মস্তিষ্কের অতিরিক্ত বিকাশ। ছোট ছোট প্রাণী যুগ পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছে। মানুষ তার আদিম পূর্বপুরুষের মত চার হাতের উপর ভর না করে যেমন দুইপায়ে চলাফেরা ও দুই হাতে ধরা ছোঁয়ার কাজ সম্পন্ন করতে শিখেছে, তেমনি তার মস্তিষ্কেরও বিকাশ ঘটেছে। কিন্তু তার দেহ ও বুদ্ধির মধ্যে সকল সময়ে সংগতি রক্ষা হয়নি। ফলে মস্তিষ্কের অতিরিক্ত বিকাশের জন্য তার জীবনে একটা ট্র্যাজিডি সৃষ্টি হতে চলেছে। মানুষের মস্তিষ্ক তার গৌরবের বস্তু সন্দেহ নাই, কিন্তু এই গৌরবই তার অভিসম্পাত। মস্তিষ্কের শক্তিই তাকে পশুপক্ষী প্রভৃতি জীবজন্তু থেকে শ্রেষ্ঠতর করে' তুলেছে, কিন্তু এই শক্তিই আবার তাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে চলেছে। নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার, যন্ত্রপাতির পরিকল্পনা মানুষের জীবনে নিত্য নতুন ও দ্রুত পরিবর্তন সৃষ্টি করেছে। অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জন

করতে গিয়ে সে অদূর ভবিষ্যতে নিজের সমাধি রচনা করেছে। বর্বরতা থেকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়াই সভ্যতা। কিন্তু সভ্য মানুষ এখনও অপর মানুষের উপর আক্রমণ ও শোষণ চালাচ্ছে। যে দিন মানুষ বৃহত্তর কল্যাণের জন্য দুঃখকষ্টকে হাসি মুখে বরণ করে নিতে পারবে, যখন সে সমগ্রের জন্য ব্যক্তি-স্বার্থ বলি দিতে পারবে, সে দিন সত্যকার সভ্যতার জন্ম হবে।

পাঁচ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

পশ্চিম ইয়োরোপে, বিশেষতঃ ফ্রান্স ও স্পেনে অসংখ্য অস্থি, অস্ত্রশস্ত্র, গুহা ও পর্বতগাত্রের চিহ্ন ও চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ত্রিশ হাজার বৎসর অথবা তার পূর্বে মানুষের মতো যে সকল জীব বাস করত তারাই বর্তমান কালের মানুষের পূর্বপুরুষ। আদিম মানুষ কেবলমাত্র ইয়োরোপের পশ্চিম অংশে প্রথম আবির্ভূত হয়নি।

মানুষের প্রথম জন্মস্থান

প্রথম কৃষিকার্য্য। সভ্যতা কৃষি ও উদ্ভিদকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। ভাবিলভ্ প্রমুখ রাশিয়ার বৈজ্ঞানিকদের মত এই যে ভারতবর্ষে মানুষের শ্রেষ্ঠ খাদ্য প্রথম উৎপন্ন হয়। সুতরাং ভারতবর্ষ মনুষ্য-সভ্যতার আদি জন্মস্থান। উত্তর ভারতে গঙ্গা যমুনার বারিধারা-সিক্ত সরস সমতল ক্ষেত্র, মেসোপোটেমিয়ার স্রোতোদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থান, মিশরের নীল নদের বারিধৌত উর্বর ক্ষেত্র, ভূমধ্য সাগরের মধ্যগত বিস্তৃত নিম্নস্থান সর্বপ্রথমে কৃষিকার্যের উপযোগী ছিল শস্য উৎপাদন প্রণালীর আবিষ্কার হওয়ার পর জলবায়ু ও আবহাওয়ার অনিশ্চয়তা ও অঙ্কুরোদ্গমের রহস্যের দিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হল, নিয়ত পরিবর্তনশীল প্রকৃতির দৃশ্যাবলী ও ঘটনা পরম্পরার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা-ধারার তত্ত্ব উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টায় তার বুদ্ধিবৃত্তির উদ্বোধন হল এবং জটিল সমস্যা সমাধান করার প্রবৃত্তি জন্মলাভ করল।

নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ কৃষি, পশু পালন, নানা রকমের সুদৃশ্য ও সযত্ন নির্মিত অস্ত্র, উদ্ভিদের আঁশ নির্মিত মোটা কাপড় ও চুপড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করার

কৌশল ও মোটামুটি ধরণের মৃৎপাত্র গঠনের প্রণালী উদ্ভাবন ক'রে উচ্চতর সভ্যতা ও উৎকর্ষের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এ যুগের মানুষ পৃথিবীর উচ্চস্থান-সমূহে বিস্তৃত হতে লাগল।

আজকাল ভূমিকর্ষণ, বীজবপন, শস্যকর্তন প্রভৃতি কার্য আমাদের কাছে অতি সহজ ও সরল বলে মনে হয়। কিন্তু কুড়ি হাজার বৎসর পূর্বের মানুষের কাছে এগুলি এত সরল ও সহজ ছিল না। এর জন্য বহু কালের যত্ন ও সাধনা, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষা ও সতর্কতা আবশ্যক হয়েছিল। স্বচ্ছন্দ বনজাত গম তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সেই গম সংগ্রহ করে সে তাকে পাথরের মুষলে পিষে ছাতু তৈরী করল এবং তাকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে শিক্ষা করল।

কৃষিকার্যদ্বারা খাদ্য উৎপাদন করার পন্থা আবিষ্কৃত হওয়ার পূর্বে মানুষ বর্বর ছিল। যাযাবর অবস্থায় খাদ্যের সন্ধানে সে ঘুরে বেড়াত, খাদ্য অন্বেষণ তার জীবনের একমাত্র কার্য ছিল। তখন সমাজ ছিল না। মানুষ দলবদ্ধ হয়ে বাস করত। খাদ্য উৎপাদন করার সঙ্গে যন্ত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, বাসগৃহ নির্মিত হল, খাদ্য সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে রাখার প্রবৃত্তি দেখা দিল, বিভিন্ন শ্রেণীর উদ্ভব হল, এক কথায় মানুষ দৈবের উপর নির্ভর না করে নিজের উপর নির্ভর করতে শিখল। কতগুলি লোক শক্তি ও প্রভুত্ব অর্জন করল এবং কালক্রমে তারা আলস্যপরায়ণ হয়ে অন্যের শ্রমলব্ধ বস্তু গ্রহণ করতে লাগল,—সমাজে ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান সৃষ্টি হল। তাদের মধ্যে একদল লোক শিল্প ও ব্যবসায়ে মন দিল। উদরের চিন্তা না থাকলে মানুষ সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতির চর্চা করে, তার মানসিক শক্তির বিকাশ হয়, উচ্চ ভাব ও চিন্তার উদয় হয়,—সভ্যতার জন্ম হয়। কৃষি বা শস্যোৎপাদন-প্রণালীর উদ্ভাবন সমাজ ও মানব জীবনে অভাবনীয় পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

মানব-সভ্যতার ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগের দান

ইতিহাস লিখিত হওয়ার পূর্বে সভ্যতার উপাদানগুলি সংগৃহীত হয়েছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগেই মানুষ কথা বলতে শিখেছিল, কাপড় ও গৃহনির্মাণ করতে সমর্থ হয়েছিল, পশুপালন, অগ্নির ব্যবহার, অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ-কৌশল আয়ত্ত করেছিল, কৃষিকার্য শাসন-প্রণালী চিত্রাঙ্কন স্থাপত্য ও লিপিকৌশল শিক্ষা করেছিল।

মানুষ কথা বলতে পারে; ইতর প্রাণীর ভাষা আছে বটে, কিন্তু তার

ভাব প্রকাশের ক্ষমতা নাই। মনোভাব জ্ঞাপনের আশ্চর্য ক্ষমতা মানুষের আছে, অন্য জীবের নাই। এই শক্তিই মানুষকে ইতর প্রাণী থেকে পৃথক করেছে। কিন্তু এক দিনেই মানুষ কথা বলতে শেখেনি। বহুকালব্যাপী সাধনার ফলে সে কথা বলতে পেরেছে; চিৎকার করে বা সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা ইতর প্রাণী মনোভাব জ্ঞাপন করে। আদি কালের মানুষও ইসারা বা চিহ্নদ্বারা পরস্পরের ভিতর ভাবের আদান-প্রদান করত। ক্রমে বাক-যন্ত্রের পরিচালনে এক জাতি অন্য জাতির চেয়ে অধিকতর উন্নতি করেছিল। ভাষাই মানব সভ্যতা বিস্তারের সর্বপ্রধান ও সর্বপ্রথম সোপান। হার্ডার বলেছেন, এম্ফিয়নের বীণার সুর কোন নগর নির্মাণ করেনি, ঐন্দ্রজালিকের মায়াদণ্ড মরুভূমিকে উদ্যানে পরিণত করেনি, কিন্তু সমাজ-জীবনের বিপুল উৎস ভাষা এই অঘটন ঘটিয়েছে।

শীত গ্রীষ্ম বর্ষা থেকে দেহ রক্ষা করার জন্য মানুষ চেষ্টা করেছিল। পিরামিড নির্মাণ করার কল্পনা তার মনে উদিত হওয়ার বহু পূর্বে সে প্রকৃতির অসহ্য নিষ্ঠুরতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কাপড় বুনতে ও গৃহনির্মাণ করতে শিক্ষা করেছিল।

সভ্যতার নিম্নস্তরেই মানুষ আগুন আবিষ্কার করে তাকে কাজে লাগিয়েছিল। বস্ত্রবয়ন, গৃহনির্মাণ ও অগ্নি আবিষ্কার করার পর সে প্রকৃতিজয়ে বহির্গত হল। অসভ্য মানুষ দুইখণ্ড কাঠ ঘষে আগুন উৎপাদন করত। উচ্চতর সভ্যতার যুগেও পাথর ও লোহার সাহায্যে অগ্নি-উৎপাদন করার কৌশল বহু কাল প্রচলিত ছিল।

শত্রুজয় বা হিংস্র জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা এবং দৈনন্দিন জীবনের কাজ-কর্মের সুবিধার জন্য প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগে বিভিন্ন আকারের অস্ত্র নির্মিত হয়েছিল। প্রথমে এই সকল অস্ত্রের গঠনকৌশল বা শিল্পচাতুর্য ছিল না। পরে প্রস্তর খণ্ডকে ঘষে মেজে ধারাল অস্ত্রশস্ত্র নির্মিত হল। ঐ সময়েই নৌকা, চাকা প্রভৃতির উদ্ভাবন হয়েছিল।

প্রথমে মানুষ পশুর উপকারিতা ঠিক ভাবে বুঝতে পারেনি। সে জানত যে পশুমাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। যাযাবর অবস্থায় সে কোন কোন পশুর উপকারিতা বুঝতে পেরেছিল। স্থানান্তরে গমনাগমনের ও জিনিষপত্র বহনের জন্য ঘোড়া ব্যবহৃত হত, মেষ ও ঘোড়ার মাংস ভক্ষণ ও দুধ পান করা হত। পরে কৃষিকার্যের সাহায্যে স্থায়ী বসবাস করার সময় মানুষ কঠোর পরিশ্রমী প্রাণীদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে সমর্থ হল। প্রথমে ঘোড়া

বন্য অবস্থায় ছিল। পরে তাকে পোষ মানিয়ে নেওয়া হল। মধ্য এশিয়া পশুপালনের প্রথম প্রকৃষ্ট স্থান ছিল।

প্রাচীন কালে মানুষ এক স্থানে শস্য উৎপাদন করত না। ঋতু-পরিবর্তনের সঙ্গে সে স্থানে স্থানে ভ্রমণ করে বেড়াত। তখন তাকে প্রকৃতির খেয়ালের উপর নির্ভর করতে হত। ক্রমে শস্য উৎপাদনের স্থায়ী উপায় উদ্ভাবিত হওয়ার পর অন্ন-সমস্যার সমাধান হল। তখন সাহিত্য শিল্প ললিতকলা প্রভৃতি সভ্যতার অঙ্গ সকলের জন্ম ও উন্নতি সম্ভব হল। কারণ খাদ্য দ্রব্যের সচ্ছলতা ও নিশ্চয়তা কর্মপ্রবণতা এনে দেয়, বুদ্ধি ও রুচি মার্জিত করে, সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথ উন্মুক্ত করে' দেয়। ঐতিহাসিক যুগ আরম্ভের পূর্বেই এশিয়ায় নানা রকমের শস্য উৎপাদিত হয়েছিল।

যাযাবর অবস্থায় মানুষ দল বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত থাকে। অযত্নসম্ভূত ফলমূল তার ক্ষুন্নিবৃত্তি করে। জীবন ধারণের স্বাভাবিক বৃত্তি তাকে বিভিন্ন স্থানে চালিত করে, কিন্তু শস্য উৎপাদনের উপায় উদ্ভাবিত হওয়ার পর জমির সঙ্গে মানুষের সংস্রব ঘটে। সামাজিক সত্তার প্রকৃত ভিত্তি জমি। জমির সম্পর্ক মনুষ্য জীবনের অবাস্তবতা দূর করে, গোষ্ঠী-জীবনের সংস্কার হয়, সামাজিক দায়িত্ববোধ জন্মে, স্বাতন্ত্র্যবোধ লোপ পায়, প্রকৃত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজ-সত্তাবোধ স্থায়ী বসবাসের প্রারম্ভ। ক্রমে জীবনযাত্রা-প্রণালীর জটিলতা বাড়ে, ফলে অর্থনৈতিক অভাব ও আনুষঙ্গিক অসন্তোষ, পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য বাদবিসংবাদ দেখা দেয়। সমাজের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে মধ্যস্থ মানতে হয়। আবার অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ভ্রাম্যমাণ আক্রমণকারীদের হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সকলের চেয়ে বলবান ব্যক্তিকে নেতৃপদে বরণ করতে হয়। এই নেতা বা দলপতি সমাজের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত ক্ষমতা ক্রমে হস্তগত করে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে এবং সকলের উপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য স্থাপন করে। কালক্রমে এই ব্যক্তিই দেশের রাজা হয়ে ওঠে।

সুকুমার শিল্প বা ললিতকলা বিজ্ঞানবুদ্ধি পরিচালনার সুফল—সংস্কৃতির কষ্টিপাথর। অন্তরের সৌন্দর্যানুভূতি বাইরের বস্তুতে প্রতিফলিত হয়। চিত্রে ভাস্কর্যে স্থাপত্যে ও সাহিত্যে মানুষের মনোভাব প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির অফুরন্ত রূপ-রস, অপরিমিত ঐশ্বর্য মানুষের ভাবপ্রবণ হৃদয়ের উপর অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে। বেগবতী নদীর কলধ্বনি, বনশ্রীর স্নিগ্ধ অঞ্জনে

বিহঙ্গের মধুর কাকলি, লতা-পাতা, ফুল-ফলের অপরূপ বর্ণ-বৈচিত্র্য আদি মানবের চক্ষু ও কর্ণের দ্বারে প্রবেশ লাভ করে তার মন মাতিয়ে তুলেছিল। বন-কুসুমের সুরভিশ্বাস, স্বভাবজাত লতাকুঞ্জের শীতলতা তার হৃদয়ে শান্তিসুধা বর্ষণ করেছিল। প্রকৃতির সীমাহীন রস-সমুদ্র থেকে সৌন্দর্যের তরঙ্গ এসে আদি মানবের শিশুসুলভ মনে অদম্য কৌতূহল সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বের গূঢ় রহস্য-দ্বার খুলে গিয়েছিল। শিল্পানুভূতির সোনার কাঠি দিয়ে মানব-আত্মা চিরসুন্দরের মণিময়দ্বার উন্মোচন করে অনন্ত রূপ, অফুরন্ত রস, অনবদ্য সৌন্দর্য, অপরিমিত সুরভির ভিতর গোপন রহস্যটিকে পরিমূর্ত, জাগ্রত ও প্রাণবন্ত করেছিল। তখন সে লেখনীর স্পর্শে, তুলির দুই একটা আঁচড়ে তার অন্তরাত্মার সেই নিগূঢ় ভাবটিকে ছন্দে ও গানে, বর্ণে ও রসে, মর্মর প্রস্তরে ও পর্দার উপর শতদলের মত বিকশিত করেছিল।

সভ্যতা বৃদ্ধির ও প্রগতির সর্বপ্রধান উপকরণ লিপি। লিপির সুনির্দিষ্ট সীমার ভিতর মানুষ তার সরস ও চঞ্চল মনোভাবকে সুসংবদ্ধ ও সুস্থির করে দিয়েছিল। শ্রুতিপরম্পরায় জ্ঞানের স্রোত প্রবাহিত হত বটে, কিন্তু তা প্রায়ই শিক্ষার্থীর মনোবিকলনের আতিশয্যে বা ভ্রমপ্রমাদের পঙ্কে অবলুপ্ত হয়ে যেত। লিপি উদ্ভাবন করে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করেছিল, ভাবী কল্যাণের পথ প্রশস্ত করেছিল। প্রথমে চিত্র, পরে অক্ষর মনের ভাব প্রকাশের সাহায্য করত। মানুষের জীবনের ঘটনাসমূহ বর্ণমালার সাহায্যে লিপিবদ্ধ হওয়ার সময় থেকে প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ প্রকৃতির গূঢ় রহস্য বুঝতে অসমর্থ ছিল। প্রকৃতির রুদ্র কঠোর ভীষণ মূর্তি তার মনে ভীতি-সঞ্চার করেছিল। জবাকুসুম-সংকাশ দ্যুতিময় সূর্যের চোখ ঝলসান রূপ, অনন্ত নীল আকাশ, কর্ণভেদী বজ্রের গর্জন, বহু যোজনব্যাপী আকাশচুম্বী পর্বতমালা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী ও শব্দ তার মনে ভয় ও ভক্তির সঞ্চার করেছিল। এইভাবেই ধর্মের জন্ম হয়েছিল। ধর্মভাব-উৎপত্তির প্রধান কারণ ভীতি।

জাতি-বিভাগ

অন্যান্য প্রাণীর মতো মানুষেরও নানা জাতি আছে। ভৌগোলিক সংস্থান ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এই বিভাগের কারণ। পর্বত এবং সাগর দেশ ও মানুষের

মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। পূর্ব এশিয়া এবং আমেরিকার মানুষের ভিতর সাদৃশ্য আছে। তাদের গায়ের রঙ্ পীত, চুল লম্বা ও গালের হাড় উঁচু। সাহারার দক্ষিণে যে সকল মানুষ বাস করে, তাদের রঙ্ কালো, নাক চেপ্টা, ঠোঁট পুরু এবং মাথার চুল কোঁকড়ান। ভূমধ্য সাগরের উপকূলের লোকদের রঙ্ সাদা, চোখ ও চুল ঘনকৃষ্ণবর্ণ। পেপুয়া ও নিউ জিল্যাণ্ডের লোকের রঙ্ তামাটে ও কালো এবং চুল কোঁকড়ান। ইয়োরোপ বা এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে নানা রকম আব্‌হাওয়ার ভিতর বিভিন্ন ধরণের লোক জন্মেছিল। অষ্ট্রেলিয়া ও এশিয়ার লোক এবং নিগ্রোদের এক বংশে জন্ম নয়। সম্ভবতঃ তারা এক রকম বেষ্টনীর ভিতর দীর্ঘ কাল পালিত ও বর্ধিত হয়েছে। দশ বারো হাজার বৎসর পূর্বের লোকেরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হলেও তখনও তারা বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হয়নি। আধুনিক যুগে মানুষের জাতিগত বৈষম্য তিরোহিত হচ্ছে। মানুষ মানুষই, সে যে কোন দেশের যে কোন জাতির মানুষ হোক্ না কেন, তার স্বাভাবিক ধর্ম এক। আকৃতিগত বৈষম্য সত্ত্বেও তার প্রকৃতিগত সাম্য আছে।

জাতি-বিভাগ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তাঁরা বিভিন্ন জাতির মানুষকে মিশ্র বা খাঁটি, এমন তিন চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রকৃত কথা এই যে সকল জাতিই মিশ্র। তবে মোটামুটি ভাবে সমগ্র মনুষ্য-জাতিকে প্রধানতঃ চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে, কিন্তু ছোট ছোট এমন বহু জাতি আছে, যারা এই প্রধান বিভাগ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত নয়।

প্রথম, ইয়োরোপ এবং ভূমধ্য সাগরের নিকটবর্তী স্থানে এবং পশ্চিম এশিয়ায় যে জাতির লোক দেখা যায়, তাদের নাম ককেশিয়ান। ককেশিয়ানদের তিনটি উপবিভাগ, যেমন, উত্তরে নার্ডিক, দক্ষিণে আইবিরিয়ান এবং মধ্যস্থলে আলপাইন।

দ্বিতীয়, পূর্ব এশিয়া ও আমেরিকার জাতিসকলের নাম মঙ্গোলিয়ান।

তৃতীয়, আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের নাম নিগ্রো।

চতুর্থ, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউ গিনির আদিম অধিবাসীদের নাম অষ্ট্রেলোয়ড্।

তা ছাড়া, আরবের মরুপ্রদেশে বিচরণশীল যাযাবরদের নাম সেমিটিক।

কোন কোন পণ্ডিত মানুষের মাথা মাপ করে তার দৈর্ঘ্য ও হ্রস্বতা অনুসারে জাতি-বিভাগ করেছেন, কিন্তু এই বিভাগ সর্বজন-গৃহীত হয়নি। মস্তকের আকার অবস্থা বিশেষে কয়েক শত বৎসরের মধ্যে পরিবর্তিত হয়।

ভাষা-বিভাগ.

কোন না কোন সময়ে সকল মানুষ যে এক ভাষায় কথা বলত, তার কোন প্রমাণ নাই। প্রাগাধুনিক যুগের মানুষ কথা বলত কি না—তাও আমাদের জানা নাই। সম্ভবতঃ তখন ইঙ্গিত ইসারায় ভাবের আদান প্রদান চলত। শব্দের অনুকরণ কিংবা বস্তুজ্ঞাপক নামের দ্বারা ভাব প্রকাশ করা হত। বস্তুবিষয়ক ও বিস্ময়সূচক শব্দ দ্বারা ভাষা গঠিত হয়েছিল। নব্য প্রস্তর-যুগে বিভিন্ন ভাষায় মাত্র কয়েক শত শব্দ ছিল। এখন আভিধানিক শব্দের সংখ্যা অল্প নয়, কিন্তু কৃষকরা মাত্র চার পাঁচ শত শব্দ ব্যবহার করে' মনের ভাব ব্যক্ত করে। নব্য প্রস্তর-যুগের মানুষ অঙ্গভঙ্গী বা নৃত্য দ্বারা কোন কিছু বর্ণনা করত এবং দুইটি সংখ্যার বেশী গণতে পারত না।

বিভিন্ন ভাষায় মৌলিক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষ কোন ভাব প্রকাশের এক উপায় দেখে পণ্ডিতরা অনুমান করেন যে, এই সকল ভাষা এক পর্যায়ভুক্ত। আবার এমন অনেক ভাষা আছে যাদের প্রকৃতি, আকার ও ব্যাকরণ একেবারে ভিন্ন। প্রায় আট হাজার বৎসর পূর্বে পশ্চিম এশিয়ায় অনেকগুলি মানুষ একত্র বাস করত। তাদের নাম আর্য। তাদের ভাষার নাম ইণ্ডো-ইয়োরোপীয়ান। ইংরাজী ফরাসি জর্মান স্প্যানিশ ইটালিয়ান্ গ্রীক রাশিয়ান পারশিক ও ভারতীয় ভাষা সকল সেই এক ভাষার শাখা। এক ভাষা এক রক্তের প্রমাণ নয়। পাঁচ ছয় হাজার বৎসর পূর্বের ভাষাও মৌলিক ভাষা নয়।

সম্ভবতঃ ডানিউব নিপার ডন এবং ভল্গা নদী চতুষ্টয়ের সরস তটভূমি এবং কাস্‌পিয়ান হ্রদের উত্তরে ইউরল পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত স্থানে আর্য-ভাষাসকল সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছিল। তখনও বোস্‌ফোরস্ প্রণালী এশিয়া ও ইয়োরোপকে ভিন্ন মহাদেশে পৃথক করেনি। ডানিউব নদ পূর্বদিকে অধুনালুপ্ত সাগরে প্রবাহিত হত। ঐ সাগর দক্ষিণ পূর্ব রাশিয়া থেকে তুর্কিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং কৃষ্ণ সাগর কাস্‌পিয়ান ও আরল সাগর তার অন্তর্গত ছিল। যারা আর্য-ভাষায় কথা বলত এবং যারা উত্তর পূর্ব এশিয়ায় বাস করত, তাদের মধ্যে এই সাগরের ব্যবধান ছিল।

হিব্রু ও আরবী সেমিটিক ভাষার অন্তর্গত। এদের মৌলিক ক্রিয়াপদ, ভাব প্রকাশের রীতি ও ব্যাকরণের মূল সূত্র আর্য ভাষাসকল থেকে পৃথক।

এরা স্বাধীন ভাবে জন্ম লাভ করেছিল। আসিরিয়ান, ফিনিশিয়ান এবং আরও কতগুলি ভাষা সেমিটিক ভাষারই বংশধর। খ্রীষ্ট জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বেও আর্য ও সেমিটিক ভাষায় যারা কথা বলত, তাদের ভিতর ব্যবসা প্রভৃতি বিষয়ে আদান-প্রদান চলত। দুইটি পরিবারের অন্তর্গত ভাষা সকলের আভ্যন্তরিক মর্মান্তিক ভেদ দেখে মনে হয়—নব্য প্রস্তর-যুগ আরম্ভ হওয়ার পর হাজার হাজার বৎসর ধরে এরা সম্পূর্ণ পৃথক আকারে বর্তমান ছিল। যারা সেমিটিক ভাষায় কথা বলত, তারা আরবের দক্ষিণে বা উত্তর পূর্ব আফ্রিকায় বাস করত।

প্রাচীন মিশরীয়, কোপ্‌টিক, বেরবার, ইথিওপিক ভাষাসকল হ্যামিটিক নামে অপর এক জাতীয় ভাষার অন্তর্গত। ল্যাপল্যাণ্ড এবং সাইবেরীয়ার ভাষাসমূহ, ফিনিস্‌, ম্যাগিয়ার, তাতার, মান্‌চু ও মোঙ্গলীয় ভাষাসকল তুরানিয়ান নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ কোরিয় ও দ্রাবিড় ভাষার সঙ্গে এদের সম্পর্ক আছে। চীনা, বর্মিজ, শ্যায়ামিজ্‌ ও টিবেটান ভাষাসকল চৈনিক পরিবারভুক্ত।

মানব-ভাষার এই প্রধান প্রধান বিভাগের বাহিরে আরও কয়েকটি ভাষা প্রচলিত আছে, যেমন—আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের ভাষা, আফ্রিকার বাণ্টু, দ্রাভিডিয়ান এবং মালয়-পলিনিসিয়ার ভাষা সকল।

প্রায় দশ হাজার বৎসর পূর্বেও বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন ভাষায় কথা বলত। শিকার, পশুপালন ও সাময়িক কৃষিকার্য তাদের জীবনধারণের উপায় ছিল। সমুদ্র উপসাগর অরণ্য মরুভূমি ও পর্বতশ্রেণী তাদের মিলন ও সংমিশ্রণের অন্তরায় ছিল। এজন্য তাদের পরস্পরের ভিতর আদান-প্রদানের সুবিধা ছিল না। একটা জাতি বা দলের সংখ্যাও অল্প ছিল। তাদের ভাষা ক্রমে গড়ে' উঠেছিল। নব্য প্রস্তর-যুগে সমগ্র পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা কয়েক হাজারের বেশী ছিল না। আরও কয়েক হাজার লোক আফ্রিকা ও ভারতবর্ষের বনে জঙ্গলে বাস করত। সে সময়ে মধ্য আফ্রিকা নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল।

এখানে যে কয়েকটি ভাষার কথা বলা হল, তা ছাড়া স্থান বিশেষে অপর ভাষাও প্রচলিত ছিল। ক্রমে শক্তিশালী ভাষাগুলি দুর্বল ভাষাগুলিকে কবলিত করেছে, অথবা—তারা প্রাকৃতিক নির্বাচনের ফলে লোপ পেয়েছে। বাস্ক হোটেনটট্‌ বাণ্টু, প্যাপুয়া এবং অধুনালুপ্ত ট্যাস্‌মেনিয়ার ভাষাগুলি চিরকালই পৃথক ভাবে স্বাধীন সত্তা রক্ষা করে আসছে।

নব্য প্রস্তর-যুগের ভৌগোলিক অবস্থা

নূতন পাথর যুগে পৃথিবীর ভৌগোলিক সংস্থান ভিন্ন ধরণের ছিল। কালক্রমে বরফের আবরণ অন্তর্হিত হল। বল্টিক ও ক্যাস্পিয়ান সাগরের মধ্যবর্তী স্থান জলময় ও দুর্গম জলাভূমি পরিপূর্ণ ছিল। ক্যাস্পিয়ান ও আরবসাগর এবং তুর্কীস্তানের মরুপ্রদেশের অধিকাংশ স্থান ভল্‌গা নদের সমতলভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত অধুনালুপ্ত জলরাশির চিহ্নস্বরূপ বর্তমান আছে। এই লুপ্ত সাগরের একটি শাখা কৃষ্ণ সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উচ্চ পর্বত-প্রাচীর এবং আধুনিক সিন্ধুনদের নিম্ন প্রদেশে বিস্তৃত সমুদ্রের জলরাশি মোগল ও দ্রাবিড় জাতিদ্বয়কে নর্ডিক জাতিসকল থেকে তাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল। এই সময়ে সাহারার মরুপ্রদেশ উর্বর ও জনাকীর্ণ স্থান ছিল। ক্রমে বায়ু-চালিত বালিরাশি এর উপর পড়ে' একে শুষ্ক জলহীন মরুভূমিতে পরিণত করল এবং ভূমধ্য সাগরের নিকটবর্তী জাতি ও নিগ্রোদের মধ্যে প্রাকৃতিক ব্যবধান সৃষ্টি করে দিল। পারস্য উপসাগর উত্তরে আরও বহু দূর পর্যন্ত এবং দক্ষিণ আরব আবিসিনিয়া ও সোমালি দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্তমান ভূমধ্য সাগর এবং লোহিত সাগর উর্বর উপত্যকা ছিল এবং সেখানে সুস্বাদু জলপূর্ণ অসংখ্য হ্রদ ছিল। বঙ্গোপসাগরের ফেনিল অম্বুরাশি, দিগন্ত প্রসারী হিমালয়ের অত্যুচ্চ শিখরশ্রেণী এবং মধ্য এশিয়ার উচ্চ মালভূমি দ্রাবিড় ও মোগলদের বিভক্ত করে দিয়েছিল। আধুনিক কালের গোবি মরুভূমি বহু হ্রদ ও সাগরে পূর্ণ ছিল। এশিয়ার মধ্যস্থল থেকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতমালা মঙ্গোলিয়ান জাতিসকলকে চৈনিক এবং উরাল-আলতায়িক নামে দুই জাতীয় ভাষাভাষী মনুষ্যে পরিণত করেছে। সুপ্রাচীন কালে পৃথিবীর এইরূপ ভৌগোলিক সংস্থান রক্তমিশ্রণের অন্তরায় হয়েছিল।

ছয়

প্রাচীন সাম্রাজ্যের যুগ

সুমেরিয়া, বাবিলোনিয়া, আসিরীয়া

৪৫০০—৩৩০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ

টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সমতলভূমির প্রাচীন নাম মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়া ছিল বহু গৌরবময় সভ্যতা ও সাম্রাজ্যের জন্মভূমি। পৃথিবীর সভ্যতার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ হয়েছিল মেসোপটেমিয়া মিশর ও সিন্ধু উপত্যকা নিয়ে। ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস, নীল ও সিন্ধুনদ প্রায় একই যুগে সভ্যতা জন্ম দিয়েছিল।

মেসোপটেমিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এর সভ্যতা বিকাশে সাহায্য করেছিল। মধ্য এশিয়া থেকে স্থলপথে, পূর্ব এশিয়া থেকে জলপথে এর বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপন করেছিল ভূমধ্য সাগরীয় অঞ্চলের সঙ্গে। এই বাণিজ্যিক সংযোগ থেকেই মেসোপটেমিয়ার প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলির অভ্যুদয় হয়েছিল।

আসিরীয়া। সুমেরের উত্তরে বাবিলোন, বাবিলোনের উত্তরে টাইগ্রিসের পশ্চিম তীরে কুড়ি মাইল ব্যেপে অবস্থিত ছিল প্রথম সারগণের রাজধানী আক্কাদ বা আগেদ্। আক্কাদের উত্তরে টাইগ্রিসের পূর্বতীরে প্রাচীন অসুর নগর। এই নগরের নাম থেকে সাম্রাজ্যের নাম হয়েছিল আসিরীয়া এবং এর রাজধানী ছিল নিনেভে।

সুমেরিয়া। ইউফ্রেটিস্ এবং টাইগ্রিস নদীদ্বয়ের মোহানার কাছে যে জাতি বাস করত, তার নাম সুমের। ঐতিহাসিক হল বলেন, সুমেরীয় সভ্যতা সুনিয়ন্ত্রিত আকারে প্রথম থেকেই আমাদের চোখে পড়ে। খ্রীষ্টের জন্মের চার হাজার বৎসর পূর্বেই সুমেররা সুসভ্য হয়েছিল। তারা ধাতুর ব্যবহার জানত, বড় বড় শহরে বাস করত, জটিল ধরণের লিপি ও শাসন-প্রণালী উদ্ভাবন করেছিল। তারা মেসোপটেমিয়ার বাহিরে অন্য কোন দেশ থেকে এসে তাদের উচ্চাঙ্গের সভ্যতা অর্ধসভ্য আদিবাসীদের জীবন ধারার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল এবং বিজিত জাতির তদানীন্তন সভ্যতাকে কুক্ষিগত করে' নিয়েছিল। রাগোজিন বলেছেন, দ্রাবিড়-ভারতের সঙ্গে বাবিলোন ও চাল্ডীয়ার বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। তিনি বলেন, মুঘীর নগরের ভগ্নস্তূপের ভিতর

ভারতের শাল কাঠ পাওয়া গেছে। ৩০০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে যুক্ত বাবিলোনের প্রথম রাজা উর-ইয়া মুখীর নগর নির্মাণ করেছিলেন।

বাবিলোনিয়া। বাবিলোনিয়া নদীদ্বয়ের মোহনা থেকে দুই শত মাইল বিস্তৃত ছিল। সেমাইটরা এর নাম দিয়েছিল শিনার। গ্রীকরা এর বাবিলোনিয়া নাম দিয়েছিল। এর রাজধানী উর থেকে সমগ্র দেশের নাম সুমের হয়েছিল।

সুমেরের লোক খাল কেটে নদী থেকে জল এনে দেশের মাটিকে চাষের উপযোগী করেছিল। তারা সাপের পূজা করত ইয়া বা অহীর পবিত্র মন্দির ইরিধু নগরে অবস্থিত ছিল। তারা উপাসনা করত, ছাগল বা ভেড়া বলি দিত। পুরোহিতরা সমাজে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করত। তারা নক্ষত্র-বিদ্যায় পারদর্শী ছিল, স্বপ্নের গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কার করে' ভবিষ্যতের কথা বলতে পারত। পিতা পুত্রকে শিক্ষা দিত। পুত্র পিতার স্থলাভিষিক্ত হত।

তাদের মতে বারোটি সূর্য ছিল। চন্দ্র সূর্য এবং আরও পাঁচটি গ্রহ রাশি-চক্রের বারোটি চিহ্ন ভেদ করত। রাশি-চক্র ভেদ করতে সূর্যের এক বৎসর এবং চন্দ্রের এক মাস সময় লাগত। গতি অনুসারে গ্রহসকল অল্পাধিক সময়ের ভিতর তাদের নির্দিষ্ট পথে ভ্রমণ করত এবং মানুষের ভাগ্যের উপর শুভাশুভ প্রভাব বিস্তার করত। বাবিলোনে চান্দ্রমাস অনুসারে বৎসর গণনা হত।

সুমেরে শীলমোহরের প্রচলন ছিল। মাটির তৈরী দলিলের উপর শীল-মোহরের ছাপ দেওয়া হত। রাজা, পদস্থ ব্যক্তি অথবা ব্যবসায়ীদের শীলমোহর সুন্দরভাবে খোদাই করা হত। মাটির টালির উপর খোদাই করে' আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রভৃতি লিখে রাখা হত। ব্রোঞ্জ তামা সোনা রূপা ও লোহার প্রচলন ছিল।

সুমেরের লোকেরা বুদ্ধিমান ছিল। তাদের উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনী প্রতিভা, কল্পনার বিদ্যুৎ খেলা আশ্চর্য ধরণের ছিল। তারা কীলকাক্ষর উদ্ভাবন করেছিল।

খ্রীষ্টের জন্মের সাত হাজার বৎসর পূর্বে দক্ষিণে উর এবং উত্তরে নিপুর স্থাপিত হয়েছিল। এন্‌স্তাগ্‌কুশানা বাবিলোনের সর্বপ্রথম নরপতি ছিলেন। তিনি খ্রীষ্ট পূর্ব ৪৫০০ অব্দের পূর্বে কেঙ্গির বা বাবিলোনের দক্ষিণ অংশের

রাজা বলে' নিজেকে অভিহিত করেছিলেন। শিরপুরনা বা বর্তমান টেলো নামক স্থানে উরনিনা যে বংশ স্থাপন করেন তার ক্ষমতা ৪৩০০—৪১০০ পর্যন্ত অপ্রতিহত ছিল। এই বংশের রাজাদের শিল্প ও উৎকীর্ণ লিপি দেখে মনে হয় যে, শিরপুরনায় সভ্যতা বহু শতাব্দী পূর্ব থেকে ক্রমোন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। প্রায় পাঁচ হাজার পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে বাবিলোনিয়ায় সেমিটিক প্লাবন আরম্ভ হয়। উর নগরে কয়েকজন নরপতি রাজত্ব করেছিলেন, কিন্তু ২৭৫০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে সেমিটিকরা প্রথম সারগণের নেতৃত্বে বাবিলোনিয়ার উত্তরে আগেদ্ নগরে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে' দুই হাজার বৎসর বাবিলোনিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। ২১০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে হামুরাবি সমগ্র বাবিলোনিয়ার একচ্ছত্র সম্রাট হন। তিনি বাবিলোনে রাজধানী স্থাপন করেন।

জলধারাসিক্ত উর্বর বাবিলোনিয়ার উদ্যানে যখন মানব-সভ্যতা-কুসুমটি প্রস্ফুটিত হচ্ছিল, তখন ঐ দেশের উত্তরাঞ্চলে অসুরগণ ভবিষ্যৎ পালোয়ানের উপযোগী বলসঞ্চয় করে' চতুর্দশ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে প্রথম শালমেন্সারের নেতৃত্বে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। একাদশ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে প্রথম টিগ্‌নাথ্‌পিলেসের অপূর্ব বাহুবলের কাছে বাবিলোনিয়া মস্তক অবনত করেছিল।

আসিরিয়া। কোন কোন পণ্ডিতের মতে বৈদিক যুগের শেষভাগে খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে দেব বা আর্যরা ভারতের সীমা অতিক্রম করে' বাবিলোনের একশত ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার নাম অসুর বা আসিরিয়া।

প্রথমে আসিরিয়া বাবিলোনিয়ার একটি উপনিবেশ ছিল। এর রাজধানীর নাম নিনেভে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০৬ অব্দে সেদিশরা নিনেভে নগরকে এমন ভাবে ধ্বংস করেছিল যে, এমন কি তার স্মৃতি পর্যন্ত লোপ পেয়েছিল। অসুর নজিরপালের রাজত্ব কালে (৮৮৫-৮৬০ পূঃ খ্রীঃ) অসুর সভ্যতা উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করেছিল। মনুষ্য-মস্তকযুক্ত ষাঁড় ও সিংহের মূর্তি এই যুগের শিল্পের আদর্শ ছিল।

এই রণপ্রিয় জাতির রাজা তাদের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তাঁর মন্ত্রীরাও এক এক জন সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। সে দেশের অধিবাসীরাও সৈনিক ছিল। তারা চাষ করত না, কাপড় বুনত না। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সকল বস্তু তারা নিকটবর্তী প্রদেশ থেকে লুণ্ঠন করে আনত। এদের দাসদাসী মজুর শিল্পী প্রভৃতি যুদ্ধে পরাজিত ধৃত বন্দী ছিল। এই নিষ্ঠুর নৃশংস বীরের জাতি

বিদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য অভিমুখে চালনা করে নিজেদের নগরাভ্যন্তরে আনয়ন করত। ইষ্ট দেবতা অসুরের প্রীতি ও আশীর্বাদ লাভের জন্য তারা বিজিত দেশের লুণ্ঠিত দ্রব্য দেবপূজায় ব্যবহার করত। তাদের পদতলে এক সময় এশিয়ামাইনর আর্তনাদ করেছিল, সাইপ্রাস ও সাগর বক্ষের অন্যান্য দ্বীপপুঞ্জ অসুর দেবতার নৈবেদ্য সরবরাহ করত, এমন কি সুদূর মিশরও এই দেবতার দক্ষিণা অর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

দ্বিতীয় সারগণ। ৭২২ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে ২য় সারগণ রাজা হন। সিংহাসনে অধিরোহণের সময় তাঁর সাম্রাজ্য টলমল করেছিল। তাঁর বাহুবলে সিরিয়া পরাজয় স্বীকার করেছিল, বিদ্রোহী রাজ্যসকল বশীভূত হল, মিডিয়া অধীনতা স্বীকার করল, বৈদেশিক অত্যাচার থেকে বাবিলোন রক্ষা পেল। দেশের পুরাতন ধর্ম পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল, পুরোহিত ও দেশের অধিবাসিগণ স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করল। সারগণ বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি প্রজাদের হিত কামনা করতেন, তাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন এবং বিজিতদের প্রতি দয়ালু ছিলেন।

সারগণের পুত্র সেন্নাচারিব পিতার ন্যায় বিজয়ী বীর ছিলেন না. তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। অকারণ রক্তপাত, পাশবিক নির্দয়তা ও অমানুষিক অত্যাচার তাঁর আনন্দ বিধান করত. প্রাচীন নগর বাবিলোন ধ্বংস করে' তিনি দুরপনেয় কলঙ্ক অর্জন করেছিলেন।

অসুর বানিপালের প্রাসাদ অতি বিরাট ছিল। এর অসংখ্য কক্ষ স্থাপত্য ও শিল্পকলা গৌরবের বস্তু। এই প্রাসাদের মধ্যে অসুর বানিপালের প্রসিদ্ধ গ্রন্থশালা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই গ্রন্থাগারে ইতিহাস আইন চিকিৎসা ভৌতিক বিদ্যা সৃষ্টিতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে মাটির পুস্তক পাওয়া গেছে। তিনি সিরিয়া ও এশিয়ামাইনর জয় করেন, নাইনেভেকে বিরাট নগরে পরিণত করেছিলেন, বহু প্রাসাদ ও অসংখ্য মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, পালেষ্টাইন ও সিরিয়া লুণ্ঠন করে' ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছিলেন নাইনেভের প্রাচীর পুনর্গঠন করেছিলেন। বাবিলোন ধ্বংস করে' সেই স্থানের স্থপতি ও শিল্পীদের বন্দী করে এনে, তাদের দ্বারাই তাঁর প্রাসাদ নির্মাণ করিয়েছিলেন। নাইনেভের প্রাসাদ-গাত্রের উৎকীর্ণ চিত্রাবলী থেকে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর আসিরিয়ার জীবনযাত্রার ধারা, আচার-ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতির কথা অবগত হওয়া যায়।

আসিরিয়ার সভ্যতা। পরবর্তী কালের এথেন্সের মত বাবিলোন সভ্যতা ও উৎকর্ষ সাধনে যত্নবান ছিল, কিন্তু অসুররা স্পার্টানদের মত প্রাচ্যের রণপ্রিয় জাতি হিসাবে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। যুদ্ধ ও অস্ত্রচালনা তাদের একমাত্র কার্য ছিল। বাহুবল বৃদ্ধির সঙ্গে তারা জীবনের উচ্চতর উদ্দেশ্যকে অগ্রাহ্য করেছিল। এই দুই জাতির শিল্প, প্রকৃতি ও দেশ ভিন্ন ধরণের ছিল। অসুর রাজ্য শীতপ্রধান ও তার মৃত্তিকা অনুর্বর ছিল। টাইগ্রিসের খরস্রোত তার বাণিজ্য-পোত চলাচলের প্রতিকূল ছিল। বাবিলোনিয়া রাজনীতি ও অর্থনীতি বিস্তায় অগ্রসর হয়েছিল। অসুররা বাবিলোনিয়ার বহু যুগলব্ধ সাধনাকে আয়ত্ত করে' তার ভগ্নস্তূপের উপর নিজেদের সভ্যতা গড়ে তুলতে চেয়েছিল—কিন্তু অনুকরণ প্রকৃত জীবন লাভের উপায় নয়।

অবস্থা বিপর্যয়, সংঘাত, পরিবর্তন ও বিবর্তনের ভিতর দিয়েও বাবিলোনের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়েছিল, তার প্রাণসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি; কিন্তু অসুরের কৃত্রিম সভ্যতার রিক্ততা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তার পতনের গভীরতায়। তরবারির সাহায্যে অসুর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তরবারি একে বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিল এবং তরবারিই এর সাম্রাজ্য শাসনের প্রধান উপায় ছিল। তরবারি ছিল এর সহায় ও সম্বল, এর ভিত্তি ছিল তরবারি। সুতরাং অসুরের সভ্যতা ধূমকেতুর মত ক্ষণকালের জন্য উদিত হয়ে কোথায় বিলীন হয়ে গেল। অসুর বানিপালের দুর্বলতা, নির্দয়তা ও বর্বরতা অসুর সাম্রাজ্যের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছিল। বাবিলোন স্বাধীনতা ঘোষণা করল। মিডিশদের রণভেরী অসুরের প্রধান নগরীর সিংহদ্বারে বেজে উঠল। নিনেভের গগনচুম্বী গৌরবচূড়া ধূলিসাৎ হল (৬০৯ পূঃ খ্রীঃ), অসুর-সাম্রাজ্যের অধিকাংশ স্থান মিডিয়ার হস্তগত হল। নেবুকাডনিজারের বাহুবলে সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হল বটে, কিন্তু মিডিয়ার শক্তি বা পারস্যের অভ্যুদয় তার পতনের পথ পরিষ্কার করে দিল। অবশেষে পারস্য সম্রাট সাইরাসের বীরত্বে মিডিয়া ইলামাইট অসুর বাবিলোন ও মিশর সাম্রাজ্য পরাভূত ও নিজিত হল এবং পশ্চিম এশিয়ার কর্তৃত্ব আর্য হস্তে ক্রীড়নক হয়ে উঠল। অসুর-বাবিলোনের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়ে গেল।

বাবিলোনের সভ্যতা। হামুরাবি প্রথমে ইউফ্রেটিস উপত্যকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিকে একটি শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে' বাবিলোনের ভাবী সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। তিনিই প্রচলিত আইন সংহিতা

আকারে বিধিবদ্ধ করেছিলেন। এই ছিল বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে সর্বপ্রথম সংহিতা। এতে দুই শত আশীটি ধারা আছে। প্রাচীন বাবিলোনের গার্হস্থ্য জীবন, রাজনীতি, সামাজিক রীতি, বাণিজ্য নীতি, সম্পত্তি বণ্টন-ব্যবস্থা, দাসপ্রথা, নৌবিদ্যা, চিকিৎসা বিধি, কৃষি প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ের নিয়মাবলী এতে স্থান পেয়েছে। গীলগামীশ মহাকাব্য প্রাচীন বাবিলোনের অন্তর্জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেয়। এই মহাকাব্য তার জাতীয় সম্পত্তি। তাদের দেবতারা ছিল মানবিক গুণের অধিকারী। দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিক চিন্তা তাদের মনে স্থান পায়নি। পারমার্থিক বিষয় নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। পরলোক বা পরলোকতত্ত্ব তাদের ধর্মে স্থান পায়নি। তাদের ধর্ম ও বাস্তব জীবন একসূত্রে গাঁথা ছিল। তারা বহু দেবতার পূজা ও উপাসনা করত।

মৃত্যুর পর মানুষের কি হয়, দেহের মৃত্যুর সঙ্গে জীবের মৃত্যু হয় কিনা, আত্মা বলে' কিছু আছে কি না, মৃত্যুর পর আত্মা থাকে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন মানুষের মনে আসার সঙ্গে দার্শনিকতার জন্ম। সাধারণ মানুষ দৃশ্য বস্তুর ভিতর, আবশ্যকতার গণ্ডীর মধ্যে পরিতৃপ্ত থাকে। আর এক শ্রেণীর মানুষও আছে। তারা প্রয়োজনের সীমা অতিক্রম করে', জ্ঞানের তৃতীয় চক্ষুর সাহায্যে ইন্দ্রিয়কে অতিক্রম করে' ইন্দ্রিয়ের অতীত রাজ্যে বিচরণ করে। পরপারের উদাত্ত সমুদ্র-গর্জন তাদের শ্রুতিগোচর হয়, ঐহিক বস্তুর প্রতি মমত্ববোধ তাদের লোপ পায়। কিন্তু এ যুগের মানুষ চিন্তাশীলতায় বেশীদূর অগ্রসর হয় নি, অভিজ্ঞতার সীমা-ভূমি অতিক্রম করার স্পর্ধা তার হয় নি। তখনও সে সৃষ্টি-রহস্যকে দুর্জ্ঞেয় বা অনির্বচনীয় বলে ভাবতে শিক্ষা করেনি, অনুভূতির সোনার কাঠির সাহায্যে সে অতীন্দ্রিয় জগতের দ্বার উদ্ঘাটন করতে চেষ্টিত হয়নি। প্রাচীন কালের গ্রীসের লোকের মতো সে সৃষ্টিকে খণ্ডভাবে দেখেছিল, আকাশ বন জল স্থল দৃশ্য জগৎকে পরিকল্পিত নানা দেব দেবীর মূর্তি দিয়ে অধ্যুষিত করেছিল।

তারা বর্ণমালা লেখার জন্য ভূর্জপত্র ও চামড়া ব্যবহার করত, পাথর বা মাটির ফলকের উপর খোদাই করে' মনোভাব প্রকাশ করত। তাদের কবিতা গল্প প্রভৃতি মাটির ফলকের উপর লেখা হত। নক্ষত্র-বিদ্যায় তারা প্রাচীন জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। রাশিচক্রের গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্বন্ধে, ধূমকেতু ধ্রুবতারার অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে তাদের নিখুঁত জ্ঞানের পরিচয়

পাওয়া যায়। অঙ্কশাস্ত্রেও তারা সমধিক উন্নতি করেছিল। শিল্প তাদের জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। ভাষায়, ধর্ম-বিশ্বাসে, সভ্যতায় ও শিল্পে অসুর-বাবিলোনের সাদৃশ্য দেখা যায়। টেলো বাবিলোন নিনেভে ও কাম্মার শিল্পে একই ভাব পরিস্ফুট। শিল্প বিষয়ে বাবিলোন মিশরের অধমর্ণ নয়। বাবিলোনে স্থাপত্য শিল্প স্বাধীনভাবে জন্মলাভ করেছিল। চিত্রবিদ্যা ভাস্কর্য উৎকীর্ণ মূর্তি ও ঘটাদি নির্মাণ কৌশল তাদের পারদর্শিতা প্রমাণিত করে। গীত-বাদ্য তাদের অবিদিত ছিল না। অসুররা মিশরের শিল্প অনুকরণ করে তার উন্নতি করেছিল এবং পারসিক ও গ্রীক শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। অসুরের শিল্পকলা এশিয়ামাইনরে আমদানি হয়ে গ্রীক শিল্পে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। চান্দ্র মাস অনুসারে বাবিলোনে বৎসর গণনা হত। দিনমানকে বারো ভাগে বিভক্ত করে সময় নিরূপণ করার পদ্ধতি বাবিলোনে প্রচলিত ছিল। গ্রীস তার অনুকরণ করেছিল। নিনেভের গ্রন্থাগারে দেখা যায় যে অসুরে প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, ধাতু বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চা অবজ্ঞাত হয়নি।

সিন্ধু-সভ্যতা। সার জন মার্শালের মতে সিন্ধু প্রদেশের তাম্রযুগীয় সভ্যতা এক বৃহত্তর তাম্রযুগীয় সভ্যতার অংশমাত্র। পূর্বদিকে মাঞ্চুরিয়া থেকে পশ্চিমদিকে ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করে' দক্ষিণ ইউরোপ পর্যন্ত এই তাম্রযুগীয় সভ্যতা প্রসারিত ছিল। মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে তাম্রযুগীয় সভ্যতার কাল বিভিন্ন হলেও, সিন্ধু উপত্যকায় তাম্রযুগের কাল পূঃ খ্রীঃ ৩২০০ নির্দিষ্ট হয়েছে।

সিন্ধু-সভ্যতা এশিয়ামাইনর, মিশর, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার নিকট ঋণী কি না, এ সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে মেসোপটেমিয়ার প্রাচীনতম সভ্যতা যে সিন্ধু সভ্যতার কতকটা সমসাময়িক এবং সুমেরীয় সভ্যতার কয়েকটি নিদর্শন যে মোহেন-জো-দারোর স্তরগুলির ভিতর পাওয়া গেছে তা অবিসংবাদিত সত্য। সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশে মৃত্তিকা গর্ভ থেকে যে সকল জিনিষপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে লোহার কোন দ্রব্য পাওয়া যায়নি, কেবলমাত্র পাথর, তামা, বা ব্রোঞ্জ নির্মিত দ্রব্য পাওয়া গেছে।

মোহেন-জো-দারোতে একটি সমৃদ্ধিশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। সেখানে পাকা ইটের বৃহৎ ইমারত, কূপ, স্নানাগার, রাস্তার উপর সাঁকো ও নর্দমা এবং একটা প্রকাণ্ড সাধারণ স্নানাগার আবিষ্কৃত হয়েছে।

বৃহৎ স্তম্ভযুক্ত যে একটি প্রকাণ্ড হলঘর পাওয়া গেছে, তা সভাগৃহ বলে' মনে হয়।

শহরের অধিবাসীদের জীবনযাত্রা ও আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। তারা গম ও যবের চাষ করত, গরু ভেড়া শূকর প্রভৃতি পশু পালন করত এবং নদীতে মাছ ধরে খেত। মহিষ উট হাতি নানা রকমের হরিণের মৃত দেহের চিহ্ন দেখা যায়। তাদের শীলমোহরে বাঘ বানর কুকুর ও শশকের চিত্র অঙ্কিত আছে। তারা সোনা রূপা তামা সীসা টিন প্রভৃতি ধাতুর ব্যবহার জানত। অস্ত্রশস্ত্র ও বাসন তামায় নির্মিত হত। অধিবাসীরা সমৃদ্ধিশালী ছিল। তারা সোনা রূপার অলংকার ব্যবহার করত, পশম ও তুলা থেকে সুতা কেটে কাপড় বুনত। তাদের মাটির পাত্রের উপর সুন্দর কারুকার্য আঁকা আছে।

তাদের শীলমোহরের উপর ষাঁড়, মহিষ প্রভৃতি জীবজন্তুর ছবি এবং এক প্রকার চিত্রলেখা আঁকা আছে। এই যুগের প্রধান দেবতা ছিলেন মহামাতা মহাদেবী বা প্রকৃতি দেবী। শিবমূর্তি ও শিবলিঙ্গের মত পাথরও আবিষ্কৃত হয়েছে। গাছ ও জীবজন্তুর পূজা হত। তারা মৃতদেহ কবর দিত বা আগুনে পুড়িয়ে দিত।

সুমেরে মুষ্টিমেয় অট্টালিকার পাশে অসংখ্য ক্ষুদ্র কুটীর আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানকার সাধারণ নাগরিক অতি দীন হীন অবস্থায় ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করত। কিন্তু মোহেন-জো-দারোতে অসংখ্য বৃহৎ ও সুন্দর গৃহ দেখে অনুমিত হয় যে সেখানে নাগরিকদের সমধিক উন্নতি হয়েছিল। আর্যদের ভারতবর্ষে আসার পূর্বে সিন্ধু-সভ্যতা বর্তমান ছিল।

মিশর। মিশর পৃথিবীর স্বাভাবিক রাজবর্ত্মের নিকট অবস্থিত ছিল না। এর পশ্চিমে দিগন্তব্যাপী সীমাহীন বালিরাশির ধূ ধূ করা অপূর্ব দৃশ্য, পূর্ব দিকে প্রকৃতির জ্বালাময়ী রুদ্রমূর্তি ও দক্ষিণে নিউবিয়ার নিষ্ঠুরদর্শন অনুর্বর ভূমি। মিশরের মৃত্তিকা উর্বর, কিন্তু বিনা পরিশ্রমে সেখানে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা সম্ভব নয়। অতি প্রাচীন কাল থেকে এখানে মানুষ কৃষিকার্যে মনোনিবেশ করেছিল। যাযাবর জীবনের অশান্তি ও অনিশ্চয়তা মিশরবাসীর জীবনে চাঞ্চল্য এনে দিতে পারেনি।

খ্রীষ্টের জন্মের সাত হাজার বৎসর পূর্ব থেকে মিশরের ইতিহাস আছে। কথিত আছে ৪৪০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে মেনিস্ নামে এক ব্যক্তি উত্তর ও দক্ষিণ মিশর

সংযুক্ত করে প্রথম রাজবংশ স্থাপন করেন। ইনিই নাকি মেম্ফিস্ নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ৪২৪১ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে তিন শত পঁয়ষট্টি দিনে বৎসর গণনা আরম্ভ হয়েছিল। ২৪০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দের পর মেম্ফিসের প্রাধান্য হ্রাস হলে থীবস্ রাজধানী হয়। ৪৪০০—৩৩২ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশরে একত্রিশটি রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। দক্ষিণ মিশরের খা-সিখেম নামে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি দ্বিতীয় রাজবংশের উত্তরাধিকারিণীকে বিবাহ করে উত্তর মিশরে রাষ্ট্রিক শাসনের কেন্দ্র স্থাপন করেন। তাঁর পুত্র খেট্‌মিটার মেম্ফিসে প্রথম পিরামিড নির্মাণ করেন। নেফ্‌রু এই বংশের শেষ রাজা। তাঁর রাজত্বের সঙ্গে পিরামিড নির্মাণের যুগ আরম্ভ হয় (৩২০০ পূঃ খ্রীঃ)।

চতুর্থ রাজবংশের প্রথম রাজার নাম শারু। খুফু তাঁর পরে রাজা হন। সম্ভবত তিনি নেফ্‌রুর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। খুফু ও তাঁর পুত্র খাফ্‌রা যথাক্রমে চিওপস্ এবং চিফ্রেন নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই বংশ মেম্ফিসের নিকট প্রায় সত্তরটি পিরামিড নির্মাণ করেছিল। তার মধ্যে তিনটি উল্লেখযোগ্য। বৃহত্তম পিরামিড প্রায় চল্লিশ বিঘা পরিমিত স্থানের উপর নির্মিত হয়েছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটস্ বলেছেন, এক লক্ষ লোক কুড়ি বৎসর পরিশ্রম করে এই বিরাট পিরামিড নির্মাণ করেছিল। বৃহদায়তন তিনটি পিরামিড নির্মাণ করেছিলেন খুফু, শেফরা এবং মেনকুর্যা নামে তিনজন সম্রাট।

সম্রাটদের মৃতদেহ রক্ষা করার জন্য এই সকল গৃহ বা সমাধিমন্দির নির্মিত হত। আকাশচুম্বী সৌধাবলী তাঁদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করেছে, দুরন্ত কাল তাদের ধ্বংস করতে সমর্থ হয়নি। দরিদ্রের অশ্রুজল-নিষিক্ত প্রস্তরখণ্ডে প্রোথিত এই সকল মন্দিরে, গর্বিত সম্রাটদের আত্মাভিমান চরিতার্থকারী এই সকল সৌধে, প্রাচীন কালের শিল্পনৈপুণ্য স্থাপত্য ও নির্মাণ-কুশলতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে, "রূপহীন মরণ"কে "মৃত্যুহীন সাজে" সজ্জিত করে এরা বিশ্বমানবের বিস্ময় উৎপাদন করেছে। উত্তর মিশরের সূর্য দেবতা রা'র উপাসক উমেরকাফ্ দক্ষিণ মিশরে একাধিপত্য স্থাপন করেন। দক্ষিণ-মিশরের উপাস্য দেবতা হোরস্ অবজ্ঞাত হলেন, রা প্রাধান্যলাভ করলেন। দ্বাদশ বংশের সম্রাটগণ নীলনদের জলধারা নিয়ন্ত্রিত করেছিলেন, পতিত জমির চাষ এবং শাসনকার্যের সুব্যবস্থা করেছিলেন। বহু বিরাট মন্দির, বৃহৎ মূর্তি ও প্রকাণ্ড স্তম্ভ তাঁদের কীর্তি ঘোষণা করছে। খ্রীষ্টপূর্ব আঠারো

শতকের প্রারম্ভে মেষপালক রাজারা মিশর অধিকার করে তিন শত বৎসর ক্ষমতাশালী থাকে। মিশরের লোক তাঁদের বর্বর বলত। তাঁরা যুদ্ধে রথ ও ঘোড়া প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

প্রথম থট্‌মিস্ মিশরের মরুপ্রাচীর ভেদ করে তার স্বাভাবিক স্বাতন্ত্র্য ও নির্জনতা ভঙ্গ করেছিলেন। তিনি এশিয়া জয়ে বহির্গত হন। এই সময়ে মিশরবাসী বিশ্বের সন্ধান প্রথম পেয়েছিল, তার সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে বৃহত্তর জগতের কথা জানতে পারল। থটমিসের কন্যা হাটাস্থ পিতার মৃত্যুর পর ১৫৫২ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁর বহুপূর্বে নিটোক্রীস্ সম্রাজ্ঞী হয়ে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। বহু গৃহ ও প্রাসাদ নির্মাণের জন্য হাটাস্থ মিশরের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি পুরুষের পোষাক ও কৃত্রিম শ্মশ্রু ধারণ করে সিংহাসনে বসতেন। তিনি যুদ্ধ-জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন। সোমালি দেশ পর্যন্ত তাঁর আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল। তৃতীয় থটমিস্ ভগ্নীর হস্ত থেকে সিংহাসন উদ্ধার করে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেছিলেন। তিনি সিরিয়া অধিকার করে বাবিলন-অসুর সাম্রাজ্য জয় করেন (১৫০০ পূঃ খ্রীঃ)। তিনি মিশরের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়ী বীর ছিলেন। তিনি বহু গৃহ নির্মাণ করেছিলেন, শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বিজিত দেশের উপর সদয় ব্যবহার করতেন।

তৃতীয় আমেন-হোটেপের সাম্রাজ্য দক্ষিণে নিউবিয়া থেকে এশিয়া মাইনরের পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এত বড় সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েও তিনি পররাজ্যলোলুপ ছিলেন। আমেন-হোটেপ জাঁকজমকশীল সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে মিশরের সভ্যতা ও ঐশ্বর্য উচ্চ সীমায় উঠেছিল, কিন্তু ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা মিশরের জাতীয় শক্তির মূলে কুঠারাঘাত করেছিল।

ঊনবিংশ বংশের (১৩৬৫—১২৩৫ পূঃ খ্রীঃ) দ্বিতীয় রামেসিস্ (১৩১৭—১২৫০ পূঃ খ্রীঃ) বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। অসংখ্য মন্দির ও গৃহ নির্মাণের জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি কেনান রাজ্য জয় করেন এবং ইথিওপিয়া ও লাইবিয়ার উপর প্রাধান্য স্থাপন করেন। পারস্যরাজ কামবাইসিস্ ৫২০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে মিশর জয় করেন। কয়েক বৎসর পরে পারসিকগণ মিশর থেকে বিতাড়িত হয়েছিল।

৬৫৫—৩৩২ পূঃ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বহু রাজা মিশরের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। এই সময়ের মধ্যে অসুরের পর ক্রমান্বয়ে বাবিলন, পারস্য ও গ্রীস পৃথিবীর

ইতিহাসে প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। ৩৩২ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে ভুবন-বিজয়ী আলেকজান্দার মিশরের উদ্ধারকর্তা বলে গৃহীত হলেন। আলেকজান্দ্রিয়া গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্রে পরিণত হল এবং পৃথিবীর দ্বিতীয় নগর ও প্রাচীন রাজধানী বলে পরিগণিত হল। এইস্থানে খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হয়ে প্রাচীন মিশরের ধর্মের উপর যবনিকা টেনে দিল। তার যে জাতীয় ধর্ম সহস্র সহস্র বৎসর ধরে তার চিন্তা, ভাব ও কল্পনা উদ্রেক করেছিল, যার প্রেরণার উৎসে তার সুকুমার শিল্প ও জাতীয় জীবন পুষ্পিত ও মুকুলিত হয়েছিল বা তার অন্তর্জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তার সভ্যতা ও কৃষ্টির মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে এসেছিল, সেই ধর্মের অন্তরাত্মা নূতন পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে জগতের সামনে আবির্ভূত হল।

মিশরের সভ্যতা। প্রায় তিন সহস্র বৎসর ধরে মিশরের জাতীয় জীবনের স্রোতটি সমভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। রাজভক্তি ও ধর্মপ্রবণতা তার রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত ছিল। তাদের চোখে সম্রাট স্বয়ং সর্বশক্তিমান ভগবানের সাক্ষাৎ অবতার, এই কল্পনাকে তারা ফিনিক্সের মূর্তিতে রূপায়িত করেছিল। এখনও তার প্রহেলিকাময় মূর্তি মরুভূমির অন্তহীন বালুসাগরের ভিতর থেকে তার অভ্রংলিহ মস্তক উত্তোলন করে রহস্যময় স্মিতহাস্যে যেন মরুপ্রান্তর প্রতিধ্বনিত করে এই বাণীই ঘোষণা করছে। সম্রাট ভগবানের মূর্ত বিকাশ, তিনি অন্যায় ও মৃত্যুর অতীত, এই ধারণা মিশরীয় জীবনের মূলমন্ত্র ছিল। রাজার মৃত্যুর পরেও মিশরের লোক তাঁর উপর অকুণ্ঠিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা বর্ষণ করত। সমাজে বিভিন্ন স্তর বা শ্রেণী ছিল। যোদ্ধা ও পুরোহিত সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করত। পুরোহিতরা আইন ও নীতিশাস্ত্র রচনা করত, তারা বিচারক ছিল। ধনু, তীর, বর্শা, তলোয়ার, ছুরি, গদা, কুঠার প্রভৃতি যুদ্ধের অস্ত্র ছিল। যোদ্ধারা বর্ম পরিধান করত। চিকিৎসকরা রোগ-নির্মুক্তির বিধান দিত। বহু বিবাহপ্রথা প্রচলিত ছিল না। সমাজে স্ত্রীলোকদের স্থান উচ্চ ছিল। ধনীরা ইষ্টক-নির্মিত গৃহে এবং দরিদ্ররা কুটীরে বাস করত। মিশরে অসংখ্য পিরামিড বা কবর আছে। এজন্য মিশরের নাম কবরের দেশ। একে দেবতার দেশও বলা যেতে পারে। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটস্ বলেন, ১৪১৬—১৩৫৭ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে সেসোস্ট্রিসের রাজত্বকালে মিশরে জ্যামিতির প্রথম উৎপত্তি হয়। তবে ঠিক কোন যুগে মিশরে ক্ষেত্র-পরিমিতির সূত্রপাত হয় তা বলা কঠিন।

সূর্যপূজা। মিশরে সূর্যপূজা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। চতুর্থ আমেন-হোটেপ সূর্যের প্রধান ভক্ত ছিলেন। তাঁর সাম্রাজ্যে সূর্যদেবতার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ ছিল। সূর্যের নাম আটন। এজন্য সম্রাটের নাম ইক্‌নাটন বা আটনের আত্মা। অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি প্রভাবে ইক্‌নাটন যে অনবদ্য সত্যের সন্ধান পেয়েছিলেন জগতের ধর্মের ইতিহাসে তা দুর্লভ। যে পরম সত্যের সৌন্দর্যে প্রকৃতি উদ্ভাসিত, যে অজ্ঞেয় রহস্য সৃষ্টির মধ্যে নিহিত, তাকে ইক্‌নাটন ভক্তি ও শ্রদ্ধা দিয়ে অন্তরের অন্তরে উপলব্ধি করেছিলেন। যে মহান্ সত্য প্রমাণের অতীত, যে সত্য অবর্ণনীয়, বাক্যমনাতীত, ইক্‌নাটন সেই সত্যের পূজারী ছিলেন, সেই সত্যকে তিনি অনুভূতি বলে উপলব্ধি করেছিলেন। তিনি এর প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, এর অনুভূতি দ্বারা তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। সূর্য বা আলোকের এই দার্শনিক তত্ত্ব সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য ছিল। তিনি গতানুগতিক সনাতন ধর্ম বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন। এই ধর্মবিপ্লবী আদর্শবাদী সম্রাট বৈনাশিক মত পোষণ করতেন। ইক্‌নাটন প্রাচীন জগতের অপূর্ব মানুষ ছিলেন।

মিশর গ্রীক দর্শনের জন্মস্থান। তার বীজ আইওনিক দর্শনে প্রতিফলিত ও বিকাশ লাভ করেছিল। মিশরের ধর্মে নিম্নশ্রেণীর জীব ও মৃত সম্রাটের পূজা প্রচলিত ছিল। তার জাতীয় জীবনের সায়াহ্নে পশুপূজা প্রবর্তিত হয়েছিল। গোষ্ঠী শ্রেণী প্রদেশ, এমন কি গৃহস্থ পরিবার বিশেষে কোন না কোন পশুর পূজা হত। ষাঁড়, কুমীর, বিড়াল, হিপোপোটেমাস প্রভৃতি জন্তু ভক্ত হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত। পরলোকে মৃত ব্যক্তির বাসস্থান নির্দেশ করার জন্য তারা অর্থ সামর্থ্য ও সময় নিয়োজিত করেছিল।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও শিল্প। মিশরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৈচিত্র্য-বিহীন। তার আকাশ নির্মল, মেঘমুক্ত—সুন্দর। কোথাও বা বিপুল জলরাশি শুভ্র ছায়াপথের ন্যায় দিগন্ত বিস্তৃত, কোথাও তৃণশস্য-পরিপূর্ণ শ্যামল ভূমিখণ্ড বহুদূর প্রসারিত। মিশর খণ্ড সৌন্দর্যের দেশ নয়। সেখানকার সকল বস্তুই বিরাট, উন্মুক্ত, উদার। প্রকৃতির শান্ত গম্ভীর মূর্তি এখানকার মানুষের কল্পনাকে অসমসাহসিকতার কার্যে উদ্রিক্ত করেছিল। বাবিলনের সমতল ক্ষেত্রে মানুষ এমন একটা সৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছিল যার সোপানাবলী বেয়ে সে দেবলোকের অমৃতত্ব লাভ করবে। মিশরে সে চেয়েছিল বৃহদায়তন প্রাসাদ গঠন করতে যার প্রসাদে সে মহাকালের ভ্রূকুটিকে অগ্রাহ্য করবে।

প্রস্তরনির্মিত বিরাট গগনস্পর্শী পিরামিড, বৃহৎ মূর্তি, উচ্চ মর্মর স্তম্ভ, অগণিত মন্দির, অফুরন্ত সমাধি মিশরের সভ্যতায় বৈশিষ্ট্য আনয়ন করেছে। খণ্ড বস্তুর মধ্যে সৌন্দর্যানুভূতি গ্রীসের বিশেষত্ব। মিশরের শিল্পে এর অভাব ছিল, কিন্তু জড় ও কঠিন প্রস্তরকে কেটে ছেঁটে কুঁদে খোদাই করে কি ভাবে তাকে প্রাণবন্ত করতে পারা যায়, তা মিশরের স্থাপত্য শিল্পে প্রথম প্রকাশ পেয়েছিল।

প্রাচীন মিশরে বর্ণমালা ছিল না, ছবি এঁকে ভাব প্রকাশ করা হত। মানুষের ছবি দিয়ে মানুষ, সিংহের ছবি দিয়ে ক্রোধ, গাছের ডালে পেঁচকের ছবি দিয়ে মৃত্যু, এইভাবে কোন বস্তু বা জন্তুর ছবির সাহায্যে মনোভাব ব্যক্ত করা হত। পরে চিত্রাঙ্কন বর্ণমালায় পরিণত হল। ভূর্জপত্রে লেখা অনেক পুস্তক আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সকল পুস্তক প্রায় খ্রীষ্ট পূর্ব তিন সহস্র বৎসরের অধিক পুরাতন। মিশরের লোক প্রথমে খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করে সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তারা কৃষি রাজনীতি ধর্ম স্থাপত্য কাপড় বোনা সোনা ও রূপার ব্যবহার ধাতু-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র বর্ষ-বিভাগ পঞ্জিকা প্রচলন জাহাজ নির্মাণ পোষাক পরিচ্ছদ অলংকার প্রভৃতি শিল্প ও হস্তসম্পাদ্য নানা বস্তু উদ্ভাবন করেছিল।

চীন—সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে চীন দেশে সভ্যতার বিকাশ হয়, কিন্তু এর প্রাচীন ইতিহাস অজ্ঞাত। কথিত আছে, প্যাণ-কু নামে এক ব্যক্তি সমস্ত মানব জাতির আদি জনক। এঁর অমানুষিক শক্তি ছিল। ইনি নাকি হাতুড়ি বাঁটালির সাহায্যে জগৎ রচনা করেছিলেন। এঁর গাত্রকীটে মানুষের জন্ম হয়। ইনি আঠারো বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনায় নিযুক্ত ছিলেন। সুই-জিন্ নামে আর এক জন মহাপুরুষ বা দেবতা আগুনের ব্যবহার প্রচলন করেন। ইনিই চীনাদের প্রমিথিউস্।

প্রাগৈতিহাসিক তমসাচ্ছন্ন যুগ থেকে উত্তর ও দক্ষিণ চীনবাসীদের মধ্যে কলহ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মিশ্রণ চলেছিল। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্বে চীনজাতি ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে প্রথম আবির্ভূত হয়। বিদেশীদের মধ্যে হুণরাই প্রথম চীন আক্রমণ করে। ২৭০০—২৪০০ পূঃ খ্রীঃ পর্যন্ত পাঁচ জন সম্রাট চীনে রাজত্ব করেছিলেন। প্রাচীন গ্রীস রোম ও ভারতবর্ষের ন্যায় চীনে ছোট ছোট অসংখ্য স্বাধীন রাজ্য ছিল। ক্রমে তারা একজন সম্রাটের শাসনে আসে। সম্ভবত চীনারা সর্বপ্রথম কৃষিকার্য আরম্ভ করে। তারা

প্রথমে মন্দির নির্মাণ করেছিল। শ্যাং ও চৌও রাজবংশ ক্রমান্বয়ে ১৭৫০—১১২৫ পূঃ খ্রীঃ এবং ১১২৫—২০০ পূঃ খৃষ্টাব্দের মধ্যে চীনে রাজত্ব করেছিল। খ্রীঃ পূঃ ৮০০—৪০০ শতকের মধ্যে চীনে অন্ততঃ পাঁচ ছয় হাজার ক্ষুদ্ররাজ্য বর্তমান ছিল। প্রায় দ্বাদশটি ক্ষমতাশালী রাজ্য তাদের উপর কর্তৃত্ব করত। দেশ যুদ্ধ বিগ্রহে সর্বদা বিধ্বস্ত হত। খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে হোয়াং-হো নদীর উপত্যকায় শী ও শীন্ নামে দুইটি শক্তিশালী রাজ্যের সঙ্গে ইয়াং-সি উপত্যকার চু রাজ্যের সংঘর্ষ হয়। চু রাজ্যের বিরুদ্ধে একটি রাষ্ট্র সংঘ গঠিত হওয়ায় এক শত বৎসরের জন্য শান্তি স্থাপিত হয়।

খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম শতাব্দে চীনে লৌহের অস্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল, কিন্তু এর বহু পূর্বে অসুর ও মিশর লৌহের ব্যবহার জানত। চৌবংশকে বিতাড়িত করে শীন্ বংশ প্রভুত্ব অর্জন করে (২৫০ পূঃ খ্রীঃ)। শীন্ নাম থেকে চীন নামের উৎপত্তি হয়েছে। এই বংশের চতুর্থ রাজা শী-ওয়াং-টি প্রাচ্য জগতে একতা ও মিলনের অগ্রদূত। ইনিই চীনের প্রথম সম্রাট। তিনি সমস্ত রাজাদের ক্ষমতা লোপ করে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নৌকা ও রাস্তা নির্মাণ করেন, সুবিধার জন্য শাসন-ব্যবস্থাকে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করেন। তাঁর মহিষী সি-লিং-সী রেশম আবিষ্কার করেছিলেন।

শি ওয়াং-টী চীনের সেকেন্দার ছিলেন। সেকেন্দারের সাম্রাজ্য অপেক্ষা তাঁর সাম্রাজ্য অপেক্ষাকৃত অধিককাল স্থায়ী হয়েছিল। হুণদের আক্রমণ থেকে চীন রক্ষার জন্য তিনি চীনের প্রসিদ্ধ প্রাচীর নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। ২১৪ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রাচীর নির্মাণ আরম্ভ হয়ে দশ বৎসরের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়। এর দৈর্ঘ্য পনের শত মাইল, ভিত পঁচিশ ফুট এবং উপরের প্রশস্ততা পনের ফুট। স্থানে স্থানে এর উচ্চতা তিরিশ ফুট। প্রায় দুই শত ফুট অন্তর এর উপরে চল্লিশ ফুট উচ্চ এক একটি গম্বুজ আছে। চীনের এই বিরাট প্রাচীর প্রাচীন কালের সপ্ত আশ্চর্যের অন্যতম।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের উচ্ছেদ করে শী-ওয়াং-টী চীনে একতা স্থাপন করেন। চীনে একতা প্রতিষ্ঠা তাঁর দ্বিতীয় কীর্তি। তিনি বড় দাম্ভিক ছিলেন। নিজের বিষয়ে এবং নিজ সময় সম্বন্ধে তাঁর ধারণা উচ্চ ছিল। যা কিছু অতীত, যা কিছু প্রাচীন, তিনি ছিলেন তার পরম শত্রু। তাঁর মতে অতীতের অন্ধ উপাসনা জড়তা ও কর্মকুণ্ঠতার লক্ষণ। জ্ঞান বা বিদ্যাচর্চা মানুষকে

অকর্মণ্য করে দেয় ভেবে তিনি চীনের সমস্ত পুস্তক, বিশেষতঃ ইতিহাস ও কনফিউশিয়াসের গ্রন্থ ভস্মীভূত করেন।

২০৯ পূঃ খ্রীঃ তাঁর মৃত্যুর তিন বৎসর পরে শীন্ বংশের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। হ্যান্ বংশ প্রতিষ্ঠিত হল। এই বংশ চারিশত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। হ্যান্ সাম্রাজ্য নদীদ্বয়ের সংকীর্ণ উপত্যকা ভেদ করে মহাচীনের বিস্তৃত ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করল। হুণদের ক্ষমতা পঙ্গু হয়ে গেল। চীনারা বৃহত্তর জগতের অপর সভ্য জাতি ও সভ্যতার সম্পর্কে এল। তিনি পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন। তিনি তাতারদের পরাজিত করেছিলেন, পূর্ব দিকে কোরিয়া থেকে পশ্চিমে ক্যাস্পিয়ন হ্রদের তটদেশ পর্যন্ত ভূমিখণ্ডে তাঁর ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মধ্য এশিয়ার সকল জাতি তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পূঃ খ্রীষ্টাব্দে চীনের ক্ষমতা ও প্রাধান্য রোমের চেয়ে বেশী ছিল। উটির আমলে চীনের সঙ্গে রোমের সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং পার্থিয়ার মারফতে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য চলে। হ্যান্ বংশের আমলে কাঠের উপর অক্ষর খোদাই করে পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা হয় এবং প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের শাসনকার্যে নিযুক্ত করার প্রথা প্রবর্তিত হয়।

প্রাচীন কালে চীনে এক ভাষা এবং এক সভ্যতার ধারা প্রচলিত ছিল। চীনাদের পূর্বপুরুষরা ঈশ্বরকে সিন্ বা আকাশ বলত। তাদের মতে ঈশ্বর এবং আকাশ এক বস্তু, আকাশ ঈশ্বরের অপর নাম। একমাত্র সম্রাটই তাঁর পূজার অধিকারী। সম্রাট প্রজাদের পিতা এবং একমাত্র পুরোহিত ছিলেন। ভগবানের সহিত ভক্তের পরিচয় করে দেওয়ার জন্য কোন মধ্যস্থের প্রয়োজন ছিল না বলে চীনে পুরোহিত সম্প্রদায় গঠিত হয়নি। চীনারা পিতৃপুরুষদের আত্মারও পূজা করত। এই ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে। সূর্য ও চন্দ্রের পূজা হত। বেদীর উপর আগুন জ্বালিয়ে পশু বলি দেওয়া হত। ট্যাংদের আমলে চীনে খ্রীষ্টান ধর্ম ও ইসলাম আবির্ভূত হয়। তাঁরা গির্জা নির্মাণ করতে অনুমতি দেন। ক্যান্টনে আরবরাও একটি মসজিদ্ নির্মাণ করেছিল।

রাষ্ট্র চৈনিক জীবন-পরিধির কেন্দ্র ছিল। তাদের মতে রাষ্ট্রের সৃষ্টিকর্তা ভগবান। নাগরিক না হলে মানুষের জীবন বিফল অর্থহীন ও সার্থকতাশূন্য। সরকারী পদ ও কার্য সম্ভ্রম ও মর্যাদার মাপকাঠি। রাষ্ট্রের কার্যে নিযুক্ত হওয়াই চীনবাসীর একমাত্র ও মুখ্য কামনা ছিল। জ্ঞানী ব্যক্তির সরকারী কার্যে

আত্মনিয়োগ অবশ্য প্রতিপাল্য কর্তব্য। ধর্ম ও নীতি রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অন্তর্গত, কারণ রাষ্ট্রই ভগবৎ বুদ্ধিমত্তা ও জাতীয় মন বিকাশের একমাত্র উপযুক্ত আধার। জন্মের পর সকল মানুষই সমান। অভিজাত সম্প্রদায় বা 'জাত' বলে কিছু ছিল না। পুত্র পিতার সম্পত্তি ছাড়া অন্য কোন বস্তু উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়ার অধিকারী ছিল না। জ্ঞান ও কর্ম পদ ও মর্যাদার নিয়ামক। দেশের সমস্ত ভূমিসম্পত্তির একমাত্র অধিকারী রাজা, প্রজারা সেই সম্পত্তি ঋণস্বরূপ গ্রহণ ক'রে উপভোগ করে। যৌথসম্পত্তির নয় ভাগের এক ভাগ রাষ্ট্রের প্রাপ্য। এই এক অংশ ছাড়া প্রজারা অন্য কোন কর দিত না।

বৃহৎ চীন সাম্রাজ্যের শাসনকার্য একদল কর্মচারী পরিচালন করত। এদের নাম ম্যাণ্ডারিন। এরা প্রাচীন কালের রীতি-নীতি শিক্ষা-দীক্ষায় পারদর্শী ছিল। কৃষি ও হস্তসম্পাদ্য কার্যে চীনারা চিরকাল সুদক্ষ। শস্য, চা ও রেশম উৎপাদনে তারা সুপটু। তারাই প্রথমে কাগজ তৈরী করে। তারাই প্রথমে বারুদ আবিষ্কার করেছিল। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য তাদের ধর্মে ও কর্মে কখনও স্থান পায়নি। তাদের রাজধানী সি-আন্-ফু শিল্প ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল। পোষাক-পরিচ্ছদ, এমন কি ব্যসন-বিলাসিতায় রাষ্ট্র-নির্ধারিত রীতি অনুসৃত হত। পিতৃভক্তি, উচ্চপদস্থ ব্যক্তির প্রতি অনুরক্তি, স্বজন-প্রীতি কর্তব্যনিষ্ঠা প্রভৃতি গুণ চীনা চরিত্রের অলংকার। ট্যাং যুগে চীনারা সকল বিষয়ে উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছিল। ইয়োরোপ অনেক বিষয়ে তাদের বহু পশ্চাতে ছিল।

চীনের ভাষা ও সাহিত্য।

শান্তিপ্রিয় জাতি শক্তিমান বীরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। তাদের ভিতর জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিরা রাজনীতি ও শাসন-নীতিতে পারদর্শী হয়। প্রাচীন কালের রীতিনীতি সঞ্জীবিত রাখার উদ্দেশ্যে চীনারা প্রাগৈতিহাসিক যুগ অবসানের প্রাক্কালে কয়েকটি চিহ্ন উদ্ভাবন করেছিল। ফো-হাই নামে একজন পৌরাণিক রাজা মনের ভাব জ্ঞাপন করার জন্য এক ধরণের চিহ্ন উদ্ভাবন করেছিলেন। এর নাম কুয়া। এই প্রণালীতে ধ্বন্যাত্মক পদের সম্পর্ক ছিল না। চীনা ভাষা এক বর্ণাত্মক। কোন চীনা শব্দ এক বর্ণের বেশী নয়। এতে বিভক্তি যুক্ত হয় না। বিশেষণকে বিশেষ্যে পরিণত করতে হলে কিংবা লিঙ্গ ও সংখ্যার পরিবর্তনেও শব্দের কোন বিকৃতি হয় না।

বিভক্তি-যোগে ক্রিয়ার পরিণতি হয় না এবং কাল নির্দেশ করাও চলে না। আবর্তন বিবর্তন বিশ্লেষণ ও সংহতির ভিতর দিয়ে এই প্রাচীনতম বস্তুতন্ত্রী লেখমালা আধুনিক চীনা বর্ণমালায় পর্যবসিত হয়েছে। এর অনিশ্চয়তা জটিলতা ও আলো-আঁধারি অস্পষ্টতা পঠন-পাঠনের বিষম অন্তরায় হয়েছিল। চীনা ভাষায় পদে বর্ণের পারম্পর্য নাই কিংবা ধ্বনি আশ্রয় করে শব্দ বা পদ গঠিত হয়নি। এতে পদই সর্বেসর্বা, অখণ্ড স্বাধীন সত্তা। চীনা ভাষায় শব্দকোষ প্রায় পঞ্চাশ হাজার চিহ্ন বা রেখা নিয়ে গঠিত, কিন্তু এর অর্ধেকের বেশী ব্যবহৃত হয় না। সাধারণতঃ চার হাজার চিহ্নের জ্ঞানই যথেষ্ট। এজন্য প্রচলিত চীনা ভাষা দুর্বোধ্য গতিহীন ও আড়ষ্ট।

তুলিই চীনাদের প্রাচীন লেখনী। মিশরে চিত্রলিপির বিশ্লেষণে বর্ণমালা সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু চীনে তা হয়নি। চীনারা প্রকৃতির দৃশ্য বা বস্তুকে চিত্রে রূপ দিয়েছিল কিন্তু কালক্রমে তাদের ভাষা যখন পরিপুষ্ট হয়ে উঠল তখন শুধু চিত্রলিখনে ভাষাকে সীমাবদ্ধ করে রাখা সম্ভব হয়নি, তখন নূতন অক্ষর সৃষ্টি আবশ্যক হয়ে উঠল। সংস্কৃত ও চীনা সমজাতীয় ভাষা নয়, কিন্তু চীনা ভাষার উপর সংস্কৃতের প্রভাব দেখা যায়। চীন দেশে বৌদ্ধধর্মের বহুল প্রচারই তার মূল কারণ।

চীনাদের শ্রেষ্ঠ ধর্ম পুস্তকের নাম শী-কিং। এই গ্রন্থ চীনের জাতীয় জীবনের অফুরন্ত প্রস্রবণ। চীনারা একে শ্রদ্ধা ও ভক্তির চোখে দেখে। এই পুস্তক একাধারে প্রাচীন ইতিহাস ধর্মনীতি রাষ্ট্রনীতি—তাদের সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবনের প্রয়োজনীয় নিয়মাবলীর মহাভারত। অন্যান্য ধর্ম-পুস্তকের মধ্যে কীঙস্ অন্যতম। এ ছাড়া কনফিউশিয়াস্ ও তাঁর শিষ্যরা চার-খানি গ্রন্থ লিখেছিলেন।

চীনে নক্ষত্রবিদ্যার চর্চা হত। জ্যোতির্বিদরা ভবিষ্যৎ গণনা করে বলত। তারা পুরোহিতদের স্থান অধিকার করেছিল। গ্রহ-নক্ষত্রের গতি, চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ, বৎসর বিভাগ ও পঞ্জিকা গণনা ইত্যাদি আলোচনা হত। ১৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনে প্রথম আদমসুমারী প্রবর্তিত হয়েছিল। পূর্বে পৃথিবীর কোথাও লোক গণনা হত না। মাত্র দেড়শ' বৎসর পূর্বে আমেরিকার যুক্ত রাজ্যে প্রথম লোক গণনা হয়। সে কালের চীনারা দিক্‌দর্শনযন্ত্র চুম্বক পাথর উদ্ভিদবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করত। হরিদ্রা-নদীর ভীষণ স্রোতে গ্রাম কান্তার ভেসে যেত। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সে স্রোত নিবারণ করা হয়েছিল।

দার্শনিক সূক্ষ্মতত্ত্বের বিচার ও বিশ্লেষণ, পারমার্থিক সত্যের অনুভূতি, সৃষ্টি-রহস্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। তাদের শিল্পে ধর্মে কর্মে অন্তঃপ্রেরণা বা অন্তর্জ্ঞানের সন্ধান অল্পই পাওয়া যায়। তাদের চিন্তার পরিধি সংকীর্ণ, ভাবের গভীরতা অল্প। তাদের জিজ্ঞাসাবৃত্তির গবেষণা-কেন্দ্র—জড় ও স্থূল। তাদের চিত্রে সাহিত্যে ললিতকলার এই সাধারণ প্রাকৃত বুদ্ধি স্পষ্ট ধরা দিয়েছে। জাগ্রত চেতনার বহির্দেশে যে অচীন পুরী আছে, তার অভিজ্ঞতা অর্জনে তারা উদাসীন ছিল। দৃশ্য জগৎ ও ব্যবহারিক সত্য নিয়েই তারা ব্যস্ত ছিল। তারা অতীন্দ্রিয় লোকের ভাব-মন্দাকিনী ধারার সন্ধান পায়নি। অন্তঃপ্রেরণার ঊষর ক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গের কাব্য সংগীত ও সুকুমার শিল্পের লতা পুষ্পিত হয় না, তাদের সুষীম রূপ বিকশিত হয় না, তাদের ভিতর পরম সত্যের, চির সুন্দরের ছন্দ ধ্বনিত হয় না। চীনা জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল মস্তক, বুদ্ধিবৃত্তি, কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনাই সভ্যতার শেষ কথা নয়। কেবল মঙ্গলকে নিয়েই মানুষের জীবন নয়, সুন্দরকেও সে চায় মনপ্রাণ দিয়ে। মানুষের সভ্যতার একদিকে যেমন বিজ্ঞানের সাধনা, আর একদিকে তেমনই চাই সুন্দরের সাধনা। একদিকে শক্তি মঙ্গল, জ্ঞান, আর এক দিকে সৌন্দর্য আনন্দ শৃঙ্খলা। কিন্তু সভ্যতার পূর্ণতা কেবল বিজ্ঞানে ও আর্টে নয়। প্রকৃতির রহস্য-দ্বারের উদ্ঘাটনে, দর্শনের জটিল সমস্যার সমাধানে, মহাকাব্য রচনায়, চিত্র অংকনে, বৃহৎ মন্দির নির্মাণে সভ্যতা সৃষ্টি হয় না। সভ্যতার ভিত্তি ন্যায়। যে সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের আচরণের ভিতর ন্যায়ের শাসন নাই, সে সমাজ সভ্য নয়। যেখানে মানুষ মানুষকে ভালোবাসতে পারে না, যে সমাজে মানুষের সঙ্গে মানুষের প্রীতির সম্পর্ক নাই, যেখানে বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা এক মানুষকে অপর মানুষ থেকে পৃথক করে, সেখানে সত্যকার সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

চীনাদের প্রকৃতির গঠনে তরলতার পরিবর্তে কাঠিন্য, গতির পরিবর্তে স্থিতি, সজীবতার পরিবর্তে স্থবিরতা, সাত্ত্বিকতার পরিবর্তে রাজসিকতা প্রকাশ পেয়েছে এবং তাদের শিক্ষায় দীক্ষায় ধর্মে সাহিত্যে ও জাতীয় জীবনে জড়মতা ও স্থিতিশীলতা স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

ভারতবর্ষ। ভগ্নস্তূপ স্তম্ভ প্রভৃতির লিপি উদ্ধার কিংবা মৃত্তিকাগর্ভে বহুকাল সঞ্চিত নিদর্শন সকল উত্তোলন ও আবিষ্কার করে বিশেষজ্ঞরা বাবিলন অসুর ও মিশরের প্রাচীন ইতিহাস সংকলন করেছেন। দুঃখের বিষয় বৈজ্ঞানিক

প্রণালীতে ভারতবর্ষের ইতিহাস গঠনের উপযোগী উপকরণ খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্ববর্তী নয়। পূর্ব কথিত দেশ সকলের তুলনায় ভারতবর্ষের সভ্যতা আধুনিক,—এই ধারণা এত কাল ঐতিহাসিকরা পোষণ করে এসেছেন। নীল নদ বা তাইগ্রীস এবং ইউফ্রেতিসের জলধারার সঙ্গে শুধু যে মিশরের অথবা মেসোপোটেমিয়ার প্রথম সভ্যতা বাহিত হয়ে এসেছিল তা নয়, সিন্ধু নদের স্রোতধারাও ভারতীয় সভ্যতার কোরকটিকেও ফুটিয়ে তুলেছিল। ডাঃ অডলফ্ এরম্যান বলেছেন, মিশর ও বাবিলনিয়ার সভ্যতা আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি। ইয়োরোপের নূতন প্রস্তর যুগ দশ বারো হাজার বৎসরের অধিক পুরাতন নয়। খ্রীষ্ট পূর্ব ১১৫০ সাল পর্যন্ত মধ্য গলে পাথরের অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার হচ্ছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ শতকেও ব্রোঞ্জের বদলে লোহার ব্যবহার আরম্ভ হয়নি। সুতরাং ইণ্ডো-এরিয়ানরা ইয়োরোপের নূতন প্রস্তর যুগের আর্যদের সমসাময়িক। কাজেই তাদের সভ্যতা খ্রীষ্ট পূর্ব চার হাজার বৎসরের বেশী পুরাতন নয়, অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা মিশর ও মেসোপোটেমিয়ার সভ্যতার চেয়ে নবীনতর।

অনেকের মতে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে আর্যরা ভারতের বাইরের কোন এক দেশ সম্ভবত মধ্য এশিয়া থেকে এসে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন এবং অনার্যদের যুদ্ধে পরাস্ত করে আর্য সভ্যতার পত্তন করেন। কেহ কেহ বলেন, ভারতবর্ষ আর্যদের পিতৃভূমি। এই দুই মতই অগ্রাহ্য হয়েছে। যে সকল নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে, তা চার পাঁচ হাজার বৎসরের পূর্বের হলেও সেগুলি আর্যদের কীর্তি নয়। প্রায় ২০০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসে এবং উত্তর পূর্ব এশিয়ামাইনরে আর্যদের প্রথম দর্শন পাওয়া যায়। এর অনেক পরে তাঁরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে তাঁরা বাইরে গিয়েছিলেন, এ মতের স্বপক্ষে কোন যুক্তি নাই।

আর্য জাতির উৎপত্তি। ঐতিহাসিকরা বলেন, আনুমানিক ৩০০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে মধ্য বা পূর্ব ইয়োরোপের কোন অংশে আদি আর্যজাতির উৎপত্তি হয়। তখন এঁদের সভ্যতা উচ্চস্তরের ছিল না, কিন্তু এঁরা যে কর্মকুশল ও চিন্তাশীল ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নাই। গোচারণ ও কৃষি এঁদের প্রধান বৃত্তি ছিল। অন্যান্য সদ্গুণের ভিতর এঁরা স্ত্রীজাতিকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। শীতের আতিশয্য অথবা উরাল-আলতাই জাতির অসভ্য লোকদের তাড়নায় আর্যরা বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হন। তাঁরা পূর্ব দক্ষিণ ও পশ্চিমে বিস্তৃত হতে

লাগলেন। এর পূর্বেই অসুর মিশর ও বাবিলোনের সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। গ্রীস ও এসিয়ামাইনরে প্রাচীন কাল থেকে সভ্যতা বর্তমান ছিল। ভারতবর্ষে আসার পথে আর্যরা উত্তর মেসোপোটেমিয়ায় এসেছিলেন। বাবিলন ও এসিয়ামাইনরের প্রাচীন ভাষায় আর্যদের উল্লেখ আছে। সুতরাং আর্যরা হয় উত্তর থেকে ককেশাস পর্বতমালা অতিক্রম করে, না হয় উত্তর গ্রীসে মাসিদন ও থ্রেস প্রদেশের ভিতর দিয়ে কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণে উত্তর এশিয়া মাইনরের পথ ধরে এসিয়ামাইনর ও মেসোপোটেমিয়ায় এসেছিলেন। নবাগত আর্যদের কতকগুলি গোত্র ঐ সকল অঞ্চলে বসবাস করতে লাগল। কোথাও বা তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে গেল, আবার কোথাও তারা নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করল। সম্ভবতঃ ১৮০০—১২০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আর্যরা মেসোপোটেমিয়া অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হন। এঁরা বেদ রচয়িতা আর্যদের পূর্বপুরুষ কিন্তু যে আর্যরা মেসোপোটেমিয়ায় বাস করতেন তাঁরা নিজেদের দেবতা সম্বন্ধে যে সকল স্তোত্র রচনা করেছিলেন তার কিছু কিছু ভারতবর্ষ পর্যন্ত পৌঁচেছিল। এই সকল স্তোত্র রচনার কাল আনুমানিক ২০০০-১৫০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দ। এই দেশে অবস্থান কালে সুসভ্য আসিরিয়া ও বাবিলনীয় জাতির পরিশীলন তাঁদের ভাবপ্রবণ হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অসুরের বিরাট সৌধ শৌর্য বীর্য প্রভৃত ঐশ্বর্য তাঁদের চিত্ত অভিভূত করেছিল এবং দুর্গম পর্বত ও অনধিগম্য অরণ্যানী অতিক্রম করে তাঁরা ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করার পরেও অসুর জাতির গৌরবময় স্মৃতি তাঁদের মনে জাজ্বল্যমান ছিল। তাঁদের জাতীয় জীবনের সুদৃঢ় অঙ্গনে যে কাব্য-প্রতিভা সাবলীল নিরাভরণ ভাষার সৌন্দর্যে উন্মেষিত ও প্রস্ফুটিত হয়েছিল, তাকে ব্যাস নামে অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন কোন কবি চয়ন করে সংস্কৃত সাহিত্য-আসর চিরকালের জন্য মধুর সুরভিশ্বাসে পূর্ণ রেখেছেন। এই সাহিত্যের এক একটি শব্দ আভ্যন্তরীন ওজস্বিতায় পরিপূর্ণ, আপন রূপেই আপনি উদ্ভাসিত। প্রাচীন আর্য জীবনের তুচ্ছাতিতুচ্ছ স্মৃতিগুলি এই বিরাট সাহিত্যের প্রশস্ত পটে প্রতিফলিত হয়েছে। পরবর্তী যুগের দার্শনিকতার নৈরাশ্যময় আচ্ছাদনে এর ঔজ্জ্বল্য মসীলিপ্ত হয় নি। সমাজ গোষ্ঠীজীবন রাষ্ট্র-নীতি উচ্চতম জ্ঞান, হৃদয়াবেগের কত উজ্জ্বল দৃপ্ত হীরক খণ্ডের মত এই অনুপম ভাষার স্বচ্ছ পটে সুন্দর হয়ে উঠেছে। এই রচনার অপূর্ব অবদান—জ্ঞান ঔদার্য গাম্ভীর্য ও সরলতা।

আর্যদের যে সকল গোত্র মেসোপোটেমিয়ায় বাস না করে পূর্বদিকে

এসেছিল তারাই পারসিক ও ভারতীয় আর্যদের পূর্বপুরুষ। খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় সহস্রের মধ্যভাগে বা দ্বিতীয়ার্ধে (আনুমানিক ১৫০০ পূঃ খ্রীঃ) আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসীদের তাঁরা দাস বা দস্যু বলতেন। তাদের সঙ্গে যে সংঘর্ষ হয় তার বর্ণনা ঋগ্বেদে আছে। ঐ সময়ে ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ নেগ্রিটো বা নিগ্রোবটু, অস্ট্রিক জাতি ও দ্রাবিড়রা বাস করত। তাদের মধ্যে দ্রাবিড়রা অপেক্ষাকৃত সভ্য ছিল। হিন্দুসভ্যতার বাইরের উপকরণ দ্রাবিড়দের দান। মোহেন-জো-দড়ো এবং হরপ্পার সভ্যতা দ্রবিড় অথবা আর্য কি না, নিঃসন্দেহে বলা যায় না, তবে এই সভ্যতার উপর দ্রাবিড় জাতির সংস্কৃতি ও কৃতিত্বের ছাপ পড়েছিল মনে হয়। নাগরিক সভ্যতার উন্মেষ দ্রাবিড়দের মধ্যেই হয়েছিল। অস্ট্রিক জাতির সভ্যতা মুখ্যতঃ গ্রামমুখী ছিল। নবাগত আর্যদের সভ্যতায় যাযাবর ও গ্রামীন, এই উভয়ের মিশ্রণ ছিল। আর্যরা বিজেতৃরূপেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করেছিলেন। তাঁদের ভাষা উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল। শব্দের অনপচয়তা এই ভাষার ঐকান্তিক বৈশিষ্ট্য। অনার্যদের অনুন্নত ও দুর্বল উপভাষাসকল এই শক্তিশালী ভাষার কাছে মস্তক অবনত করেছিল। অনতিবিলম্বে আর্যভাষা শ্রেষ্ঠতম ভাষা হিসাবে সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে উঠল। কিন্তু অনার্যদের দেবতা ধর্মানুষ্ঠান দর্শন তত্ত্বজ্ঞান ও ভক্তিবাদ আর্যদের মনের উপর গভীর ছাপ দিয়েছিল ; পূজা হোম প্রতিমা দেব-প্রতীকের প্রতি পুষ্প পত্র চন্দন সিন্দুর প্রভৃতি অর্পণ, চাউল ফল-মূল প্রভৃতির নৈবেদ্য, বলির পশুর মুণ্ড বা পাত্রে রক্ত নিবেদন ইত্যাদি আর্য-রীতি ছিল না। এই সকল অনার্য অনুষ্ঠান ক্রমে সংস্কৃত হয়ে হিন্দু অনুষ্ঠানে পরিণত হল। পঞ্চম বা ষষ্ঠ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু সভ্যতা অনার্য ভাবপুষ্ট হয়ে নব কলেবর ধারণ করেছিল।

বৈদিক যুগ। বৈদিক যুগের আর্যরা সপ্তসিন্ধু দেশে বাস করেছিলেন। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে তাঁরা হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যবর্তী স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁরা যে সকল রাজ্য স্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে পাঁচটি প্রধান—কুরু পাঞ্চাল কাশী কোশল এবং বিদেহ। আর্য সভ্যতার কেন্দ্র ক্রমে পূর্বাঞ্চলে সরে যেতে লাগল। বৈদিক যুগের ভরত পুরু ত্রিৎসু তুর্বসু প্রভৃতি আর্য উপজাতিদের পরিবর্তে কুরু পাঞ্চাল প্রভৃতি নূতন জাতি ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হল। পূর্বের নাগরিক জীবনের ক্ষুদ্রতায় ও সংকীর্ণতায় তারা সন্তুষ্ট থাকতে পারল না। বৃহত্তর রাষ্ট্রিক জীবনের আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষা তাদের চিত্ত আলোড়িত করতে লাগল। ঐ যুগের সাহিত্যে ঋগ্বেদ

ও রাজসূয় যজ্ঞের বহুল উল্লেখ এর প্রমাণ। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখা যায় যে দুষ্মন্ত ও শত্রুজিৎ নামে দুইজন রাজা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। কোশল পাঞ্চাল ও মৎস্যের রাজারাও এই যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও এর উল্লেখ আছে। রাজচক্রবর্তী হয়ে দুর্বল ও ক্ষুদ্র রাজ্য সকলের উপর কর্তৃত্ব লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষাই মহাভারতের যুদ্ধের প্রধান কারণ। এই ভীষণ যুদ্ধ প্রায় ১০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়েছিল।

জাতি বিভাগ। ক্রমে বেদের ভাষা দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। এর অর্থবোধের জন্য একদল বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হল। যারা এই কার্যে পারদর্শী হল তাদের ব্রাহ্মণ বলা হল। সমাজে কর্মানুসারে জাতি সৃষ্টি হল। ব্রাহ্মণরা বেদ অধ্যয়ন যজন ও যাজন করত। যারা শাসনকার্য ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হল তারা ক্ষত্রিয়, যারা কৃষি ও ব্যবসায়ে মনোনিবেশ করল তারা বৈশ্য এবং যারা এই তিন শ্রেণীর সেবা করত তারা শূদ্র নামে পরিচিত হল। শাস্ত্রীয় ক্রিয়া-কর্ম ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান প্রথম তিন বর্ণের ব্যক্তির জীবনে প্রধান স্থান অধিকার করল। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে চল্লিশ রকমের সংস্কার পালন করতে হত। অগ্নিষ্টোম ব্রাত্যষ্টোম রাজসূয় অশ্বমেধ পুরুষমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ সমারোহে অনুষ্ঠিত হতে লাগল। পূর্বকালের সহজ সরল ধর্ম বিশ্বাসের পরিবর্তে এক জটিল ধর্মের সৃষ্টি হল।

উপনিষদ। এই সময়ে একদল জ্ঞানী প্রচার করতে লাগলেন যে কর্ম আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি করতে সক্ষম নয়, কর্মে মুক্তি হয় না, কর্ম নূতন নূতন বন্ধন সৃষ্টি করে, একমাত্র জ্ঞানেই মুক্তি। তাঁরা কর্মকে নিম্নে স্থান দিয়ে জ্ঞানের মহিমা প্রচার করতে লাগলেন। তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি—যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মকে লাভ করেন—তিনিই ব্রহ্ম। এই ধরনের চিন্তা, এই রকম জ্ঞান ও কর্মের বিভাগ ঋগ্বেদেও দেখা যায়। এতকাল মানুষের প্রতিষ্ঠা ছিল কর্মে, স্থূল দৃশ্য জগতে; এখন তার প্রতিষ্ঠা হল জ্ঞানে। কর্মধারার মূল অস্ফুটে, প্রকাশের বীজ অপ্রকাশে, এই ধারণা তার মন আলোড়িত করতে লাগল। সুতরাং সৃষ্টিকে, মানুষকে বুঝতে হলে বিশ্বের আদি তত্ত্ব বুঝতে হবে, অণুর চেয়ে অণুর দিকে, মহতের চেয়ে মহত্তের দিকে, গোড়ার দিকে অভিযান আরম্ভ হল উপনিষদের চিন্তায়, এক সার্বভৌমিক ধর্মের অন্বেষণে। উপনিষদের সংখ্যা প্রায় দুই শত। তার মধ্যে বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য প্রাচীনতম। দুটি গ্রন্থই খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বের রচনা।

ঔপনিষদিক যুগের সভ্যতা। ঔপনিষদিক যুগে ভারতীয় চিন্তা অসীমের উর্ধতম দেশে বিচরণ করেছিল। ব্যক্তের অন্তরালে অব্যক্ত সত্তার লীলা-খেলার সন্ধান দিয়ে, প্রাণময় প্রকৃতির গোপন অন্তরালে যে শক্তির নৃত্য চলেছে, যার অশ্রুত নূপুর নিক্কণের তালে ও ছন্দে প্রকাশমান বিশ্ব, আমাদের বৎসর মাস ও ঋতু, চন্দ্র সূর্য গ্রহ-তারকা, আমাদের দৃষ্ট ও অদৃষ্ট জীবন ধর্ম কর্ম পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত—যে জ্যোতির চিন্ময় সাগরে ডুব দিলে অজ্ঞানতার তামস নদী অতিক্রম করা যায়, যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করে, জাগ্রত বস্তুকে অব্যক্তের পরা চেতনায়, ব্রহ্মানন্দে স্থাপন করে উপনিষদ যে অমূল্য সম্পদ সঞ্চিত রেখেছেন, দুরন্ত কাল তাকে নষ্ট করতে পারেনি। জগতের চিন্তা-রাজ্যে এর তুলনা নাই। মিশরে ও ভারতে মানুষ চেষ্টা করেছিল মৃত্যুর গোপন রহস্য উদ্ঘাটন করতে, মৃত্যুঞ্জয়ী হতে। মিশরে তার চেষ্টা পর্যবসিত হয়েছিল বৃহদাকার পিরামিড্ নির্মাণ করে কৃত্রিম উপায়ে তার মৃতদেহ অনন্তকাল সঞ্জীবিত রাখার বৃথা কায়িক পরিশ্রমে, আর ভারতবর্ষে সে চেষ্টা করেছিল পরাবিদ্যার আলোচনায়, পরম সত্যানুভূতির আনন্দরসে, উদাত্ত সংগীতের মূর্ছনাময় বিরাট ঔপনিষদিক সাহিত্য-সৌধ রচনায়। এই পার্থক্য ভারতীয় সভ্যতার ধারা ও গতি নির্দেশ করছে এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাসমূহের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত করেছে।

উপনিষদ যুগের সমাজে স্ত্রীলোকদের স্থান উচ্চ ছিল। তারা বিদ্যা ও জ্ঞানের চর্চা করত। জনকের রাজ সভায় গার্গি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্যের দুইজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁদের নাম মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। প্রব্রজ্যা করার সময় তিনি বললেন—দেখ, মৈত্রেয়ী, বনগমনের পূর্বে আমার বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে চাই। মৈত্রেয়ী বললেন, ধনরত্ন বিষয় সম্পত্তি কি আমায় অমৃতত্ব এনে দিবে? উত্তর হল, না। মৈত্রেয়ী বললেন, যাহারা অমৃতত্ব লাভ হয় না তা নিয়ে আমি কি করব? যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, তুমি ভাল কথা বলেছ। এস, আমি তোমায় জ্ঞানের কথা বলি। তারপর তিনি মৈত্রেয়ীকে উচ্চতত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগলেন।

খ্রীষ্ট পূর্ব সপ্তম শতকের শেষ ভাগে বারাণসীর এক ব্যক্তি মগধের রাজা হলেন। তার নাম শিশুনাগ। তিনি রাজগৃহে রাজধানী স্থাপন করলেন। শৈশুনাগ বংশের দশ জন রাজা প্রায় দুই শত বৎসর (৬০০—৪০০ পূঃ খ্রীঃ)

রাজত্ব করেন। মহানন্দীন ঐ বংশের শেষ রাজা ছিলেন। এক শূদ্রাণীর গর্ভে তাঁর এক পুত্র জন্মে। তাঁর নাম মহাপদ্ম নন্দ। ইনিই নন্দবংশ স্থাপন করেন। মহাপদ্ম বীর যোদ্ধা ছিলেন। তিনি সে যুগের বিখ্যাত ক্ষত্রিয় বংশ সকল ধ্বংস করে উত্তর ভারতে এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কাশ্মীর পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই সময় গ্রীসের ভুবন-বিজয়ী বীর সেকেন্দার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে ঝিলাম নদীর তীরে পুরুকে পরাজিত করেন (৩২৭ পূঃ খ্রীঃ)।

যখন আলেকজান্দার পাঞ্জাবে অবস্থান করছিলেন সেই সময়ে স্বদেশ থেকে নির্বাসিত এক অসহায় যুবক তাঁর শরণাপন্ন হয়েছিল। ইনিই বিশ্ববিশ্রুত মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত। তাঁর পিতা মহাপদ্ম নন্দ নন্দবংশ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্র সমৃদ্ধিসম্পন্ন বাণিজ্যক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। মহাপদ্ম নন্দের আরও আটটি পুত্র ছিল। নন্দদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র থেকে পলায়ন করেন এবং আলেকজান্দারের শিবিরে অবস্থান ক'রে তাঁর নিকট যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করেন। ঔদ্ধত্যের জন্য আলেকজান্দার তাঁর উপর বিরক্ত হওয়ায় চন্দ্রগুপ্ত সেই স্থান ত্যাগ করেন। আলেকজান্দারের ভারতবর্ষ ত্যাগের পর চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাব অধিকার করেন (৩১৫ পূঃ খ্রীঃ) এবং চাণক্যের সঙ্গে মিলিত হন।

চন্দ্রগুপ্ত ও চাণক্য। নন্দরাজা চাণক্যকে অপমান করেছিলেন। চাণক্যের অপর নাম বিষ্ণুগুপ্ত বা কৌটিল্য। পাণ্ডিত্য উপস্থিত বুদ্ধি কুটিলতা রাজনৈতিক প্রতিভায় তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত কৌশলে নন্দবংশ ধ্বংস করে পাটলিপুত্রের রাজা হন (৩২১ পূঃ খ্রীঃ) এবং কৌটিল্যকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেন। ৩১২ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রাজ্যাভিষেকের পূর্বে চন্দ্রগুপ্ত উত্তর ভারত জয় করেন।

চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ ও পারস্যের সীমা থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সাম্রাজ্য আয়তনে ও লোকসংখ্যায় সার্লেমেনের সাম্রাজ্যের চেয়ে বৃহত্তর ছিল এবং রোমান সাম্রাজ্য অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না। বিসমার্কের রাজনৈতিক প্রতিভা, মেকিয়াভেলির কূটবুদ্ধি এবং উচ্চ দার্শনিকতা একাধারে চাণক্যে অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল। চাণক্যের অর্থশাস্ত্র অপূর্ব পাণ্ডিত্যের বিশ্বকোষ। রাজা ও মন্ত্রীর কর্তব্য, বাণিজ্য নীতি, গ্রাম ও সহরের শাসনবিধি, সামাজিক আচার ব্যবহার, বিবাহ ও স্ত্রীলোকের অধিকার,

সৈন্য-বিভাগ, নৌবিভাগ, যুদ্ধবিগ্রহ, শান্তি কৃষি রাষ্ট্রনীতি, শিল্প প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের মূল্যবান তথ্য এই বিরাট গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

চন্দ্রগুপ্তের কর্মৈষণা ও চাণক্যের জ্ঞান, একজনের বুদ্ধি ও অপর ব্যক্তির বাহুবল, এই দুই শক্তির মিলনে ভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি নূতন রূপ গ্রহণ করেছিল। স্মরণাতীত কাল থেকে ঋষিদের জ্ঞান ভারতীয় সভ্যতার ভিত্তিভূমি ছিল। চরম সত্যের অভীপ্সায় তাঁরা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করেছিলেন। তাঁদের দৃষ্টি ছিল অন্তরের দিকে কিন্তু চাণক্যের দৃষ্টি বাস্তবকে অগ্রাহ্য করেনি। তিনি দেখেছিলেন মানুষের মনোভাব বিচিত্র, তার দৃষ্টি ও রুচি বিচিত্র। বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য স্থাপন করতে হলে সম্রাটের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা চাই, ভারতের অন্তর্মুখী শক্তি প্রস্রবণকে বহির্মুখী করে কর্মের পথে চালনা করা চাই। এই আদর্শের প্রতিচ্ছবি তিনি দেখেছিলেন প্রতিভাশালী যুবক চন্দ্রগুপ্তের মধ্যে। এই বাস্তববোধ তাঁর অপরূপ বুদ্ধিশক্তির পরিচয়।

মেগাস্থিনিস্। ৩২৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর তাঁর সেনাপতি সেলুকাস মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া হস্তগত করেন এবং বাবিলনে রাজধানী স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে লুপ্ত গ্রীক প্রাধান্য পুনরুদ্ধার করতে গিয়ে চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে তাঁর বিরোধ ঘটে। সেলুকাস বার বার পরাজিত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন এবং নিজ কন্যার সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বিবাহ দিয়ে মৌর্যবংশের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হন। সেলুকাস মেগাস্থিনিস নামে একজন গ্রীক দূতকে চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় প্রেরণ করেন। মেগাস্থিনিস্ পাঁচ বৎসর তথায় বাস করে ভারতীয়দের আচার-ব্যবহার রীতিনীতি সম্বন্ধে একটি মূল্যবান বিবরণ রেখে গেছেন। চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর শাসন ব্যবস্থা-সম্বন্ধে বহু তথ্য মেগাস্থিনিসের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

রাজপ্রাসাদ প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্মিত এবং সোণার পাত দিয়ে মোড়া ছিল। পাটলিপুত্র ভারতবর্ষের রাজধানী ও বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এর দৈর্ঘ্য সাত মাইল ও প্রস্থ দেড় মাইল ছিল। এর চারদিকে কাঠের প্রাচীর ছিল এবং চৌষট্টিটি প্রবেশ-দ্বার ছিল। কাঠের প্রাচীর বেষ্টন করে একটি গভীর প্রশস্ত পরিখা ছিল। শোণ নদী থেকে জল এনে পরিখাকে পূর্ণ রাখা হত। পশুর সঙ্গে যুদ্ধ, ঘোড়দৌড় ও শিকার সম্রাটের চিত্ত-বিনোদন করত। অন্তঃপুরে গ্রীক রমণীগণ প্রহরীর কার্য করত। সম্রাট প্রত্যহ

একবার প্রকাণ্ড দরবারে বসে প্রজাদের অভিযোগ শ্রবণ করতেন। তিনি হিন্দু ছিলেন কিন্তু তাঁর ধর্মমত উদার ছিল। তাঁর রাজ্যের সকল প্রজা স্ব স্ব ধর্ম পালন করত। রাজ্যের কল্যাণের জন্য তিনি উপযুক্ত ব্রাহ্মণদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। রাজধানীর আভ্যন্তরীন কাজকর্ম নির্বাহের জন্য মিউনিসি- প্যালিটি ছিল। এর তিরিশ জন সভ্য ছিল। প্রত্যেক বিভাগে পাঁচজন সভ্য ছিল। বিভাগগুলির নাম (১) শিল্পাদির উন্নতি বিভাগ, (২) বৈদেশিকদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের বিভাগ, (৩) আদমসুমারির কার্যবিভাগ, (৪) ব্যবসা পরিচালন-বিভাগ, (৫) শুল্ক আদায় বিভাগ।

রাজপ্রতিনিধিরা প্রাদেশিক শাসনকার্য পরিচালনা করত। সাধারণতঃ তারা রাজার আত্মীয় ছিল। গুপ্তচরের সাহায্যে সম্রাট তাদের গতিবিধি লক্ষ্য করতেন। তক্ষশীলা, উজ্জয়িনী এবং ভিনসা প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের বাসস্থান ছিল। অপরাধীদের কঠোর দণ্ড দেওয়া হত। কৃষিক্ষেত্র সম্রাটের সম্পত্তি বলে বিবেচিত হত। উৎপাদিত ফসলের এক চতুর্থাংশ রাজস্ব আদায় হত। জল সেচনের সুব্যবস্থা ছিল। ইহা একটি বিশেষ বিভাগের উপর ন্যস্ত ছিল।

সৈন্যবিভাগ সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হত। তিরিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য, ছয় লক্ষ পদাতিক, নয় হাজার হাতি এবং অসংখ্য যুদ্ধরথ রাষ্ট্রের ব্যয়ে রক্ষিত হত। তিরিশ জন সভ্য নিয়ে গঠিত একটি কমিটির উপর সৈন্যবিভাগ পরিচালনের ভার ছিল। এই কমিটি ছয়টি বোর্ডে বিভক্ত ছিল। এক একটি বোর্ডে পাঁচজন সভ্য ছিল। তাহারা নৌবহর, খাদ্য সরবরাহ, পদাতিক সৈন্য, অশ্বারোহী সৈন্য, যুদ্ধরথ ও হস্তী পরিদর্শনের কার্য করত। সৈনিকদের প্রচুর বেতন দেওয়া হত।

সাম্রাজ্যের ভিতর শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। সম্রাট বিদ্যা ও শিল্পের পৃষ্ঠ- পোষক ছিলেন। রাজ্যের ভিতর সুন্দর রাস্তা ছিল। পাটলিপুত্র থেকে উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত বারো শত মাইল একটি দীর্ঘ ও সুন্দর রাজপথ ছিল।

এত প্রাচীন কালে এমন সুন্দর ব্যবস্থা অতি অল্প দেশেই দেখা গেছে। মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের কার্যাবলী তাঁর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি প্রমাণিত করে। মৌর্য্য সাম্রাজ্য ঐতিহাসিক যুগের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্য। আলেকজান্দারের সাম্রাজ্যকে সাম্রাজ্য নামে অভিহিত করা যায় না। বিভিন্ন দেশ জয় করে আধিপত্য স্থাপন করলেও তিনি রাষ্ট্রিক একত্ব আনয়ন করতে সমর্থ হন নি। তাঁর দুর্দ্ধর্ষ বিজয়ী বাহিনী যখন যে দেশের উপর দিয়ে চলে গেছে তখনই সেই

দেশ স্রোতের মুখে লতার মতো অবনত মস্তকে তাঁর প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে, কিন্তু তাঁর চলে যাওয়ার পর সে দেশ পুনরায় মস্তক উত্তোলন করে দাঁড়িয়েছে। সিন ও হান সাম্রাজ্য বিশ্বের ইতিহাসে দ্বিতীয় এবং রোমান সাম্রাজ্য তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

অশোক ও বৌদ্ধধর্ম। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার মগধের রাজা ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র অশোক দুর্দান্ত ছিলেন। এজন্য লোকে তাঁকে চণ্ডাশোক বলত। সম্রাট হওয়ার পর অশোক সমুদ্রতীরবর্তী কলিঙ্গ প্রদেশ জয় করেন (২৬১ পূঃ খ্রীঃ)। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর তাণ্ডবলীলা দর্শনে তাঁর হৃদয়ে করুণার সঞ্চার হয়। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর স্বভাবের পরিবর্তন হল। চণ্ডাশোক ধর্মাশোক নামে পরিচিত হলেন।

ছন্দ তান লয়ে সুরের প্রকাশ। সুর যখন মর্মে এসে পৌঁছে তখন অবচেতন মনে ভাবের তন্ত্রী স্পন্দিত হয়ে ওঠে, সুপ্ত চেতনা নিজের ছন্দে, নিজের পথে রূপান্তরিত হয়ে প্রকাশ পায়। বৌদ্ধধর্মের সম্পর্কে এসে অশোক এক অপরূপ আনন্দের সন্ধান পেলেন, তাঁর অন্তরতম সত্তা সাড়া দিয়ে উঠল। বৌদ্ধধর্মের মহান ভাবধারা তাঁর জীবনের গতি ফিরিয়ে দিল। তিনি বিশ্ববাসীর চিত্ত আকৃষ্ট করলেন। বিশ্বের ইতিহাসে তাঁর স্থান চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তাঁর পূর্বে ও পরে কোন সম্রাট অহিংস নীতি অবলম্বন করে রাজ্যশাসন করেন নি। মানুষের জাগতিক সুখসম্পদ বৃদ্ধি করার চেয়ে তার আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন শ্রেয় ও প্রেয়, রক্তপাত করে দেহ জয় করার চেয়ে ভালোবাসা দিয়ে মনের উন্নতি সাধনই শ্রেষ্ঠতর কাজ। এজন্য তিনি তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তরস্তম্ভে, পর্বতগাত্রে, শিলাফলকে তথাগতের অমৃতময় বাণী ও নীতিগর্ভ উপদেশ উৎকীর্ণ করে দিলেন। এই সকল অনুশাসন পাঠ করে তদনুসারে তাঁর প্রজারা জীবন পরিচালিত করবে, মহান্ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে উঠবে ও উচ্চ আদর্শে জীবন গঠন করবে—এই ছিল তাঁর অন্তরের বাসনা। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তিনি আপনার প্রিয় পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বেশে সুদূর সিংহল দ্বীপে প্রেরণ করেছিলেন। কাশ্মীর, মহীশূর, কোঙ্কন, চোল দেশ, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ ও মালয় উপদ্বীপে ভিক্ষুদের প্রেরণ করা হল। মানুষ ও পশুর জন্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হল।

তাঁর সময়ে পাটলিপুত্র নগরে বৌদ্ধ স্থবিরদের একটি সঙ্গীতি হয়। এই সভায় বৌদ্ধধর্মের পুস্তকাদি শৃঙ্খলাবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ হয়। এই পথ অবলম্বন করে

তিনি নির্বাণ লাভ করতে ইচ্ছা করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর তাঁর জীবন বড় মধুর হয়েছিল। তাঁর সাম্রাজ্যের বর্বর জাতিদের উন্নতির উপায় নির্দেশের জন্ম তিনি একটি মন্ত্রীসভা গঠন করেছিলেন। তিনি স্ত্রীশিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। ব্যাপক ভাবে জনশিক্ষার জন্ম এরূপ অক্লান্ত অকপট পরিশ্রম ও বিপুল আয়োজন পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন।

মহারাজ অশোক স্বীয় কর্মের ভিতর দিয়ে দেবত্বের পরিচয় দিয়েছেন, বস্তুতান্ত্রিক জীবনের উপর আধ্যাত্মিকতার আলোকপাত করেছেন। মানুষের সীমিত জীবনের সঙ্গে অসীম জীবনের সংযোগ স্থাপন কার্যে তিনি সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। এজন্য অর্ধ জগৎ জুড়ে লোক এখনও তাঁর নাম স্মরণ করে ধন্য হয়।

অতিমাত্র আধ্যাত্মিকতা। তাঁর এই অতিমাত্র আধ্যাত্মিকতায় মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল। অসংখ্য সঙ্ঘারাম বিহার মঠ স্থাপিত হয়েছিল। দলে দলে লোক সংসার ত্যাগ করে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী সেজে মঠে বাস করতে লাগল। এক এক মঠে দশ হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বাস করত। অরণ্য নগর হল, নগর অরণ্যে পরিণত হল, আলস্য প্রশ্রয় পেল। কর্মবিমুখ নরনারী একত্র বাস করতে লাগল, নৈতিক বন্ধন শিথিল হয়ে গেল। গার্হস্থ্য জীবন পরিত্যক্ত হল। রাজ অনুগ্রহে অশন-বসনের কষ্ট দূর হওয়ায় মঠের অধিবাসীদের সংখ্যা বেড়েই চলল। ধর্মবিশেষের প্রতি রাজার পক্ষপাতিত্ব ও অনুরক্তিতে অন্য ধর্ম সম্প্রদায় ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট হন। পুষ্যমিত্রের নেতৃত্বে হিন্দুরা বিদ্রোহী হয়ে উঠল। ব্যাকট্রিয়ায় গ্রীকরা স্বাধীন হয়ে গেল। কলিঙ্গ ও অন্ধ্র স্বাধীন হল। ১৯০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীক নরপতি ডেমিট্রিয়াস্ কপিশা গান্ধার পাঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ জয় করলেন। মিনেণ্ডার সিন্ধুনদের বদ্বীপ গুজরাট রাজপুতানার কিছু অংশ এবং অযোধ্যা জয় করে পাটলিপুত্র অধিকার করার জন্য অগ্রসর হলেন, কিন্তু পুষ্যমিত্র তাঁকে বিতাড়িত করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত, উত্তর ভারতের অর্ধেকাংশ, পশ্চিম ভারত ও মধ্যপ্রদেশ গ্রীকদের অধিকারভুক্ত হল। কোন কোন গ্রীক রাজা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন। ক্রমে গ্রীকরা হিন্দুদের সঙ্গে মিশে গেল। পুষ্যমিত্র শেষে মৌর্য্য রাজাকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। শুঙ্গবংশ (১৭৯-৭৮ পূঃ খ্রীঃ) স্থাপিত হল। পুষ্যমিত্র অশোকের অহিংস নীতির কেন্দ্র পাটলিপুত্রে দুই বার অশ্বমেধ যজ্ঞ করে বৌদ্ধধর্মের প্রতিবাদ ঘোষণা করেন।

বৈদেশিক আক্রমণ। অশোকের মৃত্যুর দুই শত বৎসর পরে মগধের রাজনৈতিক ক্ষমতা লুপ্ত হলেও বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র হিসাবে এর প্রভাব বর্তমান ছিল। এই সময়ে মধ্যএশিয়ার অবারিত প্রান্তর থেকে দলে দলে লোক এসে ভারতবর্ষ আক্রমণ করতে লাগল। এদের নাম ব্যাকট্রিয়ান শক সিথিয়ান তুর্কী ও কুশান। মধ্যএশিয়ার দুর্দ্ধর্ষ যাযাবরগণ সংখ্যাধিক্যবশতঃ বাসস্থান ও খাদ্যের অন্বেষণে বহির্গত হয়েছিল। প্রথমে তারা চীনে আশ্রয় অন্বেষণ করে কিন্তু সেই দেশ থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তাদের ভিতর অনেকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে ব্যাকট্রিয়া থেকে মিনেণ্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। পুষ্যমিত্র তাঁকে বিতাড়িত করেন, কিন্তু কাবুল ও সিন্ধুদেশ তাঁর হস্তগত হল। তারপর শক আক্রমণের প্রবল স্রোত ভারতবর্ষের উপর প্রবাহিত হল। তারা যাযাবর তুর্কীদের একটি শাখা ছিল। তারা উত্তর ও পশ্চিম ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। কুশানরা তাদের শ্যামল তৃণভূমি থেকে বিতাড়িত করে ব্যাকট্রিয়া ও পার্থিয়া অধিকার করে এবং উত্তর ভারত, বিশেষতঃ পাঞ্জাব, রাজপুতানা ও কাথিয়াবাড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষের কুশান সাম্রাজ্য দক্ষিণে কাশী ও বিন্ধ্য পর্বতশ্রেণী, উত্তরে খাসগড় ও খোটান এবং পশ্চিমে পারস্য ও পার্থিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তারা ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে যাযাবর জীবনধারা ত্যাগ করে একটি সুসভ্য জাতিতে পরিণত হয়। এই সকল ব্যাকট্রিয় ও তুর্কী শাসনকর্তা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে ভারতীয় সংস্কৃতির রসধারায় পরিপুষ্ট হয় এবং একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে এক একটি আত্মকর্তৃত্ব-সম্পন্ন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার আকার ধারণ করে।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারত। এই যুগে তক্ষশীলা ও মথুরা বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র আলোচনার কেন্দ্র ছিল। চীন ও পশ্চিম এশিয়া থেকে বহু বিদ্যার্থী এই দুইটি স্থানে সমবেত হয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে ক্রমাগত বৈদেশিক আক্রমণ ও মৌর্যশাসন পদ্ধতির ধ্বংস—এই দুইটি কারণে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি প্রাচীন আর্য সংস্কৃতি ও শাসন পদ্ধতির প্রতিনিধি হয়ে উঠল। উপর্যুপরি আক্রমণের চাঞ্চল্য ও তাড়নায় বহু গুণী ব্যক্তি উত্তর ভারত থেকে এসে দক্ষিণ ভারতে বাস করতে লাগলেন। এর এক হাজার বৎসর পরে মুসলিম আক্রমণের ফলে অনুরূপ অবস্থার উদ্ভব হয়। এমন কি বর্তমান কালেও বৈদেশিক আক্রমণ দক্ষিণ ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার উপর অল্পই হস্তক্ষেপ করেছে।

উত্তর ভারতের সংস্কৃতি বহু সংস্কৃতির সমবায়ে গঠিত। দক্ষিণ-ভারত আর্য সংস্কৃতির প্রতিভূ, প্রাচীনের উপাসক, অতীতের গ্যাসরক্ষক—আর্যধর্ম শিল্প সমাজ নীতির রক্ষক। মগধের পতনের সঙ্গে বহু পণ্ডিত শিল্পী স্থপতি ও কারিগর দক্ষিণ ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে ইয়োরোপের বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। মুক্তা হাতির দাঁত সোনা চাউল লঙ্কা ময়ূর এমন কি বানর বাবিলোন মিশর গ্রীস ও রোমে রপ্তানি করা হত। মালাবার উপকূল থেকে শালকাঠ চাল্ডিয়া ও বাবিলোনিয়ায় প্রেরিত হত। এর জন্য ভারতীয় নাবিক পরিচালিত ভারতীয় জাহাজ ব্যবহৃত হত। প্রাচীন জগতে দক্ষিণ ভারতের স্থান উচ্চ ছিল। অশোকের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে অন্ধ্রদেশ একটি বৃহৎ রাজ্যে পরিণত হয়েছিল।

আলেকজান্দারের সময় থেকে প্রায় চারি শত বৎসর গ্রীসের সঙ্গে ভারতবর্ষের আদান-প্রদান চলতে থাকে। ভারতীয়রা গ্রীকদের যবন বলতেন। হিন্দুরা গ্রীসের কাছে জ্যোতিষ শিল্প ও বিজ্ঞানের নূতন তত্ত্ব শিক্ষা করেছিলেন।

গুপ্তযুগ। চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুপ্তবংশ স্থাপিত হয়। পাটলিপুত্র এই বংশের রাজধানী ছিল। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবী বংশের কুমারদেবীকে বিবাহ করেছিলেন। এই বিবাহের রাজনৈতিক ফল সুদূর প্রসারী হয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। এজন্য তাঁকে 'ভারতের নেপোলিয়ন' বলা হয়। তিনি দক্ষিণ কোশল, কেরল ও কাঞ্চীর রাজাদের পরাজিত করেন। সমতট নেপাল কামরূপ মালব প্রভৃতির রাজারা তাঁর অধীনতা স্বীকার করেন। মৌর্য্য সাম্রাজ্যের পর এত বড় সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে স্থাপিত হয়নি।

গুপ্ত সম্রাটরা হিন্দু ছিলেন। তাঁরা বিদ্যাচর্চায় উৎসাহ দিতেন। তাঁরা প্রাকৃত ত্যাগ করে সংস্কৃত ভাষার প্রচারে সাহায্য করেছিলেন। এঁদের সময়ে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান হয়, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস এবং শিল্প ও সাহিত্যের বিলক্ষণ উন্নতি হয়।

৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত গুপ্ত সম্রাটদের আধিপত্য স্বীকার করে। মালব তাঁদের অধীনতা স্বীকার করলেও উহা তাঁদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। মালবের রাজা যশোধর্মদেব মিহিরকুলকে দমন করেন। কোরুর যুদ্ধে (৫৩৩ খ্রীঃ) হূণদের প্রাধান্য লোপ পায়।

যশোধর্মদেব। অনেকের মতে যশোধর্মদেবই ভারতের গৌরবমণি

বিক্রমাদিত্য। হূণদের পরাজিত করেন বলে এঁর নাম শকারি হয়েছিল। যখন হূণ আক্রমণের ঘনমসীছায়ায় উত্তর ভারত আচ্ছন্ন তখন কয়েকজন মনীষীর অতুলনীয় প্রতিভার দীপ্ত আলোকে চতুর্দিক উজ্জ্বল হয়েছিল। এঁদের নাম নবরত্ন। তাঁরা এক সময়ে প্রাদুর্ভূত না হলেও একই যুগের লোক ছিলেন। নবরত্নের আবির্ভাবে উজ্জয়িনী পবিত্র তীর্থে পরিণত হয়েছিল।

সাম্রাজ্যিক সত্তা। গুপ্তযুগে ভারতবর্ষ আর একবার আপনার সাম্রাজ্যিক সত্তা অনুভব করার সুযোগ পায়। কিন্তু তার প্রভাব গভীর ও স্থায়ী হয়নি। তাঁরা মহাজাতীয় ইতিহাস সৃষ্টি করতে সমর্থ হননি। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ভারতবর্ষ অন্তরে অন্তরে আর্য ও অনার্যে বিভক্ত। এখানে কখনও সামাজিক ঐক্য স্থাপন হয়নি, সাম্রাজ্যিক ঐক্য সামাজিক ঐক্যের উপর ভিত্তি স্থাপন করেনি। বহু সংখ্যক অনার্যদের মধ্যে পড়ে আর্যরা প্রাচীনকাল থেকে আত্মরক্ষায় ব্যাপৃত ছিলেন। এজন্য তাঁরা সমাজনীতি গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। হিন্দু রাজারা সমাজ রক্ষার জন্য তাঁদের অর্থ সামর্থ্য ও বুদ্ধি প্রয়োগ করেছিলেন। সুতরাং রাষ্ট্রজয় ও সাম্রাজ্য রক্ষার প্রতি ততদূর মনোযোগী হতে পারেন নি। রামায়ণ ও মহাভারতে আর্যদের বীরত্বকাহিনী সুললিত ছন্দে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও সমাজনীতির দ্বন্দ্ব সুস্পষ্ট। এজন্য হিন্দুদের এই দুই কীর্তিস্তম্ভে ইতিহাসের কথা তত বেশী নাই—রাষ্ট্রীয় বীরদের কাহিনীর মধ্যেও তত্ত্বকথা বা নীতি-উপদেশ প্রধান স্থান পেয়েছে। তাঁদের কোন পুস্তকে ঐতিহাসিক বোধ বা ঐতিহাসিক সত্তা প্রবল হয়ে ওঠেনি। এই দ্বন্দ্ব, এই পৃথক সত্তাবোধ ভারতের জাতীয় জীবন গঠনের অন্তরায় হয়েছে।

হর্ষবর্দ্ধন। যশোধর্মদেবের পর মালব রাজ্য অনেক দিন স্বাধীন ছিল। সেই সময় আরও তিনটি রাজ্য—বল্লভী, মগধ ও থানেশ্বর বিখ্যাত ছিল। থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্দ্ধন সমগ্র আর্যাবর্তের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। কান্যকুব্জ তাঁর রাজধানী ছিল। তিনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কবি বাণভট্ট তাঁর সভাসদ ছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন শৈব ছিলেন কিন্তু কোন ধর্মের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল না। এঁর রাজত্বকালে চীন দেশের পরিব্রাজক হিউন-স্যাং ভারতবর্ষে আসেন এবং পনের বৎসর ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন। হর্ষবর্দ্ধন পাঁচ বৎসর অন্তর একটি বড় সভা আহ্বান করতেন। এই সভায় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা হত। তিনি পণ্ডিতদের প্রচুর পারিতোষিক দিয়ে উৎসাহিত করতেন। ৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর কনৌজ সাম্রাজ্য লোপ পায়। সপ্তম শতাব্দীতে ভারতবর্ষ

বহুধা বিভক্ত হয়ে যায়। হিন্দু রাজারা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। ফলে বৈদেশিক আক্রমণের পথ প্রশস্ত হয়ে গেল।

পারস্য। সপ্তসিন্ধু দেশে বাস করার সময় আর্যদের মধ্যে গৃহকলহ আরম্ভ হয়। এই কলহ ভীষণ যুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। পুরাণে এই যুদ্ধ দেবাসুর-সংগ্রাম নামে পরিচিত। যে সকল আর্য ইন্দ্রের পূজায় সোম আহুতি দিতেন তাঁদের নাম দেব বা দৈত্য ছিল। যাঁরা প্রচলিত বৈদিক ধর্মে অনাস্থাসম্পন্ন ছিলেন ও মিথ্রের পূজা করতেন তাঁদের নাম অসুর ছিল। অসুররা দেবদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে ইচ্ছা করে। ফলে যুদ্ধ হয়। অসুরদের পরাজয় হল। দুই দলের মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাদ স্থায়ী হয়ে গেল। মিথ্রা-উপাসক অসুররা জন্মভূমি সপ্তসিন্ধু পরিত্যাগ করে ব্যাকট্রিয়ানা ও বেলুচিস্তানে চলে গেল। যারা ব্যাকট্রিয়ানায় উপনিবেশ স্থাপন করল তারা সে স্থানের নাম দিল "এরিয়ানা বিজো" বা আর্যদের জন্মভূমি। পরে এরিয়ানা বিজো তুষারাচ্ছন্ন হয়ে মনুষ্যবাসের অনুপযুক্ত হল। তখন জিমের নেতৃত্বে একদল অসুর উত্তরাঞ্চলে চলে যেতে বাধ্য হল। অনেক দিন পরে এরিয়ানা বিজো তুষারাক্রমণ থেকে মুক্ত হলে জোরাষ্ট্রার (৬৬০—৫৮৩ পূঃ খ্রীঃ) তাঁর অনুচর-দের সঙ্গে সেখানে বাস করতে লাগলেন। তিনি এরিয়ানা বিজোকে স্বর্গ নামে অভিহিত করলেন। পরে এই ভূস্বর্গের উচ্চস্থান থেকে তাঁরা পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে পারস্যে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

আর্যদের মধ্যে পারসীকরাই ঐতিহাসিক যুগে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল। সাইরাসের সময় (৫৬০—৫২৯পূঃ খ্রীঃ) থেকে সেকেন্দারের অভিযানের সময় (৩২৭ পূঃ খ্রীঃ) পর্যন্ত দুই শত বৎসর তারা শৌর্য বীর্য ও ক্ষমতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিল। পূর্ব দিকে ভারতবর্ষের সীমা থেকে মিশর পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। গ্রীস জয় করে তারা এমন কি ইয়োরোপ আক্রমণ করতে উদ্যত হয়েছিল।

সাইরাস। সাইরাস পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জন্মের সময় পারস্য একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্বে গঙ্গা নদীর পশ্চিম তীর থেকে সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র অধীশ্বর হয়েছিলেন। বাবিলোনের সভ্যতা সুসা নগরের ভিতর দিয়ে পারস্যের পার্বত্য প্রদেশে প্রবেশ করেছিল। পৃথিবীর ইতিহাসে সাইরাসের নাম স্মরণীয়। তিনি সকলের চেয়ে পুরাতন বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিলেন। প্রাচীন কাল থেকে পারস্যের চতুর্দিকে বহু রাজ্য

ছিল। সকলে একত্রিত হলে তারা পারস্যকে গ্রাস করে ফেলত। নানাজাতির সঙ্গে সংঘর্ষে পারস্যের রাজনৈতিক সত্তা প্রবল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সাইরাস বৃথা রক্তপাত করে তাঁর তরবারি কলুষিত করেননি। বিজিত শত্রুর উপর তিনি সদয় ব্যবহার করতেন। তিনি অত্যাচারিত ও পদদলিত জাতিকে উদ্ধার করতেন, দেশী রাজার অধীনে রেখে তার জাতীয়তা রক্ষা করতেন। নানা জাতির সমন্বয়ে এক সম্রাটের অধীনে যে বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছিল তা পৃথিবীর ইতিহাসে নূতন। সাইরাসকে অবলম্বন করে "পারস্য আপন অখণ্ড মহিমার বিরাট ভূমিকা অনুভব করিতে পারিয়াছিল।" সাইরাসের পুত্র ক্যামবাইসিস্ মিশর জয় করেছিলেন।

ডেরিয়াস্। ৫২১ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ডেরিয়াস পারস্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁর সাম্রাজ্য একত্রিশটি প্রদেশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল। প্রত্যেক প্রদেশে একজন কার্যনির্বাহক ও একজন সেনাপতি ছিল। ডেরিয়াস্ নিজ নামে সোনা ও রূপার টাকা প্রচলন করেছিলেন। সাম্রাজ্যকে সুনিয়ন্ত্রিত করে রাষ্ট্র শাসনের যে আদর্শ তিনি প্রবর্তন করেছিলেন প্রাচ্য জগতে তা গৃহীত হয়েছিল। তিনি পারস্যের রাষ্ট্রিক সত্তার প্রতীক ছিলেন। তাঁর পুত্র জারাকসিস্ আলস্যপরায়ণ ও দুর্বল নরপতি ছিলেন। তিনি গ্রীস আক্রমণ করেছিলেন। ইয়োরোপে যুদ্ধাভিযানে অত্যধিক লোকক্ষয় ও অযথা অর্থনাশ পারস্যের দুর্বলতা এবং পতনের অনিবার্য কারণ। সেকেন্দারের প্রচণ্ড আক্রমণে (৩৩০ পূঃ খ্রীঃ) পারস্য তাঁর পদানত হয়ে পড়ে।

পারসিক সভ্যতা। বাবিলোনের বর্ণমালার অনুকরণে পারসীকরা নিজেদের বর্ণমালা আবিষ্কার করে তার উন্নতি করেছিল। পূর্বে শব্দ ব্যবহারের পারম্পর্যের ভিতর বিচ্ছেদ ছিল না, বাক্যের মধ্যে শব্দগুলি অবিচ্ছেদে ব্যবহৃত হত। শব্দ বা পদের মধ্যে ব্যবধান রক্ষা করার রীতি পারসীকরাই প্রথম উদ্ভাবন করেছিল। শিল্পে তাদের মৌলিকতা ছিল না। আড়ম্বর ও বিলাসিতা রাজ-সভার বৈশিষ্ট্য ছিল। সুসা, বাবিলোন ও ইক্‌বাটনা সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। সম্রাট এই তিনটি নগরের প্রত্যেকটীতে কয়েক মাস করে বাস করতেন।

পারস্যের শিল্প। পারসীকরা প্রকৃতির মুক্ত প্রাঙ্গণে ও বনভূমির মুক্ত স্থানে বাস করতে ভালবাসত। নগরে বাস করতে আরম্ভ করেও তারা উন্মুক্ত ও উদারভাবের অনুকূল গৃহ নির্মাণ করেছিল। তাদের কায়িক পরিশ্রম পারস্যকে নন্দন কাননে পরিণত করেছিল। মিশরের বিরাট মন্দির তার রহস্যময়

অন্তর্জীবনের পরিচয় দেয় কিন্তু পারস্যের উন্মুক্ত হর্ম্যরাজি তার চির পুরাতন স্বাধীন জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে বর্তমানের সামঞ্জস্য বিধান করে তার অন্তর্লীন ভাবধারার সূত্রটিকে পরিস্ফুট করে দিয়েছে। মিশরের শিল্পে আছে একটা শান্ত গম্ভীর উদাস ভাব, অপূর্ব শালীনতা। পারস্যের শিল্পে আছে চঞ্চলতা, অস্থিরতা। ভারতের শিল্পলক্ষ্মী ধ্যান-স্তিমিত-লোচনা—নিবিড় সুখানুভূতির পূর্ণানন্দে ভরপুর—ঘন সুষুপ্তির আনন্দময় অবস্থায় আত্মতৃপ্ত। বিরাটত্ব ও বিশালতার অপূর্ব সমন্বয়ে মিশরের শিল্প গরীয়ান। পারস্যের শিল্প-দেবতা জীবন-সংগ্রামের দুর্বার চাঞ্চল্যে দোলায়মান, প্রাণাবেগের বিপুল আন্দোলনে অস্থির-কর্মময় জীবনের কোলাহলময় পথের যাত্রী।

সাত

প্রাচীন যুগের অন্যান্য জাতি

হিব্রু জাতি। হিব্রুরা সেমাইটদের একটি শাখা। প্রথমে তারা অর্ধসভ্য ও যাযাবর অবস্থায় ছিল। তাদের চিন্তার উপর মিশরের ছাপ দেখে মনে হয় তারা মিশরীয় সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। মিশর থেকে এসে তারা জর্ডান নদীর তীরভূমিতে বাস করে। তাদের রাজনৈতিক জীবনের পরিধি স্বল্পপরিসর ছিল। প্রাচীন জগতের রাজনীতি ক্ষেত্রে তারা কোন বিশিষ্টতা দেখাতে পারেনি।

প্রাগৈতিহাসিক যুগ (২৩০০—১০০০ পূঃ খ্রীঃ) গোষ্ঠীপতিদের আমল। এই যুগ হিব্রু জাতির শৈশবকাল। গোষ্ঠীপতিদের মধ্যে এব্রাহাম প্রধান। ঐতিহাসিক ব্যক্তি না হলেও তিনি ছিলেন ধর্মবিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক। ভগবানের ন্যায় বিচার ও মঙ্গলময়ত্বে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। ১০২০—৯৩০ পূঃ খ্রীঃ ডেভিড ও সলোমনের রাজত্বকাল। ডেভিড জেরুসেলেমকে ইস্রাইলের পবিত্র নগর করলেন, সমগ্র হিব্রু জাতিকে একতার বন্ধনে শক্তিশালী করে তুললেন, টায়র থেকে শিল্পী এনে প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। দেশ থেকে গম, মদ্য, তৈল এবং মধু প্রচুর পরিমাণে রপ্তানি হত। যুদ্ধের অস্ত্র বর্ম, কৃষিকার্যের জন্য যন্ত্রাদির উন্নতি হয়েছিল। রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হল। পিতার মৃত্যুর পর সলোমন ইস্রাইলের সিংহাসন অধিকার করলেন। আড়ম্বর ও ঐশ্বর্যের জন্য

তাঁর নাম প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। বাণিজ্যের দ্বারা তিনি দেশের ধনাগমের পথ উন্মুক্ত করেছিলেন। গম, বার্লি, মধু, তৈল, মদ্য, পশম, চর্ম ও কাষ্ঠ বিনিময়ে তিনি ফিনিশীয়দের মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় ধাতব যন্ত্র গ্রহণ করতেন। প্রভূত অর্থব্যয়ে প্রকাণ্ড অট্টালিকা নির্মিত হল। বহু দাস নিযুক্ত করে সলোমন লিবানন পর্বত থেকে বিস্তর কাঠ এনে মন্দির নির্মাণ করেন। তাঁর বহু স্ত্রী ও অসংখ্য উপপত্নী ছিল। সলোমনের আড়ম্বর, বিলাসপ্রিয়তা ও ইন্দ্রিয়সেবা স্বাভাবিক ফল প্রসব করল। চাল্ডীয়রা জেরুসেলেম অবরোধ করে নগর পুড়িয়ে দিল এবং বহুসংখ্যক নরনারী বন্দীরূপে বাবিলোনে প্রেরিত হল (৫৮৬ পূঃ খ্রীঃ)। বাবিলোন অধিকার করার পর সাইরাস্ ইয়ুদীদের জেরুসেলেমে ফিরে যেতে অনুমতি দিলেন। ৩৩৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে সেকেন্দার সিরিয়া ফিনিশিয়া ও টায়র অধিকার করে জেরুসেলেম নগরে প্রবেশ করেন। গ্রীক ভাষা ও সাহিত্য, গ্রীক চিন্তা ও ভাব ইয়ুদীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

হিব্রু সভ্যতা। জিহোভা হিব্রুদের শ্রেষ্ঠ উপাস্য দেবতা ছিলেন। তাদের ভিতর গোষ্ঠীপতি সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করত। তাদের সমাজে বিবাহ-প্রথা প্রচলিত ছিল, স্ত্রীলোকের স্থান নিচু ছিল না, সমাজে তাদের অবারিত গতিবিধি ছিল, বিবাহের পূর্বে পুত্র-কন্যার উপর পিতার ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। তাদের মধ্যে দাসত্বপ্রথা বর্তমান ছিল কিন্তু প্রতি ছয় বৎসর অন্তর দাসদের মুক্তি দেওয়া হত। তাদের শিক্ষা উন্নত ছিল না। তাদের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ শাসনপ্রণালী ও চিন্তাধারা ধর্মের অনুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হত। শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠান ধর্মের স্থান গ্রহণ করেছিল। শাস্ত্রবিধান তাদের জীবনে সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল। সহস্র বৎসর পরে বেথ্লিহামের মহাপুরুষ যখন ভ্রান্ত জনমত, শাস্ত্রের শুষ্ক প্রাণহীন বিধি-নিষেধকে দূরে ঠেলে দিয়ে জ্ঞান ও ভক্তির উৎসমুখ খুলে দিলেন, তখন তাদের ভিতর এক অনির্বচনীয় শক্তির স্রোত প্রবাহিত হল, পৃথিবীতে নবযুগের অবতারণা হল। প্রাচীন কালের ইয়ুদীদের মনে আনুষ্ঠানিক ধর্ম এতখানি স্থান জোড়া করে বসেছিল যে তারা রাষ্ট্রকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার মনোভাব অর্জন করতে পারেনি। খৃষ্টপূর্ব সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর পূর্ববর্তী যুগে তাদের সভ্যতার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই।

সিডিয়া ও সিমেরিয়া। মধ্য এশিয়া ও উত্তর ইয়োরোপের শক্তিশালী জাতিদের নাম সিথিয়ান। পারস্যরাজ প্রথম ডেরিয়াসের সিংহাসন অধিরোহণের

পূর্বে তারা তুর্কিস্তানের কঙ্করময় উষরভূমি থেকে দলে দলে বহির্গত হয়ে জারাকাউস্ ও অক্সাস্ নদী উত্তীর্ণ হয়ে দক্ষিণে খোরাসান আফগানিস্থান হিন্দুস্থান বা পারস্যে অভিযান চালাত অথবা ভল্গা নদী অতিক্রম করে সিরিয়া, এশিয়া মাইনরে, কিংবা পশ্চিমে ডানিউব নদীর অপর পারে ইয়োরোপের বিভিন্ন স্থানে আত্মপ্রকাশ করত। তাদের অভিযানের দুর্বার স্রোতে প্রাচীনতম সুসভ্য বহু জাতি ও দেশ ভেসে যেত। এমন কি মধ্যে মধ্যে তারা অসুর ও পারসিকদেরও বিব্রত করে তুলত। তারা এশিয়া মাইনরের পশ্চিমাংশে লিডিয়া রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করেছিল।

খ্রীষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকের পূর্বে তারা যাযাবর ছিল। তারা শস্য উৎপাদন করত না। অশ্ব তাদের প্রধান ঐশ্বর্য ছিল। তারা অশ্বদুগ্ধ পান ও অশ্বমাংস ভক্ষণ করত, তলোয়ার পূজা করত এবং পশু বধ করে তার মাথার খুলিতে মদ্য পান করত। সিমেরিয়ানরা ক্রাইমিয়ায় বাস করত। তারাও অশ্বদুগ্ধ পান করত, তাঁবু ও পশুদলের সঙ্গে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়াত। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে তারা এশিয়া মাইনরে লুটপাট আরম্ভ করে এবং জাইগীস্‌কে নিহত করে সার্দিস নগর অধিকার করেছিল।

এশিয়া মাইনরে ছোট ছোট অনেক জাতি ছিল। ৬৯১ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে এলয়াটিস্ লিডিয়ার সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তিনি প্রথমে মুদ্রা প্রচলন করেছিলেন। প্রায় একশত বৎসর পরে ক্রীশাস্ লিডিয়ার রাজা হন। অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধীশ্বর বলে তাঁর নাম চিরপ্রসিদ্ধ। ক্রীশাসের পূর্বেই লিডিয়ানরা নৌবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছিল।

লিডিয়ার ভূমি অত্যন্ত উর্বর ছিল। ঐ দেশের পর্বতের সানুদেশ স্বভাবজাত অজস্র দ্রাক্ষা কুঞ্জে ও দেবদারু বৃক্ষের শ্যাম লতাপল্লবে সুশোভিত ছিল। সার্দিস তাদের রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ সার্দিসের প্রাচীন নাম এশিয়া থেকে প্রদেশ এবং মহাদেশের অধিকাংশ স্থান ঐ নামে পরিচিত হয়।

লিডিয়ার লোকেরা প্রাচীন জগতের শিল্পশক্তি ছিল। দ্যূত ও গোলক ক্রীড়া এবং মুদ্রা আবিষ্কার করে তারা জগতে চিরস্মরণীয় হয়েছে। গীতবাদ্য ব্যায়াম ও ভাস্কর্যের জন্য তারা বিখ্যাত। তারা লিঙ্গপূজা করত। তাদের রাজধানী সার্দিস নগর সভ্যতার কেন্দ্র, ঐশ্বর্য ও সৌন্দর্যের লীলা নিকেতন ও প্রাকৃতিক শোভার আধার হয়েছিল। এর উচ্চ প্রাচীর ও মন্দির-চূড়া গগন স্পর্শ করত। এর অট্টালিকা, প্রাসাদ, জনাকীর্ণ রাজপথ, এর বিলাসী নাগরিক-

দের উচ্চ হাস্য ও আনন্দ কোলাহল একে যেন বিশ্বমানবের মিলনক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। তাদের নৈতিক চরিত্রের দৃঢ়তা ছিল না কিন্তু ঔদার্যে, সহনশীলতায় ও প্রসাদগুণে তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে মিলনের সূত্র বেঁধে দিয়েছিল।

ফিনিশিয়া। সিরিয়ার দক্ষিণে লিবানন পর্বতশ্রেণী ও ভূমধ্য সাগরের মধ্যবর্তী স্থান ফিনিশিয়া নামে পরিচিত। ফিনিশিয়ার অধিবাসীরা কখনও সাম্রাজ্য স্থাপন করেনি। অপর দেশ জয় করার প্রবৃত্তি তাদের ছিল না। হেরোডোটাস্ বলেন, ২৭০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে ফিনিশিয়ানরা সাইপ্রাস্ এবং রোডস্ দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ষোল শত পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে তারা ইজিয়ান উপসাগরের সকল অংশে গমনাগমন করত। গ্রীকরা তাদের কাছে নৌকা নির্মাণ-কৌশল ও বর্ণমালা শিক্ষা করেছিল। তারা সুদূর স্পেনে ও কার্থেজে বাণিজ্য করত। প্রায় দুই শত বৎসর ফিনিশিয়া পারস্যের অধীন ছিল। পরে গ্রীক, রোমান ও সারাসেনরা একে অধিকার করে।

ফিনিশিয়ানরা ইতিহাসে বাণিজ্য ও সমুদ্র যাত্রার জন্য বিখ্যাত ছিল. তারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ছিল না। শিল্পবাণিজ্যের সৃষ্টিশক্তি প্রভাবে তারা দেশ দেশান্তরে শান্তির বাণী বহন করে নিয়ে আসত। বর্ণমালার উন্নতি সাধন করে তারা মানবজাতির জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারে সহায়তা করেছিল। এর জন্য সভ্যজগৎ তাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ। তারা বাবিলোন মিশর ও অন্যান্য জাতির সভ্যতার প্রচারক। সৃজনীশক্তির প্রাচুর্যে তাদের মন পরিপূর্ণ ছিল। এজন্য পরধন-লোলুপতা ও নর-রক্তপাতের বাসনা তাদের মনে স্থান পায়নি। গ্রীক শিল্পের উপর তারা অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এশিয়া মাইনর। এশিয়া মাইনর ইউরোপ ও এশিয়ার মিলন-স্থান। প্যালেষ্টাইন এশিয়া এবং আফ্রিকার মধ্যবর্তী রাজপথ। বিগত তিন সহস্র বৎসর ধরে এশিয়া মাইনর প্রধান জাতিদের যুদ্ধক্ষেত্ররূপে ইতিহাসে পরিচিত। ডেভিডের সময় হিতাইতরা হিব্রুদের সমকক্ষ ছিল। ৭১১ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে সারগন তাদের ক্ষমতা লোপ করেন। তারা স্বাধীনভাবে নিজেদের বর্ণমালা আবিষ্কার করেছিল। ভাষা ও দেহের গঠনে হিতাইতরা মোগল ছিল। এমন কি চীনাদের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিল। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে তারা মেসোপটেমিয়ার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে এসে এশিয়া মাইনরে বাস করে। তাদের বাহুবল এতদূর বেড়ে উঠেছিল যে তারা দুর্জয় মিশরকেও অগ্রাহ্য করতে সাহসী

হয়েছিল। পরে তারা সেমিটিক জাতি দ্বারা নির্জিত ও পরাভূত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

হিতাইতদের শিল্পে মৌলিকতা ছিল না। তারা অসুরের শিল্পের অবিকল অনুকরণ করেছিল, কিন্তু অসুর-শিল্পের দ্যোতনা, তার অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি ও ঐকান্তিকতা, অসুর-স্থাপত্যের সৌন্দর্যানুভূতি তাদের শিল্পে ছিল না। ধর্ম বিষয়ে তারা সেমিটিক জাতির অধমর্ণ। তারা অনুকরণ প্রয়াসী ছিল। প্রতিভার জ্যোতির্ময় রশ্মিপাতে তাদের জাতীয় জীবন ও সভ্যতা ভাস্বর হয়ে ওঠেনি। তাদের ক্ষীণ অস্তিত্বের ঋজুপ্রবাহ প্রতিকূল শক্তির খরস্রোতে কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেল।

প্রাচীন আমেরিকা। নূতন পাষাণ যুগের শেষ ভাগে মংগোলিয়া থেকে একদল মানুষ বেরিং প্রণালীর অধুনালুপ্ত স্থলপথে উত্তর আমেরিকায় উপস্থিত হয়। নৃতত্ত্ববিদদের মতে ভারতীয়রা দশ হাজার কি ততোধিক বৎসর পূর্বে এলুশিয়ান দ্বীপের পথে ক্রমে দলে দলে আমেরিকায় আসে। বার্টনও এই মত অনুমোদন করেন। এলিয়ট্ স্মিথ্ হিউয়েট্ প্রমুখ বহু পণ্ডিত দৃঢ়ভাবে বলেছেন যে মেক্সিকোর আদিম সভ্যতার উৎস ভারতবর্ষেই ছিল। মেক্সিকো পেরু এবং অন্যান্য স্থানে খনন কার্যের ফলে মূর্তি ও মন্দির মঠ প্রাসাদ ও গৃহের যে ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে তাদের নির্মাণ কৌশল প্রভৃতি দেখে বিশেষজ্ঞরা বলেন যে এতে ভারতবর্ষের শিল্পরীতি বিশেষভাবে অনুসৃত হয়েছে। বৌদ্ধ মঠও আমেরিকায় আবিষ্কৃত হয়েছে। আমেরিকার আদিম অধিবাসীরা গণেশ, ইন্দ্র, বরুণ, শালগ্রাম শিলা ও ছোট বড় দেবতার মূর্তি পূজা করত। বাংলা দেশের চড়ক পূজার মতো মেক্সিকোতে এখনও একটি পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অনাবশ্যক জটিলতা তাদের অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়। মায়া ও আজ্‌টেকদের ভিতর নাগ পূজার প্রচলন ছিল। মেক্সিকোতে পুরোহিত প্রথা, শবদাহ প্রথা, সতী প্রভৃতি প্রচলন ছিল। হিন্দুদের মতো তারা লগ্নানুসারে বিবাহ করে। স্ত্রীলোকেরা হিন্দু প্রথায় প্রসাধন করে ও সিঁথিতে সিন্দুর ব্যবহার করে। এদের মধ্যে কোন না কোন আকারে এখনও জাতিভেদ প্রথা, সমাজে শৃঙ্খলারক্ষার জন্য পঞ্চায়েৎ প্রথাও বর্তমান আছে। ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির দুইটি প্রবাহ পূর্বে ও পশ্চিমে চলে যায়। একটি প্রবাহ পশ্চিমে পারস্যের দিকে এবং পূর্ব দিকের প্রবাহটি মালয়, শ্যাম, বলি ও যবদ্বীপ থেকে ইণ্ডোনেশিয়া ও পলিনেশিয়া অতিক্রম করে মধ্য আমেরিকায়

উপস্থিত হয়। সুতরাং খ্রীষ্ট জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতবর্ষ ও পূর্ব এশিয়া থেকে আর্য ও মোগল জাতি আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে। এরাই সেখানকার আদিম অধিবাসী। কলম্বস্ ভুলক্রমে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের যে ইণ্ডিয়ান বা ভারতবাসী আখ্যা দিয়েছিলেন তা বাস্তব বলে প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত চমনলাল তাঁর 'হিন্দু আমেরিকা' নামক গ্রন্থে একথা প্রমাণ করেছেন।

যা হোক এশিয়া থেকে নবাগতের দল উত্তর দিক থেকে দক্ষিণাঞ্চলে বিস্তৃত হয়। তখন উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে বল্গা হরিণ ও দক্ষিণ অংশে বাইসন দলে দলে ভ্রমণ করে বেড়াত। তখনও দক্ষিণ আমেরিকা কূর্ম ও হস্তীর আকারবিশিষ্ট অতিকায় ভীমদর্শন প্রাণীদের লীলাস্থান ছিল।

আমেরিকার এই সকল আদিম জাতি যাযাবর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তারা পাথরের স্থূল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত, লোহার ব্যবহার জানত না কিন্তু তামা ও সোনার ব্যবহার জানত। মেক্সিকো ইউকেটন ও পেরু কৃষিকার্যের অনুকূল ছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব এক সহস্র বৎসর পূর্বে সেখানে যে সভ্যতার অভ্যুদয় হয় তা ইউরেশীয় সভ্যতা থেকে ভিন্ন ধরণের হলেও উচ্চাঙ্গের ছিল। সেখানে বীজবপন ও শস্যকর্তনের সময় নরবলি দেওয়া হত। প্রাচীন গোলার্ধে সভ্যতা ও চিন্তাধারার উন্নতির সঙ্গে এই কুপ্রথা রহিত হয়েছিল কিন্তু আমেরিকায় এর দ্রুত বিস্তৃতি ও প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমেরিকায় পুরোহিতদের ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। পুরোহিতরা শাসন, যুদ্ধ ও আইন প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণ করত।

ইউকেটন প্রদেশে মায়া নামে এক প্রকার লিপি প্রচলিত ছিল। এর সাহায্যে পুরোহিতরা কৌশলের সঙ্গে এক জটিল পঞ্জিকা সৃষ্টি করেছিল। তাদের ভাস্কর্য সুন্দর ছিল বটে কিন্তু তার অনাবশ্যক জটিলতা তাদের অদ্ভুত মনোবৃত্তির পরিচয় দেয়।

নরবলি প্রাচীন আমেরিক সভ্যতার প্রধান অঙ্গ ছিল। মেক্সিকোতে প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মানুষকে বলি দেওয়া হত। জীবন্ত মানুষকে এই ভাবে হত্যা করে পুরোহিত সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের মনে ধর্মভাব উদ্রেক করত। তাদের দেবমন্দির নরশোণিতে প্লাবিত হত, তাদের যাবতীয় জাতীয় উৎসব নররক্ত-পাতের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হত। তাদের মৃৎপাত্রের গঠন-প্রণালী, বস্ত্রবয়ন ও রঞ্জন করার কৌশল উচ্চাঙ্গের ছিল। লেখার জন্য কাগজ ছিল না, চামড়ার ব্যবহার হত।

ইউরোশিয়ার বিভিন্ন জাতির সভ্যতা পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করে ক্রমোন্নতির সোপানে উঠেছে কিন্তু কূপমণ্ডূকতা ও সংকীর্ণতার জন্য আমেরিক সভ্যতা শৈশবকাল অতিক্রম করতে সমর্থ হয়নি। মেক্সিকোর লোক পেরুর কথা জানত না, পেরুবাসী মেক্সিকোর সংবাদ রাখত না। তারা স্বদেশের সংকীর্ণ ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। বুদ্ধিমান প্রতিবেশী উন্নতির উদ্বোধক। চিন্তা ও ভাবের আদান-প্রদান ও সমাবেশ ব্যক্তি বা জাতির শক্তি বৃদ্ধি করে। ঈর্ষাহীন প্রতিযোগিতা উৎকর্ষ ও উন্নতির পথ পরিষ্কৃত করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী আমেরিক জাতিসকল চিরাচরিত প্রথায় তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করেছে, কোন উচ্চতর আদর্শ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি, কোন নূতন ভাবের বিদ্যুৎ-রেখা তাদের অন্ধকার মনের উপর আলোকপাত করেনি। তাদের জীবন বদ্ধ জলাশয়ের মতো পূতিগন্ধময় হয়ে উঠল—তারা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে গেল। কয়েক শতাব্দী পরে ইয়োরোপীয় জাতিদের সম্পর্কে এসে তারা বৃহত্তর জগতের সন্ধান পেল বটে কিন্তু ধনলিপ্সু স্পেনীয়রা "সুবর্ণের দেশে" এসে তাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিল তাতে তাদের জীবন-প্রদীপটির ক্ষীণ রশ্মি নির্বাপিত হয়ে গেল। পরাধীনতার ঘন অন্ধকার তাদের জীবনের উপর যবনিকা টেনে দিল।

আট

বিশ্বসভ্যতায় জাতির দান

যুগে যুগে মানুষ পৃথিবীতে জন্মেছে, উৎকৃষ্ট বস্তু ভোগ করেছে, বৃদ্ধি ও ক্ষয় পেয়েছে; কিন্তু আমরা তার ইতিহাস জানি না। ইতিহাস সৃষ্টি না করলে ইতিহাস থাকে না। যিনি নূতন ভাবের ভাবুক, যাঁর চিন্তা ও দৃষ্টান্ত জগতের চিন্তাধারা পরিবর্তন করে দেয়, তিনিই ভবিষ্যতে লোকের শ্রদ্ধাভক্তির ফুলচন্দন পেয়ে থাকেন। যে ব্যক্তি জগতের চিন্তার উপর যত গভীর ছাপ দিতে পেরেছেন তিনিই তত বেশীদিন বিশ্বের মনোরাজ্যের উপর সিংহাসন অধিকার করে থাকেন, তত দিন তাঁর কথা বিস্মৃতির হস্ত থেকে রক্ষা পাবে। জগতের সভ্যতার ইতিহাসে ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের দান বিশ্বজনের সম্পত্তি।

সভ্যতা নানারূপে প্রকাশ পায়। তার ধর্ম আত্মবিকাশ, মানব-ধর্মের অভিব্যক্তি। জাতিবিশেষ যে অংশে সত্য, সে সেই অংশে অমর। আমাদের আত্মবিকাশ প্রকৃতিজয়ে। প্রকৃতিজয়ের অভিযানে বহির্গত হয়ে কেউ বা আত্মজয়ে সমর্থ হয়েছে। ইয়োরোপের আত্মা আত্মপ্রকাশ করেছে গ্রীসের জ্ঞানে, রোমের কর্ম দ্যোতনায় এবং মধ্যযুগের ভক্তিতে। এই ত্রিধারার ত্রিবেণী-সঙ্গম পাশ্চাত্য সভ্যতা। প্রাচ্য সভ্যতার গতি ও প্রকৃতি অন্য ধরণের। কর্ম ও ভক্তির পথে প্রাচ্য সভ্যতার প্রতিষ্ঠা জ্ঞানে—আত্মজয়ে।

শাখাগুলি বৃক্ষ থেকে বহির্গত হয়, চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়ে পড়ে কিন্তু বৃক্ষ এক। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল জাতিই ভিন্ন ভিন্ন পথে অগ্রসর হচ্ছে। দেশ-বিদেশের সকল মানুষ একই মানবজাতির বিভিন্ন অংশ। সকল জাতিই উন্নতি-অবনতি, উত্থান-পতনের ভিতর দিয়ে কোন এক মহান্ উদ্দেশ্য সিদ্ধির দিকে চালিত হচ্ছে। বিভিন্ন জাতির সভ্যতার স্রোতগুলি যুগযুগান্ত প্রবাহিত হয়ে বিশ্বসভ্যতার মহাসাগরের সঙ্গে মিলিত হবে, এই আশা অসংগত নয়।

প্রাচীন সভ্যতার অবদান। ঋগ্বেদে সমুদ্র ও দ্বীপের উল্লেখ আছে দেখে মনে হয় প্রাচীনকালের আর্যরা সমুদ্রযাত্রা করতেন, তাঁদের সমুদ্রগামী জাহাজ একশত দাঁড় বেয়ে চালিত হত। এই জাহাজ বা নৌকা পালের সাহায্যে চলত। যারা বাণিজ্যের জন্য দেশ-বিদেশে গমনাগমন করত তাদের নাম পণি।

ইয়োরোপে নূতন পাষাণযুগে নদী বা হ্রদের তটভূমিতে নৌকা নির্মাণ হত। দুই তিনখানি কাঠ একত্র বেঁধে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হত। পরে গাছের গুঁড়ির মাঝের অংশ কুঁদে ডোঙ্গা তৈরী হয়। মিশর ও মেসোপটেমিয়ায় ঝুড়ির মতো একরকম নৌকার ব্যবহার ছিল। চামড়ার পেটিকার মতো নৌকার আকার ছিল। সাত হাজার পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে সুমেরিয়ায় নৌকার প্রচলন ছিল। ভূমধ্যসাগর লোহিত সাগর পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরের পশ্চিম অংশে নৌকার সাহায্যে বাণিজ্য বিস্তৃতি লাভ করেছিল।

ক্রীট দ্বীপের নোসস্ নগরের সভ্যতা মিশরীয় সভ্যতার সমকালীন, এমন কি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলে মনে হয়। প্রায় ৪০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে সেমাইটদের আবির্ভাবের পূর্বে নোসসের অধিবাসীরা অর্ণবপোতে সমুদ্রে বিচরণ করত। ১৪০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে নোসস্ ধ্বংস হওয়ার পর ফিনিশীয়রা কার্থেজে উপনিবেশ স্থাপন করে (৮০০ পূঃ খ্রীঃ) এবং ১০০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দের আরও পূর্বে সিডন ও টায়র আফ্রিকার উপকূলে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল।

প্রায় ৫২০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে কার্থেজের হান্নো নামে এক ব্যক্তি পাঁচখানি জাহাজ একত্র করে জিব্রল্টার প্রণালী প্রদক্ষিণ করে আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল বেয়ে তাঁর নৌবহর চালনা করেছিলেন। তিনি গ্যাম্বিয়া অতিক্রম করে একটি দ্বীপে উপস্থিত হন। এই সময়ে হেমিলকন নামে কার্থেজের আর এক ব্যক্তি উত্তর ইয়োরোপে প্রেরিত হন। ওয়া ম্যারিটাইমা নামে লাটিন কবিতায় বর্ণিত আছে যে তিনি বিস্কে উপসাগর অতিক্রম করে একটি দ্বীপপুঞ্জে আসেন।

ষষ্ঠ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে ফিনিশিয়ার লোকেরা মার্সেলস্ নগরে উপনিবেশ স্থাপন করে। ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দে পাইথিয়াস্ নামে এক জ্যোতির্বিদ উত্তর ইয়োরোপে যান। তিনি মাত্র একখানি জাহাজ নিয়ে যাত্রা করেন। তিনি আলবিয়ন আবিষ্কার করেন। তারপর উত্তর দিকে যাত্রা করে থিলি নামে এক দ্বীপে বা মহাদেশে উপস্থিত হন। তিনি আর বেশি দূর যেতে পারেননি। এই দেশ তাঁর সমুদ্র যাত্রার শেষ সীমা। তিনি বলেছেন, থিউলের উত্তরে সমুদ্র, এমন কি বায়ু পর্যন্ত ছিল না। অন্ধকারময় কুজ্ঝটিকা, বর্ষার ধারা ও প্রবল ঝড় তাঁর ভীতি উৎপাদন করেছিল।

মিশরের নিকো নামে এক রাজা ফিনিশিয়ার কয়েক ব্যক্তিকে আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করতে আদেশ দেন। আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করতে তাদের তিন বৎসর লেগেছিল। হেকাটিউস্ ও হেরোডোটস্ তথ্য সংগ্রহের জন্ম দেশ ভ্রমণ করতেন এবং বিভিন্ন দেশের সমাজ জাতি ভৌগোলিক সংস্থান প্রভৃতি সম্বন্ধে মূল্যবান উপাদান সংগ্রহ করে পুস্তক রচনা করে গেছেন।

লিপি-কৌশল। অক্ষর বা লিপি মানুষের আত্মপ্রকাশের প্রধান উপায়। বর্ণমালা স্মৃতিশক্তির সহায়তা করে, পূর্বসঞ্চিত জ্ঞান সঞ্জীবিত করে রাখে। অক্ষর উদ্ভাবনের পূর্বে চিত্র-সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা হত। চীনে ভাব প্রকাশের জন্ম একটা জটিল প্রণালী গড়ে উঠেছিল। এর বেড়াজাল ভেদ করে শব্দার্থ গ্রহণ করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সুতরাং একদল বিশেষজ্ঞের উদয় হল। এরা বিদ্যাচর্চা করত। রাষ্ট্র-পরিচালন ও শাসনকার্য তাদের হস্তগত হয়েছিল। তাদের নাম মাণ্ডারিন। সুমেররাও মনোভাবকে স্থায়ী আকার দান করার জন্ম চিত্র ব্যবহার করত কিন্তু তাদের লিখন-প্রণালী জটিল চিত্রে পরিণত না হয়ে বর্ণের আকার ধারণ করেছিল। সুমেরদের কীলকাক্ষর আসিরিয়া ও চাল্ডিয়ায় গৃহীত হয়েছিল। তাদের সাঙ্কেতিক চিহ্নের নিদর্শন ইয়োরোপে প্রচলিত বর্ণমালায় স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

মিশরের চিত্রাঙ্কন রীতি ক্রমে সাঙ্কেতিক শব্দবিন্যাসে পরিণত হয়েছিল কিন্তু ফিনিশিয়া লাইবিয়া লিডিয়া ও ক্রীটের অধিবাসীদের এবং কেল্টিক আইবেরিয়ানদের ভিতর অন্য একপ্রকার অক্ষর ব্যবহৃত হত। কয়েকটি বর্ণমালা ভূমধ্য সাগরের নিকটবর্তী স্থানে প্রচলিত ছিল কিন্তু তাদের গঠন ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ছিল। ফিনিশিয়ার বর্ণমালায় স্বরবর্ণের অভাব ছিল। পরে গ্রীস এই অভাব পূরণ করে।

চিত্রাঙ্কনেই বর্ণমালার সৃষ্টি হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত শক্তি ক্রমে পরিস্ফুট হয়ে মানব সভ্যতার ইতিহাসে এর স্থান নির্দেশ করে দিল। প্রাচীনকালে মৌখিক শিক্ষা দেওয়া হত। লিখনপ্রণালী উদ্ভাবনের পর শিক্ষাদানের ধারা পরিবর্তিত হল। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কারের সঙ্গে বর্ণমালার গুরুত্ব ও উপকারিতা উপলব্ধ হল। মুদ্রাযন্ত্র বিদ্যাচর্চা ও জ্ঞান বিস্তারে সাহায্য করেছে, ফলে যুগযুগান্তর সঞ্চিত অভিজ্ঞতা স্থায়িত্ব লাভ করেছে, মানবজাতি প্রগতির পথে দ্রুত অগ্রসর হয়েছে।

মন্দির নির্মাণ। সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সঙ্গে মন্দির নির্মাণ আরম্ভ হয়। মন্দির ও সভ্যতা সমসাময়িক। নগর পত্তনের যুগে দেবতাদের জন্য মন্দির নির্মাণ হয়েছিল। দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য পশুবলি দেওয়া হত। পূজা ও ধর্মানুষ্ঠানের জন্য একদল বিশেষজ্ঞ ছিল। ক্রমে তারা সম্প্রদায় গড়ে তুলল এবং পুরোহিত নামে পরিচিত হল। পূজা ও বলির নির্দিষ্ট ঋতু ও সময় ছিল। পুরোহিতরা শুভ ও অশুভ কালের একটা নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করেছিল, বর্ণমালার অনুশীলন করত, লোকের মনস্তুষ্টি ও লাভের জন্য রোগনির্মুক্তির উপায় নির্ধারণ করত এবং যাদুবিদ্যার আলোচনা করত।

প্রাচীনকালের লোক প্রাকৃতিক বস্তু, যেমন সূর্যের পূজা করত। জীবজন্তুর মূর্তি মন্দিরে স্থান পেত ও ভক্তদের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করত। দেবমূর্তির সঙ্গে দেবীমূর্তি জুড়ে দেওয়া হত। মিশর বাবিলোন ও ভারতের দেব-দেবী সকল দাম্পত্য প্রেমাভিলাষী ছিল। অজ্ঞানতার যুগে পুরোহিতরা জ্ঞানের বাতি জ্বেলে রেখেছিল। তারা বিদ্যাচর্চা করত ও অধ্যাত্মতত্ত্ব আলোচনা করত।

প্রাচীনকালের রাজারা জ্ঞান চর্চা করতেন। ভারতের ক্ষত্রিয় রাজারা ব্রাহ্মণদের উপনিষদের গূঢ় তত্ত্ব শিক্ষা দিতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে একাধারে জ্ঞানী ও বীর ছিলেন। আসিরিয়ার শেষ রাজা অসুর বেনাপাল মাটির উপর খোদাই করা বস্তুসকল সংগ্রহ করতে ভালবাসতেন। তাঁর গ্রন্থাগার আবিষ্কৃত

হয়েছে। বাবিলোনের নেবোনিডাস্ বিদ্বান রাজা ছিলেন। তাঁর কল্পনা শক্তি প্রবল ও জ্ঞান প্রগাঢ় ছিল। বিদ্যাচর্চার জন্য তিনি এমনকি রাজকার্যেও অবহেলা করতেন। তিনি গবেষণায় নিমগ্ন থাকতেন। প্রথম সারগণের রাজত্বকাল ৩৭০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ বলে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন।

সামাজিক অবস্থা। খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে সুমের সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সে সময় থেকে সাম্রাজ্য স্থাপনের যুগ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জীবনে বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়নি। আলেকজান্দারের সময়েও তাদের অবস্থা প্রায় পূর্ববৎ ছিল, এমন কি এখনও পৃথিবীর অনেক দেশে তাদের সাধারণ প্রকৃতি ও মনোভাব বিশেষ কিছু উন্নত হয়নি।

এ পর্যন্ত সভ্যতা সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের আশ্রয় করে অগ্রসর হয়েছে। পর্বত চূড়া সূর্যকিরণে আলোকিত হয়, সানুদেশ অন্ধকারে থাকে। তেমনি উপরের মুষ্টিমেয় জনকয়েক ব্যক্তি উন্নত হয়েছিল, জাতিসাধারণ অন্ধকারেই ছিল। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাদের দাসত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। তাদের ভিতর শক্তিশালী ব্যক্তি বা নেতা প্রধান হয়ে উঠল, সাধারণ মানুষ অজ্ঞতার অনুপাতে বশ্যতা ও পরাধীনতা স্বীকার করে নিয়েছে। সাধারণ অজ্ঞ মানুষ পরাধীনতার সহজ ও নিরাপদ অবস্থায় থাকতে ভালবাসে। ব্রেসটেড্ বলেছেন যে ২০০০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে মিশরের লোক তাদের সামাজিক অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল না, কিন্তু সে অবস্থাকে তারা নিয়তির বিধান বলে মেনে নিয়ে সান্ত্বনালাভ করেছে। তাদের অসন্তুষ্টির ভিতর বিদ্রোহের লেশ ছিল না। রাজার শাসন করার অধিকার আছে কিনা, ঐশ্বর্যে ধনীর ন্যায়সংগত দাবি আছে কিনা, ধনাভিজাত্য ও বংশাভিজাত্য অসংগত ও অন্যায় কিনা, অন্যকে বঞ্চিত করে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি অর্জনের অধিকার আছে কিনা, এ সকল প্রশ্ন তাদের মনে উদয় হয়নি। বর্তমান যুগেও ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে খর্ব করার চেষ্টা চলেছে, এখনও যোগ্যতমের উদ্বর্তন নীতির আদর চলেছে, এখনও মনের স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির অভাব আছে। এখনও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বিরোধকে আশ্রয় করে সমাজের গঠন-পদ্ধতি, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতিযোগিতাকে অবলম্বন করে আন্তর্জাতিক নীতি পরিচালিত হচ্ছে। এখনও ব্যক্তিগত সমাজগত ও রাষ্ট্রগত প্রতিযোগিতা আমাদের জীবনের সকল কর্ম ও আচরণের মূলকথা।

যুদ্ধ প্রাচীন সমাজে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধ-জয়ের পর লুণ্ঠিত দ্রব্য ও বন্দী হস্তগত হত। বর্বর সমাজে বন্দীকে শাস্তি অথবা দেবতার কাছে বলি দেওয়া হত। তাদের মধ্যে স্ত্রীলোক ও বালক বিজেতৃ-সমাজের অন্তর্ভুক্ত হত।

সে কালের সমাজে কয়েকটি স্তর ছিল। প্রথম, পুরোহিত সম্প্রদায়ের প্রভাব অল্প ছিল না। এরা জ্ঞানানুশীলন করে সমাজে বিশিষ্ট স্থান ও মর্যাদা লাভ করেছিল। বিদ্যাচর্চা তাদের সংকীর্ণ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়, অভিজাত সম্প্রদায়। রাজা মন্ত্রী প্রাদেশিক শাসকরা ও লেখকরা এই সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল। তৃতীয়, কৃষক সম্প্রদায় সমাজের নিম্নস্তরে ছিল। তারা জমি চাষ করত, খাজনা দিত ও গ্রামে বাস করত। চতুর্থ, ভূমিহীন কৃষক সম্প্রদায়। সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে এরা নিজেদের স্বার্থরক্ষা করত। পঞ্চম, বণিক সম্প্রদায়। এরা দেশ-বিদেশে বাণিজ্য করে দেশের ধনবৃদ্ধি করত।

ভারতবর্ষে চারিটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। গুণ ও কর্ম অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র নামে চারিটি প্রধান বিভাগ ছিল। অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ফলে বহু উপজাতির উৎপত্তি হয়েছিল। তা ছাড়া শিল্পীদেরও সঙ্ঘ ছিল। জাতিবিভাগ ক্রমে জন্মগত হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধধর্ম জাতিবিভাগের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল।

চীনের সামাজিক সংস্থানে যোদ্ধার স্থান নীচে ছিল। উচ্চ চিন্তা, বিদ্যাচর্চা ও অধ্যাত্মবিদ্যার অনুশীলনের জন্য ভারতের ব্রাহ্মণরা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিল কিন্তু চীনের মাণ্ডারিনরা একটা বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হয়নি। মাণ্ডারিনের পুত্র হইলেই মাণ্ডারিন হওয়া চলত না। সমাজের যে কোন স্তরের যে কোন ব্যক্তি বিদ্যা অর্জন করে উপযুক্ত বিবেচিত হলে মাণ্ডারিন হতে পারত। ভারতের ব্রাহ্মণ ও চীনের মাণ্ডারিনের মধ্যে এই প্রভেদ ছিল। এই প্রভেদের ফলে ব্রাহ্মণরা নিজেদের পবিত্র পুস্তক সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হয়েও ব্রাহ্মণবংশে জন্ম বলে গর্বে স্ফীত ও পূর্বপুরুষদের প্রতিভায় বঞ্চিত হয়েও তাদের মাহাত্ম্য কীর্তনে শূন্যগর্ভ আত্মপ্রসাদ লাভ করত। মাণ্ডারিনরা পুরাতন ও জীর্ণ পুস্তকের পৃষ্ঠায় তাদের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি সীমাবদ্ধ করে রেখেছিল। এজন্য তাদের উজ্জ্বল প্রতিভার ধার ম্লান হয়ে গেল এবং ব্রাহ্মণদের মতো তারাও রক্ষণশীলতার প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়াল।

নয়

গ্রীক সভ্যতা

গ্রীক সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন। ঐতিহাসিক যুগের উষাকালে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকের তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় আর্যদের একটি শাখা বল্‌কান উপদ্বীপ এবং তার নিকটবর্তী স্থানসমূহে ইজিয়ান সভ্যতার সংস্পর্শে এসেছিল। হোমরের কাব্যের যোদ্ধাসকল এক ভাষায় কথা বলত। গ্রীকদের বিভিন্ন শাখা হেলি-নিজ্‌ নামে পরিচিত হলেও তাদের মধ্যে আইওনিক ইয়োনিক এবং ডরিক নামে তিনটি উপভাষা বর্তমান ছিল। হেলিনিক জাতি ইজিয়ান সভ্যতা ধ্বংস করে তার ভগ্নস্তূপের উপর একটি নূতন সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তারা সমুদ্র পার হয়ে এশিয়ামাইনরে, কৃষ্ণসাগরের উপকূলে এবং ইটালির দক্ষিণে বিস্তৃত হয়েছিল। তারা মার্সেলস্ নগর স্থাপন করেছিল এবং ৭৩৫ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে সিসিলি দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ঐতিহাসিক যুগে তারা এথেন্স স্পার্টা করিন্থ্ থীবস্ সামস্ ও মাইলিটাস্ নগর নির্মাণ করে নূতন গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র স্থাপন করেছিল। ইউফ্রেতিস্ ও তাইগ্রীস্ নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে, সিন্ধু ও নীল নদের উপত্যকায় এবং ইয়াং-সি-কিয়াং নদীর তটভূমিতে যে মানব-সভ্যতা-তরুর শাখা চতুষ্টয় ফলপুষ্পে সুশোভিত হয়েছিল, তার অন্যতম শাখা গ্রীসের পার্বত্য প্রদেশে নূতন পত্রপল্লবে মঞ্জুরিত হয়ে ইউরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। পুরী বা নগর গ্রীক সভ্যতার কেন্দ্র ছিল। সে সভ্যতার মূল প্রাচীনতর সভ্যতার ভিতর নিহিত ছিল।

পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিরা স্তরে স্তরে উন্নত হয়ে সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠেছিল। ধর্ম রাজা ও পুরোহিত ক্রমান্বয়ে তাদের জাতীয় জীবন নিয়ন্ত্রিত করত, কিন্তু গ্রীসে একই ব্যক্তি যৌবনে যোদ্ধা, পরিণত বয়সে শাসনকর্তা ও বার্দ্ধক্যে পুরোহিত হত। মিশর চীন সুমের ও ভারতে পুর রাজ্যে, রাজ্য সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছিল কিন্তু গ্রীসের নগরগুলি একত্র মিলিত হয়ে রাষ্ট্র বা সাম্রাজ্য গঠন করতে সমর্থ হয়নি। তাদের পুরী-রাষ্ট্রের ক্ষীণ দীপশিখা নির্বাপিত হওয়ার সময় পর্যন্ত তারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছিল। এই বৈশিষ্ট্য গ্রীক সভ্যতা ও গ্রীক রাষ্ট্রচিন্তার মূলকথা।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গ্রীসের নগরে যে শাসনপ্রণালী প্রবর্তিত হয়েছিল তাকে অভিজাতপ্রধান সাধারণতন্ত্র বলা যেতে পারে। কোন নগরে যখন

সামাজিক বা সাম্প্রদায়িক ব্যবস্থায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ পেত সেই সুযোগে কোন চতুর ব্যক্তি সেখানকার রাষ্ট্র শাসন করার ক্ষমতা হস্তগত করে নিত এবং পুরবাসীদের পৃষ্ঠপোষক সেজে প্রকৃতপক্ষে ক্ষমতা অধিকার করত। ষষ্ঠ এবং চতুর্থ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গ্রীসে গণতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছিল কিন্তু গ্রীসের পৌর-শাসনপ্রণালী আধুনিক গণতন্ত্র নামের যোগ্য ছিল না।

বৃহত্তর রাষ্ট্রগঠনের অক্ষমতা। নগরের সঙ্গে নগরের বিরোধ থেকে স্বদেশ-ভক্তির জন্ম হয়েছিল। প্রয়োজন হলে গ্রীসের পুর বা নগরসকল বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হত কিন্তু পরস্পর মিলিত হয়ে বৃহত্তর রাষ্ট্র গঠন করতে পারেনি। তাদের সীমাবদ্ধ ভৌগোলিক সংস্থানের ভিতর উচ্চতর মনোবৃত্তি স্থান পায়নি। তাদের জাতীয়তা পুর ও গৃহের প্রতি তীব্র ভালবাসায় পর্যবসিত হত। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি নগর ও গৃহ থেকে নির্বাসিত হত তখন সে ঘোরতর দেশদ্রোহী হয়ে উঠত। প্রেমিকের প্রত্যাখ্যাত প্রণয় রোষবহ্নি উদ্দীপিত করে। তাতে তার প্রেমাস্পদও ভস্মীভূত হয়ে যায়। গ্রীসে এরূপ ব্যক্তির অভাব হয়নি। তারা অকৃতজ্ঞ পুরবাসীদের উপযুক্ত শিক্ষা দিবার জন্য বিদেশী শত্রুকে আহ্বান করে আনত, স্বদেশ আক্রমণের সহজ রাস্তা দেখিয়ে দিত, এমন কি শত্রুর পক্ষ অবলম্বন করে দেশবাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে কুণ্ঠিত হত না।

অস্ট্রাকিজম। রাজনীতিক্ষেত্রে দুই তিন জন প্রধান ব্যক্তির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে নাগরিকরা তাদের মতামত একখানা ইটের উপর লিখে দিত। যার বিরুদ্ধে ভোটসংখ্যা বেশি হত তাকে দশ বৎসরের জন্য নির্বাসন বরণ করতে হত। এর নাম অস্ট্রাকিজম অথবা সমাজচ্যুতি।

গ্রীসে একটি নগরের সঙ্গে অপর একটি নগরের ঐক্য ছিল না। শত্রুদ্বারা পরাজিত হলে তারা একতাসূত্রে আবদ্ধ হত। তাদের একতা পরাজয়ে, স্বাধীনতায় নয়। কিন্তু ভাষা বর্ণমালা সাহিত্য ধর্ম বিষয়ে তারা একজাতি ছিল। তারা ডেলস্ এবং ডেল্‌ফির মন্দিরে আপোলোর পূজা করত। প্রতি চার বৎসর অন্তর অলিম্পিক ক্রীড়ার অনুষ্ঠান হত। এই খেলায় গ্রীসের বিভিন্ন নগরের ব্যায়ামবীর সকল যোগ দিত। তাদের এই জাতীয় ক্রীড়া তাদের জীবনের ক্ষুদ্রতা ও সংকীর্ণতার কথা ভুলিয়ে দিত। ৭৭৬ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে এই ক্রীড়া আরম্ভ হয়। এই গ্রীসের প্রথম ঐতিহাসিক অব্দ।

যুদ্ধ বিরোধ ও হিংসা তাদের রাষ্ট্রদেহে পুরাতন ক্ষতের মতো উদ্বেগ ও অশান্তি

সৃষ্টি করেছিল। এশিয়া মাইনর এবং নিকটবর্তী দ্বীপগুলির অধিবাসী লিডিয়ার আনুগত্য স্বীকার করল। পারস্য সম্রাট সাইরস লিডিয়ার সম্রাট ক্রীশাসকে পরাজিত করলেন। আইওনিয়ানরা পারস্যের অধীনতা স্বীকার করল।

গ্রীসের একজন নির্বাসিত চিকিৎসকের প্ররোচনায় একটি বিরাট বাহিনী নিয়ে ডেরিয়স্ ডানিউব নদ পার হয়ে সিথিয়ানদের বিরুদ্ধে অভিযান করলেন কিন্তু তাদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে কোনমতে প্রাণ নিয়ে তিনি সুসায় পলায়ন করলেন। গ্রীক সেনাপতি হিষ্টিয়স্ সুসায় নিমন্ত্রিত হয়ে নজরবন্দী হলেন। হিষ্টিয়স্ গোপনে আইওনিয়ান গ্রীকদের পারস্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে তোলেন। ৪৯৫ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে লাডির যুদ্ধে গ্রীক নৌবহর পরাজিত হল। হিষ্টিয়সকে হত্যা করা হল।

৪৯০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে পারসিক সৈন্য প্রথম গ্রীস আক্রমণ করল। আটিকার মারাথন নামক স্থানে তারা অবতরণ করে। এথিনিয়নিরা অসীম বীরত্বের সঙ্গে পারসিক বাহিনীকে পরাজিত করল। মারাথনের নৌযুদ্ধে পারসিকদের পরাজয়ের বার্তা শুনে ডেরিয়স্ ভগ্নহৃদয় হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁর পুত্র জারাকসিস্ মিশরের বিদ্রোহ দমন করে গ্রীস জয়ের জন্য একটি বিরাট বাহিনী সংগ্রহ করলেন। গ্রীসজয়লিপ্সু সৈন্যসমুদ্র দেখে জারাকসিস্ আনন্দিত হলেন কিন্তু পরমুহূর্তে আবার অশ্রুপাত করতে লাগলেন। তাঁর এই বিরুদ্ধ ভাবাবেশের কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেছিলেন, আমি আজ সমুদ্রসৈকতে বালুরাশির মতো এই অগণিত সৈন্যের অধীশ্বর! আমার মত সুখী কে? আজ থেকে একশত বৎসর পরে এই অপরিমেয় সৈন্য শ্রেণীর কেউ জীবিত থাকবে না। এই কথা ভেবে আমি অশ্রুবিসর্জন করছি।

লিওনিডাস্। পারস্য সম্রাটের বিরাট নৌবহর ভীষণ ঝড়ের প্রকোপে ধ্বংস হয়ে গেল। থার্মপিলির গিরিবর্ত্মে স্পার্টান বীর লিওনিডাস্ মাত্র চৌদ্দ শত সৈন্য নিয়ে যে বীরত্ব ও সাহস দেখিয়েছিলেন তার জন্য বিশ্বের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। থেমিষ্টকলিস্ এবং আরিস্টাইডিস্ সালামিসে পারস্যের নৌবহর ধ্বংস করে দিলেন। পর বৎসর প্লেটিয়ার যুদ্ধে পারস্যের সেনাপতি পরাস্ত ও নিহত হল। মাইকেলির যুদ্ধে পারসিক সৈন্য জলে ও স্থলে পরাজিত হল।

প্লেটিয়া ও মাইকেলির যুদ্ধের পর গ্রীসে শান্তি প্রতিষ্ঠা হল। এই শান্তি প্রায় চল্লিশ বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। এথেন্সের এই গৌরবময় যুগে এক অপূর্ব

ধরণের সভ্যতার উদয় হল। চিত্রে, ভাস্কর্যে, সাহিত্যে, দর্শনে ও বিজ্ঞানে তার প্রতিভা বিকশিত হল। গ্রীসের জাতীয় জীবনে নবভাবের জাহ্নবীধারা প্রবাহিত হল। এথেন্স বিদ্যা ও শিল্পের চিত্রশালায় পরিণত হল—ইয়োরোপের ভাবী উন্নতি ও গৌরবের কেন্দ্র হয়ে উঠল। হেলিনিক জাতির অন্তস্তলবাহী প্রেরণার ফল্গুধারা উচ্ছ্বসিত, কল্লোলিত ও বেগবান হয়ে তার অত্যাশ্চর্য শিল্প-কলায় বিকশিত হল।

পেরিক্লিস্। যে মহামনীষী গ্রীসের সুপ্ত অন্তরাত্মাকে সচেতন ও সজ্ঞান করে তুলেছিলেন, তার অন্তর্লীন প্রকৃতিকে সাহিত্যে, শিল্পে ও জীবনে ব্যক্ত করেছিলেন, যাঁর রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি, গভীরতম ও মহত্তম সৌন্দর্যানু-ভূতির সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এক নবযুগের অবতারণা করেছিল, তাঁর নাম পেরিক্লিস্। ত্রিশ বৎসরের বেশি তিনি রাষ্ট্রের অদ্বিতীয় কর্ণধার ছিলেন। পেরিক্লিস্ যুগস্রষ্টা মহাপুরুষ ছিলেন। আসপেশিয়া নাম্নী এক বিদুষী ও বুদ্ধিমতী রমণী পেরিক্লিসের আদর্শ সাধনার সহায়ক হয়েছিলেন। মাইলিটস্ নগর তাঁর জন্মস্থান ছিল। বিবাহ-বন্ধনে সংযুক্ত না হলেও তাঁরা পতি-পত্নীর মতো বাস করতেন। পেরিক্লিসকে কেন্দ্র করে সে যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও সাহিত্যিকদের যে মধুচক্র রচিত হয়েছিল, আসপেশিয়া সেই সংগ্রহ কার্যের অগ্রণী ছিলেন। সে যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আসপেশিয়ার বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রশংসা করে গেছেন।

পেরিক্লিস নেতৃপদে অধিষ্ঠিত থেকে রাষ্ট্রের কার্য সুন্দরভাবে সম্পাদন করতেন। ক্ষমতা হস্তান্তর করার তাঁর লেশমাত্র ইচ্ছা ছিল না। চিরশত্রু পারস্যকে হতবীর্য ও হৃতসর্বস্ব দেখে তিনি ডেলস্ মিত্রসংঘের সঞ্চিত অর্থ এথেন্সের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করার জন্য ব্যয় করতে লাগলেন। তাঁর প্রতিভার সান্নিধ্যে সমকালীন ব্যক্তিদের বুদ্ধি ও শক্তির দরজা খুলে গেল। জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী সূর্যের চারিদিকে আবর্তিত হয় ও তার আলোকে আলোকিত হয়। তেমনি পেরিক্লিসের প্রতিভা-বৃত্তের মধ্যে এথেন্সের মনীষীরা তাঁর সৃজনী শক্তির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।

গ্রীসের বহু মনীষী ও শিল্পী এথেন্সে সমবেত হলেন। ফাইডেসিয়াস তাঁর দক্ষিণ হস্ত ছিলেন। এয়ুসারস্ কিমোন ও পলুগ্নোটস্ প্রভৃতি চিত্রকর, এয়ুডাইয়ুস্ ওলাটস্ ম্যুরোণ ও পল্যুক্লাইটস্ প্রভৃতি ভাস্কর, ফাইডিয়স্ ও তাঁর শিষ্য

আগরাক্রিটস্ ও কলোটিসের সঙ্গে মিলিত হয়ে এথেন্স নগরীকে সৌন্দর্যশ্রী-মণ্ডিত করে তুললেন। বহু শ্রেণীর লোক এথেন্সের এই মহামেলায় অর্থ উপার্জন করত।

এথেন্স গ্রীসের জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান হয়ে উঠল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে এই নগরে যত যশস্বী মনীষীর আবির্ভাব ও সম্মেলন হয়েছিল অন্য কোন স্থানে আজ পর্যন্ত তেমন দেখা যায়নি। ইস্কিলাস্ সফোক্লিস্ ইউরিপিডিস্ হেরোডোটস্ থৌকু-ডিডিস্ জিনো আনাক্সাগোরস্ প্রোটাগোরস্ সক্রেটিস প্লেটো ক্রাটীস্ ক্রাটীনস্ আরিকোকানিয়া প্রভৃতি কবি, দার্শনিক, ঐতিহাসিক এই নগরে সমবেত হয়ে এথেন্সকে মহাপুণ্যতীর্থে পরিণত করেছিলেন।

পেরিক্লিস ত্রিশ বৎসর এথিনীয় গণতন্ত্রের পরিচালক ছিলেন। তিনি প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বক্তৃতা দিতেন। তাঁর অর্থপিপাসা ছিল না। বিনা প্রয়োজনে তিনি গৃহের বাইরে যেতেন না। তিনি ভাবতেন সামাজিক নিমন্ত্রণ, ভোজের স্বাধীনতা ও মেলামেশা পদমর্যাদা নষ্ট করে। তাঁর অসাধারণ সহিষ্ণুতা ছিল। একদিন একটি দুষ্ট লোক সারাদিন তাঁকে গালিগালাজ করেছিল। নির্বিকার চিত্তে তিনি এই অত্যাচার সহ্য করলেন। রাজকার্য সমাপন করে সন্ধ্যার সময় তিনি গৃহে ফিরে এলেন। লোকটি তাঁকে গালাগালি দিতে দিতে তাঁর গৃহ পর্যন্ত এল। গৃহে এসেই তিনি একজন ভৃত্যকে বললেন, আলো নিয়ে এই ভদ্রলোকটিকে তাঁর গৃহে দিয়ে এস।

ঐশ্বর্যে ও জ্ঞানে, শিল্পে ও সভ্যতায় এথেন্স সমগ্র হেলাসের রানী হবে, গ্রীক জাতি তার পতাকার নিচে সমবেত হয়ে যুগযুগান্তের বিরোধ ভুলে যাবে—এই মহান আদর্শ পেরিক্লিসের জীবনের একমাত্র সাধনা ছিল। কিন্তু এতে এথেন্সের প্রাকৃতজনের মন আকৃষ্ট হয়নি। জাতির উচ্চতম অংশ জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষা-দীক্ষায় উন্নত হয়েছিল বটে কিন্তু তার আলো নিচের স্তরে প্রবেশ করেনি। ফিডিয়াসের কৃতিত্বের সমাদর ও পুরস্কার তাদের ঈর্ষা উদ্রেক করল, হেরোডোটস্‌কে অর্থ সাহায্য তাদের অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করল এবং মাইলিটসের একটি রমণীর সঙ্গে পেরিক্লিসের মিলন ও আসক্তি তাদের ঘৃণার কারণ হয়ে উঠল। কোন বিখ্যাত ব্যক্তিকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা সে কালের লেখকদের রীতি ছিল। উন্নত চরিত্র বা প্রতিভা নীচ ও অশিক্ষিত ব্যক্তির গর্বে আঘাত দেয়। প্রতিভার অভাব পরিহাসের আতিশয্যে পূর্ণ

হয়। এথেন্সের বহু লেখক পেরিক্লিসকে লক্ষ্য করে বিদ্রূপাত্মক নাটক রচনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন এবং এই উপায়ে সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জন করে জনপ্রিয়তা অর্জন করতেন।

দুরন্ত কাল সকল বস্তুই ধ্বংস করে। প্রেটিয়া ও সালামিসের গৌরবময় স্মৃতি ক্ষীণ হতে লাগল। সৌধাবলীর শিল্প-সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেল। দূরত্ব ও নূতনত্বের অবগুণ্ঠন অপসারিত হল। প্রতিভার সাথে ঘনিষ্ঠ সাহচর্য, সৌন্দর্যের সাথে নিত্য পরিচয় বিস্ময়ের কাজল মুছে দেয়। পেরিক্লিস ও তাঁর যুগান্তরকারী কর্ম জনসাধারণের চোখে মলিন ও হীনপ্রভ হয়ে গেল। সততা যাঁর জীবন, দারিদ্র্য যাঁর ব্রত, সেই পেরিক্লিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষিত হল। প্রথমে শত্রুদের আক্রোশ তাঁর বন্ধুদের উপর পড়ল। ড্যামন নির্বাসিত হলেন। বিধর্মী বলে ফিডিয়াস্‌কে কারাগারে মৃত্যুবরণ করতে হল। অভিযুক্ত হওয়ার ভয়ে দার্শনিক আনাক্সাগোরস্‌ স্থানত্যাগ করলেন। আসপে-শিয়াকে নির্বাসন দিবার ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। একদিকে তাঁর প্রাণপ্রতিম বুদ্ধিমতী এই অসামান্যা রমণী, অন্যদিকে তাঁর অকৃতজ্ঞ এথেন্স নগরী—এই দোটানার আবর্তে পেরিক্লিসের হৃদয় বিদীর্ণ হল। তাঁর অশ্রু আসপেশিয়াকে কিছুকালের জন্য রক্ষা করল। এথিনিয়ানগণ পেরিক্লিসকে অপমান করে তাদের জঘন্য মনোবৃত্তির পরিচয় দিল।

এথেন্স ও স্পার্টা। পেরিক্লিসের বুদ্ধিবলে এথেন্স হেলেনিক সভ্যতার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কিন্তু তার শক্তি সুদৃঢ় হওয়ার পূর্বেই তাকে আবার যুদ্ধে লিপ্ত হতে হল। গ্রীসের দুইটি বৃহৎ নগর এথেন্স ও স্পার্টা যেমন একবৃন্তে দুইটি রঙের ফুল। স্পার্টা ছিল মননে বুদ্ধিধর্মী, বিচারক্ষম—এথেন্স ছিল উদারপন্থী, আবেগপ্রধান। স্পার্টা ছিল ধনতান্ত্রিক, অভিজাতদের স্বভাবসিদ্ধ নেতা—এথেন্স ছিল স্বাধীনতা ও সাম্যের পূজারী।

৪৩১ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের যুদ্ধ আরম্ভ হল। পেরিক্লিসের নেতৃত্বে এথিনিয়ান সৈন্য পরাজিত হল। ক্লিয়ন নামে এক ব্যক্তি তাঁকে অভিযুক্ত করল। তিনি সেনাপতির পদ থেকে বিচ্যুত হলেন ও তাঁর অর্থদণ্ড হল। তাঁর পুত্র তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। তাঁর দুটি পুত্র ও ভগ্নী মহামারীতে মৃত্যুমুখে পতিত হল। তিনিও অব্যাহতি পেলেন না। ৪২৯ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে এই মহামনীষীর জীবনদীপ নির্বাপিত হল।

সত্য ও সুন্দরের অভিধ্যানে পেরিক্লিস বিভোর ছিলেন। তাঁর কর্ম-

কোলাহলময় জীবনের ভিতর দিয়ে এই আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছিল। কিন্তু এতে এথেন্সের জনমনের জাগরণ সূচিত হয়নি। এথেন্সের শিল্প ও সাহিত্যের অভিব্যক্তি মাত্র জনকয়েক প্রতিভাবান ব্যক্তির সাধনার সুফল। এই সাধনা পরিশীলিত সমাজ ও উন্নত পরিমণ্ডলের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, সাধারণ লোক তার সন্ধান রাখত না। জাতীয় মনের উপর তার রেখাপাত হয়নি, জাতীয় শিক্ষা-দীক্ষায় তার সার্থকতা অনুভূত হয়নি।

আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতা হেলেনিক সভ্যতার কাছে ঋণী : এই সভ্যতার দুটি ভাবধারার অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। হেব্রীয় মানসের পরলোকমুখীনতা ও তীব্র ভক্তিবাদ এবং হেলেনিক মানসের সৌন্দর্যানুভূতি পাশ্চাত্য মানসকে রঞ্জিত করেছে। আবার গ্রীক সভ্যতার বিজ্ঞানধর্মী স্বভাববাদের মধ্যে প্লেটোর অলৌকিকতাবাদের আবির্ভাব ভারতীয় প্রভাব প্রমাণিত করে। বৌদ্ধযুগের ধর্মপ্রচার ভারতীয় সভ্যতার মর্মকথা ইয়োরোপের সীমান্তে যে বহন করে নিয়ে গিয়েছিল তা অস্বীকার করা চলে না।

আলেকজান্দার। পেরিক্লিস যুগের একশত ত্রিশ বৎসর পরে ফিলিপ ম্যাসিদনের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁর পত্নী অলিম্পীয়ার প্ররোচনায় ফিলিপ নিহত হলে আলেকজান্দার পিতৃ সিংহাসন অধিকার করে সমগ্র গ্রীক বাহিনীর সেনাপতি হন। তিনি সিথিয়ান রাজ্য আক্রমণ করলেন, থীবস্ অধিকার করে ধ্বংস করা হল। গ্রানিকাস্ নদীতীরে পারস্যের নৌবহর ধ্বংস করে তিনি সার্দিস ইফিসস্ মাইলেটস এবং হালিকারনেসস্ হস্তগত করলেন। তারপর টায়র ও সিডন অধিকার করে তিনি ৩৩২ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে মিশরে প্রবেশ করলেন। মিশর আত্মসমর্পণ করল। সে দেশের মন্দির সকলে অতীত যুগের যে গৌরবময় পুণ্যচিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল তার স্বপ্নমধুর আবেষ্টনী আলেকজান্দারের চিত্তে এক অপূর্বভাব সৃষ্টি করেছিল। তিনি মিশরের রহস্যময় সৌন্দর্যমায়ায় অভিভূত হলেন।

যুবজনোচিত ভাবপ্রবণতা ও সৃজনীপ্রতিভা তাঁর মধ্যে অপ্রতুল ছিল না। পিতার বলিষ্ঠ ঔদার্য ও অসামান্য শূরত্ব এবং মনীষী আরিষ্টটলের শিক্ষা সুফল প্রসব করেছিল। তিনি বাণিজ্যের কেন্দ্র টায়র ধ্বংস করেছিলেন কিন্তু নীল নদের অন্যতম শাখার তীরে আলেকজান্দ্রিয়া নামে একটি নূতন নগর স্থাপন করলেন। টায়রের উত্তরে আলেকজান্দ্রিয়াটা নগর স্থাপিত হল। এই দুইটি নগর তাঁর পরিশীলিত মনের সাক্ষ্য দান করছে। আলেকজান্দ্রিয়া সভ্য জগতের

অদ্বিতীয় নগরে পরিণত হল। সৃজনী প্রতিভার সঙ্গে ধর্মভাবের কুহেলিকার মিশ্রণ তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য'।

দীর্ঘ চারিশত বৎসরের পরাধীনতায় মিশরের অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। ইথিওপিয়া আসিরিয়া বাবিলোনিয়া পারস্য ও ভারতের কিয়দংশ তাঁর পদানত হল। তারা অতীতের অন্ধ উপাসক হয়েছিল। পরাধীন জাতির সম্বল পারমার্থিক চিন্তা। অতীন্দ্রিয় জগতের চিন্তায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে সে বর্তমানের শোচনীয় অবস্থাকে বিস্মৃত হতে চায়। তখন সে শক্তিমানের সমস্ত অবিচার ও অত্যাচারকে দৈবের বিড়ম্বনা বলে গ্রহণ করে। এই দাসসুলভ মনোভাব তার হীন পতিত অবস্থায় কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা দান করে। অতীত গৌরব-স্ফীত সুসভ্য বিজিত জাতি জেতৃদের বর্বর বলে চিত্তের দীনতা ঢেকে রাখে।

আলেকজান্দারের অভিযানে প্রাচ্য মানস আলোড়িত হয়নি। তিনি প্রাচ্য জগতের বহির্দ্বারে উপস্থিত হয়েছিলেন, গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সমর্থ হননি। তাঁকে উপলক্ষ্য করে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার যে সংঘাত হয়, তার প্রভাব অতি সামান্য এবং তাঁর চলে যাওয়ার সঙ্গে তা অন্তর্হিত হয়েছিল। তাঁর সার্বভৌম আধিপত্যের ব্যর্থ প্রয়াস তাঁর অতিমাত্র দাম্ভিকতার পরিচয় দেয়। গ্রীক সভ্যতার সুধাভাণ্ড হস্তে ধারণ করে তিনি এসেছিলেন কালান্তক যমের দূতরূপে ক্ষণস্থায়ী পাশবিক শক্তির জ্বালাময় প্রবাহের আকারে। আলেকজান্দারের প্রলয়ঙ্কর বারত্ব ইয়োরোপের অন্তরাত্মার প্রতীক। বিশ্বসভ্যতায় তাঁর দানের বিশেষ কোন মূল্য নাই।

আলেকজান্দারের প্রতিভা। হিংসার পথ সভ্যতা প্রচারের উপায় নয়। দেশ জয় লুণ্ঠন রক্তপাত ধ্বংস, অসহায় ও দুর্বল জাতির উপর কঠোর নির্যাতন সভ্যতা বিস্তারের পথ নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে আলেকজান্দারের প্রতিভা উচ্চাঙ্গের ছিল না। তিনি পারস্য জয় করলেন কিন্তু রাষ্ট্র শাসনের প্রাচীন ধারা অব্যাহত থেকে গেল। রাস্তা বন্দর ও শাসন প্রতিষ্ঠানের কোন পরিবর্তন হয়নি। তিনি মিশর জয় করলেন কিন্তু এতে মাত্র প্রভু বিনিময় হয়েছিল। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করলেন কিন্তু ভারতের সনাতন জীবনযাত্রা প্রণালীর কোন পরিবর্তন ঘটেনি। একদিকে তিনি যেমন সতেরটি নূতন নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি টায়র ধ্বংস করে সমুদ্রপথে গমনাগমনের ও বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁকে উপলক্ষ্য করে গ্রীক সভ্যতার

উৎস ধারা অজানা দেশে প্রবাহিত হয়েছিল সত্য কিন্তু তাঁর অভ্যুদয় ও দিগ্বিজয়ের পূর্ব থেকে বাবিলোন ও মিশরে বহু গ্রীক এসে ভাবের আদান প্রদান করেছিল।

৩২৩ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে বাবিলোনে তাঁর মৃত্যুর পর অরাজকতা ও বিদ্রোহে তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হতে লাগল। এই সুযোগে তাঁর প্রধান সেনাপতিরা সাম্রাজ্য বিভাগ করে নিলেন। পারস্য সাম্রাজ্য এবং সিন্ধু তীর থেকে লিডিয়া পর্যন্ত ভূভাগ সেলুকাসের হস্তে পতিত হয়। আন্‌টিগোনস্ মাসিডোনিয়ার অধিপতি হন। ফিনিসিয়ার তটভূমি এবং এশিয়া মাইনর টলেমির শাসনাধীন হল। সেলুকাসের সেলুসিড্ বংশ এবং টলেমির বংশের ক্ষমতা বহুকাল অক্ষুণ্ণ ছিল কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল থেকে গলরা এসে মাসিডোনিয়া ও গ্রীস লুট করে ডেল্‌ফি দখল করে (২৭৯ পূঃ খ্রীঃ)। গলদের দুই শাখা বস্‌ফোরস্ পার হয়ে এশিয়া মাইনরে উপস্থিত হল এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে পার্শ্ববর্তী জাতিদের নিকট কর আদায় করতে লাগল। আর্মেনিয়া এবং কৃষ্ণ সাগরের তটভূমিস্থিত রাজ্যসকলে গ্রীক ভাবাপন্ন স্বাধীন রাজাদের অভ্যুদয় হয়েছিল। পূর্বাঞ্চল থেকে সিথিয়ান ব্যাকট্রিয়ান ও পার্থিয়ানরা দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে সেখানকার রাজ্য সকল বিধ্বস্ত করতে লাগল। দ্বিতীয় পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে ব্যাকট্রিয়ার গ্রীকরা উত্তর ভারত আক্রমণ ও জয় করে অস্থায়ী বহু রাজ্য স্থাপন করতে লাগল।

আলেকজান্দারের চরিত্র। এইরূপে কালস্রোতে আলেকজান্দারের সাম্রাজ্য কোথায় ভেসে গেল। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ও দুর্দমনীয় জয়লিপ্সা তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রাণশক্তির অপচয় ঘটিয়েছিল। আড়ম্বরপ্রিয়তা, দাম্ভিকতা ও গর্ব, নিজেকে বড় করে দেখার ও দেখাবার প্রবল বাসনা তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টার মূলতত্ত্ব ছিল। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। ফিলিপের বিশ্বস্ত সেনাপতি পারমিনিও, তাঁর পুত্র ফিলোটাস্ এবং শিক্ষাগুরু আরিষ্টটলের ভ্রাতুষ্পুত্র সামান্য কারণে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হল। পিতার নিন্দা শুনতে তিনি ভালবাসতেন। এক সময় তাঁর বন্ধু হিফিইষ্টিয়ন পীড়িত হন। চিকিৎসার সামান্য ত্রুটির জন্য তাঁর মৃত্যু হয়। আলেকজান্দার শোকের একটা অভিনয় করে ফেললেন। চিকিৎসকের প্রাণদণ্ড হল, নিকটবর্তী নগর সকলের প্রাচীর ভেঙ্গে দেওয়া হল, শিবিরে গীতবাদ্য বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধুর আত্মার প্রীতির জন্য কয়েকখানা গ্রামের যুবকদের হত্যা করা হল এবং তাঁর সমাধির জন্য তিন কোটি কুড়ি হাজার টাকা

খরচের ব্যবস্থা করা হল। এই ধরণের শোকাভিনয় পাগলামির নামান্তর। একদিকে উত্তেজিত মস্তিষ্কের পাশবিক ব্যবহার, অপর দিকে আবার নারীসুলভ কোমলতা ও ধর্মভাবপ্রবণতা—এক প্রবৃত্তির অতিমাত্র ঝোঁক থেকে আর এক প্রবৃত্তির আতিশয্যে চলে যাওয়া, এই বিরুদ্ধভাবের দ্বন্দ্ব বাতুলতা বই আর কিছুই নয়। আড়ম্বর আত্মশ্লাঘা এবং অতিমানবত্বের ভান তাঁর জীবনের সকল কর্মের অন্তর্লীন গোপন রহস্য ছিল।

দশ

পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য ও দর্শন

ভারতবর্ষ। পৃথিবীর কোন্ ভাষা প্রথমে সাহিত্যের আকার গ্রহণ করেছিল তা এতকাল আমাদের জানা ছিল না। পণ্ডিতদের মতে ঋগ্বেদ সংহিতা পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য পণ্ডিত প্রবর জেকবি বলেন, ৪৫০০—২৫০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বৈদিক যুগ এবং এই যুগের শেষার্ধে সংহিতা সকল রচিত হয়েছিল। মহামতি তিলকও এই মত সমর্থন করেন। উইন্টারনিজ্ বলেন, ৩০০০—৮০০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ বৈদিক যুগ। বেদের সঙ্গে তুলনা করলে হোমরের কাব্য নবীন। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ রচনার যুগে লিপি বা বর্ণমালা ভারতে প্রচলিত ছিল না। মোক্ষমুলর বলেছেন, খ্রীষ্ট পূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে ভারতে বর্ণমালা ব্যবহৃত হত না। কিন্তু এখন পণ্ডিতরা স্থির করেছেন যে খ্রীষ্ট পূর্ব সপ্তম শতকে ভারতে লিপি প্রচলিত ছিল।

বৈদিক সাহিত্য। যা হোক এ কথা সত্য যে বৈদিক সাহিত্য খ্রীষ্ট জন্মের আট শত বৎসর পূর্বেই পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। বৈদিক সূক্তগুলি সভ্য আর্য মানবের মানসিক প্রতিকৃতি। এই সুপ্রাচীন কালে কি ভাব, কি ধারণা আশা ও উদ্যম তাদের মন আলোড়িত করেছিল তা আমরা বৈদিক সাহিত্যে সুস্পষ্ট দেখতে পাই। আর্যদের সরল প্রকৃতি বিশ্বের সুন্দর ও মহান বস্তু দেখে পুলকিত হত। বালার্ক সিন্দুর ফোঁটা ললাটে ধারণ করে সুখময়ী উষা পূর্ব গগনে আবির্ভূত হলে তাদের হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হয়ে উঠত। প্রকৃতির শান্ত মধুর মূর্তি দর্শন করে তাদের কবিহৃদয় আনন্দে নেচে উঠত। তার ভীম করাল রূপ

তাঁদের রোমাঞ্চ সৃষ্টি করত। তাঁরা তাঁদের আশ্চর্য-পুলকিত হৃদয় সীমাহীন আকাশে বিস্তৃত করে দিতেন, জড় প্রকৃতির ভিতর দিয়ে ইন্দ্রিয়াতীত রাজ্যে বিচরণ করতেন, দৃশ্য পদার্থের নিগূঢ় অর্থ ছন্দোবন্ধে ফুটিয়ে তুলে অনন্তের, অবাঙ্‌মনস গোচর বস্তুতে আত্মহারা হতেন। "উপরে এক মহাসাগর, আর এক বিপুল অন্ধকার, মাঝখানে শুধু ব্যক্তের, জাগ্রতের আলোকরশ্মিটি তির্যকভাবে নিপতিত। মাঝখানের আয়তনটিই হইতেছে আমাদের পরিচিত, ইন্দ্রিয় বুদ্ধির পরিচিত আয়তন—যাহা সহজ সুলভ সাধারণ বস্তুতন্ত্র গদ্যাত্মক - উপরে ও নীচে হাত ধরাধরি করিয়া মিলিয়া মিশিয়া পেছনে এক অনন্তের রহস্যের মহাসৌন্দর্যের মিষ্টিক রাজ্য সৃষ্টি করিতেছে"। ঋগ্বেদের কবি ছিলেন মিষ্টিক কবি, আধ্যাত্মিক কবি। তাঁর দৃষ্টিতে সমস্ত প্রকৃতি ছিল অস্থূল অশরীরী সত্তার বিগ্রহ। তিনি ডুব দিয়েছিলেন অরূপের অতলস্পর্শে। স্থূল বস্তুতে স্থূল ঘটনায় দেখেছিলেন "একটা সূক্ষ্ম বিরাট শক্তির বা চেতনার লীলা।"

বেদের কর্মকাণ্ডের উপাস্য দেবতা বহু এবং উপাসনার প্রকারও বহু। জ্ঞান-কাণ্ডের প্রতিপাদ্য বিষয় ব্রহ্ম, উদ্দেশ্য অজ্ঞান নিবৃত্তি। সাধারণ লোকের চিত্তাকর্ষক শ্রুতিমধুর রসাত্মক বাক্যবিন্যাস বা রমণীর অঙ্গরাগাদির বর্ণনা করে যে গ্রন্থ লেখা হয়, বেদ তার অন্তর্গত নয়। বৈদিক মন্ত্রে বেদনা আছে, অনুভূতি আছে, আবেগ ও উৎসাহ আছে কিন্তু তা জ্ঞানের প্রগ্রহে সংযত। অন্তর্জ্ঞান এই সাহিত্যের প্রাণ গুণ ও শক্তি।

আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ। কালক্রমে আরণ্যক ও ব্রাহ্মণ সকল রচিত হয়েছিল। চিন্তাশীল ব্যক্তিরা বৈদিক কর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব প্রচার করতে লাগলেন। ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হলেও উপনিষদ দার্শনিক গ্রন্থ নয়। ব্রহ্ম সেতুর ন্যায় জগৎ বিধারণ করে আছেন, তিনি সৃষ্টি স্থিতি ও লয়ের মূল কারণ, উপনিষদে এই তত্ত্বই সুন্দর সরল প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। উপনিষদে যুক্তিতর্কের অবসর নাই, কারণ নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া, তর্ক দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। এতে পরমত খণ্ডন ও স্বমত স্থাপনের চেষ্টা নাই। উপনিষদের মতে ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি। অজ্ঞান এর প্রতিবন্ধক। জ্ঞান সূর্যোদয়ে কর্মরূপ ইন্ধন ভস্মীভূত হলে মোক্ষলাভ হয়, পুনর্জন্ম নিবারিত হয়।

ষড়্‌দর্শন। খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকে ভারতের দর্শন সাহিত্যে ছয় জন প্রতিভাসম্পন্ন মনীষীর আবির্ভাব হয়। এঁদের নাম কপিল, পতঞ্জলি, গোতম, কণাদ, জৈমিনী ও ব্যাস। এঁদের দার্শনিক মত যথাক্রমে সাংখ্য

যোগ বৈশেষিক পূর্ব মীমাংসা এবং উত্তর মীমাংসা নামক গ্রন্থে সূত্রাকারে নিবদ্ধ হয়েছে। এই গ্রন্থগুলি ষড়দর্শন নামে পরিচিত। হিন্দু দর্শনে বেদ স্বতঃপ্রমাণ বলে স্বীকৃত হয়েছে। সকল দর্শনের উদ্দেশ্য মোক্ষ বা অপবর্গ। কপিল বলেন, প্রকৃতি ও পুরুষের জ্ঞানেই মুক্তি। পতঞ্জলির মতে চিত্তবৃত্তি নিরোধ হলে সম্যক জ্ঞান হয়। ষট্ পদার্থের জ্ঞানলাভে মুক্তি হয় বলে গোতম প্রচার করেছেন। কণাদ বলেন, পরমাণুর জ্ঞান থেকে মুক্তি হয়। জৈমিনীর মতে বৈদিক ক্রিয়াকর্মের সম্যক অনুষ্ঠান মুক্তি দান করে। ব্যাস নির্দেশ করেছেন জীব-ব্রহ্মৈক্য-সাধন জ্ঞান লাভের পন্থা। যাঁরা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করতে চান না, যাস্ক তাদের মত নিরসন করেছেন। চার্বাক ও লোকায়তগণ আত্মা, ঈশ্বর ও পরজগৎ সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন।

রামায়ণ ও মহাভারত—পণ্ডিতরা বলেন, মহাভারতের প্রথম সূচনা সম্ভবত খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি কোন সময়ে এবং তার সমাপ্তি ঘটে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের কাছাকাছি কোন সময়ে। এই সহস্র বৎসরের ভারতবর্ষের মর্ম ইতিহাস সমগ্রভাবে বিবৃত হয়ে আছে মহাভারতে। মহাভারত একটি বিস্ময়কর সাহিত্যসৃষ্টি।

কথিত আছে চতুর্বেদ, অষ্টাদশপর্ব মহাভারত এবং অষ্টাদশ মহাপুরাণ সংকলন করেছিলেন ব্যাস। মহাভারত এক ব্যক্তির রচনা নয়, তেমনি কোন এক কালের নয়। মহাভারতকে পঞ্চম বেদ বলা হয়, কারণ ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে বেদ ও পুরাণের মধ্যমণি মহাভারত। মহাভারতের মূলতত্ত্ব একটি ইতিহাস, এর কলেবর ছিল স্বল্পপরিসর, শ্লোকসংখ্যা অল্প কয়েক হাজার মাত্র। ক্রমে তাতে উপাখ্যান তত্ত্বালোচনা প্রভৃতি যুক্ত হতে হতে তার শ্লোকসংখ্যা এক লক্ষের বেশি হয়ে তার আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

কুরুপাণ্ডবের বিবাদ ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঐতিহাসিক সত্য কিনা বলা যায় না। ভারতবর্ষের তৎকালীন সমাজ বিবর্তনের চিত্র, আদর্শের বিভিন্নতা ও সংঘাত, রাজনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি, নদী পর্বত জনপদ প্রভৃতির ভৌগোলিক সংস্থান ইত্যাদি নানা বিষয় মহাভারতের বিশাল পটভূমির উপর প্রতিফলিত হয়েছে। মহাভারতকে জানলেই ভারতবর্ষকে সমগ্রভাবে জানা হয়। এজন্য 'যাহা নাই ভারতে তাহা নাই ভারতে' প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মহাভারত ভারতবর্ষের সজীব বিশ্বকোষ।

রামায়ণ ব্যক্তিবিশেষের রচনা। এর রচয়িতা বাল্মীকি। ঋগ্বেদের বহু

অংশে কবিত্ব থাকলেও বৈদিক সূক্তগুলিকে কবিতা বলা হয় না এবং বৈদিক ঋষিদের কবি আখ্যা দেওয়া হয় না। মহাভারতের অনেক অংশে কবিত্ব দেখা গেলেও ব্যাসদেবকে কবি বলা হয় না এবং মহাভারতকে কাব্য বলে বর্ণনা করা হয় না।

সর্গ বিভাগ কাব্যের প্রধান লক্ষণ। "কবির কল্পনা প্রতিভার যে সৃষ্টি তার নাম সর্গ।" রামায়ণের প্রত্যেকটি কাণ্ড কতকগুলি সর্গে বিভক্ত। রামায়ণের পূর্ববর্তী সাহিত্যে সর্গবিভাগ নাই। ঋগ্বেদের বিভাগের নাম মণ্ডল। এক একটি মণ্ডলে কতকগুলি সূক্ত আছে। মহাভারতের পর্বগুলির বিভাগের নাম অধ্যায়। এজন্য রামায়ণ আদিকাব্য এবং বাল্মীকি আদিকবি।

মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্র অর্জুন কৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় রামায়ণের জনক ঐতিহাসিক ব্যক্তি কিন্তু রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি পাত্রপাত্রীদের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ নাই। অনেকের মতে রামায়ণ কাহিনী মূলত রূপকাত্মক। রবীন্দ্রনাথের মতও তাই। সীতা মানে হলরেখা। জনক রাজার হলমুখে তাঁর উৎপত্তি। পাষাণী অহল্যা হলচালনার অযোগ্য কঠিন ভূমি। রাম তাঁর উদ্ধারকর্তা। রাম মানে রমণীয়তা, লক্ষ্মণ মানে সম্পদ। লক্ষ্মণ রাম ও সীতার সহচর। যেখানে সীতা সেখানে তার একদিকে সৌন্দর্য ও অপর দিকে সম্পদ। স্বর্ণলঙ্কা মানে বিপুল ঐশ্বর্য। যিনি সকল লোককে আর্তনাদ করিয়েছিলেন তিনি রাবণ। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য ও শক্তির অধিকারী। রামায়ণ কাব্যের গল্পাংশ রাম ও রাবণের দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত। তাদের দ্বন্দ্বের কারণ সীতাহরণ। এই ঘটনাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিখ্যাত নাটক রক্তকরবীতে ভাবরূপে গ্রহণ করে তার এক আধুনিক অনবদ্য রূপ দিয়েছেন।

রামায়ণের সার্থকতা তার মানবিকতায় ও কাব্যরসে। মহাভারতে আছে মানবচিত্তবৃত্তির প্রকাশ বৈচিত্র্য। রামায়ণের চরিত্রগুলি ভারতবর্ষের চিত্তকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে, মহাভারতের চরিত্রগুলি তা পারে নি। যুধিষ্ঠির ধর্মরাজ কিন্তু তাঁর রাজ্য আদর্শ নয়। রামরাজ্যই আদর্শ রাজ্য। রাম লক্ষ্মণের সৌভ্রাত্র, রামসীতার দাম্পত্য, হনুমানের প্রভুভক্তি, ভরতের ত্যাগ, রামের পিতৃবাক্য পালন আদর্শ স্থান অধিকার করে আছে। অর্জুনের বীরত্ব আদর্শ বটে কিন্তু তা রামের বীরত্বের কাছে ম্লান হয়ে যায়। ভারতবর্ষের জাতীয় চরিত্র গঠনে মহাভারতের চেয়ে রামায়ণের প্রত্যক্ষ প্রভাব বেশি।

মহাভারতে ভারতবর্ষ প্রতিফলিত হয়েছে। রামায়ণ ভারতবর্ষকে

প্রভাবিত করেছে। মহাভারত ভারতবর্ষের জাতি সমাজ ও মনের ইতিহাস। রামায়ণ ইতিহাস নয় বটে কিন্তু তা ভারতবর্ষের ইতিহাসকে রূপ দিয়েছে। মহাভারতের মূল কাহিনীকে অবলম্বন করে খুব কম কাব্য রচিত হয়েছে। রামায়ণ বহু কাব্য ও কবি সৃষ্টি করেছে। রামকাব্য ভারতীয় সাহিত্যকে যুগে যুগে অলংকৃত করেছে। ভাষার লালিত্যে, ছন্দ ও রচনানৈপুণ্যে এবং মানবচিত্তের সুকুমার গুণগুলির প্রতিফলনের দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে মনে হয় রামায়ণ মহাভারতের পরবর্তী যুগের সৃষ্টি।

যে সত্য ও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত সমভাবে প্রবাহিত হয়ে এসেছে তা এই দুইটি জাতীয় মহাকাব্যের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং পুণ্যসলিলা জাহ্নবীধারার মতো ভারতের জাতীয় চিত্তভূমিকে সুশ্যামল করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস। অন্য ইতিহাস কালে কালে কতই পরিবর্তিত হইল কিন্তু এ ইতিহাস পরিবর্তন হয় নাই। ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সঙ্কল্প তাহারই ইতিহাস এই দুই কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।

মহাকাব্য অন্তর্জ্ঞান-প্রধান, কিন্তু তাতে অন্তঃপ্রেরণা এমন ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে এই দুইটি বস্তুকে সকল সময়ে বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয় না ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় গ্রীক সাহিত্যেও এই দুই ধারা প্রবাহিত।

গ্রীক সাহিত্য। গ্রীসের মহাকবি হোমর বীরযুগের অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তিদের চিত্র এঁকেছেন। তাঁর মহাকাব্যের নাম ইলিয়াড্ ও ওডেসি, খ্রীষ্টপূর্ব কয়েক শত বৎসর পূর্বের রচনা। অবশ্য এর আরও পূর্বে কয়েক শতাব্দী ধরে হোমরের কবিতা মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছিল। হোমর সৃষ্টির গূঢ়তম রহস্য উদ্ঘাটন করতে চেষ্টা করেননি। তিনি আত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব ছেড়ে গ্রীক বীরদের শূরত্ব, জীবন-কথা ও গ্রীক দেব-দেবীদের মহিমা, ভক্ত-বৎসলতা ও গৌরব প্রচার করে উদ্দীপনাপূর্ণ কাব্য রচনা করেছিলেন।

গ্রীসে মহাকাব্য সকলপ্রকার কাব্যের ভিত্তি ছিল। কয়েক শতাব্দী ধরে অন্য কোন রকমের কাব্য গ্রীসে রচিত হয়নি। পিণ্ডার, সিমোনিডিস্ এবং সাফো গীতি কবিতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ডাইওনিয়সের উৎসব উপলক্ষে কোরস্ গান হত। কোরস্ দৃশ্য নাটকে পরিণত হয়েছিল। ইস্কিলাস্ (জন্ম ৫২৫ পূঃ খ্রীঃ) দ্বিতীয় বক্তার ভূমিকা জুড়ে দিলেন। পরে সফোক্লিস্ (৪৯৫

পূঃ খ্রীঃ জন্ম) তৃতীয় বক্তার ভূমিকা সংযোগ করে দেন। ক্রমে নাটকের বিভিন্ন বক্তার ভূমিকা কথোপকথন প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করল এবং কোরস্ দৃশ্য নাটকের অপেক্ষাকৃত অপ্রয়োজনীয় অংশ বলে পরিগণিত হল। উঁচু কাঠের মঞ্চের উপর অভিনয় হত। খ্রীষ্ট পূর্ব ছয় শতকে নাট্যমন্দির প্রথম নির্মাণ হতে লাগল। সফোক্লিস্ একশত তেরখানি নাটক রচনা করেছিলেন।

ডাইওনিয়সের উৎসব অনুষ্ঠানে বিয়োগান্ত নাটক জন্মলাভ করেছিল। পঞ্চম শতকে আরিষ্টোফেনিস্ রাজনৈতিক ঘটনা বা কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে ব্যঙ্গ করে নাটক রচনা করেছিলেন। একশত বৎসর পরে মিনেণ্ডার সামাজিক আচার ব্যবহার সম্বন্ধে ব্যঙ্গ নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বইএর সংখ্যা বৃদ্ধি হল। লোকে বই পড়তে লাগল। গল্প ও উপন্যাস রচিত হল এবং প্রহসন বা ব্যঙ্গ নাটকের সমকক্ষ হয়ে উঠল।

ইতিহাসের জনক হেরোডোটস্ পেরিক্লিসের সময় এথেন্স নগরে এসেছিলেন। তাঁর ইতিহাস গদ্যে রচিত হয়েছিল। তার পূর্বে বিয়োগান্ত নাটক উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল। জিনোফন এনাবিসিস্ নামক পুস্তকে দশ হাজার গ্রীক বীরের প্রত্যাবর্তন-কাহিনী মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

সুমের, অসুর ও বাবিলোনে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভব হয়েছিল কিনা জানা নাই। একমাত্র মিশরেই উচ্চচিন্তা বিকাশ লাভ করেছিল। সম্রাট চতুর্থ আমেন-হোটেপ সূর্য বা আটনের দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করেছিলেন। প্রকৃতির মধ্যে সত্য শিব ও সুন্দরের সাধনা ও তার স্পষ্ট অনুভূতি ইক্‌নাটনের ধর্ম বিশ্বাসের মূল উৎস ছিল। মিশরের ধর্মে যে বীজ নিহিত ছিল তাই আইওনিক দর্শনে স্ফূর্ত হয়েছিল। এশিয়ার পশ্চিম উপকূলে আইওনিয়া বা যবন প্রদেশই গ্রীক দর্শনের সুতিকাগার। থালীস্ (৬৪০ বা ৬২৪ পূর্ব খ্রীঃ) এর জনক ছিলেন। তিনিই মিশর থেকে জ্যামিতি আনয়ন করে গ্রীসে তার প্রচলন করেন।

সক্রেটিস। সক্রেটিসের পূর্বে সৃষ্টি-রহস্য ও দার্শনিক তত্ত্বের আলোচনা হলেও একমাত্র সক্রেটিসই গ্রীক দর্শনকে আকাশ থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে এনেছিলেন। সক্রেটস্ ছিলেন জ্ঞানের রাজা। ইয়োরোপীয় দর্শনের জন্ম সক্রেটিস্ থেকে। কালের দূরত্ব তাঁর মহামনীষার ছবিটিকে ম্লান করতে সমর্থ হয়নি। বিষয়াকাঙ্ক্ষাশূন্য এই সন্ন্যাসী নানা সমস্যার সমাধানে মগ্ন থাকতেন, জীবনের আদর্শ নিয়ে বিচার করতেন। আত্মচিন্তার আলোকে জীবনের বিচিত্র বিচ্ছিন্ন

ঘটনাগুলিকে দর্শন করে তিনি সত্যের পথ রচনা করেছিলেন। সত্যকার দর্শন সমগ্রের সঙ্গে অংশের, অখণ্ডের সঙ্গে খণ্ডের সামঞ্জস্য স্থাপন করে কল্যাণের পথ দেখিয়ে দেয়। জীবনের সমগ্র রূপ তাঁর চিত্তের পটভূমিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

পেরিক্লিস্ যুগের অন্যতম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক সক্রেটিস ৪৭০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে এথেন্স নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাল্যে ও যৌবনে ব্যায়াম, কলাশাস্ত্র, জ্যামিতি ও জ্যোতিষ শিক্ষা করেছিলেন। সে যুগের যুবকরা কুতার্কিকদের ভ্রান্ত মত অনুসারে পরিচালিত হয়ে নীতি ও দুর্নীতির মধ্যে ব্যবধান মেনে চলত না। তাদের নৈতিক অধঃপতন দেখে সক্রেটিস মর্মাহত হন। রাজপথে হাটে-বাজারে সকলের সঙ্গে তিনি তত্ত্বালোচনা করতেন। তিনি জ্ঞানকে সর্বোচ্চ স্থান দিতেন। তাঁর মতে ধর্ম ও জ্ঞান এক। যে ব্যক্তি কুকার্যে রত তাকে জ্ঞান দাও, সে পাপপথ ত্যাগ করবে। জ্ঞানী কখনও দুষ্কর্ম করতে পারেন না। তিনি বহু দেবতায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং আত্মার অমরত্বে বিশ্বাস করতেন।

সক্রেটিসের নূতন নীতিশিক্ষার প্রচারে এথেন্সের প্রাচীনদল ক্রুদ্ধ হয়েছিল। সে সময়ে এথেন্সে গণতন্ত্রের নামে অন্যায়ের রাজত্ব চলেছিল। অর্বাচীন জনতার বিচার বুদ্ধিতে তাঁর আস্থা ছিল না। তিনি বলতেন, জ্ঞানীই রাষ্ট্রশাসনের উপযুক্ত। অল্পবুদ্ধি লোকেরা দায়িত্বপূর্ণ শাসনকার্য পরিচালনার অনুপযুক্ত। এথেন্সের সমাজপতিরা বলেছিল, সক্রেটিস যুবকদের শুষ্কতর্ক শিক্ষা দিচ্ছেন, তারা দেশের উপাস্য দেবতাদের অগ্রাহ্য করে উন্মার্গগামী হচ্ছে। সক্রেটিস বিচারালয়ে অভিযুক্ত হলেন। তাঁর প্রাণদণ্ড হল। মৃত্যুর পূর্বে কয়েকদিন তিনি কারাগারে বাস করেছিলেন। এই সময়ে তিনি বন্ধু ও শিষ্যদের সঙ্গে আত্মা ঈশ্বর পরজগৎ প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করতেন। দেহ মরণশীল, আত্মা অমর, জ্ঞানই মানুষের একমাত্র আরাধ্য ও কাম্য বস্তু ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করতে করতে তিনি হেমলক পান করে প্রাণত্যাগ করলেন (৩৯৯ পূঃ খ্রীঃ)। উইল ডুরাণ্ট বলেছেন, Woe to him who teaches men faster than they can learn. কিন্তু মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনে যিনি সাধারণ মানুষের চিত্তকে সত্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পশ্চাৎপদ হন, তিনি কাপুরুষ। সক্রেটিস্ কোন বই লেখেননি। তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী নূতন ধরণের ছিল। তাঁকে কোন বিষয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি প্রতিবাদীকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তার মতের অসারতা প্রমাণ করে দিতেন। প্রশ্নকারী নিজের ভ্রম বুঝতে পারত।

সক্রেটিসের বহু শিষ্য ছিল। তাদের মধ্যে প্লেটো প্রধান ছিলেন। গুরুর তিরোধানের সময় পর্যন্ত সাত বৎসর তিনি সখা ও সহচরের ন্যায় তাঁর সহবাস করেছিলেন। প্লেটো বলেছিলেন, ভগবানকে ধন্যবাদ যে আমি বর্বর হয়ে জন্মাইনি, গ্রীক হয়ে জন্মেছি; ক্রীতদাস হয়ে জন্মাইনি, স্বাধীন হয়ে জন্মেছি; নারী হয়ে জন্মাইনি, পুরুষ হয়ে জন্মেছি, কিন্তু ভগবানকে সবচেয়ে বেশী ধন্যবাদ যে আমি সক্রেটিসের যুগে জন্মগ্রহণ করেছি। এথেন্সের প্রায় এক মাইল দূরে একটি ক্ষুদ্র বাসগৃহ ও উদ্যান ক্রয় করে ৩৮৬ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আকাডিমাইয়া নামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেখানে শিষ্যদের শিক্ষাদান করতেন। প্রায় সহস্র বৎসর আকাডিমাইয়া গ্রীস ও রোমের প্রধান বিদ্যাপীঠ ছিল।

গুরুদেব সক্রেটিসকে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন বলে এথেন্সের গণতন্ত্রের নেতারা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট হয়। এথেন্সে বাস করা নিরাপদ নয় দেখে তিনি গ্রীস ত্যাগ করে বারো বৎসর দেশে দেশে পরিব্রাজকের বেশে ভ্রমণ করেন। মিশর সিসিলি ইটালি প্রভৃতি দেশে দ্বাদশ বৎসর অতিক্রান্ত হয়। প্লেটোর দর্শনের উপর হিন্দুদর্শনের ছায়াপাত হয়েছে। দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর চিত্তকে জ্ঞানের ঐশ্বর্যে পূর্ণ করেছিল দেশ-বিদেশের জ্ঞান-ভাণ্ডার থেকে তিনি মধু আহরণ করে যে মধুচক্র রচনা করেন তা রসের প্রাচুর্যে ভরপুর হয়ে উঠেছিল। সত্য ও সুন্দরের অভিজ্ঞান তাঁর হৃদয়ে জ্ঞানের অমল জ্যোতি বিকিরণ করেছিল।

প্লেটো। সক্রেটিসকে প্রধান বক্তা করে প্লেটো অনেকগুলি সংলাপ প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। এইভাবে আত্মবিলোপ করে তিনি গুরুর মুখ দিয়ে দার্শনিক তত্ত্ব সকলের ব্যাখ্যা ও মীমাংসা করেছেন। গুরুকে শিষ্যের এইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘদান জগতের ইতিহাসে দুর্লভ। প্লেটোর মতে দর্শন এক বিপুল জ্ঞান তপস্যা ও ধর্ম সাধনার প্রকৃষ্ট উপায়। তাঁর লিপি-কৌশল উচ্চ শ্রেণীর ছিল। তাঁর গ্রন্থে কবিত্ব ও চিন্তাশীলতা, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ, জাগতিক ও পারমার্থিক ভাব একাধারে বর্তমান। তাঁর পঁয়ত্রিশখানি সংলাপ নিবদ্ধ গ্রন্থ দার্শনিক তত্ত্ব উদ্ঘাটনের জন্য রচিত হলেও তাদের মধ্যে তিনি উচ্চশ্রেণীর সাহিত্যিকের ন্যায় সৌন্দর্য সৃষ্টির অতুলনীয় ক্ষমতা দেখিয়েছেন।

আত্মার অমরতা সম্বন্ধে পিথাগোরসের মতবাদ গ্রহণ করে প্লেটো তার পরিপুষ্টি সাধন করেন। প্লেটোর মতে আত্মার দুইটি রূপ। আত্মা একাধারে জ্ঞানময় ও অজ্ঞান। স্বয়ংক্রিয় হলে আত্মা জ্ঞানময়, দেহ দ্বারা কার্য করলে

তিনি অজ্ঞান। আত্মার স্বরূপ শাশ্বত, নিত্য কিন্তু দেহসম্পর্কে তিনি ক্ষণস্থায়ী। প্লেটো অদ্বৈতবাদী ছিলেন না। তিনি জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করতেন। যাঁর সামনে সত্য ও শিব নিত্য বর্তমান তিনিই পুরুষোত্তম। যিনি নিজের উদ্দিষ্ট কর্ম সুচারুরূপে সম্পাদন করেন তিনিই সাধু ও নীতিকুশল। যাঁর জীবন যে পরিমাণে বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত তাঁর জীবন সেই পরিমাণে উন্নত। বস্তুর উদ্দেশ্য বোঝা প্রকৃত জ্ঞান। আত্মার আশ্রয় পরমাত্মা, মানুষের পরাগতি। জড় জগৎ তার বাইরের প্রকাশ। তিনি বলেন Idea বা মনোময় জগতই সত্য। জড়বস্তুর বাস্তব সত্তা নাই। পরমাত্মা মঙ্গলময়। এজন্য তিনি জগৎ সৃষ্টি করেছেন। পরম সুন্দরের ধ্যানই অত্যুত্তম জীবন। ধ্যানময় জীবনই মানুষের পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ। নিষ্ক্রিয়তা মানুষকে শ্রেষ্ঠপদের অধিকারী করে না।

প্লেটোর রিপাব্লিক নামক পুস্তক জ্ঞানের অফুরন্ত প্রস্রবণ। এতে তিনি রাজনৈতিক সামাজিক দার্শনিক সমস্যা সকল নির্ভীকভাবে আলোচনা করেছেন। তিনি পৃথিবীতে স্বর্গ নির্মাণের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। ভবিষ্যতের সে স্বর্গে মানুষের স্বাধীন সরল জীবন আনন্দের প্রাচুর্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে। তাঁর মতে একমাত্র জ্ঞানীই শাসন-তরণীর কর্ণধার হওয়ার উপযুক্ত। মানুষকে নিয়েই রাষ্ট্র। রাষ্ট্র মানুষের প্রবৃত্তি অনুসারে গঠিত হয়। রাষ্ট্রের প্রকৃতি পরিবর্তন করতে হলে মানুষের স্বভাবের পরিবর্তন করা চাই। জ্ঞানী দ্বারা শাসনকার্য পরিচালিত না হলে রাষ্ট্রশাসনে অনাচার ও অত্যাচার চলবে। সুতরাং জ্ঞানী ও সৎ মানুষ তৈরী করতে হবে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করে তোলাই সৎ মানুষ তৈরীর একমাত্র উপায়। ভাল শিক্ষা ব্যবস্থায় মানুষ সৎ হয়। তাহলে জাতিসাধারণ কল্যাণের পথে চালিত হবে। সৎ শিক্ষায় মানুষের দেহ সুগঠিত ও সুন্দর হবে, তার মনে সংগীতের সুর বেজে উঠবে। বলিষ্ঠ নিষ্পাপ ও সুদৃঢ় মানুষ শক্তিশালী জাতি গঠন করে। সে মানুষের প্রাণে সংগীতের সুর, মস্তিষ্কে জ্ঞান, হৃদয়ে শ্রদ্ধা আসা চাই। তার শিক্ষার পূর্ণতা, চরিত্রের পরিপূর্ণ বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের উন্মেষ হওয়া চাই।

প্লেটো বৈশ্য-শাসনের বিরোধী ছিলেন। তিনি গণতন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন না। মুষ্টিমেয় শিক্ষাভিমানী ব্যক্তির শাসনও তিনি সমর্থন করেন না। তিনি যথেচ্ছাচার শাসনের বিরোধী। তাঁর মতে শাসনকর্তা দার্শনিক, সত্যনিষ্ঠ ও ধার্মিক হবেন। সুশৃংখল স্বাধীন রাজ্যেই ধর্ম সম্ভব। রাজকার্যে সকলের

অধিকার সমান থাকতে পারে না, কারণ জগতে সাদৃশ্য আছে, সাম্য নাই। ব্যক্তি ও রাষ্ট্র অভিন্ন।

জ্ঞান চর্চার জন্য সক্রেটিস্ যে বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালী অবলম্বন করেছিলেন প্লেটো তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুললেন। তাঁর প্রশ্নোত্তরমূলক বিচার-প্রণালী প্লেটোর হস্তে একটি বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছিল।

যখন প্লেটো আকাডিমাইয়ায় শিক্ষাদান কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন তখন মাসিদন থেকে একটি সুন্দর যুবক শিক্ষার্থী তাঁর নিকট উপস্থিত হয়। এই যুবকের নাম আরিষ্টটল। বস্তুতন্ত্রহীন অধ্যাত্মচিন্তার দৃঢ়ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর সন্দেহ ছিল। প্লেটোর মৃত্যুর পর তিনি এথেন্সের লাইসিউম নামক স্থানে শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠা করে শিষ্যদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। প্লেটো ও সক্রেটিসের দার্শনিক মতবাদের সমালোচনা করার সৎসাহস তাঁর ছিল। এথেন্সে আসার পূর্বে তিনি আলেকজান্দারের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

আরিষ্টটল। আরিষ্টটলের বহুমুখী প্রতিভা আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। দুই হাজার বৎসর পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তিনি যে মত প্রকাশ করেছিলেন তা এখনও আমাদের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করে। আরিষ্টটল আদর্শ ও ব্যবহারের সামঞ্জস্য বিধান করতে চেয়েছিলেন।

সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে লোকের মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল। কল্পনার স্বপ্নময় রাজ্যে বিচরণ করার মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। আরিষ্টটল বাস্তবের উপাসক ছিলেন। তাঁর মতে রাজা, দাস ও স্ত্রীলোকের পরনির্ভরশীলতা স্বাভাবিক। প্লেটো তাঁর আদর্শ রাজ্য থেকে কবিকে নির্বাসন দিয়েছিলেন, কিন্তু আরিষ্টটল বললেন, কাব্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ কাব্যের অন্তর্নিহিত শক্তি আছে। তিনি বেকন ও বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রদূত। তিনি জ্ঞানানুশীলনের ন্যায়ানুমোদিত পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। তিনি ন্যায় শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানের স্রষ্টা ছিলেন। তাঁর মতে মানুষ সামাজিক বা রাজনৈতিক জীব। মানুষের সঙ্গ শক্তির উদ্বোধক। রাষ্ট্রেই মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি পূর্ণ বিকশিত হয়; ব্যষ্টির কল্যাণে রাষ্ট্রের স্বার্থকতা। সীমাবদ্ধ পুর-রাষ্ট্রেই সুখময় আদর্শ জীবন সম্ভব। দর্শন বা বিজ্ঞানের অনুশীলন, কলাশাস্ত্রের আলোচনা ও সৃষ্টি, ধ্যান ও কঠোর আত্মসংযম আদর্শ জীবনের বৈশিষ্ট্য। কেবলমাত্র সুখার্জনই মানুষের একমাত্র কাম্য নয়। উপযুক্ত ও বৈধ কর্ম সম্পাদনে যে সুখ সহজে জন্মে তাই প্রকৃত সুখ। শিল্পীর কৃতিত্ব সৃষ্টিতে, ব্যক্তির

শ্রেষ্ঠত্ব মহৎ কর্মে। অতি ভোজন ও অনশন উভয়ই স্বাস্থ্যের পক্ষে অনিষ্টকর। সুস্বাস্থ্য দুইটি চরম সীমার মধ্যবর্তী স্থান। একথা দেহ ও মন সম্বন্ধে সমান খাটে। সুখময় জীবন মধ্যপন্থার অনুবর্তী। উপযুক্ত শিক্ষা প্রভাবে ভাবাবেগ ও সংবেদনা সুসংযত হয়ে ন্যায়ের ধারণা কর্মে আকারিত হলে চরিত্রের উৎকর্ষ সাধিত হয়। সক্রেটিস বলেছেন, জ্ঞানই ধর্ম। আরিষ্টটল বললেন, কেবলমাত্র জ্ঞানই ধর্ম নয়। সত্য কথা না বললে, 'সত্য কথা বলা উচিত' এই নীতির জ্ঞান নিষ্ফল। শিক্ষা দ্বারা ভাবাবেগ সংযত ও পরিশুদ্ধ করলে ন্যায়নিষ্ঠ কর্ম করার ইচ্ছা আসে। শিক্ষক ও ব্যবস্থাপক এই অতি প্রয়োজনীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন, কারণ তাঁরা বিশেষজ্ঞ। সাধারণ ও বিশেষ বিধি সম্বন্ধে অন্তর্দৃষ্টি আছে বলে রাজনীতিজ্ঞ সাধারণ বিধিকে আইনে ও শিক্ষক বিশেষ বিধিকে পাঠ্যতালিকাভুক্ত করেন। শিক্ষক ও রাজনীতিজ্ঞের মঙ্গল সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি বুদ্ধিনিষ্পন্ন। নীতির দিক দিয়ে আমরা যখন মানুষকে বিচার করি—তার প্রশংসা করি বা দোষ দিই, তখন তার কর্ম অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির বিচার করি, যেহেতু ইচ্ছা শক্তিই কর্মের উৎস। ইচ্ছা কার্যের আকারে আত্ম-প্রকাশ না করলে, ইচ্ছা ভাল কি মন্দ, এইরূপ বিচারের অধীন হয় না।

সাধু চরিত্র সৎকার্যে অভিব্যক্ত হয়। শিক্ষা, অনুশীলন ও সাধনা সাধুচরিত্র গঠন করে। জীবনের প্রতিপদে চরিত্র কার্যের নিয়ামক, আবার চরিত্র পূর্ব-নিষ্পন্ন কার্যের ফল। সুতরাং চরিত্র ও কার্য বীজ ও অঙ্কুরের মতো পরস্পরকে নিয়ন্ত্রিত করে। প্লেটোর মতো আরিষ্টটলও মানুষকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। মানুষ জ্ঞানী ও অজ্ঞান, সংস্কৃত ও প্রাকৃত। আদর্শ-রাষ্ট্রের শাসনকর্তা জ্ঞানী। জ্ঞানীর আদর্শ জীবন পরিস্ফুট আইন রচনায়, রাষ্ট্রশাসনে ও শিক্ষায়; প্রাকৃত ব্যক্তির আদর্শ জীবন অভিব্যক্ত সহযোগিতায়। মনুষ্য-জীবনের সার্থকতা বিচারে। প্রাণী ও উদ্ভিদ জীবন ধারণ করে, প্রাণী অনুভব করে, কিন্তু মানুষ বিচার করে। বিচার দুই প্রকারের—বস্তুতন্ত্রী ও ভাবতন্ত্রী, বিশ্লেষণী ও সংশ্লেষণী। বস্তুতান্ত্রিক বিচার বিষয়সাপেক্ষ, ভাবতান্ত্রিক বিচার সার্বভৌমিক। নীতিশাস্ত্রে বস্তুতন্ত্রী জ্ঞান নিয়মানুগ আচরণসিদ্ধ। এই আচরণ মধ্যপন্থী। মানুষই নিয়মানুসারে জীবন পরিচালিত করতে পারে বলে মনুষ্যপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এই। রাজনীতি শাস্ত্রে বস্তুতন্ত্রী জ্ঞান একজন মানুষকে আর একজন মানুষের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্ররোচিত করে রাষ্ট্রের মঙ্গল সাধন করে। প্রাণীদের ভিতর একমাত্র মানুষই সামাজিক

ও রাজনৈতিক জীব। ইতর প্রাণীরা দল বেঁধে একত্র বাস করে সত্য, কিন্তু তাদের এই প্রকৃতি সহজাত ও অন্ধ—কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয় না। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে সহযোগিতা মনুষ্য প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য,—তার রাজনৈতিক জীবনের চরম সার্থকতা। সংশ্লেষণী জ্ঞানের বিষয়বস্তু সার্বিক ও নিত্য। এই জ্ঞান দর্শন ও বিজ্ঞান আলোচনায় পরিমূর্ত, এই জ্ঞান মানুষের শ্রেষ্ঠতম ঐশ্বর্য। এর অনুশীলনে উচ্চতম আদর্শ জীবনের অভিব্যক্তি। আরিষ্টটলের মতে সংশ্লেষণী জ্ঞানে মানব-আত্মায় ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাব বলা যেতে পারে। যে সত্যানুভূতি লাভের জন্য আমরা দর্শন ও বিজ্ঞান অনুশীলন করি এবং কখনও তাতে সফলকাম হই, তারই নিরন্তর ও গভীর অনুধ্যান ভগবৎ ক্রিয়া। সুতরাং যখন আমরা মননশীল কর্মে সংশ্লেষণী বুদ্ধি প্রয়োগ করি তখনই আমরা ব্রহ্মসারূপ্য লাভ করি। উচ্চতম শক্তির অনুশীলন নিরতিশয় আনন্দের আকর। সুতরাং মননশীল ও সাধনাপ্রোজ্জ্বল জীবন সর্বাপেক্ষা সুখময়। পারমার্থিক চিন্তায় শান্তি ও আনন্দ লাভ করে জীবনকে সার্থক করে তোলার জন্যই আদর্শ রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

ব্যক্তির অধিকার ও আদর্শ রাষ্ট্রের ধারণা সম্বন্ধে প্লেটো ও আরিষ্টটলের মত সীমাবদ্ধ। তাঁরা ব্যক্তির মঙ্গলকে রাষ্ট্রের মঙ্গলের নীচে স্থান দিয়েছেন। তাঁদের আদর্শ রাষ্ট্রে মাত্র অল্পসংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তিরই শাসনের অধিকার আছে। রাষ্ট্রের সার্থকতার যূপকাষ্ঠে তাঁরা ব্যক্তিস্বার্থ উৎসর্গ করেছিলেন। আধুনিক সভ্য জগতের কোন কোন স্থানে ব্যক্তির অধিকার রাষ্ট্রের অধিকারের নীচে স্থান পেলেও প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির চরম স্বার্থের সঙ্গে রাষ্ট্রিক মঙ্গলের চরম আদর্শের প্রভেদ নাই। ব্যক্তির চরম সার্থকতা ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশ—রাষ্ট্রিক মঙ্গলের চরম আদর্শ ব্যক্তির চরম বিকাশ। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক মানসিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চরম উৎকর্ষ সাধনের চেয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রের অধিকতর বাঞ্ছনীয় আর কিছু নাই।

আলেকজান্দার আরিষ্টটলকে প্রয়োজনাতিরিক্ত অর্থ সাহায্য করতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ও রাজার সাহায্যে এক সহস্র ব্যক্তি তাঁর পুস্তক রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহে নিযুক্ত হয়েছিল। লাইসিয়ুমের ছাত্ররা তাঁর তত্ত্বাবধানে ১৫৮ রকমের শাসনতন্ত্রের বিশ্লেষণ করেছিল। বিধিবদ্ধভাবে বিজ্ঞান আলোচনার পদ্ধতি জগতের ইতিহাসে এই প্রথম। আলেকজান্দারের অকালমৃত্যুতে অর্থানুকূল্যের অভাবে বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আরিষ্টটলের মৃত্যুর পঞ্চাশ বৎসর পরে লাইসিয়ুমের শিক্ষালয় হীনপ্রভ হয়ে যায়।

আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর মিশর টলেমির শাসনাধীন হয়। তিনি ফেরোয়া হয়ে উঠলেন। তিনি গ্রীক পুর-রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী মিশরে আমদানি করেন। তাঁর বিচারালয়ে গ্রীক ভাষা ব্যবহৃত হত। মিশরের শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রীক ভাষায় কথা বলত এমন কি মিশরের ইহুদীদের জন্ত বাইবেল গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিভালয়। টলেমি অনন্তসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি মিউজিয়ম্ স্থাপন করেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিশ্ববিভালয়। ইহা পণ্ডিতদের বিভাচর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখানে বহু পণ্ডিত বিভা ও জ্ঞান বিতরণ করতেন। এখানে গণিত ও ভূগোল শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হয়েছিল। এখানেই বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ইউক্লিড্ জ্যামিতি লিখেছিলেন, ইরাটোস্থিনিস্ পৃথিবীর আয়তন জরিপ করেছিলেন, আপোলোনিয়স্ শঙ্কুচ্ছেদ বিভা সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখেছিলেন, হিপারকস্ নক্ষত্র সকলের প্রথম তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, হিরো প্রথম বাষ্পীয় যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, আর্কিমিডিস্ পাঠ ও গবেষণার জন্ত এখানে এসেছিলেন। এই স্থানেই হিরোফাইলস প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন। এখানকার চিকিৎসা বিভালয় উন্নত ছিল।

রাজা মিউজিয়মের শিক্ষক নিযুক্ত করতেন। রাজকোষ থেকে শিক্ষকরা অর্থসাহায্য পেতেন। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার প্রথম টলেমির গৌরবের বস্তু হয়ে আছে। প্রাচীন মিশর ও অসুরের গ্রন্থাগারের পর এত বড় গ্রন্থাগার সে যুগে ছিল না। দ্বিতীয় টলেমি এর উন্নতি করেছিলেন। ফিলাডেলফসের মৃত্যুর পর এর গ্রন্থ-সংখ্যা এক লক্ষ হয়েছিল। ৪৮ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হয় তখন এর গ্রন্থ-সংখ্যা পাঁচ বা সাত লক্ষ ছিল। জিনো ডোটসের মতো প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক এবং কালিমেকসের মতো প্রথিতযশা কবি এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করা তাঁদের অন্ততম কর্তব্য ছিল। বহু বিভার্থী ও কোবিদ এখানে সমবেত হয়ে জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করতেন।

আলেকজান্দ্রিয়ায় মুদ্রাযন্ত্রের ব্যবস্থা ছিল না। —লিখিত পুস্তক ব্যবহৃত

হেলিনিক ভাবাপন্ন সভ্যতা। যে অলক্ষ্য শক্তিবলে দৃশ্যজগতে নিয়ম শৃংখলা ও শাসনের রাজত্ব চলে আরিষ্টটল ও প্লেটোর মনীষা তার সন্ধান পেয়েছিল। খাঁটি হেলিনিক সংস্কৃতির স্থূল প্রাচীর ভেঙ্গে গিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় হেলিনিক ভাবাপন্ন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতা নানা জাতির—গ্রীস, মিশর, সেমাইট, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের মিশ্র জাতি সকলের সমবেত সাধনার ফল। মানব সভ্যতা বক্রপথে অভিযান করেছে। হেলিনিক যুগের ঔজ্জ্বল্য এথেন্সে কেন্দ্রীভূত হয়ে হেলিনিক ভাবপুষ্ট আলেকজান্দ্রিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সৃজনী প্রতিভার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতিষ্ঠা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলীর হাতে বিভাগগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হল। চিকিৎসা শাস্ত্রে, জ্যোতির্বিদ্যায়, ব্যাকরণ শাস্ত্রে ও ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ পণ্ডিত সকল ছয় শত বৎসর ধরে আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যাপীঠে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। খ্রীষ্টান ও মোসলেম ধর্মের তত্ত্বাংশ অন্ধ গোঁড়ামি ও সংশয়বাদ এঁদেরই সৃষ্টি। হেলিনিক ভাবাপন্ন খ্রীষ্টান চার্চ বিজয়ী বর্বরদের বুদ্ধিবৃত্তি অধিকার করল ও পশ্চিম ইয়োরোপের সভ্যতার আলো জ্বেলে দিল। মুসলমান বিজেতৃ সকল ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণাংশের ভিতর দিয়ে হেলিনিক ভাব রঞ্জিত চিত্ত বহন করে স্পেনে উপস্থিত হল। এই চিন্তাধারায় আরব ইহুদী ও পারসিক প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। আলেকজান্দ্রিয় সংস্কৃতির খ্রীষ্টান সংস্করণের সঙ্গে মোসলেম ও ইয়ুদী সংস্কৃতির মিলন স্থান স্পেন। এই মিলন পূর্ণতা লাভ করেছিল ত্রয়োদশ শতকের খ্রীষ্টান স্কলাষ্টিসিজমে এবং সপ্তদশ শতকের স্পাইনোজার দার্শনিক বিশ্লেষণে।

হেলিনিক সভ্যতার প্রকৃতি আনন্দ, উচ্চ চিন্তা, সংলাপ নিবদ্ধ ;—আলেকজান্দ্রিয় সংস্কৃতির প্রকৃতি একাগ্রতা, পূর্ণাঙ্গতা, অনুসন্ধিৎসা। আলেকজান্দ্রিয় সংস্কৃতির মূল উৎস প্লেটো। প্লেটোনিক চিন্তার বীজ আলেকজান্দ্রিয়ার কর্ষিত ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় বিদ্যাচর্চা পঞ্চদশ শতকের ইতালির রেনাসাঁসে আত্মপ্রকাশ করে আধুনিক যুগের অবতারণা করেছিল। এর আলোক মধ্যযুগীয় তমিস্রা দূর করে আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক গবেষণা সমালোচনা পদার্থবিদ্যা ও শিল্প বিজ্ঞানের রহস্য উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে এথেন্স থেকে চীন পর্যন্ত সমস্ত প্রাচ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান [illegible] হয়েছিল। এই যুগে মানুষ প্রথম সজাগ

আলেকজান্দারের মৃত্যুর পর মিশর টলেমির শাসনাধীন হয়। তিনি ফেরোয়া হয়ে উঠলেন। তিনি গ্রীক পুর-রাষ্ট্রের শাসনপ্রণালী মিশরে আমদানি করেন। তাঁর বিচারালয়ে গ্রীক ভাষা ব্যবহৃত হত। মিশরের শিক্ষিত সম্প্রদায় গ্রীক ভাষায় কথা বলত: এমন কি মিশরের ইহুদীদের জন্ম বাইবেল গ্রীক ভাষায় অনূদিত হয়েছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়। টলেমি অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি আলেকজান্দ্রিয়ায় একটি মিউজিয়ম্ স্থাপন করেন। ইহা প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়। ইহা পণ্ডিতদের বিদ্যাচর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এখানে বহু পণ্ডিত বিদ্যা ও জ্ঞান বিতরণ করতেন। এখানে গণিত ও ভূগোল শাস্ত্রের সমধিক উন্নতি হয়েছিল। এখানেই বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ইউক্লিড্ জ্যামিতি লিখেছিলেন, ইরাটোস্থিনিস্ পৃথিবীর আয়তন জরিপ করেছিলেন, আপোলোনিয়স্ শঙ্কুচ্ছেদ বিদ্যা সম্বন্ধে গ্রন্থ লিখেছিলেন, হিপারকস্ নক্ষত্র সকলের প্রথম তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন, হিরো প্রথম বাষ্পীয় যন্ত্র উদ্ভাবন করেছিলেন, আর্কিমিডিস্ পাঠ ও গবেষণার জন্ম এখানে এসেছিলেন। এই স্থানেই হিরোফাইলস প্রথম শব ব্যবচ্ছেদ করেন। এখানকার চিকিৎসা বিদ্যালয় উন্নত ছিল।

রাজা মিউজিয়মের শিক্ষক নিযুক্ত করতেন। রাজকোষ থেকে শিক্ষকরা অর্থসাহায্য পেতেন। আলেকজান্দ্রিয়ার গ্রন্থাগার প্রথম টলেমির গৌরবের বস্তু হয়ে আছে। প্রাচীন মিশর ও অসুরের গ্রন্থাগারের পর এত বড় গ্রন্থাগার সে যুগে ছিল না। দ্বিতীয় টলেমি এর উন্নতি করেছিলেন। ফিলাডেলফসের মৃত্যুর পর এর গ্রন্থ-সংখ্যা এক লক্ষ হয়েছিল। ৪৮ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে যখন এই গ্রন্থাগার ভস্মীভূত হয় তখন এর গ্রন্থ-সংখ্যা পাঁচ বা সাত লক্ষ ছিল। জিনোডোটসের মতো প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও সমালোচক এবং কালিমেকসের মতো প্রথিতযশা কবি এর গ্রন্থাগারিক ছিলেন। পুস্তক তালিকা প্রস্তুত করা তাঁদের অন্যতম কর্তব্য ছিল। বহু বিদ্যার্থী ও কোবিদ এখানে সমবেত হয়ে জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করতেন।

আলেকজান্দ্রিয়ায় মুদ্রাঙ্কনের ব্যবস্থা ছিল না। হস্তলিখিত পুস্তক ব্যবহৃত হত। বহু লেখক এই কার্যে নিযুক্ত হত। লেখার জন্ম ভূর্জপত্র ব্যবহার হত। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে মুদ্রাঙ্কন অবিদিত ছিল। কাগজের অত্যন্ত অভাব ছিল।

হেলিনিক ভাবাপন্ন সভ্যতা। যে অলক্ষ্য শক্তিবলে দৃশ্যজগতে নিয়ম শৃংখলা ও শাসনের রাজত্ব চলে আরিষ্টটল ও প্লেটোর মনীষা তার সন্ধান পেয়েছিল। খাঁটি হেলিনিক সংস্কৃতির স্থূল প্রাচীর ভেঙ্গে গিয়ে আলেকজান্দ্রিয়ায় হেলিনিক ভাবাপন্ন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতা নানা জাতির—গ্রীস, মিশর, সেমাইট, সিরিয়া ও এশিয়া মাইনরের মিশ্র জাতি সকলের সমবেত সাধনার ফল। মানব সভ্যতা বক্রপথে অভিযান করেছে। হেলিনিক যুগের ঔজ্জ্বল্য এথেন্সে কেন্দ্রীভূত হয়ে হেলিনিক ভাবপুষ্ট আলেকজান্দ্রিয়ায় আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং সৃজনী প্রতিভার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রতিষ্ঠা হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক মণ্ডলীর হাতে বিভাগগুলি সুনিয়ন্ত্রিত হল। চিকিৎসা শাস্ত্রে, জ্যোতির্বিদ্যায়, ব্যাকরণ শাস্ত্রে ও ধর্মশাস্ত্রে পারদর্শী ও অভিজ্ঞ পণ্ডিত সকল ছয় শত বৎসর ধরে আলেকজান্দ্রিয়ার বিদ্যাপীঠে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। খ্রীষ্টান ও মোসলেম ধর্মের তত্বাংশ অন্ধ গোঁড়ামি ও সংশয়বাদ এঁদেরই সৃষ্টি। হেলিনিক ভাবাপন্ন খ্রীষ্টান চার্চ বিজয়ী বর্বরদের বুদ্ধিবৃত্তি অধিকার করল ও পশ্চিম ইয়োরোপের সভ্যতার আলো জেলে দিল। মুসলমান বিজেতৃ সকল ভূমধ্য সাগরের দক্ষিণাংশের ভিতর দিয়ে হেলিনিক ভাব রঞ্জিত চিত্ত বহন করে স্পেনে উপস্থিত হল। এই চিন্তাধারায় আরব ইহুদী ও পারসিক প্রভাব সুস্পষ্ট ছিল। আলেকজান্দ্রিয় সংস্কৃতির খ্রীষ্টান সংস্করণের সঙ্গে মোসলেম ও ইয়ুদী সংস্কৃতির মিলন স্থান স্পেন। এই মিলন পূর্ণতা লাভ করেছিল ত্রয়োদশ শতকের খ্রীষ্টান স্কলাষ্টিসিজমে এবং সপ্তদশ শতকের স্পাইনোজার দার্শনিক বিশ্লেষণে।

হেলিনিক সভ্যতার প্রকৃতি আনন্দ, উচ্চ চিন্তা, সংলাপ নিবন্ধ ;—আলেকজান্দ্রিয় সংস্কৃতির প্রকৃতি একাগ্রতা, পূর্ণাঙ্গতা, অনুসন্ধিৎসা। আলেকজান্দ্রিয় সংস্কৃতির মূল উৎস প্লেটো। প্লেটোনিক চিন্তার বীজ আলেকজান্দ্রিয়ার কর্ষিত ক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আলেকজান্দ্রিয়ায় বিদ্যাচর্চা পঞ্চদশ শতকের ইতালির রেনাসাঁসে আত্মপ্রকাশ করে আধুনিক যুগের অবতারণা করেছিল। এর আলোক মধ্যযুগীয় তমিস্রা দূর করে আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক গবেষণা সমালোচনা পদার্থবিদ্যা ও শিল্প বিজ্ঞানের রহস্য উজ্জ্বল করে তুলেছিল।

খ্রীষ্ট পূর্ব পঞ্চম ও চতুর্থ শতকে এথেন্স থেকে চীন পর্যন্ত সমস্ত প্রাচ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। এই যুগে মানুষ প্রথম সজাগ হয়েছিল, নূতন শক্তি, নূতন সত্য আবিষ্কার করেছিল।

প্রাচীন কালের ধর্ম-প্রচারকগণ

কন্‌ফিউশিয়াস্‌। চো-বংশের রাজত্ব কালে ৫৫০ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে চীনের লু প্রদেশে কনফিউশিয়াসের জন্ম হয়। তাঁর বংশের উপাধি কুং ছিল। তাঁর শিষ্যরা তাঁকে "আমাদের প্রভু কুং" বলতেন। তৃতীয় বৎসর বয়সে পিতৃ-বিয়োগের পর তাঁর দুর্দশার সীমা ছিল না। বাইশ বৎসর বয়সে তিনি নিজ গ্রামে লোক-শিক্ষার কার্য আরম্ভ করেন। জিজ্ঞাসু তরুণদের তিনি জাতীয় ইতিহাস ও সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট করতেন। তিনি কিছু লিখে রেখে যাননি অথবা নূতন কিছু করেননি। চীন দেশে তখন অশান্তি ও অনাচারের রাজত্ব চলেছিল—সমস্ত সাম্রাজ্যের শাসনযন্ত্র শিথিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্ত সকল পরস্পর কলহে রত ছিল এবং রাজা-প্রজার বাদ বিসম্বাদ চলেছিল। তিনি লু প্রদেশের কোন এক নগরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। তিনি প্রজাসাধারণের প্রিয় হয়ে উঠলেন। তাঁর ক্ষমতা ও প্রভাব দেখে প্রধান মন্ত্রী ভীত হয়ে পড়লেন। তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। রাজকার্যে ইস্তফা দিয়ে কয়েকজন শিষ্য সঙ্গে নিয়ে তিনি স্থান ত্যাগ করলেন। তিনি বহু রাজ্যে ত্রয়োদশ বৎসর ভ্রমণ করতে লাগলেন। কোন রাজা তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না।

তিনি নিজেকে অতিমানুষ বলে কখনও ঘোষণা করেন নি। কোন্ পথ অবলম্বন করলে মানুষের জীবন সুখময় হয়, কি উপায়ে প্রজারা ধর্মভাবে জীবন যাপন করতে পারে, এই শিক্ষা দেওয়া তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তিনি বলতেন, আমি জ্ঞানী হয়ে জন্মাইনি। তিনি বহু সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর সম্পর্কে এসেছিলেন। রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারের বিফল চেষ্টার জন্য তাঁরা তাঁকে উপহাস করতেন। তিনি এর উত্তরে বলতেন, পশুপক্ষীর সঙ্গে বাস করা অসম্ভব। মানুষের সঙ্গ না করলে কার সঙ্গ করব? পৃথিবীর লোক সত্য পথ গ্রহণ করলে এর অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হবে না।

কনফিউশিয়াস মধ্যপন্থী ছিলেন। যথা নিয়মে যথা কালে এবং যথা স্থানে তিনি সকল কাজ করতেন। তিনি মিতাহারী ছিলেন। অহংকার তাঁর ভিতর স্থান পেত না। তিনি শিষ্যদের বলতেন, সাহিত্য ও নীতি আলোচনা কর, সরলতা ও সত্য কথা বলতে অভ্যাস কর। তাঁর মতে, পাঁচটি সম্বন্ধের উপর

সমাজ প্রতিষ্ঠিত—স্বামী-স্ত্রী সম্বন্ধ, পিতা-পুত্র সম্বন্ধ, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সম্বন্ধ, রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ, এবং বন্ধু-সম্বন্ধ। এই কয়টি সম্বন্ধে লোক তাদের কর্তব্য পালন করলে সমাজ ও দেশ সুশাসিত হবে। তিনি বলতেন, তুমি অপরের কাছে যে আচরণ চাও না, অন্যের প্রতি সেরূপ আচরণ করবে না। অনেক জ্ঞানগর্ভ ক্ষুদ্র বাক্য তাঁর সাধারণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়।

যে পাণ্ডিত্যে চিন্তাশীলতা নাই তেমন পাণ্ডিত্য অর্জনের পরিশ্রম বৃথা। পাণ্ডিত্যহীন চিন্তাশীলতা বিপজ্জনক।

অসন্তুষ্টি প্রকাশ না করে দারিদ্র্য ভোগ করা কঠিন।

জাতি কর্তব্য করতে শিক্ষা করলে দেশ ও রাজার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হতে পারবে।

নিম্ন শ্রেণীর লোক যতই শিক্ষিত হবে, উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিদের দ্বারা যুদ্ধে পরিচালিত হতে তারা ততই অনিচ্ছা প্রকাশ করবে।

ভাল কাজের দ্বারা শত্রুকে জয় করতে পারা যায়। কেউ মন্দ ব্যবহার করলে তার প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাকে বন্ধুর মত দেখ, তাকে ভালবাস ও তার দোষ ক্ষমা কর। কিন্তু তিনি বলতেন, যদি মন্দ ব্যবহারের জন্য তুমি শত্রুর প্রতি ভাল ব্যবহার কর, তবে ভাল ব্যবহারের জন্য তার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করবে? সুতরাং সদ্ব্যবহারের জন্য সদ্ব্যবহার এবং ন্যায়ের দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার করবে।

কন্‌ফিউশিয়াস্ কোন নূতন ধর্ম স্থাপন করেননি। তিনি বুদ্ধ বা যিশু-খ্রীষ্টের মতো কোন ধর্মমত প্রচার করেননি। সামাজিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে কোন্ নীতি অবলম্বন করলে মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে জীবন যাত্রা নির্বাহ করতে পারবে এবং পারিবারিক জীবন শান্তিময় ও সুখময় হয়ে উঠবে, তিনি এই শিক্ষাই দিতেন। তিনি প্রাচীন কালের চীনের চিন্তা ও শিক্ষাধারা রক্ষা করে চলতে উপদেশ দিতেন। জটিল দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণ আধ্যাত্মিকতা বা ধর্মের গূঢ় সত্য আবিষ্কারের প্রচেষ্টায় তাঁর শিক্ষা ভারাক্রান্ত হয়নি। তিনি স্বচ্ছ সরল ভাষায় মানুষের সমস্যা-সঙ্কুল জীবনকে সহজ ভাবে বুঝিয়ে দিতেন। তিনি বলতেন, মানুষ সামাজিক জীব। আন্তরিকতা থাকলে মানুষের প্রকৃতি পূর্ণ বিকাশ লাভ করবে, তখন সে স্বর্গে ও মর্ত্যে অফুরন্ত শক্তির অধিকারী হবে।

চীন তাঁর কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী। চীনের সভ্যতা, চীনের উৎকর্ষ ও সংস্কৃতি, চীনের রীতি নীতি, এক কথায় চীনের সকল বিষয়ে তিনি এক নূতন

যুগ এনে দিয়েছিলেন। যত কাল চীন দেশ ও চীনা জাতি বর্তমান থাকবে ততকাল পর্যন্ত কন্‌ফিউশিয়াসের নাম তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকবে। ৪৭৭ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে তিনি নিজে নিজে বলেছিলেন বিশাল পর্বত ক্ষয় হবে এবং জ্ঞানী ব্যক্তি লতার মত শুষ্ক হয়ে যাবে।

লাউৎ-সে। কনফিউশিয়াসের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে লাউৎ সে চীন দেশে জন্মগ্রহণ করেন। যখন কনফিউশিয়াস্ চীনের পারিবারিক ও রাষ্ট্রিক জীবন সংস্কার করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাও মতবাদীরা চীন দেশে উচ্চতর আদর্শের মহিমা প্রচারে ব্যাপৃত ছিলেন। লাউৎ-সে তাও ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। তাও শব্দের অর্থ ধর্ম-পথ। লাউৎ-সে বলেন, ভগবানের পূর্বে তাও বর্তমান ছিলেন। তাও সমস্ত বিশ্বে অনুস্যূত আছেন, এঁর মহিমায় বিশ্ব উদ্ভাসিত। ইনি অণু অপেক্ষাও অণু, সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম। ইনি অকায়, অথচ সমস্ত দেহবান্ বস্তুর জনক। এঁর প্রভাবে অশ্রুত শ্রুত হয়। ইনি অ-দৃষ্ট, অপাণিপাদ। ইনি ভূত সকলের জনক। ইনি সমদর্শী, অকাম। ইনি নির্মম অথচ পরম কারুণিক।

ইউনান-জু বলেছেন, তাও বিশ্ব আবৃত করে আছেন। ইনি সীমাহীন, এঁর উচ্চতা ও গভীরতা অপরিমেয়। এঁর শক্তিতে পশু সকল বিচরণ করে, বিহঙ্গগণ আকাশে উড়ে বেড়ায়। এঁর কৃপাকটাক্ষে বসন্ত ঋতুর আবির্ভাব, সমীরণ প্রবাহিত প্রাবৃট-ধারা বর্ষিত, জীবগণ প্রাণবন্ত ও বর্ধিত। ইনি নামরূপ-হীন, অনন্ত শক্তিসম্পন্ন, অব্যক্ত, বাক্যমনাতীত। এজন্য লাউৎ-সে এই অজ্ঞেয় বস্তুকে কেবলমাত্র তাও নাম দিয়েছেন। যে শক্তির অলক্ষ্য প্রভাবে উদ্যানে কুসুম বিকশিত হয়, নদী নিম্নাভিমুখে প্রধাবিত হয়, যাঁর করুণায় বৃষ্টিধারা পতিত হয়, সূর্য উজ্জ্বল কিরণ বিতরণ করে—যাঁর কোমল নয়নের কিরণপাতে তারকাবলী আলোকময় পথে বিচরণ করে, ঋতু সকল যথাসময়ে আবির্ভূত হয় ও নৃত্যে মেতে উঠে, যিনি প্রজাপতির সুকোমল পক্ষ বিচিত্র রঙে চিত্রিত করেন, যিনি বিরাট বিশ্ব পরিচালন করেন, তাঁকে আমরা অব্যক্ত বা প্রকৃতি বলি। সুতরাং তাও অর্থে আমরা প্রকৃতি বা অব্যক্ত বুঝি।

তাও মতে মানুষ এই ব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্রাংশ মাত্র। মানুষ সেই বিশ্বব্যাপিনী শক্তির বিকাশ। মানুষকে প্রকৃতির নিয়মের অনুবর্তন করতে তাও শিক্ষা দেয়। নিসর্গের প্রতিকূলতায় মানুষের অকল্যাণ—তার অনুবর্তনে কল্যাণ।

মৃত্যু কেবলমাত্র একটা অবশ্যম্ভাবী পরিণাম—চক্রের একটা আবর্তন মাত্র। লাউৎ-সে বলেছেন, যেমন দারিদ্র্য পণ্ডিতদের সহচর, মৃত্যু তেমনি সকলের চরম পরিণতি। যারা মরেছে, তারা স্বগৃহে ফিরে গিয়েছে ; যারা জীবিত আছে তারা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রকৃতি নিস্তব্ধ, জ্ঞানীও ধীর নিস্তব্ধভাবে সমস্ত ঘটনা পর্যবেক্ষণ করবেন। নিসর্গ জয়ের উপায় বিদ্রোহ নয়, অনুবর্তন। তার উপর হস্তক্ষেপ কর, তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে খাপ খাওয়াতে হবে, সম্পূর্ণরূপে নৈষ্কর্ম্য অবলম্বন করতে হবে, সমস্ত বাসনা ও প্রচেষ্টা নির্বাসন দিয়ে তূষ্ণীভাব গ্রহণ করতে হবে। দেশের শাসন কার্যেও এই নীতির অনুবর্তন চাই। নৈষ্কর্ম্য সরলতা ও সন্তোষ সুখলাভের একমাত্র উপায় এবং দেহবুদ্ধি প্রবৃত্তি ইচ্ছার সঙ্গে প্রকৃতির সমাবেশেই এই সুখের উৎপত্তি।

তাও ধর্মের শিক্ষা ও অনুশাসন, এর গূঢ় প্রকৃতিতত্ত্ব চীনের বহু লোকের জীবন শাসন করেছে। জীবনকে প্রকৃতির বশবর্তী করার জন্য বা তার সহজ অবস্থাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য তারা সংসার ত্যাগ করে নির্জন স্থানে বাস করত।

তাও ধর্মের কতকগুলি সুন্দর নীতি আছে।

দয়ার কার্য দ্বারা অন্যায়ের প্রতিকার করবে। যিনি অন্যায়কে জানেন তিনি বুদ্ধিমান, যিনি নিজেকে জানেন তিনি যথার্থ জ্ঞানী। যিনি অন্যকে পরাজিত করেন তিনি ধনবান, যিনি আত্ম জয় করেন তিনি প্রকৃত শক্তিশালী। প্রবৃত্তির মুখ শিথিল করার চেয়ে পাপ নাই। অসন্তোষের চেয়ে দুঃখ নাই। ধনলাভের চেয়ে বিপদ নাই। করুণা, সংযম ও নম্রতা, এই তিনটী মূল্যবান বস্তু। জলের চেয়ে দুর্বল বা কোমল পদার্থ নাই, কিন্তু কঠিন ও শক্ত বস্তুকেও জল ভেদ করে।

প্রাচীনকালে চীন দেশে লোক শিক্ষার জন্য কনফিউশিয়াস্ এবং লাউৎ-সে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কনফিউশিয়াস্ রাষ্ট্র ও সমাজ সংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন কিন্তু লাউৎ-সে রাষ্ট্র ও সমাজের আদি অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। কনফিউশিয়াসের মতে ইউ ও সুন যুগের রাষ্ট্রীক সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থার অনুকরণ করলে চীনে নূতন যুগের আবির্ভাব হবে, লাউৎ-সের মতে স্বভাবের অনুবর্তন করলে পৃথিবী স্বর্গরাজ্যে পরিণত হবে।

গৌতম বুদ্ধ। ৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে গৌতম বুদ্ধ হিমালয় পর্বতের পাদমূলে কপিলাবস্তু নগরে শাক্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে গৌতমের

মন প্রচলিত দুঃখবাদ ও বৈদিক ক্রিয়াকর্মের প্রতি অনাস্থায় বিচলিত হ'তে লাগল। তিনি মুক্তির পথ আবিষ্কারে মনোনিবেশ করলেন। দুঃখী ও রোগীর করুণ আর্তনাদ তাঁর হৃদয় ব্যথিত করতে লাগল। তিনি সংসার ত্যাগ করে রাজগৃহে উপস্থিত হলেন। সেখানে সন্ন্যাসীদের কাছে অধ্যাত্ম-বিদ্যা শিক্ষা করলেন কিন্তু তাঁদের শিক্ষা গৌতমকে সন্তুষ্ট করতে পারল না।

দেহনিগ্রহের পথ ত্যাগ করে গৌতম নির্জন নদীতীরে ন্যগ্রোধ মূলে ধ্যানাসীন হলেন। সত্যের নির্মল জ্যোতি তাঁর হৃদয়ে উদয় হল। তিনি বুদ্ধ বা জ্ঞানী হলেন। যে বটবৃক্ষের নীচে তিনি সমাধিস্থ হয়ে জ্ঞান লাভ করেছিলেন তা ধ্বংস হয়ে গেছে কিন্তু সেই বৃক্ষের একটি শাখা ২৪৫ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে সিংহলে রোপণ করা হয়েছিল। এই বৃক্ষ এখন পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মহীরুহ।

পাঁচ জন শিষ্যের সঙ্গে তিনি বারাণসীর ইসিপত্তন মৃগদাবে ধর্মচক্র প্রবর্তন করলেন। জগতে একটি নূতন ধর্ম প্রচারিত হল। বুদ্ধ অতীন্দ্রিয় সত্তায় বিশ্বাস করতেন না। তিনি আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করতেন না। ঈশ্বরেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি দুঃখবাদী ছিলেন। আবস্থা দুঃখের আদি কারণ। বৌদ্ধধর্ম জ্ঞান-প্রধান। সত্য জ্ঞান লাভই মুক্তি বা নির্বাণ। নির্বাণ শূন্যতা নয়। নির্বাণ পরম বা নিরতিশয় সুখ। গার্হস্থ্য জীবন নির্বাণ প্রাপ্তির পরিপন্থী নয়। জন-হিতৈষণা বৌদ্ধধর্মের প্রাণ। মৈত্রী (প্রেম), করুণা (অপরের দুঃখে দুঃখ বোধ), মুদিতা (অপরের সুখে সুখ বোধ) এবং উপেক্ষা (সুখে দুঃখে সাম্যভাব) তাঁর সাধন-প্রণালী। জ্ঞান কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের সম্পত্তি নয়। সকলেই জ্ঞান অর্জনের অধিকারী। বিচার ও আত্মপরীক্ষা বৌদ্ধ ধর্ম সাধনের অঙ্গ। তাঁর মতে সত্য চারিটি—শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি। এই চারিটি সত্য বা ধর্ম আয়ত্ত হলে ভবতৃষ্ণা বা পুনর্জন্মের বাসনা তিরোহিত হয়। সংঘ স্থাপন বুদ্ধের প্রধান কীর্তি। গৃহস্থদের সহজ পালনীয় ধর্মনীতি নির্দিষ্ট আছে। ভিক্ষুদের জন্য উচ্চাঙ্গের কঠিনতর শাসন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে।

মগধ, কোশল ও নিকটবর্তী রাজ্য সকলে তিনি নূতন ধর্ম প্রচার করতে লাগলেন। প্রথমে তাঁর সঙ্ঘে ভিক্ষুনী ছিল না। প্রিয়তম শিষ্য আনন্দের অনুরোধে তিনি অনিচ্ছার সঙ্গে স্ত্রীলোকদের সংঘে প্রবেশ করতে অনুমতি দিলেন। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলে সংঘে প্রবেশ করতে পারত। সার্বভৌমিকতা ও ভ্রাতৃত্ব তাঁর ধর্মের প্রধান লক্ষণ। ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি জন-সাধারণের

প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করতেন। আশী বৎসর বয়সে ৪৮৭ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বৌদ্ধধর্ম—সামাজিক বিপ্লব। সুদূর অতীতের গাঢ় অন্ধকার ভেদ করে এই মহামনীষার বিপুল রশ্মি অর্ধ জগৎ প্লাবিত করেছে। ত্যাগের বাণী বুদ্ধের তথা ভারতের বাণী। তিনি ছিলেন এশিয়ার আলো। সমস্ত এশিয়া একদিন তাঁর আদর্শে চলেছিল। বৌদ্ধদের যত্ন ও পরিশ্রমে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার সম্ভব হয়েছিল।

সভ্যতার আলো দানই মানুষের শ্রেষ্ঠ দান। প্রাচীনকালে কাম্বোজ ও চম্পায়, ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থেকে এর প্রচার হয়নি। বুদ্ধের মহান্ বাণী সমস্ত বিশ্বে আলো দান করেছে, শান্তি ও মুক্তির পথ দেখিয়েছে।

বিশ্বকবি গেয়েছেন—

> বোধিদ্রুম তলে তব সে দিনের নব জাগরণ—
> আবার সার্থক হোক্, মুক্ত হোক্ মোহ-আবরণ—
> বিস্মৃতির রাত্রিশেষে—এ ভারতে তোমার স্মরণ—
> নব প্রাতে উঠুক কুসুমি।

জোরাষ্ট্রার। পারস্য সম্রাট সাইরসের সময় জোরাষ্ট্রারের ধর্ম বিজেতা ও বাবিলোনের দেবতাদের উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। জোরাষ্ট্রার কোন সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন, আবার কেহ বা তাঁহাকে বুদ্ধ বা কনফিউশিয়াসের সমসাময়িক বলে নির্দেশ করেন।

ইরানীরা সূর্যকে আহুর মেজ্দা বলত। আহুর মেজ্দা অসুর মঘবা নামের অপভ্রংশ। মঘবা ইন্দ্রের নাম। সুতরাং আহুর মেজ্দা বললে বৈদিক ইন্দ্র বা সূর্যকে বুঝায়। ইনিই আবার ত্বষ্টা বা অগ্নি নামে পরিচিত। ইন্দ্র সৃষ্টি করেছেন সূর্য ও অগ্নিকে। ইনিই আবার আত্মপ্রকাশ করেছেন সূর্য ও অগ্নির ভিতর দিয়ে। মিথ্ৰ ও বৈদিক মিত্র এক পর্যায়ের শব্দ। অগ্নির উপাসনায় সূর্য ও মিথ্রের উপাসনা হয়ে থাকে। ত্বষ্টা বা ত্বষ্টি মানুষের শিক্ষক। তিনি অনন্ত কাল থেকে বর্তমান আছেন। এজন্য তাঁর নাম জরাট ত্বষ্টি। জারাথুষ্ট্রা জরাটু থেকে গঠিত হয়েছে। জারাথুষ্ট্রা নাম থেকে জোরাষ্ট্রার কথাটি এসেছে।

ইরানীদের মতে জারাথুষ্ট্রা বা জোরাষ্ট্রার অর্থাৎ অগ্নিদেবতা তাদের ধর্ম প্রকাশ করেছিলেন। এই ধর্ম তাদের পবিত্র পুস্তক জেন্দ-আবেস্তায় সন্নিবদ্ধ হয়েছে। অসুররা পরে ইরানে বাস করে জোরাষ্ট্রার উপাসক হয়েছিল।

ইতিহাসে যিনি জোরাষ্ট্রার বলে পরিচিত তিনি পরবর্তী কালে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি জোরাটুস্থির বা অগ্নিদেবতার অবতার বলে পরিচিত হন। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্য জেন্দ-আবেস্তায় প্রকৃত ধর্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু এই ধর্মতত্ত্ব বহু প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান ছিল। তিনি আকারে এর নূতন জীবন দান করেছিলেন মাত্র।

জোরাষ্ট্রারের মতে দুটি রাজ্য আছে—একটি আলোর, অপরটি অন্ধকারের। আলোর রাজ্যে অরমুজের অধিষ্ঠান, অন্ধকারের রাজ্য অহ্রীমনের। সুতরাং অরমুজ জ্ঞান ও সত্যের, অহ্রীমন্ পাপের দেবতা। জগতেও মানুষের মনে এই দুইটি দেবতার—পুণ্যের সংগে পাপের, ধর্মের সংগে অধর্মের যুদ্ধ চলেছে। এই ধর্মে বিধি অনুষ্ঠান ও পুরোহিতের প্রাধান্য থাকলেও মূর্তি পূজার ব্যবস্থা ছিল না। এই ধর্ম অনুসারে মৃতদেহ রক্ষা করার বিধি ভারতের পার্শিরা এখনও মেনে চলেন।

স্বর্গের দেবতাদের ভিতর আহুর মেজ্দা সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান। তিনি মিথ্রকে সৃষ্টি করেছেন। আবেস্তার মিথ্র যুদ্ধের দেবতারূপে সত্য ও ন্যায়ের শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য পুনঃ পুনঃ আহূত হয়েছেন। প্রথমে মিথ্র আহুর মেজ্দার নীচে স্থান পেয়েছিলেন। ৪৮৫ পূঃ খ্রীষ্টাব্দের ডেরিয়স আহুর মেজ্দা ও মিথ্রকে সমান স্থান দিয়ে তাঁর কবরের উপর পাথরের ফলকে দুই দেবতারই নাম খোদাই করে দেন। তাঁর বংশের অন্যান্য রাজারা তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন।

মিত্র শব্দের অর্থ সূর্য। আলো মানুষের বন্ধু। ভাল ও মন্দের, সৎ ও অসতের, অরমুজ্ ও অহ্রীমনের মধ্যবর্তী দেবতা মিথ্র। তিনি পরম কারুণিক ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু। তিনি অনন্ত শক্তিময়, প্রেমময় ও মঙ্গলময়। তিনি শ্রীভগবানের প্রিয়পুত্র—মানুষের উদ্ধারকর্তা ও রক্ষাকর্তা। তিনি বিশ্বাত্মা—নিখিল বিশ্বের আশ্রয়।

মিথ্রের পূজা গুহায় অনুষ্ঠিত হত। গুহা ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব শিক্ষার প্রকৃষ্ট স্থান। স্বাভাবিক গুহার অভাবে উপসকরা কৃত্রিম গুহা নির্মাণ করত। মিথ্র পূজার সংগে পর্বত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল। প্রত্যহ তিন বার মিথ্রের উপাসনা হত। সপ্তাহের প্রথম দিন রবিবার মিথ্র পূজার জন্য প্রশস্ত ছিল। খ্রীষ্টের

জন্মের বহু পূর্বে রবিবার "প্রভুর দিন" বলে পরিচিত ছিল। যে দুটি পর্বদিনকে খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টমাস ও ইষ্টার বলে সেই দুদিনেই সূর্যের পূজা হত। খ্রীষ্টানরা যীশুর জন্মদিন নিরূপণ করতে না পেরে সূর্যপূজার একটি দিনকে খ্রীষ্টমাস বা জন্মের দিন বলে ধরে নিয়েছিল। বিভিন্ন মতবাদ, ভক্তি ও দার্শনিক তত্ত্ব রক্ত-মাংসের মত খ্রীষ্টান ধর্মের কঙ্কালে সংযোজিত হয়েছিল।

রোমের প্রাচীন ধর্ম লোপ পাওয়ার পর রোমান সাম্রাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। দীক্ষার সময় শিষ্যকে একখানি তলোয়ার নিতে হত। দীক্ষিত ব্যক্তিকে "মিথ্রের উপাসক" বলা হত। এজন্য খ্রীষ্টধর্ম যোদ্ধাদের ভিতর প্রসার লাভ করেছিল। খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পরেও সম্রাট কনষ্টানটাইন মিথ্রের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা দেখাতে কুণ্ঠিত হননি। খ্রীষ্টধর্ম রোমান ও বাইজানটাইন সাম্রাজ্যে একমাত্র ধর্মরূপে বিস্তৃতি লাভ করেছিলে। শুহ্য আধ্যাত্মিকতা এই ধর্মের প্রধান দুর্বলতা ছিল। চতুর্থ শতকের শেষ দিকে এই ধর্ম খৃষ্টান ধর্মের শক্তি দ্বারা নির্জিত ও পরাভূত হয়ে রোম ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে নির্বাসিত হয়েছিল কিন্তু এর মূলটি যে খ্রীষ্টান ধর্মের অন্তরে স্থান লাভ করেছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

দশ

রোমান সভ্যতা

ভূমধ্য সাগরের দুই তীরে দুইটি শক্তিশালী নগরের অভ্যুদয় হয়। এদের নাম কার্থেজ ও রোম। প্রজাতন্ত্র-শাসিত রোম যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল তা শক্তি ও গৌরবে, বিশালতায় ও স্থায়িত্বে, প্রকৃতি ও গঠনে প্রাচ্য সাম্রাজ্য সকলের সমান ছিল না। আলেকজান্দারের সাম্রাজ্যের মত রোমান সাম্রাজ্য ব্যক্তি বিশেষের সৃষ্ট বস্তু নয়। কয়েক শতাব্দী ধরে মনুষ্য সমাজে বিবিধ পরিবর্তন সংঘটিত হচ্ছিল। মুদ্রা প্রচলন ও মুদ্রা বিনিময় ধনীর সঙ্গে রাষ্ট্রের এবং বিত্তহীনের সঙ্গে বিত্তশালীর এক অভিনব সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। নব-জাত রোমান সাম্রাজ্য-শিশুর কোন একটি নির্দিষ্ট জনক ছিল না। সারগণ থটমিস নেবুকাডনিজার সাইরস সেকেন্দর চন্দ্রগুপ্ত বা সমুদ্রগুপ্তের মত কোন এক ব্যক্তি মনীষা ও প্রতিভা বলে এই সাম্রাজ্য গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করেনি।

প্রজাতান্ত্রিক রোমই এর প্রতিষ্ঠাতা। যুগযুগসঞ্চিত সুপ্ত প্রজার কেন্দ্রাভিমুখী শক্তির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ছিল এই সাম্রাজ্য।

খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতকের পূর্বে ইতালিতে আইবেরীয় জাতি বাস করত। এর দুই শত বৎসর পরে উত্তরাঞ্চল থেকে আর্য ঔপনিবেশিকরা এসে ইতালির উত্তর ও মধ্য ভাগে বসবাস স্থাপন করে আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশ্রিত হচ্ছিল। প্রায় ঐ সময়ে গ্রীকরাও সমুদ্রপথে এসে দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলি দ্বীপে বাস করতে লাগল। ইট্রুস্কান নামে অপর এক জাতি আবির্ভূত হল। তারা টাইবর নদীর উত্তরাংশ হস্তগত করে ইতালীয়দের উপর প্রাধান্য স্থাপন করল। সুসভ্য ইট্রুস্কানরা বহু সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেছিল। তাদের মধ্যে ধাতব শিল্পের প্রচলন ছিল। টাইবর নদীর অপর পারের লাতিন জাতিসকল অসভ্য ছিল। তারা কৃষিজীবী ছিল। আলবান পর্বতের উপর তাদের জাতীয় দেবতা জুপিটারের মন্দির ছিল। কয়েকটি সহর নিয়ে লাতিন রাষ্ট্রসংঘ গঠিত হয়েছিল।

রোম পত্তন। প্রবাদ আছে ৭৫৩ পূর্ব খ্রীষ্টাব্দে রমিউলস্ ও রিমস্ নামে দুই ভাই রোম নগরী পত্তন করেন। প্রথমে লাতিন রাজারা রোমে রাজত্ব করতেন। পরে রোম ইট্রুস্কানদের হাতে আসে। প্রজাপীড়ন ও স্বৈরাচারের জন্য রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ হয় এবং রোমে প্রজাতন্ত্র প্রবর্তিত হয় (৫১০ পূঃ খ্রী)। প্রায় ২৯০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে রোমানরা মধ্য ইতালিতে আর্নো নদী থেকে নেপল্‌সের দক্ষিণ পর্যন্ত ভূভাগে প্রভুত্ব স্থাপন করে। দক্ষিণ ইতালি ও সিসিলির গ্রীকরা কতগুলি পুররাষ্ট্র রচনা করে বাস করেছিল। তাদের ভিতর সিরাকিউস ও টরেণ্টাম প্রধান। মধ্য ইতালিতে রোমের প্রাধান্য দেখে তারা ভীত হয়ে এপিরাসের রাজা পিরহাসের সাহায্য প্রার্থনা করল। এপিরাস্ সেকেন্দর-জননী অলিম্পীয়ার জন্মভূমি ছিল এবং পিরহাস্ সেকেন্দারের আত্মীয় ছিলেন। পিরহাস্ যথাক্রমে হিরাক্লিয়া ও অস্কিউলমের যুদ্ধে রোমানদের পরাজিত করেন। রোমের সহিত সন্ধি স্থাপন করে পিরহাস্ সিসিলি জয় করতে মনস্থ করেন। কিন্তু রোম ও কার্থেজ মিলিত হয়ে পিরহাসের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করল। গত্যন্তর না দেখে পিরহাস্ এপিরাসে ফিরে যেতে বাধ্য হন। সিসিলি কার্থেজের অধীন হল দেখে রোম ক্ষুব্ধ হল, বিশেষতঃ কার্থেজের নৌবল রোমের ঈর্ষা উদ্রেক করেছিল।

রোম ও কার্থেজ। সমগ্র সিসিলি কার্থেজের অধীন ছিল না। এর

পূর্বাংশ সিরাকউসের গ্রীক রাজা হাইরোর অধিকারে ছিল। জলদস্যুদের সায়েস্তা করার জন্য কার্থেজ হাইরোর সাহায্য প্রার্থনা করল। জলদস্যুরাও রোমের সাহায্য ভিক্ষা করল। সুযোগ উপস্থিত হল। রোমের ধূমায়িত বিদ্বেষ-বহ্নি প্রলয়ংকর হয়ে উঠল। প্রথম পিউনিক যুদ্ধ আরম্ভ হল (২৬৪—২৪১ পূঃ খ্রীঃ)।

সাত বৎসর ধরে বিজয়লক্ষ্মী একবার রোমের এবং পরক্ষণে কার্থেজের অঙ্কশায়িনী হতে লাগলেন। অবশেষে রোম কার্থেজকে পরাজিত করে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য করল। হাইরোর অংশ বাদে সিসিলি রোমের হস্তগত হল। সিসিলি রোমকে কর দিতে বাধ্য হল। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তাকে প্রচুর টাকা দিতে হল।

কার্থেজের প্রধান রাষ্ট্রনায়ক ও সেনাপতি হামিলকারবার্কা রোম ধ্বংস করতে বদ্ধপরিকর হলেন। তিনি স্পেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন এবং পুত্র হানিবলের নিকট প্রতিশ্রুতি নিলেন যে তিনি আজীবন রোমের শত্রুতা-চরণ করবেন। তখন হানিবলের বয়স মাত্র এগার বৎসর। মার্কাস কেটো রোমের সুদক্ষ সৈনিক ছিলেন। প্রত্যেক বক্তৃতার উপসংহারে তিনি বলতেন, "কার্থেজ ধ্বংস করা চাই"। কেটো নিষ্ঠুর স্বার্থপর ও পরশ্রীকাতর ছিলেন। ধর্ম ও নীতির দোহাই দিয়ে তিনি তরুণদের উৎপীড়ন করতেন। তিনি লাটিন ভাষায় কৃষি বিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। তিনি বলতেন, বৃদ্ধ অকর্মণ্য বলদ ও দাসকে বিক্রয় করা উচিত। তিনি একজন দাস রমণীর প্রেমে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কেটো ও হানিবল ছিলেন যুগ-প্রতিনিধি—রোম এবং কার্থেজের মনোবৃত্তির প্রতীক—সমসাময়িক যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মানদণ্ড।

হানিবল দক্ষিণ গলের ভিতর দিয়ে আল্পস পর্বতমালা অতিক্রম করে ইতালিতে প্রবেশ করলেন। পনের বৎসর তিনি ইতালির বুকের উপর বসেছিলেন। রোমানরা যুদ্ধে পরাজিত হল। রোমান সেনাপতি কর্নেলিয়াস সিপিও একদল সৈন্য স্পেনে প্রেরণ করে হানিবলের রসদ ও সৈন্য সরবরাহের রাস্তা বন্ধ করে দিলেন। হানিবলের সৈন্য সংখ্যা কম হয়ে গেল। তিনি ইতালির পাদদেশে কালাব্রিয়ায় কোণঠেশা হয়ে গেলেন। অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি কার্থেজে ফিরে যেতে বাধ্য হলেন।

সিপিও তাঁর পশ্চাতে সৈন্য চালনা করে আফ্রিকার উপকূলে অবতরণ

করলেন। কার্থেজের নিকট জামার যুদ্ধক্ষেত্রে হানিবল পরাস্ত হয়ে পলায়ন করলেন (২০২ পূঃ খ্রীঃ)। কার্থেজ রোমের পদানত হল। সন্ধির সর্ত অনুসারে কার্থেজ স্পেন ছেড়ে দিল এবং রোমের প্রধান শত্রু হানিবলকে রোমের হাতে সমর্পণ করতে বাধ্য থাকল। কিন্তু হানিবল আত্মহত্যা করে কার্থেজকে এই অপমান থেকে রক্ষা করলেন।

কার্থেজের ঐশ্বর্যে ঈর্ষান্বিত হয়ে রোম নিউমিডিয়াকে কার্থেজ আক্রমণে প্ররোচিত করল। আত্মরক্ষার জন্য কার্থেজ অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হল। চুক্তিভঙ্গের অপরাধের জন্য কার্থেজকে নিরস্ত্র করা হল, যোদ্ধাদের রোমে প্রেরণ করা হল, এবং কার্থেজের কতকটা স্থান রোমকে ছেড়ে দিতে হল। রোম সন্তুষ্ট হল না। সে প্রস্তাব করে পাঠাল যে কার্থেজের অধিবাসীদের জন্মভূমি ত্যাগ করে সমুদ্রতীর থেকে দশ মাইল দূরে চলে যেতে হবে।

কার্থেজ রোমের এই অসঙ্গত ও অন্যায় আদেশ গ্রহণ না করায় তৃতীয় পিউনিক যুদ্ধ আরম্ভ হয়। সিপিও কার্থেজ অবরোধ করায় কার্থেজে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল কিন্তু তার অধিবাসীরা আত্মসমর্পণ করল না। দুর্গ রোমের হস্তগত হল। পাঁচ লক্ষ অধিবাসীর ভিতর মাত্র পঞ্চাশ হাজার লোক জীবিত ছিল। তাদের দাসরূপে বিক্রয় করা হল। নগর পুড়িয়ে দেওয়া হল। তার ভস্মস্তূপের উপর লাঙ্গল চালান হল, নগর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ঈর্ষানল-প্রদীপ্ত রোমের তাণ্ডব নৃত্য চলতে লাগল। পিউনিক যুদ্ধ-নাটকের শেষ দুঃখময় অঙ্ক বিশ্বের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে গেল। এই বৎসর আর একটি বৃহৎ নগর রোমের রোষানলে দগ্ধ হয়েছিল। এই হতভাগ্য নগরের নাম করিন্থ।

বিজিত দেশের উপর কর চাপিয়ে এবং আমদানি পণ্যের উপর শুল্ক আদায় করে রোম রাষ্ট্রশাসন ব্যয় নির্বাহ করতে লাগল। নাগরিকরা করমুক্ত হল। রাজস্ব আদায় বন্ধ করা হল। ধনীরা দাসদের খাটিয়ে বিদেশে শস্য উৎপাদন করতে লাগল এবং সেই শস্য দেশে আমদানি করে ব্যবসা চালাতে লাগল। ফলে ইতালির কৃষিক্ষেত্র গোচারণ ভূমিতে পরিণত হল। গ্রাম ছেড়ে লোক রোমে আসতে লাগল। আলস্য ও বিলাসিতা প্রশ্রয় পেল। সর্বনাশের পথ উন্মুক্ত হল।

রোম এবং কার্থেজ বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ হলে পাশ্চাত্য জগতে একটি নূতন শক্তির অভ্যুদয় হত। এদের শোণিতপাতের অভিনয় মনুষ্য প্রকৃতির অন্তরের ভাব প্রকাশ করে। আদি কালের গুহানিবাসী বর্বর মানুষের পাশবিক

প্রবৃত্তি তথাকথিত সুসভ্য মানুষের ভিতরেও আত্মগোপন করে আছে। সভ্যতার উষাকাল থেকে সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত হয়েছে, কত ঋষিকল্প মানুষ, দেবোপম চরিত্র আদর্শের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, যথার্থ নীতির পথ প্রদর্শন করেছেন কিন্তু মানুষের অন্তর প্রকৃতির অল্পই পরিবর্তন ঘটেছে। প্রতিহিংসা ক্রোধ ভয় প্রভৃতি বৃত্তিগুলি সভ্যতা ও সংস্কৃতির কৃত্রিম পরিচ্ছদের ভিতর থেকে উঁকিঝুঁকি দেয়। তখন আমরা তার মনস্তত্ত্বের প্রকৃত সন্ধান পাই।

প্রাচীন কালের রাজাদের দিগ্বিজয়। পূর্বকালে ক্ষমতাশালী রাজারা পররাজ্য জয়ের লোভের এবং সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বশবর্তী হয়ে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হতেন। বর্তমান যুগে ব্যক্তি বিশেষের কাজ জাতির কাজে পরিণত হয়েছে। খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতকে রোমান রাষ্ট্র গ্রীসের অভিজাত-প্রধান প্রজা-তন্ত্রের সমান ছিল। তার সামাজিক জীবন আর্য আদর্শে গঠিত হয়েছিল। রোমে কৃষকরা বাস করত। রোমের আয়তন চারিশত বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা দেড় লক্ষের বেশী ছিল না। তাদের ভিতর সতেরটি বিভাগ বা শ্রেণী ছিল। প্রত্যেক পরিবারের চাষের জন্য কিছু জমি এবং বাসের জন্য গৃহ ছিল। পিতাপুত্র একত্র বাস করত এবং কৃষি জীবিকা উপার্জনের উপায় ছিল। কোন কোন জমিতে জলপাই আঙুরের চাষ হত। তাদের পোষাক ও যন্ত্রাদি সাদাসিধে ধরণের ছিল। নগর ইহাদের ধর্ম ও শাসনের কেন্দ্র ছিল। সমাজে দুটি শ্রেণীর লোক ছিল। তাদের নাম পেট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান। প্লিবিয়ানদের শাসনকার্যে অধিকার ছিল না। সিনেট সভা শাসন করত। পেট্রিসিয়ানদের ভিতর থেকে সিনেটের সভ্য মনোনীত হত। রাজা সভ্য মনোনয়ন করতেন। রাজতন্ত্র উচ্ছেদের পূর্বেও সিনেট বর্তমান ছিল। খ্রীঃ পূঃ ৫১০ সালে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হওয়ার পর দুজন নির্বাচিত ব্যক্তি শাসনকার্য চালাতেন। এদের নাম কন্‌সল। কন্‌সলরা সিনেটের সভ্য নিযুক্ত করতেন। প্রজাতন্ত্র শাসনের প্রথম অবস্থায় সিনেটের সভ্য ও কন্‌সল পেট্রিসিয়ানদের ভিতর থেকে নেওয়া হত। কর্মচারী নিযুক্ত হওয়ার সময় তারা ভোট দিত। তাদের অন্য কোনও অধিকার ছিল না। পেট্রিসিয়ানদের শাসনকার্যে একচেটিয়া অধিকার ছিল। এই দুইটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ চলত। পেট্রিসিয়ানরা চতুর ও কৌশলী ছিল। প্লিবিয়ানরা বিদেশে যুদ্ধ করত এবং পেট্রিসিয়ানরা ঘরে বসে কথামালার সিংহের মতো লুণ্ঠিত দ্রব্যের বেশীর ভাগ দাবী করত এবং বিজিত দেশের জমি ও অর্থ আত্মসাৎ করত।

পেট্রিসিয়ানদের স্বার্থপরতা ও নীচতায় বিরক্ত হয়ে প্লিবিয়ানরা দু'বার ধর্মঘট করে এবং রোম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে মনস্থ করে। পেট্রিসিয়ান-দের ভিতর দু'একজন সহৃদয় ব্যক্তি তাদের পক্ষ অবলম্বন করত এবং রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় তাদের অধিকার দাবী করত। লাঞ্ছিত ও দরিদ্র প্লিবিয়ানরা ক্রমে ক্রমে স্বাধিকার অর্জন করেছিল।

রোমে অখণ্ড জাতি প্রতিষ্ঠা। এই সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হওয়ার পর রোমের অধিবাসীরা এক অখণ্ড জাতিতে পরিণত হল। রোমের জাতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায় আরম্ভ হল। ৩৯০ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে রোম একটি ক্ষুদ্র স্থান ছিল কিন্তু ২৭৫ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে সে ইতালির বিভিন্ন প্রদেশকে একতার সুবর্ণসূত্রে গেঁথে তাদের উপর একচ্ছত্র ক্ষমতা ও প্রাধান্য স্থাপন করেছিল।

গ্রীসের প্রতিষ্ঠা সাহিত্যে ও দর্শনে। রোমের প্রতিষ্ঠা রাজনীতিতে —আইন ও বিধিনিষেধের সুনির্দিষ্ট পন্থায়। রোম অপরকে আত্মসাৎ করে নিতে জানত। পরকে আপন করা, দূরকে নিকট করা যে উদারতা তাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যের উপর প্রভুত্ব করার মনোভাব রোমের উন্নতি ও অবনতির কারণ। অন্যের সম্পত্তি অপহরণ করে রোম সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। গ্রীক সভ্যতার ভিত্তিভূমি দাসত্ব, রোমান সভ্যতা নির্ভর করেছিল লুণ্ঠনের উপর। এই উভয় সভ্যতার ভিত্তি দুর্বল ছিল বলে তাদের প্রভুত্ব বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে নি।

রোমের সাধারণতন্ত্র। যে সাধারণতন্ত্র এতকাল রোমে প্রচলিত ছিল তার নাম প্রকৃতপক্ষে পুররাষ্ট্র। অল্প কয়েক বৎসরের ভিতর এটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। গল জাতি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে লাটিন ভাষা গ্রহণ করল। ৮৯ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির সকল স্বাধীন লোক রোমান্ নাগরিক হওয়ার অধিকার পেল এবং ২১২ খৃষ্টাব্দে এই অধিকার সমগ্র রোমান সাম্রাজ্যের সকল লোকের সাধারণ সম্পত্তি বলে বিবেচিত হল। কিন্তু রোমান সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে তার বিচিত্র জনসঙ্ঘের সম্মিলন সম্ভবপর হয়নি। দূরবর্তী প্রদেশ সকলের জনমত কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করতে পারেনি। প্রতিনিধি নির্বাচন প্রথা তখনও উদ্ভাবিত হয়নি। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত না হওয়ায় শাসন-সংক্রান্ত ঘটনাবলির যথাযথ সংবাদ প্রচারের সুযোগ ও সুবিধা ছিল না।

বর্বরোচিত মনোভাব। রোমানদের মনোভাব ও চিন্তাধারা বর্বরোচিত ছিল। ২৬৪ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রিয়দর্শী অশোক তথাগতের মঙ্গলময় বাণী প্রচার করছিলেন, ঠিক সেই বৎসরই পাশ্চাত্য মহাদেশের সভ্যতম দেশের পরিশীলিত সমাজ বন্য হিংস্র জন্তুর দংষ্ট্রানখর-বিদারিত দাসের রক্তাক্ত কলেবর দর্শন করে আনন্দ লাভ করেছিল। এই বর্বর আমোদ রোমান সভ্যতার অঙ্গ ছিল। রোমের ঐশ্বর্য ও সংস্কৃতি শোণিতসিক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

নীতি ধর্ম ও বিবেক সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান এখনও জাগ্রত হয়নি। এখনও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নির্য্যাতনের তাণ্ডবলীলা চলেছে, এখনও আইন ও শৃঙ্খলার নামে রক্তপাত ও স্বার্থসিদ্ধি অনুষ্ঠিত হচ্ছে কিন্তু অন্যায়ের প্রতিবাদ করে জনশক্তি রাজশক্তির অন্যায় বিধান অগ্রাহ্য করার মতো উন্নত মন ও নৈতিক বলের পরিচয় দেয়।

ধনতন্ত্রী রোম। বাহিরে গণতন্ত্রী হলেও প্রকৃতপক্ষে রোম ধনতন্ত্রী ছিল। সিনেটের সভ্যরা যেমন লোভী ও বর্বর, তেমনি মূর্খ ও ঈর্ষাপরায়ণ ছিল। শ্রেণী বিরোধ ভীষণ আকার গ্রহণ করছে বুঝতে পেরে টাইবেরিয়াস্ গ্রেকস্ লাইসিনিয়ান আইন পুনরায় প্রচলন করতে চেষ্টিত হলেন। জমিদারি সকল খণ্ডিত হল, শস্য উৎপাদনের জন্য দাসদের পরিশ্রম বন্ধ করে দেওয়া হল। সিনেটের ধনীরা প্রতিবাদ জানাল। একটা বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি হল। জমিদারদের স্বত্ব ও দাবী পরীক্ষা করে দেখার জন্য গ্রেকাস একটি কমিশন নিযুক্ত করলেন। এই সময়ে এশিয়া মাইনরের আটেলস্ মৃত্যুর সময় তাঁর রাজ্য রোমের অধিবাসীদের উৎসর্গ করে যান। সিনেট ঐ সম্পত্তি গ্রাস করতে চেয়েছিল। গ্রেকাস আটালসের ধনরত্ন রোমের দরিদ্র লোকদের ভিতর বণ্টন করতে প্রস্তাব করলেন। গ্রেকাস দ্বিতীয় বার ট্রিবিউন পদের প্রার্থী হলেন। কৃষকরা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে উপস্থিত হল। সিনেটের সভ্যরা লোকজন সংগ্রহ করে কাপিটলে উপস্থিত হল। একটা খণ্ড যুদ্ধ হয়ে গেল। গ্রেকাস্ নিহত হলেন। কৃষক-বিদ্রোহ দমন হল। দশ বৎসরের ভিতর পুনরায় বিদ্রোহ দেখা দিল। জননেতা মেরিয়াস কনসল হলেন। তিনি একটি সৈন্যদল গঠন করলেন। জার্মানরা ইটালি আক্রমণ করল। মারিয়াস্ তাদের দুবার পরাজিত করলেন। তিনি ইটালির ত্রাণকর্তা বলে গৃহীত হলেন।

জুলিয়াস্ সিজার। এদিকে জুলিয়স সিজার জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। প্রথমে

ক্রেসাস্‌ ও পম্পী তাঁর সহযোগী ছিলেন। ক্রেসাসের মৃত্যুর পর পম্পীর সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ উপস্থিত হল। ৪৯ পূঃ খ্রীষ্টাব্দে সিজার পম্পীকে পরাজিত করে রোমান সাম্রাজ্যের নেতৃত্ব হস্তগত করে নিলেন। প্রথমে তিনি দশ বৎসরের জন্য 'ডিক্টেটর' হন। ক্রমে তিনি প্রকৃতপক্ষে রাজা হয়ে উঠলেন। তাঁর হত্যার পর অক্টেভিয়স আণ্টনি ও লেপিডাস রোমান সাম্রাজ্য ভাগ করে নিলেন। এঁদের মধ্যে ক্রমাগত যুদ্ধ চলতে লাগল। শেষে অক্টেভিয়স জয়ী হয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সিনেট ও জনসাধারণের হস্তে প্রত্যর্পণ করিলেন। তাঁর নামের সঙ্গে 'অগষ্টাস্‌' উপাধি সংযুক্ত হল। তিনি প্রাদেশিক শাসন ও অর্থনৈতিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করলেন। আইন ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হল। উত্তরে রাইন ও ডানিউব এবং পূর্বদিকে ইউক্রেতিস্‌ নদী রোমান সাম্রাজ্যের সীমা নির্ধারিত হল।

নীরো। অগষ্টাসের পর কয়েকজন সিজার রোমে রাজত্ব করেন। তাদের ভিতর নীরোর নাম নির্দয়তার জন্য ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। রোম নগরে আগুন লাগিয়ে দিয়ে তিনি পাহাড়ের উপর বসে মনের আনন্দে বীণা বাজিয়েছিলেন। রোমান সম্রাটদের ভিতর মার্কাস অরোলিয়াসের নাম বিখ্যাত। তিনি ধার্মিক ও প্রজাহিতৈষী ছিলেন। তিনি নিজেকে জনসাধারণের ভৃত্য ভাবতেন। তিনি স্টোয়িক মতাবলম্বী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর রোমান সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সম্রাট রাজত্ব করতে লাগলেন।

২৭ পূঃ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুই শত বৎসর রোমান সাম্রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল কিন্তু এই যুগে সৃজনী প্রতিভার দৈন্য ছিল। বাণিজ্যের উন্নতি হয়েছিল কিন্তু ধনীরা অধিকতর ধনী এবং দরিদ্রেরা অধিকতর দরিদ্র হয়েছিল। এই যুগ ছিল মনুষ্যত্ব-খর্বতার যুগ।

জুলিয়াস সিজারের পরবর্তী কালে রোমানরা আচারে ব্যবহারে সামাজিকতায় ও স্থাপত্য শিল্প সম্পদে সুসজ্জিত হয়েছিল। বস্তুতঃ গ্রীস বাবিলন ও মিশরের প্রাচীন সভ্যতার সঙ্গে রোম এক পংক্তিতে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত হয়েছিল।

রোমান সাহিত্য ও শিল্প। অণ্টোনাইনদের যুগে দাসদের নির্যাতন থেকে রক্ষা করার জন্য আইন প্রণয়ন হয়েছিল। দাসবিক্রয় প্রথা রহিত হয়ে গেল। নগরের বাহ্য সৌন্দর্য ও ধনীদের গৃহের সাজ-সজ্জার উন্নতি হয়েছিল। বর্বর আমোদপ্রমোদ ইন্দ্রিয়পরতা কুরুচিপূর্ণ রসালাপ রোমান নীতি-

শৈথিল্যের পরিচয় দেয়। রোমানদের পরিচ্ছদ সুন্দর ও সুশ্রী হয়েছিল। সুদূর চীনের সঙ্গে তারা রেশমের ব্যবসা আরম্ভ করেছিল। রোমে সোনার প্রচলন হয়েছিল। পুস্তকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পূর্বাঞ্চলে গ্রীক ভাষা এবং পশ্চিমাঞ্চলে লাটিন ভাষার প্রচলন হয়েছিল। কলাচর্চ্চা ও সাহিত্য সাধনায় রোম গ্রীসের অনুগামী হয়েছিল। বিজিত গ্রীকরা বিজেতা রোমানদের সাংস্কৃতিক জয় করেছিল। রোমান সভ্যতা গ্রীক ভাবাপন্ন হয়ে গেল। উপন্যাস পাঠ প্রচলিত হল। গদ্য সাহিত্য জন্মলাভ করল। লাটিন মনের উষর ক্ষেত্রে গ্রীক সাহিত্যের সুধাধারা বর্ষিত হওয়ার পূর্বেও হোরেস ও জুভিনালের কবিতা-কুসুম ফুটে উঠেছিল। প্লটস ও টেরেন্সের বিচিত্র নাটকাবলীর সৌন্দর্যে রোমান হৃদয় ছন্দিত হয়ে উঠল। সিসিরো ডিমস্থিনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন। গ্রীক আদর্শের অনুকরণে কটুলস্ তাঁর হৃদয়দ্বার উন্মুক্ত করেছিলেন। অগষ্টাসের যুগ অনুকরণের যুগ। ভর্জিলের মহাকাব্য হোমরের ইলিয়াড ও ওডেসির গগন-চুম্বী যশের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ভরসা করেছিল। ওভিড ও হোরেস গীতিকাব্য ও শ্লোকগাথায় শ্রেষ্ঠ গ্রীক আদর্শের পাশে স্থান গ্রহণের উপযুক্ত। পলিবিয়স্ গ্রীস বিজয়ের ইতিহাস লিখেছিলেন। প্লুটার্ক বীরদের জীবন-কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছিলেন। উপন্যাস ও সংলাপ নিবন্ধ রচিত হল। লাটিন ভাষায় বহু গ্রীক গ্রন্থ অনূদিত হল। লুসিয়ানের গ্রন্থ এখনও আমাদের বিস্ময় ও আনন্দ উৎপাদন করে।

বিজ্ঞান ও ভূগোল চর্চায় দৈন্য প্রকাশ পেয়েছিল। নক্ষত্রবিদ্যা ও শারীর-বিজ্ঞানের আলোচনা হয়নি। রোমানদের কঠিন আড়ষ্ট মন মিশরের মৃত্যুঞ্জয়ী শিল্পসৌন্দর্যের ধ্যানে বিভোর হয়নি, পারস্য ও গ্রীসের রসলিপ্সার ভাব-ধারা গ্রহণে সমর্থ হয়নি, প্রাচ্যের কারুশিল্পের উদ্দীপনায় পূর্ণ হয়ে ওঠেনি। তারা তাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর আনাগোনা করেই তৃপ্তিলাভ করেছিল। ভারতবর্ষ ও চীনের শিল্পকলা, বুদ্ধ জোরাষ্ট্রারের বাণী তাদের মনের জড়তা দূর করতে সমর্থ হয়নি। পদার্থ বিজ্ঞানের আলোচনায় নিউক্রেসিয়াসের মনীষা নিতান্ত অল্প ছিল না কিন্তু তাঁর বিজ্ঞানচর্চা সীমাবদ্ধ ছিল। স্বাধীনভাবে রাজনীতি আলোচনা হত না। অন্যের অর্জ্জিত অর্থে স্ফীতোদর রোমানরা যুদ্ধ-বিমুখ হয়ে পড়ল। তারা দেশ ও সমাজ রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রাণ বিসর্জ্জন করার সৎসাহস ও চারিত্রিক বল হারিয়ে ফেলল।

স্থাপত্য শিল্পে রোমানদের মৌলিকতা সুস্পষ্ট। তারা প্রথমে খিলান

নির্মাণ ও সিমেন্টের ব্যবহার করেছিল। গ্যালারিযুক্ত রঙ্গালয়, মল্লভূমি, প্রশস্ত রাজপথ, বৃহৎ অট্টালিকা, সুন্দর ও সুদৃঢ় সেতু, বৃহৎ জলাধার প্রভৃতি নির্মাণে তারা সুদক্ষ ছিল। চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে রোমানদের স্বাভাবিক প্রতিভা উচ্চাঙ্গের ছিল। বিচিত্র রঙের পাথরের সমাবেশে তারা এক অপরূপ সৌন্দর্য সৃষ্টি করত। শিল্পচাতুর্যেও তারা সুদক্ষ ছিল। ইউরোপের বর্তমান সভ্যতার গতি ও উন্নতি প্রাচীন রোমের চিন্তায় ও কার্যে নির্দিষ্ট হয়েছে। বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে ইহাই রোমের বিশিষ্ট দান।

রোমান সাম্রাজ্যের পতন। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে রোমের কেন্দ্রীয় শাসন-যন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ল। জার্মেনির বনভূমি থেকে বর্বর শক্তিশালী জাতিরা এসে রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করল। ২৩৬ খৃষ্টাব্দে ফ্রাঙ্ক ও আলমান্নি নামক দুইটি জাতি আল্‌সাসি প্রদেশে প্রবেশ করেছিল। গথ নামে আর এক জাতি আরও দক্ষিণে অগ্রসর হল। ইতিপূর্বে তারা দক্ষিণ রাশিয়ায় প্রবেশ করে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। তাদের নাম অষ্ট্রোগথ ও ভিসিগথ। গথগণ সুইডেন থেকে জলপথে বহির্গত হয়ে বল্টিক সাগর পার হয়ে রাশিয়ার উপর দিয়ে কৃষ্ণ সাগর বা কাস্‌পিয়ান সাগরের তটভূমিতে উপস্থিত হয়েছিল। তারা গ্রীস লুণ্ঠন করতে লাগল। ২৪৭ খৃষ্টাব্দে তারা ডানিউব নদ উত্তীর্ণ হয়ে সম্রাট ডিসিয়াসকে সার্বিয়ায় পরাজিত ও নিহত করল। ডিসিয়া প্রদেশ রোমের ইতিহাস থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেল। ২৭০ খৃষ্টাব্দে তারা সার্বিয়ায় নিশের যুদ্ধে ক্লডিয়াসের হস্তে পরাজিত হল এবং কয়েক বৎসর পরে (২৭০ খ্রীঃ) তারা পন্টসে লুণ্ঠন আরম্ভ করল। সম্রাট প্রোবস্ ফ্রাঙ্ক ও আলামান্নিদের বিতাড়িত করেন। সম্রাট অরেলিয়ন দুর্গাদি নির্মাণ করে রোম রক্ষা করেন।

৩৩৭ খৃষ্টাব্দে ভাণ্ডালরা ডানিউব পার হয়ে পান্নোনিয়ায় প্রবেশ করে। ভিসি-গথরা রোমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করল। তারা আড্রিয়ানোপলে সম্রাট ভালেন্সকে পরাজিত ও নিহত করে বুলগেরিয়ায় বসতি স্থাপন করল। তাদের প্রধান সেনাপতির নাম আলারিক। পান্নোনিয়ার ভণ্ডাল ষ্টিলিকো তাঁর প্রধান শত্রু। গলের রোমান সৈন্য একজন ফ্রাঙ্কের অধীন ছিল। সম্রাট ১ম থিওডোসিয়াস্ স্পেনের অধিবাসী ছিলেন। গথ সৈন্য তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিল।

রোমান সাম্রাজ্যের বিভাগ। রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হল। পূর্ব খণ্ডে গ্রীক ভাষা এবং পশ্চিম খণ্ডে লাটিন ভাষা প্রচলিত হল। আলারিক রোম দখল করলেন। ভাণ্ডালরা ও আলানিদের এক শাখা দক্ষিণ স্পেনে বাস

করতে লাগল। দক্ষিণ স্পেনের ভাণ্ডালগণ তাদের রাজা জেনসিরিকের নেতৃত্বে উত্তর আফ্রিকা দখল করল এবং রোম অধিকার করে সিসিলি দ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করল। কর্সিকা সার্দিনিয়া বেলেরিক দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর আফ্রিকার অধিকাংশ স্থান ভাণ্ডাল রাজ্যের অন্তর্গত ছিল।

আটিলা। হুন নেতা আটিলা রাইন নদীর তীর থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ডে একটি রাজ্য স্থাপন করেন। থিওডোসিয়াস্ অর্থের বিনিময়ে কনষ্টানটীনোপল রক্ষা করলেন। আটিলা গল আক্রমণ করলেন এবং ট্রয়িসের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে দক্ষিণে সৈন্য চালনা করলেন। একুইনিয়া পাদুয়া ও মিলান লুণ্ঠন করে তিনি পোপের অনুরোধে সন্ধি স্থাপন করেন।

হুন আক্রমণ ও ভাণ্ডাল রাজ্য স্থাপন একটী সনাতন সত্য প্রমাণিত করে। মিথ্যা আড়ম্বর প্রাণহীন রাজনীতি বর্বর প্রথা ও শৃঙ্খলা রক্ষার চাপে মানুষের চিন্তা ও সংস্কৃতি নিষ্পিষ্ট হচ্ছিল। তার রুদ্ধ আত্মা মুক্তির জন্য অস্থির হয়ে পড়েছিল। ভাণ্ডালদের সংখ্যা আশী হাজারের বেশী ছিল না। কিন্তু তারা এত বড় একটা সাম্রাজ্যের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন কতে সমর্থ হয়েছিল। ভাণ্ডাল আক্রমণকে উপলক্ষ করে রোমান সাম্রাজ্যের নিপীড়িত জনসঙ্ঘ বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। উত্তর আফ্রিকায় ভাণ্ডালদের আক্রমণ সেখানকার অত্যাচারিত কৃষকদের মুক্তির পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল।

জড়বাদ আদর্শহীনতা অতিমাত্র লোভ উৎপীড়ন আলস্য এই যুগের রোমান চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছিল। রোম দেহ ও মনে আত্মহত্যা করেছিল। তার পতন পরস্বাপহরণ পাপের ফল। এজন্য গল ভাণ্ডাল ও হুণদের আক্রমণে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়েছিল।

বাইজানটিয়ম। সম্রাট কনষ্টানটাইন বোসফোরসে স্থায়ী রাজধানী স্থাপন করতে মনস্থ করলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বাইজানটিয়ম্ নগর নির্বাচন করেন। এই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নগর রাজধানী হওয়ার উপযুক্ত স্থান ছিল। এখান থেকে নদীপথে রাশিয়ার মধ্যস্থলে গমনাগমনের সুবিধা ছিল। এখান থেকে বর্বর জাতিদের আক্রমণে বাধা দেওয়া সহজ ছিল। এই স্থান মেসোপোটেমিয়া মিশর গ্রীস প্রভৃতি সভ্য ও সমৃদ্ধিশালী দেশ সমূহের সমীপবর্তী ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশ সকলের সন্ধিস্থলে বর্তমান থেকে বাইজানটিয়ম রোমান সাম্রাজ্যের নৈতিক অধঃপতন, রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ও সামাজিক বিপ্লবের ভিতরেও সহস্র বৎসর তার ক্ষমতা রক্ষা করতে সাহায্য করেছিল।

একদিকে গল, অন্যদিকে ইউফ্রেতিসের তীরভূমি—এই দুই দূরবর্তী স্থানের সঙ্গমস্থল কনষ্টানটিনোপল। দুর্বল ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতা ইটালিতে কয়েক শতাব্দী জীবিত থাকার পর আলেকজান্দার প্রতিষ্ঠিত বলিষ্ঠ সাম্রাজ্যের চিতার উপর নিজ সমাধি রচনা করেছিল। বাইজানটিয়ম সাম্রাজ্য বাস্তবপক্ষে আলেকজান্দারের অস্তমিত সাম্রাজ্যের শেষ পরিণতি।

শাসন কার্যে লাটিন ভাষার ব্যবহার চলতে লাগল কিন্তু এর পশ্চাতে সৃজনী প্রতিভার বলিষ্ঠ প্রভাব ছিল না। প্রকৃত সাহিত্যের দরবারে এর স্থান উচ্চ ছিল না। গ্রীক ভাষা নূতন জীবন লাভ করেছিল। সরকারী দপ্তরখানায় স্থান পেলেই কোন সাহিত্য সমৃদ্ধ হয় না। সরকারী নথি ও খাতার পূতিগন্ধ সৎ সাহিত্যের শ্বাস রুদ্ধ করে দেয়। মানব জীবনের বৃহত্তর সত্তার মতো সৎসাহিত্যের এক উচ্চতর আদর্শ আছে এবং তার চিরন্তন সুরটি উহার মধ্যে বিচিত্র ছন্দে ও রূপে মূর্ত হয়ে উঠে। দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় রাষ্ট্রনীতি সমাজনীতি অর্থনীতি ইতিবৃত্ত ভ্রমণ-কাহিনী কাব্য উপন্যাস গল্প প্রভৃতির ভিতর দিয়ে সাহিত্য তার বাঞ্ছিত সার্থকতার দিকে অগ্রসর হয়। গ্রীক সাহিত্যের বিপুল ঐশ্বর্য, প্রবল শক্তি, অফুরন্ত প্রাণ ও দৃপ্ত বিশ্বাস বিশ্ব-সাহিত্যের আসরে তার কৌলিন্য নির্দেশ করে দিয়েছিল।

গল দেশে ফ্রেঞ্চ ভাষা বিশিষ্ট আকার ধারণ করল। এমন কি ইটালিতেও লোমবার্ড ও গথদের প্রভাবে বহু উপভাষা সৃষ্টি হল। স্পেন ও পর্তুগালে স্প্যানিস ও পর্তুগীজ ভাষা জন্মলাভ করল। সুইজারল্যাণ্ডের ভ্যালিস প্রদেশে ডিসিয়ায় রুমনিয়ায় লাটিন ভাষা জীবিত ছিল কিন্তু ব্রিটেন থেকে এই ভাষা অন্তর্হিত হয়ে গেল।

সার্বভৌমিক রাষ্ট্রের ধারণা। রোমান সাম্রাজ্যের যুগে জাতীয়তা ও স্বদেশিকতার জন্ম হয়নি। সে কালের লোক এই সাম্রাজ্যকে এক অখণ্ড শক্তিশালী রাষ্ট্র বলে ভাবত। এজন্য অন্য সকল রাজ্য রোমের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। এশিয়া মাইনরের গ্রীক রাজ্য পারগেমাস ও মিশরের শাসনকর্তারা স্বইচ্ছায় তাঁদের রাজ্য রোমানদের হস্তে অর্পণ করেছিলেন। কিন্তু ইউরোপের উত্তরাঞ্চলের বর্বর জাতিরা রোমের এই আধিপত্য স্বীকার করেনি। সার্বভৌমিক রাষ্ট্রের ধারণার বশবর্তী হয়ে সে যুগের লোক রোমের আধিপত্যকে নির্বিচারে গ্রহণ করেছিল।

সার্বভৌমিক রাষ্ট্রের ধারণা প্রাচীন কালে চীনে ও ভারতবর্ষে বর্তমান ছিল।

চীনের মতো ভারতবর্ষেও রাজচক্রবর্তী ছিল। পরবর্তী যুগে জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদের জন্মের পর পৃথিবীতে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। এখন বিত্ত সমাজের শাসক। অর্থ ও ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে মুষ্টিমেয় মানুষ অগণিত মানুষকে স্বার্থসিদ্ধির ক্রীড়নক করে তুলেছে। এজন্য আজ নূতন সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা চলেছে।

এগার

ঐতিহাসিক যুগের ধর্মপ্রচারকগণ

যীশুখ্রীষ্ট। পশ্চিম এশিয়া ধর্মান্দোলনের লীলাভূমি। পৃথিবীর প্রধান ধর্মগুলি এখানে আত্মপ্রকাশ করেছে। জুইস্ ধর্ম, পারসিক ধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলাম, এই চারিটি ধর্মের শিক্ষা যুগে যুগে মানুষের চিন্তা ও ভাব গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। এই স্থানে মোজেস্, জোরাষ্ট্রার এবং হজরত মহম্মদ আবির্ভূত হয়েছেন। জাতির পুঞ্জীভূত চিন্তা তার মানস সমুদ্রে যে ঢেউ তোলে তারই বাহ্য প্রকাশ হয় নূতন ধর্মের আকারে সেই জাতির শ্রেষ্ঠ মনীষীর জীবন ও ভাবের ভিতর দিয়ে। এক হিসাবে তিনি জাতির প্রতিনিধি।

উত্তর আরব, প্যালেষ্টাইন, মেসোপোটিমিয়া ও পারস্যের সমতল ভূমি প্রায় একই উপাদানে গঠিত। আরবের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে প্যালেষ্টাইন অবস্থিত। সিরিয়ায় মরুভূমির পাশে এই দেশে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড তাপ যেমন কষ্টকর, শীতের তীব্র বাতাসও তেমনি অসহ্য। শরতের শেষে যে বৃষ্টি হয় তারই প্রভাবে বালুময় দেশের বুকের মধ্যে প্রকাশ পায় নয়ন জুড়ানো শ্যামলিমা, অরণ্যের ভিতর ফুটে ওঠে ফুল ও নব কিশলয়।

এই দেশে প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতকে ফিলিষ্টাইন জাতি সমুদ্র উপকূলে বাস করত। তারাই এই দেশের নাম দিয়েছিল প্যালেষ্টাইন। খ্রীষ্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতকে ইহুদীরা এই দেশ জয় করে। তখন ক্যানানিটিস জাতিরা এখানে বাস করত। এদের বংশধর সকল অষ্টম শতকে সামারিটান নামে পরিচিত হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে ব্যাবিলন অবরোধের পর ইস্রাইল জাতি এখানে বিস্তৃত হয়। ইতিহাসে এরা ইহুদী নামে পরিচিত।

ইহুদীরা একেশ্বরবাদী। ছিল তাদের ভিতর দুইটি গোঁড়া সম্প্রদায়ের নাম ফারিসি ও সাডুসি। এরা ছিল পুরাতনের উপাসক, নূতনের ঘোর বিরোধী ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন।

টাইবোরিয়াস্ সিজারের রাজত্বকালে বেথলিহেম নামক স্থানে যীশুখ্রীষ্টের জন্ম হয়। সূত্রধরের অজ্ঞাত কুটীর তাঁর জন্মস্থান। তাঁর বংশমর্যাদা বা আভিজাত্যের গৌরব ছিল না, ঐশ্বর্যের দীপ্তি বা পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল না। যখন মানুষের মন মিথ্যা আড়ম্বর, প্রাণহীন রীতি-নীতি ও বর্বর প্রথার চাপে অবদমিত তখন মনুষ্যত্বের মুক্তরূপের প্রতীকস্বরূপ এই প্রাণবান মানুষটি জুডিয়ার তমসাচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মতো আবির্ভূত হয়েছিলেন। যীশুর জীবনী অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। গল্পে ও কিংবদন্তীর রহস্যজালের পশ্চাতে মহাপ্রাণতার একটি অনবদ্য চিত্র আমাদের নয়নগোচর হয়।

যীশুর শিক্ষার ভাববস্তুটি অতি সরল ও সহজ ছিল। এর ভিতর যে বিশ্বজনীন আবেদন নিহিত আছে তাই তাঁর ধর্মকে সর্বদেশে ও সর্বকালে আদরণীয় করেছে। প্রচার কার্যে বহির্গত হওয়ার পূর্বে তাঁর জীবনের ঘটনাবলী অজ্ঞাত। মধ্য এশিয়া, কাশ্মীর, লাডাক, তিব্বত প্রভৃতি দেশের লোকের বিশ্বাস যীশু ঐ সকল দেশে ভ্রমণ করেছিলেন। ঐ যুগে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে দেশ-বিদেশের বহু ছাত্র শিক্ষা লাভ করত। বহু দেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষার সহিত তাঁর শিক্ষার সাদৃশ্য দেখে মনে হয় তিনি বৌদ্ধ ধর্মের সহিত পরিচিত ছিলেন।

যীশু বলেছিলেন, জাতিধর্ম নির্বিশেষে মানুষ একই করুণাময় ঈশ্বরের সন্তান। উচ্চনীচ ধনীদরিদ্র সকলেই অসীম দয়ার আধার স্নেহময় পিতার পুত্র। শোকতাপ পীড়িত নরনারী স্বর্গরাজ্যে শান্তি লাভ করবে। এই স্বর্গ রাজ্য মুক্তির স্থান। মঙ্গলময় পিতার সকল সন্তানই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকারী। যীশু নিপীড়িত জনমণ্ডলীর হৃদয়ে এই যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিলেন, তাতে তাদের মনে কল্পলোকের ছবি ভেসে উঠেছিল।

জুডিয়ার জনমণ্ডলী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হল। তিরিশ বৎসর বয়সে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করতে আরম্ভ করেন এবং পরবর্তী তিন বৎসর এই কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি জেরুসেলেমে এলেন। ৩০ খ্রীষ্টাব্দে টাইবেরিয়াস্ রোমের সম্রাট এবং পন্টিয়াস পাইলেট জুডিয়ার রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। জেরুসেলেম প্রবেশের পূর্বে যীশু গ্যালিলি ও কেপারনামে তাঁর ধর্ম প্রচার

করছিলেন। ক্রমে তাঁর যশ রাজধানী পর্যন্ত বিস্তৃত হল। লোকে তাঁর শিক্ষার প্রকৃত মর্ম বুঝত না। তারা ভেবেছিল তিনি রাষ্ট্র ও সমাজকে উচ্ছেদ করতে চান।

স্বর্গরাজ্যের কল্পনা যীশুর ধর্ম শিক্ষায় প্রধান অঙ্গ, খ্রীষ্ট ধর্মের আধ্যাত্মিক সাধনার নিগূঢ় রহস্য। এই রহস্যমধুর আদর্শের প্রতিচ্ছবি মানুষের চিন্তারাজ্যে একটা বিপ্লব সৃষ্টি করেছিল। তিনি যে স্বর্গরাজ্যের পরিকল্পনা করেছিলেন তাতে তাত্ত্বিক জ্ঞানের চিরন্তনী আলোকধারা প্রবাহিত ছিল। ইহুদীদের ঈশ্বর ছিলেন লাভক্ষতিগনণাশীল বৈশ্যবৃত্তিসম্পন্ন দেবতা। তিনি ইহুদীদের কুলপতি এব্রাহামের সঙ্গে এই সর্তে আবদ্ধ হন যে তিনি জগতে তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিতে পরিণত করবেন। যীশু বললেন—ঈশ্বর বণিক নন। স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার সকলের আছে। সকল মানুষ সেই প্রেমময় পিতার সন্তান বলে ভ্রাতৃত্বের সুবর্ণসূত্রে গ্রথিত। অসীম তাঁর করুণা, অপার তাঁর দয়া। সে দয়ার বিরাম নাই। স্বর্গরাজ্যে আত্মপর ভেদ নাই—ইহা মহামিলনের শ্রীক্ষেত্র।

এইরূপ বিপ্লবমূলক শিক্ষা ইহুদীদের জাতিগত গর্ব, সঙ্কীর্ণ দেশাত্মবোধ ও পারিবারিক বন্ধনের মূলে কুঠারাঘাত করল। অন্ধ স্বজাতিপ্রেম ও স্বগোষ্ঠী-প্রীতির মূল উৎপাটিত হল। সমাজের অর্থ নৈতিক ভিত্তি শিথিল হওয়ার উপক্রম হল। "একজনের বিত্ত অন্য সকলের বিত্ত"—আধুনিক কালের এই সাম্যবাদ যীশুর শিক্ষায় প্রথম স্থান পেয়েছিল।

যীশু বলেছিলেন, ধর্মজীবনই একমাত্র জীবন। কায়মনোবাক্যে ঈশ্বরে আত্মসমর্পণই ধর্মজীবন। একব্যক্তি যীশুকে জিজ্ঞাসা করল—মঙ্গলময় প্রভু, অনন্তজীবন লাভের উপায় কি? যীশু বললেন—একমাত্র ভগবানই মঙ্গলময়। অন্য কেহ এই নামের উপযুক্ত নয়। তুমি ভগবৎ আদিষ্ট অনুশাসন কী জান? তাহা এই—পরদার করবে না। মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। প্রাণীহত্যা করবে না। প্রবঞ্চনা করবে না। চুরি করবে না। পিতামাতাকে সম্মান করবে।

সেই ব্যক্তি বলল—প্রভু, আমি এই সকল অনুশাসন পালন করতে এসেছি। যীশু বললেন—তোমার একটি বস্তুর অভাব আছে। যাও, তোমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় কর এবং ঐ অর্থ দরিদ্রদের বিতরণ কর। পরজগতে পুণ্য-কর্মের ফল সঞ্চয় কর। এস, ক্রস গ্রহণ কর। আমাকে অনুসরণ কর।

যীশুর কথা শুনে ঐ লোকটি চলে গেল। তার যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল। সে

তাহা ত্যাগ করতে সম্মত হল না। যীশু শিষ্যদের আহ্বান করে বললেন—ধনীদের স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা সুকঠিন। উট সূচীছিদ্রের ভিতর সহজে প্রবেশ করতে পারে কিন্তু ধনীব্যক্তি স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না।

এইরূপ শিক্ষায় একদিকে যেমন রাজনৈতিক বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লুক্কায়িত ছিল, অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিক বিপ্লবের সুস্পষ্ট আভাস ছিল। ফারিসিরা জিজ্ঞাসা করল, আপনি বলেন, সত্য আশ্রয় ভগবৎ প্রাপ্তির উপায়। বলুন, সিজারকে কর দেওয়া সঙ্গত কি না? সিজারের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা নিয়ে যীশু বললেন—সিজারের প্রাপ্য সিজারকে দাও ও ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও।

বিষয়বুদ্ধি আচার ও নিয়মানুবর্তিতা তাদের মনে জড়তা এনে দিয়েছিল। তারা যীশুকে অবিশ্বাসের চক্ষে দেখতে লাগল। রোমের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করে জেরুসেলেম স্বাধীন হবে, লোকের মনে এইরূপ একটা ধারণা বর্তমান ছিল। এমন কি তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যরাও বিরুদ্ধাচারী হয়ে উঠল। পুরোহিতদের স্বার্থে আঘাত পড়ল। তারাও তাঁর ধ্বংসসাধনে বদ্ধপরিকর হল।

বিরাট জনতা জয়ধ্বনির সহিত তাঁর অনুগমন করল। তিনি জেরুসেলেমে প্রবেশ করলেন। পুরোহিতদের মন্দির থেকে বহিষ্কৃত করা হল। একমাত্র ইহাই তাঁর বলপ্রয়োগের কার্য ছিল। গাথসিমেনির উদ্যানে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। পাইলেটের বিচারে তাঁর প্রাণদণ্ড হল। শিষ্যরা তাঁকে পরিত্যাগ করল। এমন কি পিটার বলেছিলেন—আমি ঐ লোকটিকে চিনি না। সমস্ত দিন যন্ত্রণাভোগের পর ক্রুশবিদ্ধ যীশু মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে বলেছিলেন—হে প্রভু, তুমি আমায় পরিত্যাগ করলে কেন? জীবনসমুদ্রের বেলাভূমিতে উপবিষ্ট এই মহামানবের রক্তাপ্লুত ওষ্ঠাধাবে যে নৈরাশ্যের বাণী স্ফুরিত হয়েছিল তার মূর্চ্ছনা যুগযুগান্তের তিমিররাশি ভেদ করে আজও বিশ্ববাসীর কর্ণে ধ্বনিত হচ্ছে, এখনও তাঁর সেই বেদনাময় বাণী তার অন্তরে করুণ ক্রন্দনের প্রস্রবণ বইয়ে দিচ্ছে।

রোমান সৈন্য যীশুর মাথায় কাঁটার মুকুট পরিয়ে ও তাঁর দেহ লালরঙের পোষাকে আবৃত করে তাঁকে সিজার বলে বিদ্রূপ করেছিল।

আত্মনিবেদন নৈবেদ্য লক্ষণ ও রাধাভাব খ্রীষ্ট প্রবর্তিত ধর্মের প্রাণ। যীশুর মতে পরাভক্তি বৈরাগ্য আত্মোৎসর্গ সালোক্য মুক্তির একমাত্র উপায়। যখন জুডিয়ার প্রাচীন প্রতিষ্ঠান সকল প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল, আবহমান কাল প্রচলিত রীতি-নীতি ও পুরাতন জীর্ণ প্রথা বিধি-নিষেধ জীবনের মহত্বর

আদর্শের স্থান জোড়া করে বসেছিল, সেই সময়ে ইয়ুদী সমাজে যীশুর আবির্ভাব ঘটে। প্রকৃত ধর্ম ও সত্যজ্ঞান কুসংস্কারের চাপে পিষ্ট হচ্ছিল। তিনি সত্য ও সুন্দরকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ আবির্ভূত হয়ে বজ্রনির্ঘোষে এই বাণী প্রচার করেন। কিন্তু বাস্তবতার উপাসক সাধারণ মানুষ তাঁদের এই বাণী শুনেও শোনে না, শুনলেও তার কদর্থ করে তাঁদের নির্যাতন করে। প্রকৃত মানুষ গতানুগতিকের পথে চলে। যে ব্যক্তি তার চিন্তাশূন্য শান্তির ব্যাঘাত জন্মায়, তার অলস চৈতন্যকে জাগ্রত করতে চেষ্টিত হয়, তার মানসিক জড়তার হিমগিরিকে উদগ্র সত্যের অগ্নিস্পর্শে গলিয়ে দিতে চেষ্টা করে, তাকে সে শত্রু ভাবে, সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে সংক্ষিপ্ততম পথে বিঘ্নজয়ের আয়োজন করতে পশ্চাৎপদ হয় না।

খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্যন্ত যে সকল ধর্ম আবির্ভূত ও প্রচারিত হয়েছে তাদের ভিতর পুরোহিতদের প্রাধান্য ছিল, মন্দির ও পূজাবেদীর আত্যন্তিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু গৌতম বুদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট মহম্মদ ও শঙ্করাচার্য যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন তাতে তত্ত্ব উপলব্ধি ও অনুভূতির স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল। তাঁদের শিক্ষার প্রভাবে মানবচৈতন্য জাগ্রত হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মের ভাববস্তুটি সরল সহজ ও সার্বজনীন কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে মানুষ ধর্মমত নিয়ে যুগে যুগে তর্কবিতর্ক করেছে, সম্প্রদায় গড়েছে, পরস্পরের মস্তক চূর্ণবিচূর্ণ করেছে। প্রধান ধর্মোপদেষ্টার অন্ধভক্তরা ধর্মমতের অপব্যাখ্যা করে তাকে বিকৃত করে তুলেছে। রাজনীতিজ্ঞ ও সাম্রাজ্যবাদী ধর্মকে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করেছে। শোষণ ও শাসন কার্যের সুবিধার জন্য রোমের শাসকরা কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতেন। মেকিয়াভেলি বলেছেন, ধর্ম শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ। ধর্মকে মিথ্যা জেনেও রাজা তার পৃষ্ঠপোষক হবেন। ধর্মের নেশায় মশগুল হয়ে সাধারণ মানুষ কাণ্ডজ্ঞানবর্জিত হয়, বীর্যবন্ত জীবনের আস্বাদন লাভ করতে পারে না। সম্ভবতঃ এইজন্যই কার্ল-মার্কস বলেছেন, ধর্ম মানুষের পক্ষে আফিম।

মণি। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকে আর একজন ধর্মপ্রচারকের আবির্ভাব ঘটে। এঁর নাম মণি। ২১৬ খ্রীষ্টাব্দে মিডিয়ার রাজধানী একবাটানার এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম হয়। টিসিফোন নগরে তাঁর শিক্ষা হয়েছিল। ধর্মালোচনার আবহাওয়ার ভিতর তাঁর শৈশবকাল অতিবাহিত হয়। টিসিফোনে তাঁর

হৃদয়ে সত্যের আলোক উদয় হয়েছিল। ২৪২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রথম সাপরের সিংহাসন আরোহণের সময় তিনি ধর্মপ্রচার করতে আরম্ভ করেন। তিনি বলেছিলেন, আমি কোন নূতন সত্য প্রচার করতে আসিনি। মোজেস জোরাষ্ট্রার বুদ্ধ যীশুখ্রীষ্ট প্রভৃতি আমার পূর্বগামীগণ সত্য দর্শন করেছিলেন। তাঁদের শিক্ষা পূর্ণ করার জন্য আমি এসেছি। ঈশ্বর ও সয়তান, অরমুজ ও অহ্রীমন—আলোক ও অন্ধকারের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব অবিরাম চলেছে তারই ভিতরে মানব জীবনের জটিল ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন সমস্যা নিহিত। এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধানের জন্য তাঁর আবির্ভাবের প্রয়োজন।

এই নূতন ধর্ম প্রচার করার উদ্দেশ্যে মণি ইরাণের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভ্রমণ করেন। তুর্কীস্থান, ভারতবর্ষ ও চীন তাঁর ভ্রমণ পরিক্রমার অন্তর্গত ছিল। প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে তাঁর মত দ্রুত বিস্তৃত হয়েছিল। খ্রীষ্টধর্মের উপরও তার আলোক পড়েছিল। মণি টিসিফোনে প্রত্যাবর্তন করলে বহু লোক তাঁর ধর্ম গ্রহণ করে। প্রচলিত ধর্ম ও পুরোহিতদের সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হল। ২৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা তাঁর প্রাণবধের আদেশ দিলেন। তিনি ক্রসবিদ্ধ হলেন। তাঁর দেহের চামড়া তুলে নেওয়া হল। তাঁর শিষ্যদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চলতে লাগল। ইহা সত্বেও তাঁর ধর্মমত কয়েক শতাব্দী পারস্যে আত্মগোপন করে জীবিত ছিল।

হজরত মহম্মদ। স্মরণাতীত কালের তিমিরময় যুগ থেকে আরব যাযাবর জাতির লীলা নিকেতন। চতুর্দিকে দিগন্তপ্রসারী মরুভূমি। সেখানকার প্রকৃতির মূর্তি রুক্ষ কঠোর জ্বালাময় ভীষণদর্শন। চতুর্দিকে অনলসমুদ্র, মাঝে মাঝে শ্যামল তৃণক্ষেত্র। কোথাও বা স্বচ্ছতোয়া নির্ঝরিণী যেন উষরভূমির কঠোরতাকে উপহাস করছে। এখানকার অধিবাসী বেদুইন নামে পরিচিত। এদের স্থায়ী গৃহ ছিল না। এরা উট ঘোড়া মেষ নিয়ে ঘুরে বেড়াত। জীবনের উষাকাল থেকে সায়াহ্ন পর্যন্ত এরা প্রকৃতির কোলে লালিত পালিত হত। স্বাধীনতা এদের প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর ছিল। এদের সমাজ বা রাষ্ট্রশাসনের বালাই ছিল না। এদের জীবিকা অর্জনের উপায় চৌর্যবৃত্তি কিন্তু এরা অতিথিসৎকারে অদ্বিতীয় ছিল।

মরুপ্রাচীর বেষ্টিত মক্কা তাদের প্রাচীন নগর ছিল। সেখানকার কাবা-মন্দিরে ৩৬০টি দেবমূর্তি ছিল। প্রতিদিন তারা এক একটি বিগ্রহের পূজা করত। বহু ইহুদী আরবে বাস করত। তারাও মূর্তি পূজা করতে আরম্ভ করেছিল।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত আরবের জীবন প্রবাহ সঙ্কীর্ণ খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। বণিকদের পণ্যবাহী উট চলাচলের পথের ধারে দুই একটি সহর বা বস্তির পত্তন হয়েছিল। এই সকল সহরের মধ্যে মক্কা ও মদিনা প্রধান। মদিনার সরস মাটিতে অসংখ্য খেজুর গাছ জন্মাত। মক্কা তীর্থস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিল।

মক্কার কাবামন্দির মুসলিম ধর্ম জগতের শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত। কাবা মন্দিরের নিম্নে জমজম নামে কূপ আছে। মুসলমান তীর্থযাত্রীরা এই কূপের পবিত্র জল দেশ বিদেশে নিয়ে যায়। মক্কা প্রাচীন ধর্মমতের সুরক্ষিত দুর্ভেদ্য দুর্গ ছিল। মদিনার অধিবাসীদের মনোভাব জুইস ধর্মের রসধারায় পুষ্ট ও উদারতর ছিল। এই দুইটি প্রধান নগরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও কলহ চলে এসেছিল।

৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মক্কার এক দরিদ্র পরিবারে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদের জন্ম হয়। শৈশবে তাঁর শিক্ষার সুযোগ হয়নি কিন্তু তাঁর স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রবল ছিল। প্রান্তরে মেষপালনে নিযুক্ত থেকেও মাঝে মাঝে তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকতেন। অনেক সময় তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পেত। বাল্যকাল থেকে তিনি নির্জনতা ভালোবাসতেন। বিজন গিরিকন্দর উন্মুক্ত প্রান্তর সুবিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমি এই তরুলতাহীন সীমাহীন স্থান তাঁর হৃদয়ে এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার করত। প্রকৃতির বিরাট বিদ্যালয় তাঁর মতো যুগান্তরকারী ধর্মোপদেষ্টার উপযুক্ত শিক্ষায়তন। অনন্তের ভাব তাঁর হৃদয় অধিকার করল। তিনি গম্ভীর ও ধ্যান পরায়ণ হয়ে উঠলেন। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি কাহারও সঙ্গে কথা বলতেন না। তিনি নম্র ও সত্যনিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তিনি মক্কাবাসীর শ্রদ্ধা ও অনুরাগ আকৃষ্ট করলেন।

পঁচিশ বৎসর বয়সে তিনি মক্কায় খদিজা নাম্নী এক ধনবতী বিধবা রমণীর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের ভার প্রাপ্ত হন। খদিজার বয়স তখন চল্লিশ বৎসরের বেশী। মহম্মদ খদিজার হৃদয় আকৃষ্ট করলেন। দুই জনের মধ্যে বিবাহ হয়ে গেল। খদিজার সাহায্যে মহম্মদের সংসার চিন্তা দূর হল। তিনি সৎকার্য করার অবসর পেলেন এবং আরও নির্জনতাপ্রিয় হয়ে উঠলেন। দেশবাসীর মূর্খতা ও কুসংস্কার তাঁর হৃদয় ব্যথিত করতে লাগল। তারা মূর্তি পাথর গাছ বালিস্তূপ প্রভৃতি পূজা করত, জীবিত কন্যার কবর দিত, সৎমাকে বিবাহ করত, তাদের যৌনসম্পর্ক শিথিল ছিল। নারীজাতির দুর্গতির সীমা ছিল না।

তিনি দেখলেন সামাজিক বিপ্লব ছাড়া আবব জাতির উদ্ধারের আশা নাই। তিনি সেই চিন্তায় দিনরাত মগ্ন থাকতেন। তাঁর আহারে রুচি ছিল না, নিদ্রার সময় ছিল না। অনাহারে ও অনিদ্রায় তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন। তথাপি সত্যালোক প্রজ্জ্বলিত হল না। তিনি পাগলের মতো অস্থির হয়ে উঠলেন। প্রাণের জ্বালায় ছটফট করতে লাগলেন। ঈশ্বরের করুণা হল। তাঁর অন্তর্জগৎ আলোকিত হল। অজ্ঞানতার সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হয়ে গেল।

হজরত নূতন ধর্ম প্রচার করতে আরম্ভ কবলেন। খদিজা তাঁর সর্বপ্রথম শিষ্যা হলেন। তাবপর আলি জৈয়দ নামে একজন দাস এবং আবু-বক্কর তাঁর ধর্ম গ্রহণ কবলেন। প্রথম কয়েক বৎসর তাঁব নূতন ধর্ম মক্কায় কয়েকটি গৃহস্থ পরিবারে সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে তিনি প্রকাশ্যে ধর্মপ্রচার করতে লাগলেন। পৌত্তলিকরা ক্রোধে অন্ধ হল, পুরোহিতরা তাঁকে অপমান করতে লাগল। বিদ্রূপ উপহাস নিন্দা বর্ষিত হল। শত্রুরা তাঁর প্রাণবধের জন্য ষড়যন্ত্র করতে লাগল। তাঁর শিষ্যদেব উপর ভীষণ অত্যাচার চলতে লাগল। গত্যন্তর না দেখে তিনি মদিনায় পলায়ন করলেন (৬২২খ্রীঃ)। তখন মদিনার নাম ছিল যাথেব। হজরতের আগমনের পব এর নাম হল মেদিনাৎ-এল-নবি অর্থাৎ ভবিষ্যদ্বক্তার নগর। মক্কা থেকে মদিনায় তাঁর পলায়ন হিজিরা নামে বিখ্যাত। পলায়নেব সতের বৎসর পরে খলিফা ওমব হিজিরা নামে বিখ্যাত সন প্রবর্তিত করেছিলেন।

মদিনায় এসে তিনি আউস ও খাযরাজ নামক দুই জাতির বহু কালের কলহ ও হিংসা দূর করে তাদের নবধর্মে দীক্ষিত করেন। প্রকাশ্যে উপাসনার জন্য একটি ভজনালয় নির্মাণ করলেন। মদিনায় তাঁর আধিপত্য বৃদ্ধি পেল। কিন্তু মদিনার ইয়ুদীরা শত্রুতা করতে লাগল। তাঁর বিরুদ্ধে যড়যন্ত্র চলতে লাগল। কোরেশরা তাঁকে আক্রমণ করার জন্য মক্কা থেকে যাত্রা করল। বদরের যুদ্ধে মহম্মদ জয়ী হলেন। কোরেশরা পুনরায় যুদ্ধযাত্রা করল। পুনরায় তারা পরাজিত হল। তিনি বেদুইনদের দমন করলেন, লোহিত সাগরের তীরে হারেথ নামে এক রাজাকে পরাস্ত করলেন। আবু সোফিয়ান দশ হাজার সৈন্যের সহিত মদিনা আক্রমণ করল। হজরত তাদের পরাজিত করলেন। কোরেশরা পলায়ন করল। ছয়শত মুসলমানের সহিত তিনি মক্কা প্রবেশ করতে মনস্থ করলেন। কোরেশদের সঙ্গে দশ বৎসরের জন্য শান্তি স্থাপিত হল। মুসলমানরা মদিনায় ফিরে গেল।

ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি চারিদিকে দূত প্রেরণ করলেন। পারস্যরাজ তাঁর বার্তা গ্রহণ করলেন না। কনস্টানটিনোপল, মিশর ও বস্রায় দূত প্রেরিত হল। তিনি ইয়ুদী ও বেদুইনদের যুদ্ধে পরাস্ত করে তাদের দুর্গ অধিকার করলেন। সিরিয়ার অন্তর্গত মুতা নগরের যুদ্ধে রোমান সৈন্য পরাজিত হয়ে পলায়ন করল। দশ হাজার সৈন্যের সহিত তিনি মক্কার দিকে অগ্রসর হলেন। কোরেশগণ তাঁর আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে রণে ভঙ্গ দিল।

বিজয়ী বীর হজরত ফকিরের বেশ ধারণ করে কাবা মন্দিরে প্রবেশ করলেন এবং দেবদেবীর মূর্তিগুলি চূর্ণ করে পৌত্তলিকতার শেষ চিহ্ন দূর করে দিলেন। উপাসনার জন্য সমবেত জনতার নিকট তিনি মহাসত্য প্রচার করলেন—ঈশ্বর মহান্। এক ঈশ্বর ছাড়া আর দ্বিতীয় ঈশ্বর নাই। মহম্মদ সত্য ধর্মের প্রচারক। নূতন মঙ্গল ধ্বনি আরবের দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করল। দলে দলে লোক নবধর্ম গ্রহণ করল। তাঁর সুমহান ব্রতের উদ্যাপন হল। তিনি আরবের সর্বময় অধীশ্বর হলেন। ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কর্মজীবনের অবসান হল।

মহম্মদের প্রতিভা। মহম্মদ প্রবর্তিত ধর্ম এক্ষণে পৃথিবীর এক বৃহত্তম অংশে মানুষের ধর্ম ও কর্মজীবন নিয়ন্ত্রণ করছে। পৃথিবীর অন্য কোন ধর্ম প্রবর্তক স্বয়ং অসিহস্তে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হননি। আরবের সমসাময়িক অবস্থা এবং বর্বর মরুচর জাতির কদর্য মনোবৃত্তি তাঁকে তরবারির সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। যীশুখ্রীষ্ট অথবা গৌতম বুদ্ধের মাধুর্যপূর্ণ অনবদ্য চিত্রের সঙ্গে এই যোদ্ধভাবাপন্ন ধর্মপ্রবর্তকের তুলনা করলে হয়তো তাঁর স্থান নিচে কিন্তু কতগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন সরল প্রাকৃত মানুষকে সমতাসূত্রে গ্রথিত করে একটি বলিষ্ঠ জাতিতে সংহত করতে হলে এই উপায় অবলম্বন করা ছাড়া তখন গত্যন্তর ছিল না। রাজনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি ও সামাজিক পরিস্থিতির বাস্তব জ্ঞান হজরত মহম্মদের সৃজনী প্রতিভার বৈশিষ্ট্য। আরব চরিত্রে সামাজিক ন্যায় অন্যায় বোধ ও রাষ্ট্রনৈতিক চেতনার অভাব এবং নৈতিক শিথিলতা লক্ষ্য করে তিনি অভিজ্ঞ ও কুশলী চিকিৎসকের মতো অস্ত্রোপচার করেছিলেন এবং তাঁর এই সময়োচিত ব্যবস্থা গুণে বর্বর আরবগণ একটি বিশ্বজিৎ বীরজাতিতে পরিণত হয়েছিল। প্রাত্যহিক জীবনে পারস্পরিক সহানুভূতি নিরঙ্কুশ একেশ্বরবাদ ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে দালাল সৃষ্টি বর্জন উপাসনা ও আরাধনার সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা এবং এক দয়ালু পিতার সন্তান হিসাবে মানুষের ভিতর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ

ইসলামকে জগতের পতিত ও অত্যাচারিত মানুষের কাছে আদরণীয় করে তুলেছে। সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের গবেষণা, নীতির চুল-চেরা বিচার আধ্যাত্মিক আদর্শবাদের ধোঁয়াটে আলোচনা করে হজরত সহজ প্রাকৃত মানুষের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেননি। খ্রীষ্টধর্মের ত্রিমূর্তির গূঢ় তত্ত্ব বিশ্লেষণ, জোরাষ্ট্রার ধর্মের আলো-আঁধারি বিচার নেতিবাচক অদ্বয় ব্রহ্মের অনুভব সিদ্ধ সত্তা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে ইসলাম মস্তক আলোড়ন করেননি। এই সকল দুরূহ তত্ত্বের বিচার ও আলোচনা সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য।

সহজ মানুষের সহজ সরল ভাষায় হজরত বলেছেন তোমাদের জীবন ও সম্পত্তি পবিত্র। এদের উপর হস্তক্ষেপ করে এদের পবিত্রতা নষ্ট করো না। যে ব্যক্তি বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন করে তার উপর লোষ্ট্রনিক্ষেপ করা হবে। স্বামী স্ত্রীর পারস্পরিক দাবী-দাওয়া আছে। তাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস রাখা চাই। নইলে তাদের আলাদা ঘরে আবদ্ধ রাখা হবে এবং বেত্রাঘাত করা হবে। স্ত্রীলোকদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে এবং ঈশ্বরের আদেশে তোমরা তাদের গ্রহণ করেছ। তোমরা নিজেরা যেমন খাও এবং পর, তোমাদের দাসদের তেমনি খাদ্য ও বস্ত্র দিবে। ক্ষমার অযোগ্য দোষ করলে তাদের নির্যাতন করবে না। বরং তাদের বিক্রয় করে দিও, কারণ তারা ঈশ্বরের দাস। একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানের ভাই। তোমরা সকলেই সমান।

ইসলামের বৈশিষ্ট্য। হজরত নিজেকে কলুষ কালিমা শূন্য বা অবতার বলে প্রচার করে সাধারণ মানুষের মনে অতিমানবতার কুহেলিকা সৃষ্টি করেননি। তিনি কেবলমাত্র আল্লাহর বার্তাবহ। তিনি আর দশজনের মতো সাধারণ মানুষ। সাধারণ মানুষের দোষগুণ তার চরিত্রে থাকা স্বাভাবিক। সুতরাং ঋষিত্বের কষ্টিপাথরে ঘসেমেজে বিচার করলে, শ্রেষ্ঠতম আদর্শের তুলাদণ্ডে ওজন করে দেখলে ভারসাম্য ব্যাহত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য ধর্ম প্রতিষ্ঠাতাদের সঙ্গে তাঁর প্রভেদ এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বও এই স্থানে। ইসলাম প্রাকৃত ধর্ম। এর প্রভাব মুসলিম সমাজের রীতি-নীতিতে রাষ্ট্রে আইন ব্যবস্থায় উপাসনায় আচার-ব্যবহারে অশন ভূষণে সাহিত্য শিল্প ও বিজ্ঞান সাধনায়, এক কথায় তার সভ্যতায় ও সংস্কৃতিতে পরিস্ফুট হয়েছে। বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলামের বিপুল দান অনস্বীকার্য।

বারো

ইস্‌লামের পরবর্তী যুগ

প্রথম খলিফা। নবধর্ম ইসলামের প্রতীক আবু বক্কর নামক একজন জ্ঞানী। ইনি মহম্মদের অভিন্ন হৃদয় বিশ্বস্ত বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহম্মদের মৃত্যুর পর তিনি খলিফা বা ইসলাম জগতের নেতৃত্বপদ গ্রহণ করেন। তিনি মক্কা ও মদিনার মধ্যে কলহ ও বিদ্বেষ দূর করেছিলেন, বেদুইনদের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন এবং সিরিয়ায় সৈন্যচালনা করেছিলেন। মাত্র তিন চারি সহস্র আরবসৈন্য নিয়ে তিনি সমগ্র জগৎকে আল্লাহর নিকট মস্তক অবনত করানোর উচ্চাভিলাষ হৃদয়ে পোষণ করতেন। তাঁর উদ্দেশ্য প্রায় সফল হয়েছিল।

জ্বলন্ত বিশ্বাস ও দৃঢ় সংকল্প আরববাসীর হৃদয়ে এক অপূর্ব উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, তার জীবনের বহুমুখী প্রতিভা একমুখী হয়ে প্রবাহিত হল। পশ্চিমে আরব এবং পূর্বে মহাচীন, এই দুই জনসঙ্ঘের মধ্যবর্তী স্থানে অন্য কোন জাতি কল্পনায় ও আবেগে এই যুগের আরবের সমকক্ষ ছিল না। বাইজানটাইন সম্রাট হীরাক্লাইয়স পারস্য সম্রাট ২য় কসরোসকে পরাজিত করেন। তাঁর জীবন-সূর্য এক্ষণে অস্তমিতপ্রায়। পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ফলে তাঁর সাম্রাজ্য হতবল হয়েছিল। তাঁর প্রজাদের মধ্যে নানা জাতির লোক ছিল। এদিকে পারস্যও হীন ও দুর্বল হয়েছিল। পিতৃহন্তা কাভাদ কয়েক মাস রাজত্ব করে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন রাজ্যে ষড়যন্ত্র, রাজপ্রাসাদে অবাধ হত্যা, দেশের অবস্থা শোচনীয়। পারসিক এবং বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের মধ্যে নামমাত্র শান্তি ছিল। সিরিয়ার খ্রীষ্টান আরবগণ কনস্টানটিনোপলের কাছে নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করল। মেসোপোটেমিয়া এবং মরুভূমির মধ্যে পারস্যের সীমানায় আরবের একটি করদ রাজ্য ছিল। দামস্কাস্‌ প্রভৃতি নগরে আরবের প্রাধান্য বিস্তৃত হয়েছিল। এইরূপ নানা ঘটনার সমাবেশে ইস্‌লাম শক্তিসঞ্চয় করার সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিল।

আরবদের সামরিক অভিযান। আরবের সামরিক অভিযান বিশ্বের ইতিহাসকে উজ্জ্বল করেছে। জ্যোতিষ্ক সদৃশ আরবগণ, মধ্যস্থলে সূর্যোপম জ্যোতির্ময় খালিদ। মুসলিম বাহুবল সর্বত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করল। দ্বিতীয় খলিফা

ওমরের বিদ্বেষবহ্নি খালিদকে স্থানচ্যুত করল। এই মহাপুরুষ বীর হাসিমুখে অপমান সহ্য করে স্বধর্মের জন্য কর্তব্য করতে বিমুখ হননি।

মুসলিম বাহিনী হীরা নগর অধিকার করল। মেসোপোটেমিয়া কর দিয়ে বশ্যতা স্বীকার করল। খ্রীষ্টানগণ আরব ও ইহুদীরাও তাদের পক্ষ অবলম্বন করল। আরব অভিযান ও জয় একাধারে সামাজিক ও ধর্ম বিপ্লব। জোর্ডান নদীর শাখা ইয়ারমুকের তীরে খালিদ হীরাক্লাইয়সকে পরাজিত করলেন (৬৩৬)। সিরিয়া, দামস্কস এবং আন্টিওক আরবদের হস্তগত হল। কাদেমিশিয়ার যুদ্ধে পারসিকগণ পরাজিত হল (৬৩৭)। খলিফা ১ম ওমরের সময় (৬৩৪-৬৪৪) মুসলিম বাহুবলের উজ্জ্বল যুগ সিরিয়া থেকে বাইজানটিয়মের শক্তি অন্তর্হিত, আর্মেনিয়া বিজিত। জেরুসেলেম কর দিতে স্বীকৃত। কয়েক বৎসরের ভিতর পশ্চিম এসিয়ায় সেমিটিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত হল।

পূর্বদিকে সিন্ধুনদ, পশ্চিমে স্পেন ও আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে খাস্‌গড় এবং দক্ষিণে মিশর, এই বিরাট ভূমিখণ্ডে একশত পঁচিশ বৎসরের ভিতর আরবদের বাহুবলে ইস্‌লাম বিস্তৃত হয়েছিল। সভ্য জগতের উপর আরব আক্রমণকে সভ্যতার উপর বর্বরতার আক্রমণ বলা চলে না। ভাণ্ডাল অথব গথদের আক্রমণের সহিত এর তুলনা হয় না। মরুময় জাতির স্বাধীন চিন্তা ও নির্ভীকতা এর ধমনীতে সঞ্চারিত হয়েছিল। তার নিষ্কোষিত তরবারি বহু স্বাধীন রাজ্যের সর্বনাশ করেছিল কিন্তু সেই ধ্বংসস্তূপের নিচে নূতন সৃষ্টির প্রাণ-শক্তি লুকায়িত ছিল। যখন দাস ব্যবসায়ী রোমের রাষ্ট্রনীতি ও অর্থনীতি ইয়োরোপের সমাজ ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করছিল ঠিক্ সেই সময় নবধর্মের সন্তমুক্ত সুধাধারায় দুর্বল ও শোষিত জাতিদের শুষ্ক হৃদয়ক্ষেত্র মঞ্জরিত ও পুষ্পিত হল। ইস্‌লামের মহত্ত্ব ও উদারতা অখণ্ডতার আদর্শ একমুখীন শক্তি তার স্বার্থত্যাগ স্বজাতিপ্রীতি স্বধর্মানুরক্তি ও সহযোগীতা পতিত জাতিসমূহের কাছে মুক্তির বার্তা বহন করে এনেছিল। এজন্য তারা এর মহত্তর আত্মশক্তির নিকট স্বইচ্ছায় মস্তক অবনত করেছিল।

খলিফা সোয়াইয়া এবং সুলেমান, কনস্টান্‌টিনোপল আক্রমণ করেন। এই আক্রমণ সত্ত্বেও বাইজানটিয়ম্ সাম্রাজ্য ইয়োরোপের ভগ্ন দুর্গ প্রাচীরের ন্যায় আরও তিন চারি বৎসর দণ্ডায়মান ছিল। রোমের শোষণ মিশরকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছিল। খ্রীষ্টানদের সাম্প্রদায়িক কলহে সে দুর্বল হয়েছিল। মিশর সহজেই আরবদের করায়ত্ত হল। আরবরা আলেকজান্দ্রিয়ার

সুবিখ্যাত গ্রন্থাগার ভস্মীভূত করেনি। কনষ্টানটিনোপলের সম্রাট থিওডোসিয়াস্ এই বর্বর আচরণের জন্য দায়ী। থিওডোসিয়াস্ গোঁড়া খ্রীষ্টান ছিলেন। এজন্য তিনি প্রাক্-খ্রীষ্টান যুগের বিধর্মী গ্রীক লেখকদের দর্শন গ্রন্থ এবং গ্রীক দেব-দেবীদের আখ্যায়িকা ও পৌরাণিক কাহিনী ধ্বংস করে খ্রীষ্টান ধর্মের মহিমা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। দগ্ধ পুস্তকের আগুনে তিনি তাঁর স্নানের জল গরম করতেন।

আরব সেনাপতি ওক্বা উত্তর আফ্রিকা জয় করে পশ্চিমে মরক্কো পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে দেখলেন আটলান্টিক মহাসাগরের তরঙ্গভঙ্গ তাঁর পথ রুদ্ধ করে গর্জন করছে। আল্লাহ্‌র নামে জয় করার জন্য এই দিকে আর দেশ ছিল না দেখে তিনি তাঁর কাছে দুঃখ প্রকাশ করে প্রার্থনা করেছিলেন। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে আরব সৈন্য জিব্রল্টার প্রণালী পার হয়ে স্পেনে উপস্থিত হয়। গ্রীকরা এই প্রণালীর নাম দিয়েছিল হারকিউলিসের স্তম্ভ। আরব সেনাপতি টারিক এই প্রণালী পার হয়ে তাঁর সৈন্য চালনা করেছিলেন বলে এর নাম জবল্-উৎ-তারিক্ অর্থাৎ তারিকের পাহাড় বা জিব্রল্টার।

টুর্সের যুদ্ধ। এইভাবে আফ্রিকা এবং স্পেনের বক্রপথে ইস্লাম ইয়োরোপে আবির্ভূত হয়েছিল। স্পেন জয় করে আরবগণ দক্ষিণ ফ্রান্সে উপস্থিত হল কিন্তু উত্তরে আর বেশী দূর অগ্রসর হতে সমর্থ হননি। পশ্চিম ইয়োরোপের অধিবাসীগণ সঙ্ঘবদ্ধ হল এবং চার্লস মার্টেলের নেতৃত্বে ফ্রান্সের টুর্স নামক স্থানে তাদের পরাজিত করল। টুর্সের রণক্ষেত্রে ইয়োরোপের ভাগ্য পরি-বর্তনের সন্ধিস্থল। এখানে আরবদের পরাজয় না হলে ইয়োরোপের ইতিহাস অন্য আকার ধারণ করত।

আরবগণ স্পেনে বহু শত বৎসর রাজত্ব করেছিল। পূর্ব যুগের মরুচর যাযাবর জাতি এক্ষণে বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী। তাদের সারাসেন অর্থাৎ মরুদেশের অধিবাসী বলা হত। ক্রমে তারা নাগরিক জীবনের বিলাসিতা ঐশ্বর্য ভোগ করতে লাগল, মরুভূমির সামান্য কুটীরের পরিবর্তে প্রাসাদ নির্মাণ করে তাতে বাস করতে অভ্যস্ত হল।

প্রথম থেকে মক্কায় বেদুইন অভিজাত সম্প্রদায় নবগঠিত ইসলাম সাম্রাজ্যে আধিপত্য করছিল। আবু বেকর ১ম ওমর এবং ওথ্মান মক্কায় অভিজাত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। আবু বেকর ও ওমরের জীবন ও চরিত্র সরল ও ধর্মভাবাপন্ন কিন্তু ওথ্মানের মনোবৃত্তি ভিন্ন ধরণের ছিল। ওথ্মান স্বার্থপর

ও মতলবী ছিলেন। তিনি বলতেন, অভিযান ও দেশ জয় আল্লাহর জন্য নয়, মক্কার নাগরিকদের বিশেষতঃ নিজের জন্য। পূর্বগামীদের মতো তিনি নির্বিকার ও উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে হজরতের ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেননি। এ পর্যন্ত খলিফা পদ ধর্মভাবের প্রতীক ছিল। এক্ষণে সেই আদর্শ গৌরব ক্ষুণ্ণ হল। আড়ম্বরের সহিত তিনি খলিফার সিংহাসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।

হজরতের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রথমে তাঁর পোষ্যপুত্র হন এবং পরে তাঁর কন্যা ফাতিমাকে বিবাহ করেন। সুতরাং তিনি ভেবেছিলেন যে আইন অনুসারে তিনিই খলিফা পদের অধিকারী। ওমিয়াদ বংশ থেকে খলিফা হওয়ার জন্য মদিনা ও মক্কায় অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হয়। কিন্তু হজরতের প্রিয়তমা পত্নী আয়েসা ফতিমাকে ঈর্ষা করতেন এবং আলির শত্রুতা করতেন। তিনি ওথ্মানের পক্ষ অবলম্বন করেন। গৃহবিবাদের সূত্রপাত হল। আশী বৎসরের বৃদ্ধ ওথ্মান মদিনার রাজপথে নিহত হন। আলি খলিফা হলেন। তাঁরও সেই দশা হল। এই কলহের ফলে ইসলাম জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত হল। যারা খলিফাকে খলিফা বলে গ্রহণ করাকেই তাদের ধর্মবিশ্বাসের প্রধান অঙ্গ বলে মনে করল তারা সিয়া নামে পরিচিত হল। আর যারা একে অস্বীকার করল, তারা সুন্নি নামে আখ্যাত হল। আলি হাসান এবং হোসেনের শোচনীয় মৃত্যু কাহিনী গৃহ বিচ্ছেদের ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ করে।

প্রথম যুগের খলিফাদের রাজত্বকালে মুসলিম যোদ্ধাগণ অসীম বীরত্ব দৃঢ় সঙ্কল্প এবং স্বার্থত্যাগের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে। তারা যুদ্ধকে ভগবানের আদেশ বলে মনে করত। যুদ্ধকে তারা মহৎ কর্তব্য বলে গ্রহণ করত। আল্লাহর নামে আহ্বান করলে তারা জীবন স্ত্রী পুত্রের প্রতি স্নেহ বিসর্জন দিয়ে কর্তব্য পালন করতে কুণ্ঠিত হত না। তারা অর্থকে হীনবস্তু মনে করত। হজরত তাদের মনে দুইটি শক্তির উদ্বোধন করেন—ঈশ্বরের অস্তিত্বে গভীর বিশ্বাস এবং কর্তব্য নিষ্ঠা। এই দুইটি গুণ তাদের জীবনকে মধুময় করে তুলেছিল। বিজিত দেশের লুণ্ঠিত অর্থ দেখে ওমর বেদনা অনুভব করতেন। তিনি ভয় করতেন পাছে ঐশ্বর্যের মোহ মুসলিমদের বিলাসী ও সুখপ্রিয় করে তোলে।

ওমিয়াদ বংশ। আলির মৃত্যুর পর ওমিয়াদ বংশ প্রাধান্য লাভ করে প্রায় একশত বৎসর ইসলাম জগতের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেছিল। ৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লাইসিয়ার নিকট জলযুদ্ধে বাইজানটাইন নৌবহর পরাজিত হয়। ভূমধ্য-

সাগরের পূর্ব অংশে মুসলিম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। ওমিয়াদ বংশের প্রধান নরপতি মুয়াইয়ার রাজত্বকালে (৬৬১-৬৮০) কনস্টান্‌টিনোপল স্থলপথে দুইবার আক্রান্ত হয়। মুসলিম বাহুবল মধ্য এশিয়ায় প্রবেশ করল। সেখানকার শক্তিশালী তুর্কী জাতিদের ভিতর ইস্‌লাম নূতন জাগরণের সুর তুলেছিল।

ওমিয়াদ খলিফাদের রাজধানী মদিনা থেকে দামস্কে স্থানান্তরিত হল। আব্দুল মালিক এবং ১ম ওয়ালিদের আমলে ওমিয়াদ বংশ উন্নতির উচ্চ শিখরে উঠেছিল। পশ্চিমে পিরিনিজ পর্বতমালা এবং পূর্বদিকে চীনের সীমার মধ্যে এর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না। ওমিয়াদের পুত্র সুলেমান কয়েকবার কনষ্টানটিনোপল আক্রমণ করলেন কিন্তু সম্রাট লিও মুসলিম বাহুবল প্রতিহত করেন (৭১৭)। এই সময় থেকে ওমিয়াদ বংশের গৌরব ম্লান হয়ে গেল।

ইসলামের বিরাট মিলনক্ষেত্রে বহুজাতি ও উপজাতির সমন্বয় হয়েছিল। কোন নূতন ধর্মের উদয়ে উচ্চতর নীতি ও ভাবের উন্মেষ হয় সত্য কিন্তু যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে নূতনতর সমস্যা, নূতন প্রশ্ন মানুষের মন নাড়া দেয়। আবার সে নূতন পথে যাত্রা করে। হজরত মহম্মদ আরব মনের দৃঢ়মূল কুসংস্কারের গোড়ায় আঘাত করেছিলেন। তার অন্তস্তলবাহী বীরত্বের উৎসমুখ খুলে গেল। তার প্রাণময় চঞ্চলতার ভিতর বিশ্বমানবতার উদার আদর্শের অনাহত সুর ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। শক্তি প্রাচুর্য ও নিরঙ্কুশ একেশ্বরবাদ কর্ম ও জ্ঞানের গঙ্গাযমুনাধারা মরুচর আরববাসীর নিষ্করুণ আবরণের নিম্নে অলক্ষ্যে বর্তমান ছিল। যুগস্রষ্টা হজরত আরব প্রকৃতির সুগভীর মত্ততাকে পরিস্ফুট করে দিয়েছিলেন।

ওমিয়াদ বংশের খলিফা কোর-আনকে নিয়ে উপহাস করতেন। দামস্কের বিলাসিতা ও অসংযমের বিরুদ্ধে অসন্তোষ বহ্নি ধূমায়িত হচ্ছিল। সুযোগ বুঝে আব্বাসিদগণ প্রাধান্য স্থাপনে চেষ্টিত হল। এই দুই বংশের মধ্যে শত্রুতা মহম্মদের জন্মের পূর্ব থেকে বংশপরম্পরায় বর্তমান ছিল। আলি ও তাঁর দুই পুত্র হাসান হোসেনের শোচনীয় মৃত্যুর করুণ কাহিনী আব্বাসিদদের মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যায়। এই দুই বংশের ভিতর কলহ ও নিষ্ঠুরতার কাহিনীতে এই যুগের ইসলামের ইতিহাস কলঙ্কিত। আব্বাসিদ বংশের শাসন কালে স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার খলিফাদের ক্ষমতা লুপ্ত হয়। ইসলামের শক্তিকেন্দ্র দামস্ক থেকে মেসোপটেমিয়ায় স্থানান্তরিত হয়। আবুল আব্বাসের উত্তরাধিকারী মনসুর বোগদাদে নূতন রাজধানী স্থাপন

করেন। মক্কা ও মদিনার রাজনৈতিক প্রাধান্য লুপ্ত হল। এই দুই স্থান মুসলিম জগতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হল।

আব্বাসিদ বংশ। আবুল আব্বাসের পর আব্বাসিদ সম্রাটদের কলহ ষড়যন্ত্র বিদ্রোহ ও যুদ্ধের কাহিনীতে এই যুগের ইতিহাস স্ফীত ও মুখর। এর নীরস ঘটনাবলীর শ্বাসরুদ্ধকর জঙ্গলে মাত্র একজন সম্রাটের রমণীয় মূর্তি মহামহীরুহের মতো শোভা পায়। এঁর নাম হারুন-অল-রসিদ (৭৮৬-৮০৯)। ইনি বাস্তব জগতের পরিপ্রেক্ষিতে কোন গৌরবময় সাম্রাজ্য স্থাপন করেননি কিন্তু আরব্যোপন্যাসের অনির্বচনীয় শিল্পলোকের খলিফাস্বরূপ তিনি বিশ্বের কল্পনা জগতে যে অতুলনীয় সাম্রাজ্য স্থাপন করে গেছেন সে সাম্রাজ্য বিশ্বসাহিত্যে অমর হয়ে থাকবে।

হারুণ-অল-রসিদের বোগ্‌দাদ এক রহস্যময় পুরী এবং এই স্বপ্নময় পুরীর পটভূমির উপর গরীয়ান হয়ে উঠেছে মহামহিমময় সম্রাটের বাস্তব ছবি। হারুণের বোগ্‌দাদ ছিল সৌন্দর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার, শিল্পকলার লীলানিকেতন, ঐশ্বর্যবিলাসের রম্য নৃত্যশালা, জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার পীঠস্থান, মূল্যবান দ্রব্যসম্ভারের পণ্যশালা, শিক্ষা বিতরণের পবিত্র আয়তন। বহু দার্শনিক তাত্ত্বিক জ্ঞানী পণ্ডিত ছাত্র কবি সাহিত্যিক এই স্থানে সমবেত হয়েছিলেন। রাজধানীর মতো প্রাদেশিক নগরগুলি অট্টালিকা ও হর্ম্যশ্রেণীতে সুশোভিত ছিল। সুপ্রশস্ত রাজপথ রাজধানীর সঙ্গে তাদের সংযোগ রক্ষা করেছিল; সীমান্ত প্রদেশ দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত ছিল। সৈন্যরা সাহসী সুশিক্ষিত ও রাজভক্ত ছিল। মিশর থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁর রাজসভায় চীন সম্রাট ও শার্লেমেন দূত প্রেরণ করেছিলেন। খ্রীষ্টান ইয়ুদী মুসলমান ও বর্বর জাতিদের উপর সম্রাট সমদর্শী ছিলেন। ডাকবিভাগ রাজস্ববিভাগ বিচারবিভাগ সমর বিভাগ এক একজন মন্ত্রীর হস্তে অর্পিত হয়েছিল।

মুসলিম সভ্যতার স্মরণীয় যুগঃ—হারুণ-অল-রসিদের যুগ মুসলিম সভ্যতার স্মরণীয় যুগ। রাজনীতি অধ্যাত্মবিদ্যা শিল্প ও নাগরিক জীবন নূতন প্রাণসঞ্চারে শক্তিমান হয়ে উঠেছিল। ভারতবর্ষ থেকে বহু পণ্ডিত বোগদাদে আসত। বহু আরব ছাত্র তক্ষশীলার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করত। এক দিকে বোগ্‌দাদ এবং অন্য দিকে কার্ডোভা জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কাইরো বস্‌রা এবং কুফায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল।

আব্বাসিদ সাম্রাজ্যের আলো ঝলকানির ভিতর অতিমাত্রিক বিচারবুদ্ধি ও অনুকরণপ্রিয়তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। ধর্মযুদ্ধ পরদেশ লুণ্ঠনে পর্যবসিত হয়েছিল। ধর্মপীঠের মোহন্ত এক্ষণে রাজরাজেশ্বর। রাজতন্ত্র আমলাতন্ত্রে পরিণত হল। আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং বকধার্মিকতা কোর-আনিক অন্তর্জ্ঞানের আসন গ্রহণ করল। ইসলামের সার শিক্ষা সাম্য মৈত্রী ও বিশ্বপ্রেম মুসলীম জাতীয় জীবনের উচ্চতম লক্ষ্য ছিল কিন্তু এক্ষণে তা অবজ্ঞাত হল। রসীদ মদ্যপান করতেন। তাঁর প্রাসাদে পশুপক্ষী ও মানুষের অসংখ্য ছবি ছিল।

৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে রসিদের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য খণ্ডিত হয়ে গেল। দুই শত বৎসর পরে তুর্কীগণ সেলজুক বংশের নেতৃত্বে বোগ্‌দাদ এমন কি এশিয়া মাইনর জয় করেছিল। খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে তারা জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেছিল।

ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি। ইসলামের প্রথম যুগের ইতিহাসে ধর্ম ও রাজনীতি একই আধারে, একই ব্যক্তির মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। অতীন্দ্রিয় বিষয়ের সঙ্গে ধর্মের সম্বন্ধ। রাজনীতি ও অর্থনীতির সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক অকল্যাণের কারণ হয়। হজরত মহম্মদ এবং তাঁর পর চারিজন খলিফা ধর্ম ও রাজনীতিকে সংযুক্ত রেখেছিলেন। তখন হয়তো এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিল কিন্তু মুসলিম সাম্রাজ্য বিস্তৃতির পরেও ধর্মকে রাজনীতি থেকে পৃথক করা হয়নি। ইসলামিক সাম্রাজ্যে আরবী অর্থাৎ মুসলমান এবং আজমী অর্থাৎ বৈদেশিক জাতির বিভাগ ছিল। মুসলমানরা তাদের রাষ্ট্রকে ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল। এজন্য ষ্টেট্‌ বা রাষ্ট্র বললে যা বোঝায় তা ছিল না। মুসলমানগণ কোথাও স্থায়ী রাজনৈতিক রাষ্ট্র সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়নি। তারা ধর্মতন্ত্রের আদর্শ সম্মুখে রেখে দেশবিদেশে রাজ্য বিস্তার করেছিল। অমুসলমানগণ নিজ বাসভূমিতে "পরবাসী"র মতো বাস করত। প্রাচীন কালের হিন্দু রাজারাও এক ধর্মের ও এক জাতির লোকের মধ্যে প্রভেদ রক্ষা করে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। রাজ্যের সকল মানুষকে নিয়ে যে জাতি গঠিত হতে পারে তা হিন্দু ও মুসলমান রাজাদের ধারণার অতীত ছিল। মুসলিম রাষ্ট্রে শাসক ও শাসিতের এবং হিন্দু রাষ্ট্রে উচ্চ ও নীচ বর্ণের প্রভেদ বর্তমান ছিল। এজন্য প্রকৃত রাষ্ট্র গঠিত হয়নি। বিশুদ্ধ রাষ্ট্রের কোন জাতি বা ধর্ম নাই। জাতিধর্ম-নির্বিশেষে মানুষ নিয়েই রাষ্ট্র গঠিত হয়।

আরব সভ্যতা ও সংস্কৃতি। যে সকল স্থান এক সময় হেলিনিক সভ্যতার রসধারায় অভিষিক্ত হয়েছিল তা আরবের সভ্যতা জ্ঞান এবং উৎকর্ষের পরিশীলনে গৌরবান্বিত হয়েছিল। আরব মনের গুপ্ত ভাবরাশি কাব্য ও ধর্ম জিজ্ঞাসার অভীপ্সায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিজ্ঞানের জনক গ্রীস। শক্তির দূত আরব হেলিনিক ভাবপুষ্ট মিশরের সভ্যতাকে কুক্ষিগত করেছিল। আরবগণ গ্রীক সাহিত্যের সংস্পর্শে এসেছিল। গ্রীক ভাষার পুস্তক সিরিয়ায় অনূদিত হয়েছিল। নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টান সম্প্রদায় লাটিন ভাষাভিজ্ঞ খ্রীষ্টানদের অপেক্ষা শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ছিল। তারা গ্রীসের চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং শারীরবিদ্যা অনুকরণ করে তার সম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। পারস্যে ধর্ম ও দর্শনের সূক্ষ্মতত্ত্বগুলি আরবী পরিচ্ছদে নূতন বেশ ধারণ করল। ইহুদীদের সাহিত্য ও চিন্তাধারা আরব মনের উপর ছাপ দিয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের সহিত তাদের পরিচয় ছিল।

মহম্মদ আরব জাতির সামাজিক পরিধির ভিতর মানুষের জীবন ও তার কর্তব্য বিচারে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি দার্শনিক তত্ত্ব বিচার করার সময় পাননি। তথাপি কোর-আনে ও হদীস বা বচনসমূহে তাঁর অধ্যাত্মিক দৃষ্টি ও পারমার্থিক সত্য উপলব্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

গ্রীক, ইরাণীয় ও ভারতীয় চিন্তধারার সহিত আরবদের পরিচয় হলেও কর্মপ্রবণ আরবদের মৌলিক প্রকৃতি অতীন্দ্রিয়তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। তথাপি খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যে নানাজাতির নিকট থেকে আহৃত উপাদানে যে সুফী মতবাদ গড়ে উঠেছিল তার প্রথম অনুভূতি মুসলমান সাধকদের মনে ক্ষীণভাবে দেখা দিয়েছিল। তবে তা ইরাণীদের ভিতর বিস্পষ্ট হয়ে বিশ্ব মানবের সমক্ষে একটি অপরূপ বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। ভারতের মধ্যযুগের ভক্তি সাধনায়, সন্তমার্গী বৈরাগী ও সাধুদের চিন্তায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর সুফী ধর্মানুভূতির ছাপ থেকে গেছে।

সংস্কৃত, গ্রীক ও চীনা সাহিত্যের মৌলিকতা আরবী সাহিত্যে নাই। গীতি-কাব্য ও গাথা-কাব্য ছাড়া আরবী সাহিত্যের প্রায় সমস্তটা গ্রীসের ও প্রাচীন ইরাণের প্রভাবে রচিত। তথাপি আরবের সাহিত্য ভাণ্ডারে বিশ্বজনের আদরণীয় বহু অমূল্য রত্ন সঞ্চিত আছে। ইতিহাস ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব দর্শন বিজ্ঞান গদ্য ও পদ্যে রচিত সুকুমার সাহিত্যের অসংখ্য পুস্তক রচিত হয়েছে।

আরবী ভাষার সর্বজন পরিচিত দুইখানি পুস্তক কোর-আন ও আরব্য

রজনী। মুসলিম জগতে কোর-আন ভক্তি ও শ্রদ্ধার বস্তু কিন্তু আরব্য রজনী বিশ্বমানবের আদরের ধন। বিশ্বসাহিত্যের প্রথম শ্রেণীর সৃষ্টির মধ্যে আরব্য রজনী স্থান পেয়েছে। এই পুস্তক সম্বন্ধে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন— অপূর্ব কল্পনার ও রোমান্স বা রমন্যাসের নিকেতন বলিয়া আরব্য রজনীর কথা বা উপাখ্যানগুলি লোক প্রিয়তায় সর্বদেশে সর্বশ্রেণীর ও সর্ব বয়সের মানবের নিকট যে উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে, খুব কম বইয়ের বা রচনার ভাগ্যে তাহা ঘটিয়াছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কতকগুলি খান দশ বারো বইয়ের বা গ্রন্থাবলীর মধ্যে আরব্য রজনী অন্যতম। মহম্মদের পূর্ব থেকে আরবরা নিজ মাতৃভাষা আরবীতে যে জাতীয় সাহিত্য গড়ে তুলেছিল তাহা প্রধানতঃ কাব্যময়। ইহাতে তাদের মরুজীবনের সুখ ও দুঃখ, প্রেম ও বিদ্বেষ, আশা ও আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে। এই জীবনের পরিধি অল্প কিন্তু ইহা তীব্রভাবে উপলব্ধ। "এইসব কাব্য ও কবিতায় আদিম অবিমিশ্র আরব মরুজীবনের চিত্র চিরতরে সংরক্ষিত হইয়া আছে এবং এগুলিই আরবদের সত্যকার জাতীয় সাহিত্য।" এর মধ্যে যে আরবকে পাওয়া যায় সে যাযাবর মরুচারী বেদুইন। আরব্য রজনীর আরব মরুসন্তান আরব নয়, সে বসরা বোগদাদ দামস্ক বা কাইরো-নিবাসী নাগরিক আরব। মুসলিম কথাসাহিত্য জীবনকে বাদ দেয়নি, ইহা বাস্তবতা প্রধান। এর উপজীব্য মানুষের কাহিনী, দেবদেবীর কথা নয়।

আরব প্রতিভার দীপ্তরশ্মি তার ঐতিহাসিক সাহিত্যের উপর পড়েছিল। জীবনী ও ইতিহাস রচিত হয়েছিল। লোকশিক্ষা প্রবর্তিত হয়েছিল। বসরা কুফা বোগদাদ কাইরো এবং কর্ডোভায় শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হল। মসজিদ্ সংলগ্ন মোক্তব বা টোল ছিল। কর্ডোভায় বহু খ্রীষ্টান ছাত্র অধ্যয়ন করত। আরবের দর্শন স্পেনের ভিতর দিয়ে প্যারিস অক্সফোর্ড উত্তর ইটালির বিদ্যাপীঠে, এক কথায় সমগ্র পাশ্চাত্য দেশে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আভিরস্ (১১২৬-১১৯৮) কর্ডোভায় বাস করতেন। তিনি আরিষ্টটলের দর্শনকে ভিত্তি করে ধর্ম ও বিজ্ঞান, ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় বস্তুর তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যকে ধর্মের বিধি-নিষেধ ও অনুশাসনের কবল থেকে মুক্ত করে বিচারের পথে চালিত করেছিলেন। বৈদ্যরাজ আভিসিনা (৯৮০-১০৩৭) বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন। আলেকজান্দ্রিয়া দামস্ক কাইরো এবং বোগদাদে পুস্তক অনুলিপির চর্চা পূর্ণমাত্রায় চলেছিল। গ্রীক গণিতের ভিত্তির উপর আরবগণ তাদের অঙ্কশাস্ত্রের সৌধ রচনা করেছিল।

তাদের সংখ্যাতত্ত্বের উৎপত্তি কী ভাবে হয়েছিল তা এখনও রহস্যময়। বিখ্যাত এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যা এবং আরবার্টের অনেক শিষ্য সংখ্যাজ্ঞাপক চিহ্ন প্রথম ব্যবহার করেন। মহম্মদ-বিন্-মুসা শূন্য উদ্ভাবন করেছিলেন। ইনিই নাকি প্রথমে দশমিক বা পৌনঃপুনিক সংখ্যা আবিষ্কার করেন। কিন্তু হিন্দুগণই ভারতবর্ষে প্রথমে শূন্য ও দশমিক সংখ্যা ব্যবহার করেছিলেন বলে প্রমাণিত হয়েছে। জ্যামিতি শাস্ত্রে আরবরা ইউক্লিডের চেয়ে বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। যজ্ঞীয় বেদী নির্মাণের জন্য আর্যঋষিরা প্রথমে জ্যামিতির রেখা এঁকেছিলেন। প্রাচীন বৈদিক গ্রন্থে ক্ষেত্রতত্ত্বের মূলসূত্র প্রকটিত হয়েছিল। কল্পসূত্রের অন্তর্গত শূল্বসূত্রে ক্ষেত্রতত্ত্ব বিধিবদ্ধ আছে। কিন্তু আরবগণ বীজগণিতের জনক। তারা ত্রিকোণ পরিমিতির উন্নতি করেছিল। তারা কয়েকটি মানমন্দির স্থাপন করেছিল, জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক যন্ত্রাদি উদ্ভাবন করেছিল। চিকিৎসাশাস্ত্রে তারা গ্রীকদের চেয়ে বেশী উন্নতি করেছিল। শরীর বিদ্যায় ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞানেও তারা পশ্চাতে ছিল না। তাদের ভেষজ বিজ্ঞান উচ্চাঙ্গের ছিল। তারা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে রোগ চিকিৎসা করত। ঔষধের দ্বারা শরীরের স্থান-বিশেষকে অসাড় করে অস্ত্রোপচার করত।

ইয়োরোপ যখন ধর্মের অনুশাসন সাহায্যে রোগ চিকিৎসা করত তখন আরবরা বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসাতত্ত্বের আলোচনা ও গবেষণা করেছিল। রসায়নশাস্ত্রে তারা ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত করেছিল। তাদের সৌন্দর্য পরিকল্পনা, কলাকুশলতা, শিল্পনৈপুণ্য আশ্চর্য ধরণের ছিল। তারা সোনারূপা প্রভৃতি ধাতু নানাপ্রকারে ব্যবহার করতে জানত। বয়ন-শিল্পে কোন জাতি সেকালে তাদের সমকক্ষ ছিল না। তারা উচ্চাঙ্গের কাঁচের বাসন ও মাটির পাত্র ব্যবহার করত, রঞ্জনশিল্প ও কাগজ নির্মাণে সুদক্ষ ছিল। চামড়ার কাজের জন্য তারা ইয়োরোপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল। তারা সুগন্ধি দ্রব্য ও মালিশ তৈরী করতে পারত, আখের চিনি ও মদ উৎপাদন করত, বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকার্য করত, খাল কেটে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করত, সার ব্যবহার করত এবং জোড় কলমের চারায় নানা রকমের ফুলফল উৎপাদন করত।

মানব সভ্যতার প্রগতি ও জ্ঞানানুশীলনের জন্য কাগজের প্রয়োজনীয়তা অবিসংবাদী। চীন কাগজের আদি জন্মস্থান। কাগজ তৈরী ব্যাপারে আরবরা চীনের শিষ্যস্থানীয়। ইয়োরোপ এই বিষয়ে তাদের কাছে ঋণী।

লেখার জন্ম পূর্বে ভূর্জপত্র ব্যবহৃত হত। আরবরা মিশর জয় করলে ইয়োরোপে ভূর্জপত্র আমদানি বন্ধ হয়ে যায়।

জ্ঞান বিজ্ঞান আলোচনা। রাষ্ট্রে বিশৃঙ্খলা সত্বেও মুসলিম জগতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা বন্ধ হয়ে যায়নি। আদর্শ রাষ্ট্রের নিছক কল্পনাকে একদিন প্লেটো কবিজনসুলভ ভাষায় রূপদান করে বিশ্বজনকে মোহিত করেছিলেন। কিন্তু আরব এইরূপ রাষ্ট্রিক তত্বালোচনায় দরিদ্র।

বাহুবল বিস্তারের সহিত আরবরা স্থাপত্যে উন্নতি করেছিল। তাদের শিল্প সারাসেন, মুসলিম এবং আরব, এই তিন নামে পরিচিত। আরবের নিজস্ব কোন শিল্প ছিল না। গির্জা প্রাসাদ সমাধিমন্দির নির্মাণের সময় সিরিয়া এবং মিশর থেকে ইস্পাত ও শিল্পী আমদানী করতে হত। ইসলামের শিক্ষা মূর্তি গঠনের বিরোধী বলে আরবে রূপসৃষ্টি বিকাশ লাভ করেনি।

মুসলিম শিল্প সাধনার বৈশিষ্ট্য। মুসলিম চিত্রশিল্পে স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে তিনটী বৈশিষ্ট্য দেখা যায়—মনুষ্য মূর্তির অভাব, জ্যামিতিক রেখার প্রাধান্য এবং অলঙ্কার প্রাচুর্য। তাদের চিত্রাঙ্কনের প্রতিভা গাছ-পালা লতাপাতা অঙ্কনে পর্যবসিত। এর চিহ্ন ফ্রান্স জার্মেনি ইটালি ও সিসিলিতে আছে এবং চরম পরিণতি ভারতবর্ষের তাজমহল রচনায়। চিত্রাঙ্কনেও মুসলিম শিল্পী তার ধর্মীয় অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করেনি। জীবন ভোগ ও কল্যাণবোধ মুসলিম শিল্পের প্রেরণা যুগিয়েছে। এজন্য ভাস্কর্যে ও মূর্তিশিল্প পরিকল্পনায় আরবের স্থান নাই।

মিশর গ্রীস ও ভারতবর্ষ এই বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। মিশরীয় ভাস্কর্যের বিশালতা, গ্রীক ভাস্কর্যের অত্যুগ্র দৈহিক সৌন্দর্য কল্পনা, ভারতীয় ভাস্কর্যের আপনভোলা আত্মনিবেদন ও অতীন্দ্রিয়তা ভাস্কর্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছে। এই আদর্শের মাপকাঠি দিয়ে আরবের শিল্পকে বিচার করলে তার প্রতি অবিচার করা হয়। দেশ কাল সংস্কৃতি ধর্ম ও বেষ্টনী শিল্পের প্রকৃতি ও গতি নির্ণয় করে। মানুষের রুচি ভিন্ন, তার প্রকৃতি বিচিত্র, তার রূপকল্পনাও নিজস্ব। রূপশিল্পের রহস্য জাতির অন্তরে নিগূঢ় ভাবে নিহিত আছে। আরবের শিল্পমানস গির্জা ছাদ স্তম্ভ গম্বুজ প্রভৃতির নির্মাণ কৌশলে আত্মপ্রকাশ করেছে, মূর্তি গঠনে রূপায়িত হয়নি।

মুসলিম স্থাপত্যও ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। স্থাপত্যে জাতির আদর্শ অনির্বাণ অগ্নিশিখার মতো আহিত থাকে। এখানেও মুসলিম স্থপতি তার ধর্মীয় অনুশাসনকে অবহেলা করেনি। মসজিদের মাদ্রাসার কেল্লার ও

মকবরার উন্মুক্ত ভাব ও জ্যামিতিক শৃঙ্খলা লক্ষ্যের বিষয়। হিন্দুর মন্দির ও খ্রীষ্টানের গির্জা ঊর্ধ্বগামী ও সূচ্যগ্র, মস্‌জিদ প্রশস্ত ও উন্মুক্ত। মুসলিম ভাস্কর পাথর হাতির দাঁত কাঠ ও ধাতু দ্রব্যের উপর অতুলনীয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন; এতেও তিনি ধর্মীয় অনুশাসন ও জ্যামিতিক বন্ধনের বাহিরে যাননি।

বর্তমান যুগের মুসলিম সমাজ-জীবনে সঙ্গীতের স্থান অল্প কিন্তু এককালে আরব ও পারস্যের মুসলমানদের ভিতর সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। ইস্‌হাক্-আল্ মৌসিলি আবদুল মোমিন আল খলিফ প্রভৃতি বিশেষজ্ঞরা সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। সানাই তবলা তাম্বুর নাকরা সেতার এস্রাজ প্রভৃতি উচ্চাঙ্গের বাদ্যযন্ত্র মুসলমানরা অধিকার করেছিলেন। এখানেও মুসলিম জীবন দর্শনের মূলনীতি বর্তমান।

নবগঠিত আরব জাতি অদম্য উৎসাহ ও জ্ঞানার্জনীস্পৃহাবলে পারস্য ও ভারতের আর্যসংস্কৃতি এবং হেলিনিক সংস্কৃতি গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিল। তাদের চতুর্দিকে যে প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা প্রবাহিত হচ্ছিল তারা তা আকণ্ঠ পান করে একটী নূতন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৌধ রচনা করেছিল।

ইস্‌লাম ও অন্য ধর্ম্মের পার্থক্য। বৌদ্ধধর্ম খ্রীষ্টান ধর্ম এবং ইসলাম সুন্দরের উপর কল্যাণকে বেশী স্থান দিয়েছে। তাদের গোড়ায় ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব তাদের বিশ্বজিৎ ধর্মে পরিণত করেছে। গ্রীক পারসিক ও হিন্দু বা বৌদ্ধ সংস্কৃতি মূলতঃ আর্য। সুন্দরের সাধনা ও প্রেমের বাণী আর্যসংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রাণ। আর্যসংস্কৃতির শ্রেষ্ঠদান বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য। এঁরা মৈত্রী ও প্রেমের অবতার। ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্ম সেমিটিক সংস্কৃতির অন্তর্গত। তাদের মধ্যে পারম্পারিকতা শৃঙ্খলা সামাজিক কল্যাণবোধ ও গণতান্ত্রিকতা প্রাধান্য লাভ করেছে।

ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মে ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব হয়েছে। চিন্তার স্বাধীনতা ও অতীন্দ্রিয় সত্তায় অবিশ্বাস দমনের যোগ্য। হিন্দু বলে যত মত তত পথ, সকল ধর্মেই সত্য আছে। সুতরাং সকল রকমের বৈদেশিক অথবা দেশী ধর্মমত ও সংস্কার এর গাত্রে স্থান লাভ করেছে। হিন্দুর মতে ধর্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, খ্রীষ্টান বা ইসলামের মতে ধর্ম সমাজগত বস্তু। পরমতসহনশীলতা হিন্দুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। ধর্মমতের জন্য সে কাহাকেও নির্যাতিত অবজ্ঞা বা ঘৃণা করেনি। বরং ধর্মমতের অতিমাত্র স্বাধীনতা ও উদারতা তার জাতীয় জীবনে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছে।

তের

এশিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রচার

মহারাজ অশোকের চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্প এশিয়ার অধিকাংশ স্থানে প্রচারিত হয়। তাঁর দূতেরা একদিকে ভূমধ্য সাগরের তীরভূমিস্থিত দেশ সকলে এবং অপর দিকে সিংহল ব্রহ্মদেশ এবং নেপালে উপস্থিত হয়েছিল। খ্রীঃ পূর্ব ১২৫ সালের কাছাকাছি সময়ে সেনাপতি চ্যাং কিয়েন ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমায় উপস্থিত হন এবং ভারতবর্ষকে 'শেনটু' বা সিন্ধু নামে অভিহিত করেন।

হান্ যুগেই (পূঃ খ্রীঃ ২০৬-২২০ খ্রীঃ) সাংস্কৃতিক ব্যাপারে ভারত ও চীন সংযুক্ত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম চীনের আধ্যাত্মিক চিন্তা ও কলাচর্চার প্রেরণা দিয়েছিল। চীনের সভ্যতা কোরিয়া মাঞ্চুরিয়া এবং জাপানের অন্তর্জীবনের উপর আলোকপাত করেছিল। হান বংশের একজন সম্রাট দুইজন ভারতীয় ভিক্ষুকে চীনে আমন্ত্রণ করেন। বৌদ্ধ ভারত হান্ যুগের সাংস্কৃতিক ও শিল্প মানসের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

যখন খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে শক বা সিথিয়ান জাতিদের আক্রমণ ভারতের রুদ্ধ তোরণ ভেঙ্গে দিল তখন চীন সম্রাট সিংটির আমন্ত্রণে বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও পণ্ডিত লোইয়াং আশ্রমে বাস করতে লাগল। ৭০ খ্রীষ্টাব্দে বৌদ্ধধর্ম চীনের রাষ্ট্রধর্ম বলে গৃহীত হয়। খোটান ইতিপূর্বেই বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। অ্যান-শি-কাবো "(১৪৮-১৭৭ খ্রীঃ) নামে পার্থিয়ার একজন রাজা লো-ইয়াং-এ অমিতাভের পূজা প্রবর্তিত করেন।

২২০ খ্রীষ্টাব্দে হান সাম্রাজ্যের পতন হয়। সোগডিয়ার এক পুরোহিত দক্ষিণ চীনে ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি প্রচারের অগ্রদূত। গুপ্ত সম্রাটদের সমসাময়িক উচ্চ বংশের বৌদ্ধ রাজারা পাথরে খোদাই করে বহু মন্দির নির্মাণ করেন। এই সময়ে দুইজন ভারতীয় পণ্ডিত কুমারজীব (৩৪৪—৪১৩ খ্রীঃ) এবং গুণবর্মন্ চীন পরিদর্শন করেন। কুমারজীব পদ্ম ও বিমলাকীর্তি সূত্রের অনুবাদ করেন। কাশ্মীর থেকে গুণবর্মন সিংহল এবং যবদ্বীপ দিয়ে নানকিং-এ আসেন। তিনি একটি নূতন চিত্রশিল্পী সম্প্রদায় সৃষ্টি করেন। চিয়েন নান-

কিং-এ ছয় বৎসর অতিবাহিত করেন। তখন গুণবর্মন সেখানে পাণ্ডিত্য ও চিত্রশিল্প সাহায্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করছিলেন।

পঞ্চম শতকে ফা-হিয়ানের ভারত পর্যটন চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের প্রমাণ। তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে বলেছেন, আমাকে বহু বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল, দুর্গম ও বিপদসঙ্কুল স্থানের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছিল। আমি যে পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে বহির্গত হয়েছিলাম তার সাফল্যের জন্য সরলভাবে ও সাহসের সহিত অগ্রসর হয়েছিলাম। আমি যে উদ্দেশ্য, যে আশা ফলবতী করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলাম তার শতাংশের একাংশও কার্যে পরিণত করতে পারব মনে করে অবধারিত মৃত্যুর সম্মুখীন হতে পশ্চাৎপদ হইনি।

দেড় হাজার বৎসর পূর্বে চীন থেকে ভারতবর্ষে পায়ে হেঁটে আসতে হলে যে কষ্ট সহ্য করতে হত তা অম্লানমুখে সহ্য করে চীনা পর্যটক অসীম সাহস, জ্ঞান-লিপ্সা ও ধর্মপ্রাণতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বহু পুস্তক ও পবিত্র বস্তু চীনে নিয়ে যান। কুমারজীব এবং ফাহিয়ানের সময় থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়। ২২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চীনে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল। এই সময়ে চীনে বৌদ্ধধর্মের বিস্তৃতি হয়েছিল। বিলের 'চীনে বৌদ্ধসাহিত্য' নামক বিখ্যাত পুস্তকে অন্ততঃ ৮৬ জন পর্যটকের নাম পাওয়া যায়। হিয়ান-সাং-এর মনে এমন কি যুক্ত ভারত-চীন সাম্রাজ্যের কল্পনা স্থান পেয়েছিল।

ফাহিয়ান গঙ্গানদীর মোহানায় তাম্রলিপ্ত নগর থেকে বাণিজ্য পোতে সিংহল দিয়ে সুমাত্রায় যান। যবদ্বীপ থেকে ক্যান্টন যাওয়ার সময় পোলোমন বা ব্রাহ্মণগণ তাঁর সহযাত্রী ছিল। ইৎ-চিং বলেছেন, সপ্তম শতকের শেষভাগে বাইশ জন চীনা পর্যটক কাণ্টন থেকে বহির্গত হয়ে সুমাত্রায় এসেছিল, তারপর নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পাশ দিয়ে সিংহলে এবং সিংহল থেকে তাম্রলিপ্তে নেমে ভারতবর্ষের তীর্থ দর্শন করেছিল। সমুদ্র পথে ভারতবর্ষে আসতে তিন মাস লাগত।

ভারতবর্ষ এবং চীনের মধ্যে সংযোগ সাধনের সুবর্ণ সূত্র ছিল বৌদ্ধ ধর্ম। ধর্মরক্ষ ও কাশ্যপ মাতঙ্গ খাসগড় দিয়ে মধ্য এশিয়ার পথ অতিক্রম করে চীনে উপস্থিত হন। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের বহু পুস্তক চীনা ভাষায় অনুবাদ করেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের মারফতে এসিয়ায় নানা দেশ ও জাতির ভিতর প্রথম থেকে দশম খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সভ্যতা ও সংস্কৃতির আদান প্রদান চলত।

বৌদ্ধভিক্ষুদের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচার এবং চীনা বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি হয়। এই ৩ইটি বৃহৎ জাতি বিভিন্ন দেশে বাস করে, বিভিন্ন ভাষা ব্যবহার করে, বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির অধিকারী হয়েও ভেদবুদ্ধি ও বিজাতীয় ঘৃণা পরিহার করে একটি সাধারণ সভ্যতা গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল।

৪০০ খ্রীষ্টাব্দে চীনা সাহিত্য কোরিয়ার ভিতর দিয়ে জাপানে আসে। বৌদ্ধধর্মও এইভাবে আমদানি হয়েছিল। ৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় পাক্‌চ রাজ্যের শাসনকর্তা ইয়ামেটোর রাজার নিকট একখানি সোনার বৌদ্ধমূর্তি, কয়েকজন প্রচারক এবং বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ প্রেরণ করেন।

জাপানের প্রাচীন ধর্মের নাম শিনটো। চীনা ভাষায় শিন্‌টো শব্দের অর্থ 'দেবযান'। এই ধর্ম প্রকৃতিপূজা এবং পিতৃপুরুষপূজা শিক্ষা দেয়। শোটোকু তেইশির (৫৭৪—৬২২) বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর তাঁর অনন্যসুলভ তত্ত্বানু-সন্ধিৎসা ও উৎসাহ নবধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিক্ষোভ দূর করে দেয়। সুকৌশলে তিনি শিন্‌টো ধর্মের সহিত নবাগত বৌদ্ধধর্মের মিলন ঘটিয়ে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে দিলেন। তিনি চিত্রকলা ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং কতগুলি বৌদ্ধমন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সম্রাজ্ঞী সুইকো বৌদ্ধধর্মের স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। এই যুগের শিল্পরীতি তাঁর নামানুসারে পরিচিত। বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাবে জাপানের চারুকলা ও শিল্পের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল।

এইরূপে বৌদ্ধধর্মের পুণ্যস্রোতের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির ধারা প্রাচ্যের নানা দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। ট্যাং শিল্প ও সংস্কৃতি জাপানের জাতীয় জীবন অভিষিক্ত করেছিল এবং বৌদ্ধধর্ম ধীর ও শান্তভাবে জাপানের হৃদয় জয় করেছিল। বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক স্বয়ং বিপ্লবী ছিলেন। তিনি বেদের প্রামাণ্য অস্বীকার করেছিলেন ও জাতিভেদ উচ্ছেদ করেছিলেন। তিনি বুদ্ধিমুক্তির দূত ছিলেন। তাঁর শিক্ষা বিচারপ্রধান। এজন্য বৌদ্ধধর্ম জনসাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করলেও, শিনটো ধর্ম বশ্যতা ও প্রভুভক্তি শিক্ষা দেয় বলে জাপানের উচ্চশ্রেণী ও শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে তার তত আদর নাই।

সম্রাট শোমুর রাজত্বকালে (৭২৪-৭৪৮) কোরিয়ার ভিক্ষু গাইওসি জাপানে বাস স্থাপন করে কৌশলের সহিত জাপানের জাতীয় দেবতাদের বুদ্ধের প্রতিচ্ছবি হিসাবে সম্মান দান করলেন এবং বৌদ্ধধর্মের প্রতি শিন্‌টো

ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধতা দূর করে দিলেন। অবশেষে ৭৫৪ সালে চীনের বিখ্যাত ভিক্ষু পণ্ডিত কান্‌শিন জাপান পরিদর্শন করেন। ৭৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চাশ ফুট উচ্চ একটি বৃহৎ বৌদ্ধমূর্তি নারায় প্রতিষ্ঠিত হল।

মাঞ্চুরিয়ার অধিকাংশ মন্দির তিব্বতী লামা ধর্মের প্রভাব প্রমাণিত করে। তিব্বতেও ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসার লাভ করে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে স্রোঙ্‌-পো বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে ভোট জাতির যে ধর্ম ছিল তার নাম 'বোন্' ধর্ম। ইন্দ্রজাল ও ভোজবিদ্যায় আস্থা এই ধর্মের প্রধান অঙ্গ ছিল। বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে মিশ্রিত 'বোন্' ধর্মকে "জুর বোন্" বলা হয়। এর উচ্চ আদর্শ—বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তর্নিহিত শাশ্বত সত্তার সহিত একান্ত হয়ে যাওয়াই মানবজীবনের কাম্য এবং সমস্ত জীবের হিতসাধনই মানুষের কর্তব্য। বিক্রমপুরের দীপংকব শ্রীজ্ঞান (জন্ম ৯৮০ খ্রীঃ) তিব্বতে মহাযান ধর্মের মহিমা প্রচাব করেছিলেন।

ক্যন-চচ্‌-সাঃ নামে একজন বর্মী রাজা বৌদ্ধমন্দির এবং পগানে আনন্দ-চৈত্য নামে ব্রহ্মদেশের সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও বিবাট মন্দির নির্মাণ করেন। এই মন্দির বৃহত্তর ভারতের এমন কি সমগ্র জগতের সুবিখ্যাত দেবায়তনগুলির অন্যতম। ইনি একাধারে ব্রহ্মদেশের অশোক বিক্রমাদিত্য ও আকবর ছিলেন।

দীপংকর সেখানকার বৌদ্ধধর্মকে তান্ত্রিক ও বিজাতীয় প্রভাব থেকে মুক্ত করেন। তিনি তিব্বতে তের বৎসর বাস করেন এবং বহু পুস্তক রচনা করেন। তার মধ্যে বোধিপাঠপ্রদীপ প্রধান। শীলভদ্র ও শান্তিরক্ষিত নালান্দা বিহারের অধ্যাপক ছিলেন। আর একজন বাঙালী পণ্ডিত অভয়ঙ্কর গুপ্ত তিব্বতে বিশেষ সম্মান পান। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি ও ধর্মপ্রচারের ক্ষেত্রে এই সকল পণ্ডিতের অন্তর্দৃষ্টি ভারতীয় অধ্যাত্মসাধনা ও ভারতীয় জাতীয় জীবনের একত্ব প্রমাণিত করেছে।

চৌদ্দ

এশিয়ার শিল্পসাধনা

রস সাধনার প্রধান বাহন কাব্য সংগীত স্থাপত্য ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প। কাব্য মানুষের কল্পনায় এবং লোকস্মৃতিতে বেঁচে থাকতে পারে। সঙ্গীত যন্ত্রনির্ভর কিন্তু যন্ত্রসর্বস্ব নয়। স্থপতি ও ভাস্করের কীর্তি যুগযুগান্তের প্রবাহকে অগ্রাহ্য করে। চিত্রকলার বাহন ভঙ্গুর।

ভারতবর্ষে শিল্পচর্চার নিদর্শন প্রাক্-বৌদ্ধ যুগে স্পষ্ট নয়। ভারতীয় শিল্পকলায় বিশেষজ্ঞ হাভেল সাহেব বলেছেন, বৈদিক শিল্পাদর্শ কেবলমাত্র হিন্দু বৌদ্ধ জৈন মোগল ও সারাসেন শিল্পকলার ভিত্তি নয়। পরন্তু বৈদিক শিল্পতরু চীন জাপান বলি পারস্য আরব, তথা সমগ্র এশিয়ায় শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে।

ভারতীয় আর্টের জন্ম বৈদিক যুগে। বৈদিক যুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের কোন নিদর্শন নাই। ঐ যুগেই যে নৃত্য-গীত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই। গীত শব্দের অর্থ গান। সংগীতের অর্থ গান বাদ্য ও নৃত্য। বৈদিক যুগে সাম গানের প্রচলন ছিল। প্রথমে সুর, তারপর কথার জন্ম হয়। 'সামন' শব্দের অর্থ সুর। সুরের সহজ ও পূর্ণ বিকাশের জন্য কথার প্রয়োজন হয়। সাম গানের উৎপত্তি কণ্ঠস্বরে, তাহা যান্ত্রিক ছিল না। তখনও সপ্তস্বরা বীণার উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়। বীণাকে 'শততন্ত্র' বলা হত। বীণা ছাড়া তুণব ও কান্তবীণা নামক বংশীশ্রেণীর বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন ছিল। চারিপ্রকার বাদ্যযন্ত্র ছিল, যেমন তত, সুচির ঘন ও অবনদ্ধ। তন্ত্র দ্বারা নির্মিত যন্ত্রের নাম 'তত'। বায়ু দ্বারা নিনাদিত যন্ত্রের নাম 'সুষির', ধাতুময় বাদ্যের নাম 'ঘন' এবং চর্মাবৃত ঘাতযন্ত্রের নাম 'অবনদ্ধ'। দুন্দুভি এক প্রকার চর্মাবৃত ঘাতযন্ত্র। আড়ম্বর লম্বন বনস্পতি এবং ভূমি এর প্রকারভেদ।

বালকবালিকাদের নৃত্য, পুরুষদের বীরত্বব্যঞ্জক রণনৃত্য এবং 'পেষ'-ভূষায় সজ্জিত নারীদের বর্ণনা ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। নৃত্য দুই প্রকার—তাণ্ডব ও লাস্য। কথিত আছে, শিব তাণ্ডব নৃত্যের জনক, পার্বতী সৃষ্টি করেছিলেন লাস্য এবং বিষ্ণু দান করেছিলেন নাট্যরীতি। পরবর্তী যুগে নৃত্য ও নৃত্যের মধ্যে

পার্থক্য করা হয়েছিল। গান ও অঙ্গ সঞ্চালনের সাহায্যে কোন একটি বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করে যে ভাব প্রকাশ হয় তার নাম নৃত্য। তান-লয় সংযোগে ছন্দো-বদ্ধ গতির ভিতর দিয়ে যে দেহ-বিন্যাস তার নাম নৃত্ত। নৃত্য ও সংগীতের মতো অভিনয়ের অঙ্কুর বৈদিক যুগে নিহিত ছিল। যদিও প্রকৃত নাটক বা রঙ্গমঞ্চ বহু পরে রচিত হয়েছিল তথাপি ঋগ্বেদে বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে যে উক্তি ও প্রত্যুক্তি আছে তার ভিতরেই নাটকের মূল সূত্র ও ভাবের অস্তিত্ব ছিল।

বৈদিক শিল্পসাধনার আবেগ ও সংবেদনা বৌদ্ধ আর্টে স্পষ্ট ধরা দিয়েছে। বৈদিক আর্য-মানসের শিল্পানুভূতি অধ্যাত্মিক প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়েছিল। বৈদিক যজ্ঞ-বেদীর আদর্শে প্রচীনতম বৌদ্ধস্তূপের আকার ও পরিমাপ কল্পিত হয়েছিল। বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভের রেলিং এর নাম বেদিকা। সংস্কৃত 'বেদিকা' শব্দের অর্থ যজ্ঞভূমি। রেলিং-এর সমান্তরাল কাঠের নাম শুচি। বৈদিক 'শুচি' শব্দের অর্থ 'একগুচ্ছ শুদ্ধ কুশ'। কুশ যজ্ঞভূমির উপর পেতে রাখা হত। বৌদ্ধ যাত্রীগণ যে স্তূপ পরিক্রমা করতেন তার জন্য নির্দিষ্ট বিস্তৃত পথ ব্যবহার হত তাব নাম 'মেধি'। 'মেধি' শব্দের অর্থ যজ্ঞ। বৈদিক যুগের আর্য রাজাদের সমাধি মন্দির থেকে বৌদ্ধ স্তূপের উৎপত্তি। বৌদ্ধস্তূপ পূজা বৈদিক রাজাদের শ্রাদ্ধব্যপাবের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

বৌদ্ধ চৈত্যের পরিকল্পনা সংঘগৃহ অজন্তা ও ইলোরার বৌদ্ধ বিহারের স্তম্ভ কাঠের উপর কারুকার্য এবং ছাদের প্রস্তরে প্রাচীন বৈদিক আর্ট পরিস্ফুট। যবদ্বীপের চণ্ডী সেবামন্দির অজন্তাব স্তূপ মন্দিরের পদ্ম পত্র ও পুষ্প নেপালের মহাযান মূর্তিগুলি অজন্তা ও এলিফান্টার শৈবমূর্তিসকল অজন্তার চিত্রাবলী গুজরাট ও কোণারকের মূর্তি তাঞ্জোর মন্দিরে পিতল নির্মিত কলালক্ষ্মীর মূর্তি প্রাম্বাননের গাত্রের চিত্র এলিফান্টার বৌদ্ধ ত্রিরত্ন হিন্দু প্রতীকের আদর্শে পরিকল্পিত। হিন্দু দেবদেবীর মূর্তিসকল মহাযান ধর্মের অন্তর্গত হয়েছে। হারীতি তারা সাচয় লক্ষ্মী যবদ্বীপের বর-বুদুরের অবলোকিতেশ্বর সিংহলের অনুরাধাপুর যবদ্বীপের ও মামাল্লাপুরের মহিষাসুরমর্দিনী যবদ্বীপের গণেশ প্রভৃতি বৌদ্ধ দেবতাদের মূর্তিও বৈদিক আদর্শে কল্পিত। গৌতম বুদ্ধ ইন্দ্র বা শক্র ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবতাদের মহাযান অনুমোদিত মূর্তিসকল চীন কোরিয়া এবং জাপানে প্রবর্তিত হয়েছিল। বৈদিক আর্টের সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট আদর্শ বৌদ্ধ যুগে নব নব রূপে বিপুল প্রাণধর্মের বিচিত্র পথে যাত্রা করেছিল।

বৌদ্ধধর্মের প্রধান অবদান বৌদ্ধ শিল্প। মৌর্যযুগে এই শিল্প স্তূপ ও স্তম্ভ নির্মাণে নিবদ্ধ ছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকেই বৌদ্ধ শিল্প প্রভূত উন্নতি লাভ করেছিল। পরবর্তী যুগে তিনটি বিভিন্ন স্থানে এই শিল্পের উদ্ভব ও পরিণতি হয়—গান্ধার বা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, মথুরা এবং কৃষ্ণা নদীর উপত্যকায় অমরাবতী। গান্ধার প্রদেশের শিল্পে গ্রীক প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে। এজন্য এর নাম ইন্দো-গ্রীক শিল্প। বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত গ্রীক ও পরে কুষাণদের হাতে এর উন্নতি হয়।

গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের মধ্যে প্রভেদ। গ্রীক বা রোমের চিত্রকলা এবং ভারতীয় চিত্রকলার মধ্যে প্রভেদ তাদের পশুচিত্রে ধরা পড়ে। গ্রীক শিল্পীর মূর্তি কল্পনায় বাহিরের রূপটি অতিমাত্রায় প্রকাশ হয়েছে, অন্তরের রূপটি বেশী ফুটে উঠতে পারেনি। ভারতীয় শিল্পী পশুরূপের অন্তরের ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন, গ্রীক শিল্পী প্রকৃতির অনুকরণে নিপুণতা দেখিয়েছেন। শিলাচিত্রে কিন্নর অথবা গন্ধর্বের রূপকল্পনায় ভারতীয় শিল্পীর মৌলিকতা আছে। মিশর ও আসিরিয়ার মানুষ ও পশুরাজের যুগ্মমূর্তি সামঞ্জস্যহীন। মাদুরা মন্দিরের কামধেনুর স্কন্ধের উপর নারীর মুখ কৌশলে সংযোজিত হয়েছে। গ্রীক শিল্পীর প্রতিভা বাহিরের সৌন্দর্যে বিস্পষ্ট। ভারতীয় দেবমূর্তি স্বর্গীয় পবিত্রতার আধার। গ্রীক শিল্পী রূপের সাধনা করেছেন। ভারতীয় শিল্পী অধ্যাত্মিকতার সাধক। এই দুই দেশের শিল্পের গতি বিপরীত দিকে।

মিশর ও ভারতীয় শিল্পের প্রভেদ। মিশর ও ভারতের ভাস্কর্যে দূরত্বের ভাব প্রকট কিন্তু মিশরীয় শিল্পের বিরাটত্ব ভারতীয় শিল্পে পাওয়া যায় না। গ্রীসের নারীমূর্তিতে রূপরস অতি উগ্র আকারে পরিস্ফুট। ভারতীয় ভাস্কর্যে নারীরূপ কল্পনায় বিচিত্রভাব পরিদৃষ্ট। যক্ষসুন্দরীর রূপে লালসা, গৃহলক্ষ্মীর রূপে সলজ্জভাব, দেবী প্রতিমার রূপে সংযম অভিব্যক্ত। গ্রীসের দেবী প্রতিমার মানুষী ইন্দ্রিয়বোধ, ভারতের দেবীমূর্তিতে মাতৃত্বের গৌরব প্রতিফলিত। আদিবুদ্ধের জননী প্রজ্ঞাপারমিতার প্রতিমায় অধ্যাত্মিকতা ও পবিত্রতা মূর্তিমতী হয়ে বিকাশ লাভ করেছে।

চীনের শিল্প ও নাট্যকলা। চীনা 'হুয়া' শব্দের অর্থ 'কাঠ বা পাথরের উপর দাগ টানা'। চীনের ঋগ্বেদ সি-কিং নামক গ্রন্থে (১৩০০ —৭০০ পূঃ খ্রীঃ) ছবির উল্লেখ আছে। যৌন প্রেমের পেলবতা এবং সাময়িক উত্তেজনার প্রচণ্ডতা, এই দুইটি বিরুদ্ধ শক্তির তাড়নায় মনুষ্য হৃদয়ের ভাবসমুদ্র উদ্বেলিত হয়।

ইহাই স্বভাবের পরিপ্রেক্ষিতে অঙ্কিত হয়ে চীনের শিল্প ও কাব্যকলার ইতিহাসে প্রধান স্থান গ্রহণ করেছে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে সাম্রাজ্যের নগরে নগরে কন্‌ফিউশিয়াসের মন্দির নির্মিত হয়েছিল। চীনারা নির্মাণ কার্যে পাথর ব্যবহার করত না, ইট ও কাঠ ব্যবহার করত। মোগলদের তাঁবুর অনুকরণে তারা একতলা গৃহ নির্মাণ করত। দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি প্রচলিত ছিল। চো ও শ্যাং বংশের রাজত্ব কালে ব্রোঞ্জের মূর্তি গঠিত হত। চিত্রিত মাটির বাসন খোদাই-এর কাজ স্থাপত্য মুদ্রাঙ্কন কাগজনির্মাণ রেশম ব্যবহার প্রভৃতি সুকুমার শিল্পে তারা বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। কু-কাই-টী চতুর্থ শতকের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ছিলেন। ভাস্কর্যে চীনের লোক উন্নত ছিল না কিন্তু মাটির বাসন নির্মাণে তাদের দক্ষতা অতুলনীয় ছিল।

চীনের চিত্রকলা ভারতীয় আদর্শ ও চৈনিক শিল্প প্রতিভার সুমধুর ফল। বৌদ্ধযুগের অনুপ্রেরণায় সংস্কৃতি বিনিময় সমগ্র এশিয়াকে একতাসূত্রে গ্রথিত করে মহামানবের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। কাশ্মীরের শিল্পী ধর্মপ্রচারক গুণবর্মন এবং কুমারজীব (৪০০ খ্রীঃ) ভারতীয় কলাশাস্ত্রের পণ্য সংগ্রহ করে চীনে নিয়ে যান। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম এশিয়ার শিল্পকলার প্রধান উৎস টুন্‌-হুয়াং থেকে সৌন্দর্যবোধের ধারা প্রবাহিত হয়ে চৈনিক শিল্পের সহিত মিশ্রিত হয় এবং তাকে কোরিয়া ও জাপানের শিল্পমানসের সঙ্গে সংযুক্ত করে। সেং-হুই নামে সোগ্‌ডিয়ার একজন ভিক্ষু চিত্রশিল্পী এবং ধর্মগুপ্ত নামে একজন ভারতীয় চীনা চিত্রশিল্পীদের শিক্ষক ছিলেন। শাক্য-বুদ্ধ নামে আর একজন ভারতীয় পশুচিত্র এঁকেছিলেন। এই সকল বিদেশী ভিক্ষু চিত্রশিল্পীগণ ষষ্ঠ ও সপ্তম শতকে চীনে আসেন। অমিতাভ শাক্যমুনি এবং মৈত্রেয়ীর মূর্তি যথাক্রমে সপ্তম ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকের খোদাইশিল্পে প্রধান স্থান গ্রহণ করে। ট্যাং বংশের সম্রাট সিং-হুয়াং-এর রাজত্ব কালে (৭১২-৭৫৫ খ্রীঃ) চীনে নাটক নাট্যশালা ও নটনটীর আবির্ভাব হয়। মোগলদের চীন আক্রমণ ও অধিকার-সত্ত্বেও সুং সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় চীনের চিত্রশিল্পের সৌন্দর্যাদর্শ উচ্চসীমায় উঠে এবং এরই প্রভাব জাপানী চিত্রশিল্পে পরিস্ফুট।

জাপানের শিল্পকলা। জাপানের প্রাগৈতিহাসিক যুগের শিল্প প্রস্তরের কবর থেকে সংগৃহীত হয়েছে। যে বীর জাতি জাপানে আবির্ভূত হয়ে এনস্‌ নামে আদিম অধিবাসীদের বিতাড়িত করে, তাদের কবর থেকে লোহের

অস্ত্রশস্ত্র বর্ম শিরস্ত্রাণ মাটির বাসন ব্রোঞ্জের আয়না সোনায় মোড়া তামার গহনা প্রভৃতিতে বৌদ্ধপ্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করে। সম্রাট শোটকু তেইশি (৫৭৪—৬২২ খ্রীঃ) বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং বৌদ্ধধর্ম-বিরোধী আন্দোলন দমন করেন।

বৌদ্ধধর্ম প্রচারের সহিত জাপানে শিল্প ও কলাচর্চা উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, এবং ইয়ামেটোর সহিত চীনের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়। ভারতীয় দর্শন ও চীনা স্থাপত্য ইণ্ডো-গ্রীক ইণ্ডো-গুপ্ত উই ও ট্যাং ভাস্কর্য ভারতীয় ইরাণী ও ট্যাং চিত্রশিল্প এবং অজন্তা শিল্পের প্রভাব জাপানী শিল্পের উপর প্রতিফলিত হয়ে জাপানী মানসের সৌন্দর্যানুভূতির দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। জাপান সুদূর প্রাচ্যের গ্রীসে পরিণত হল এবং জাপানী জাতীয় জীবনের বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। বুদ্ধের শিষ্যদের এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রচারকদের চিত্র অঙ্কন করে জাপানের চিত্রশিল্পীগণ সৌন্দর্যবোধের ভিতর বস্তুতান্ত্রিক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। অধ্যাত্মিকতার সহিত ঐহিকতার মিলন ঘটেছিল। কিচিজোটেন বা শ্রীদেবীর চিত্রে সৌন্দর্যবোধ, বোধিসত্ত্বদের চিত্রে পরকীয়া প্রেমে আত্মবিস্মৃত শ্রীকৃষ্ণের গূঢ় অধ্যাত্মভাব এবং এগারোটি মুণ্ডযুক্ত কোয়াননের মূর্তিতে মহাযান শিল্পের অতিমানবিক গুণাবলী অভিব্যক্ত হয়েছিল। জাপানী সাহিত্যেও এই গৌরবান্বিত যুগের সৃষ্টিপ্রেরণা প্রতিফলিত হয়েছিল। লুম্বিনী ঐক্যতান অর্থাৎ ভারতীয় সঙ্গীত ও নাটকের বিষয়বস্তু মস্তিষ্ক ভেদ করে জাপানীদের অন্তরে প্রবেশ করল। জাপান এক্ষণে ভারতবর্ষকে তেন-জিকু বা স্বর্গরাজ্য বলে ভাবতে শিক্ষা করল। একটি জলকণা সৃষ্টির জন্য যেমন দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু এবং একটি অক্সিজেন পরমাণু বিদ্যুৎশক্তির অপেক্ষা রাখে তেমনি চীন ও জাপানের সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় ভাবধারার সংঘাতে ও মিলনে জাপানী জাতি একটি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করেছিল।

কিওটো নারা এবং নানিওয়া নামক তিনটি প্রাচীন নগরের মন্দির জাপানী শিল্পের কেন্দ্র ছিল। টোরি বুশির ভাস্কর্য ও দেওয়ালের উপর আঁকা ছবি হোরিয়ুজি মন্দিরে বর্তমান আছে। ফুজিওয়ারা যুগের শিল্পে বৌদ্ধ প্রভাব লক্ষিত হয়। টেনডাই সম্প্রদায়ের উপাস্য বুদ্ধ অমিতাভ এমন কি শাক্যমুনির চেয়ে জাপানী শিল্পে উচ্চতর স্থান পেয়েছেন। নবম শতকের মধ্যভাগে কানোওকা প্রকৃতিক দৃশ্য চৈনিক সাধু ও অশ্বের ছবি এঁকে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। দশম

শতকে জাপানী চিত্রশিল্পীগণ তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। কোজ সম্প্রদায়ের চিত্রকারগণ ধর্মবিষয়ক ছবি, টাকুমা সম্প্রদায়ের চিত্রকারগণ ধর্ম-বিষয়ক ছবি, টাকুমা সম্প্রদায়ের শিল্পীগণ বৌদ্ধ সাধুদের ছবি আঁকত; কাসুগা সম্প্রদায় ইয়ামেটো শিল্পের জনক। উনকাই বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন। কোশো ও তাঁর পুত্র জোকো এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে উন্‌কাই জাপানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতি। ব্রোঞ্জ ও কাষ্ঠ-নির্মিত বহুমূর্তি এই যুগের সৃষ্টি। এই সময়ের চিত্রে ও স্থাপত্যে বৌদ্ধ জেন সম্প্রদায়ের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্ম জাপানী চিত্রশিল্পে স্বাভাবিক ও অনাড়ম্বর মানসিকতা আমদানী করে তাকে সজীব ও আবেগময় করে তুলেছিল।

জাপানী নাট্যকলার ইতিহাস তের শত বৎসরের বেশী পুরাতন। এই দীর্ঘ সময়ের ভিতর বিভিন্ন প্রকারের বিচিত্র নাট্যকলার উদ্ভব হয়েছে। তার মধ্যে কাবুকী নো এবং বুগাকু উল্লেখযোগ্য। কাবুকী রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক গীতিনাট্য ও প্রহসন অভিনীত হত। নো জাপানের ক্লাসিক নাচগান ও অভিনয়। নো জাতীয় অভিনয়কলা কাবুকীর চেয়ে পুরাতন। বুগাকু আরও প্রাচীন এবং অচল। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগে চীন ভারতবর্ষ ও কোরিয়া থেকে এই ধরণের অভিনয়-কলা জাপানে আমদানি হয়েছিল বলে বিশেষজ্ঞরা বলেন।

ভারতবর্ষ, চীন ও জাপানের আর্টের বৈশিষ্ট্য। পূর্ব এশিয়ায় তিনটি দেশে অর্থাৎ ভারতবর্ষ চীন ও জাপানে যে আর্টের জন্ম তা মানুষকে শুধু আনন্দ বিতরণ করে ক্ষান্ত হয়নি, মানুষের চেতনার উন্নয়ন ও শিক্ষাদান কার্যে প্রযুক্ত হয়েছিল। হিতকে মনোহারী করা আর্টের লক্ষ্য। এই তিনটি দেশের আর্ট প্রকৃতিকে এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে উপলব্ধি করার জন্য মানুষের চেতনাকে গভীর করে তুলেছে, মানুষকে অধ্যাত্মদৃষ্টিসম্পন্ন করেছে। এই আর্টের লক্ষ্য ও ফল সামাজিক কল্যাণ।

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ইয়োরোপ

রোমান সাম্রাজ্যের পতন যে বিরাট আন্দোলন সৃষ্টি করে তা ক্রমে শান্তভাব ধারণ করল। নূতন ভাবে সমাজ গঠিত হল। ধার্মিক খ্রীষ্টান রাজাদের চেষ্টায় খ্রীষ্টান ধর্ম বিস্তৃত হল। নূতন রাজ্যের অভ্যুদয় হল। ক্লোভিসের নেতৃত্বে (৪৮১-৫১১) ফ্রাঙ্কগণ ফ্রান্স, বেলজিয়ম এবং জার্মেনির কিয়দংশে একটি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করল। ক্লোভিসের পিতামহের নাম অনুসারে এই বংশের নাম মিরোভিঞ্জিয়ান বংশ। এই বংশের রাজাদের প্রধান কর্মচারী মেয়র রাজ্যে সর্বেসর্বা হয়ে উঠে। মেয়রের পদ বংশানুক্রমিক ধারায় কায়েম হয়ে গেল। রাজা তার হাতের পুতুল হয়ে গেল।

দেড়শত বৎসর ফ্রাঙ্কিস জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত থাকে। এক বিভাগের নাম নিউষ্ট্রিয়া, অপর বিভাগের নাম অষ্ট্রেসিয়া বা রাইনল্যাণ্ড। নিউষ্ট্রিয়াকে কেন্দ্র করে বর্তমান ফ্রান্স গড়ে উঠেছে। এর অধিবাসীরা ল্যাটিন অপভ্রংশ ভাষায় কথা বলত। এই ভাষা পরবর্তী যুগে ফরাসীভাষায় রূপান্বিত হয়। অষ্ট্রেসিয়া জার্মান থেকে গেল। ৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রেসিয়ার প্রধান রাজকর্মচারী পেপিন নিউষ্ট্রিয়া জয় করে সমগ্র ফ্রাঙ্ক জাতিকে এক শাসনাধীন করেন।

তাঁর পুত্র চার্লস মার্টেল মুসলমানদের অগ্রগতি রোধ করেন। তারা টুরস পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস তাদের পরাস্ত করে তাদের শক্তি ধ্বংস করেন। এর পর থেকে পিরিনিজ পর্বতমালা তাদের বাহুবলের সীমা নির্ধারণ করেছিল। তারা পশ্চিম ইয়োরোপে আর কোনদিন অগ্রসর হতে সমর্থ হয়নি।

চার্লস মার্টেলের দুই পুত্রের ভিতর একজন সন্ন্যাসী হয়ে সংসার ত্যাগ করে। দ্বিতীয় পুত্র পেপিন সমস্ত ক্ষমতা হস্তগত করে ক্লোভিসের বংশ ধ্বংস করেন। পোপ তাঁকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন। তাঁর পুত্র শার্লেমেন ফ্রাঙ্কো-জার্মানীর উপর আধিপত্য স্থাপন করেন। শার্লেমেনের পৌত্র লুইএর মৃত্যুকাল পর্যন্ত (৮৪০) ফ্রান্স ও জার্মেনি যুক্তরাষ্ট্ররূপে বর্তমান থাকে। তারপর এরা দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হয়ে মানব জাতির ভাবী অমঙ্গল সূচনা করে। এই বিভাগ জাতি ও

মনোভাবের বিভাগ নয়—এই বিভাগ ভাষা ও ঐতিহ্যের বিভাগ এবং ইহাই ফ্রাঙ্কিশ জাতিদের দুইটি পৃথক্ জাতিতে বিভক্ত করেছে। অতীতকালে নিউস্ট্রিয়া এবং অষ্ট্রেসিয়া বিভাগের ভিতর শত্রুতা ও অমঙ্গলের যে বীজ নিহিত ছিল তা এমন কি ১৯১৪ সালে প্রথম মহাসমরের আকারে পুনরায় আত্মপ্রকাশ করেছে।

পশ্চিমাঞ্চলের অসভ্য জাতিদের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ। চার্লস মার্টেল এবং পেপিন যে সকল জাতির উপর প্রভুত্ব স্থাপন করেন তারা বিভিন্ন স্থানে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে বর্তমান ছিল। সপ্তম ও অষ্টম শতকে জার্মান এবং স্লাভোনিক জাতিরা খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হচ্ছিল। ইংল্যাণ্ডে বহু ধর্ম প্রচারকের অভ্যুদয় হয়। ইতিপূর্বে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ব্রিটেনে খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচলিত ছিল। তারপর এই ধর্ম ব্রিটেনের সীমা পার হয়ে আয়র্ল্যাণ্ডে উপস্থিত হয়। সেণ্ট প্যাট্রিক আয়র্ল্যাণ্ডে খ্রীষ্টান ধর্ম আমদানি করেন। ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতকে ইংল্যাণ্ডের উপর অখ্রীষ্টান দুর্দ্ধর্ষ ইংরেজদের অভিযানের ঝড় বয়ে চলে। ৭ম শতকের শেষভাগে একমাত্র মার্সিয়া ছাড়া সমগ্র ইংল্যাণ্ড খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে।

খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের সুফল। নব ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তিগণের অকর্ষিত মন নূতন ভাবধারায় আলোকিত হল। নর্দাম্ব্রিয়ার আশ্রমগুলি বিদ্যা ও জ্ঞান আলোচনার পীঠস্থানে পরিণত হল। টার্সাসের থিওডোর ক্যাণ্টারবেরির প্রধান পুরোহিত ছিলেন। তাঁর বহু শিষ্য গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। টাইন নদীর তীরে জ্যারোর আশ্রমে মহাজ্ঞানী বীড্ ছয় শত অন্তেবাসীর শিক্ষাদানে ব্যাপৃত ছিলেন। দেশ-বিদেশের বহু কোবিদ জ্ঞানী ও ছাত্র তাঁর কাছে জ্ঞান লাভ করে ধন্য হতেন। নানা বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্য অগাধ ছিল। তাঁর পুস্তক ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে পঠিত ও ব্যাপক ভাবে আদৃত হত। সেণ্ট বনিফেস ইয়োরোপের বহু জাতিকে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করেন।

রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টানধর্মের প্রয়োগ। ইংল্যাণ্ড ও ইয়োরোপের রাষ্ট্রকর্ণধারগণ বিজিত বিভিন্ন জাতির প্রজাদের একতাসূত্রে আবদ্ধ করার উপায় স্বরূপ খ্রীষ্টান ধর্মকে ব্যবহার করেন। খ্রীষ্টান ধর্ম রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত হয়ে দুর্বলের উপর সবলের, নিরীহ অনুন্নত জাতির উপর উন্নত লোভী বিজেতার প্রাধান্য স্থাপনের অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়ে পৃথিবীতে বহু অনর্থ সৃষ্টি করেছে, হৃদয়ের ধর্মের স্থানে তরবারির ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছে।

শার্লেমেন। পেপিনের পুত্র চার্লস্ ইতিহাসে শার্লেমেন নামে বিখ্যাত। আলেকজান্দার এবং জুলিয়স্ সিজারের ন্যায় শার্লেমেনের আলেখ্য উজ্জ্বল তুলিকায় চিত্রিত হয়েছে।

ইতিপূর্বেই রোমান সাম্রাজ্যের সমাধি হয়েছিল। বাইজানটাইন সাম্রাজ্য মরণোন্মুখ। ইয়োরোপের মানুষের মানসিক অবস্থা শোচনীয়। উচ্চ শ্রেণীর সৃজনী প্রতিভা ছিল না। পুরোহিতরা যীশুর শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞ বা উদাসীন ছিল। রোমের চার্চ মর্ত্যে স্বর্গরাজ্য স্থাপনের আদর্শ বিস্মৃত হয়ে পৃথিবীতে রোমের আধিপত্য স্থাপনে আগ্রহান্বিত হল। তার মতে সমগ্র ইয়োরোপকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করতে হলে রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব একান্ত প্রয়োজন।

শার্লেমেনের খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার। সাম্রাজ্যলিপ্সার বশবর্তী হয়ে শার্লেমেন একটির পর একটি দেশ জয় করতে লাগলেন। এই সকল যুদ্ধকে তিনি ধর্মযুদ্ধ নামে অভিহিত করতেন। স্যাক্সন ও বোহিমিয়ানদের ভিতর, হাঙ্গেরীতে, ডালমেশিয়ার ভিতর দিয়ে আড্রিয়াটিকের তীরভূমিতে তিনি অসিমুখে যীশুর বার্তা বহন করেছিলেন। পিরিনিজ পর্বতমালা পার হয়ে তিনি মুসলমানদের বার্সিলোনা পর্যন্ত বিতাড়িত করেন। তিনি ওয়েসেক্স থেকে নির্বাসিত এগবার্টকে আশ্রয় দেন এবং তাঁরই সাহায্যে এগবার্ট ওয়েসেক্সের সিংহাসনে উপবিষ্ট হন (৮০১)। এগবার্ট কর্ণওয়ালের ব্রিটনদের পরাজিত করেন এবং শার্লেমেনের মতো যুদ্ধ করে সমগ্র ইংল্যাণ্ডের রাজা বলে স্বীকৃত হন (৮২৮)। খ্রীষ্টানধর্ম প্রচারের অজুহাতে শার্লেমেন উত্তর ও বাল্টিক্ সাগরের দিকে অগ্রসর হন। ঐ অঞ্চলের অ-খ্রীষ্টান জাতিগুলি সমুদ্রের দিকে সরে গেল এবং ফ্রান্সের উত্তর তীরভূমি ও ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করে প্রতিশোধ নিতে লাগল।

স্যাক্সন ও ইংরেজগণ, তাদের ডেনমার্ক ও নরওয়ের সগোত্র সকল 'ভাইকিং' নামে পরিচিত। এরা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার লবণাম্বুবিধৌত বেলাভূমি থেকে বহির্গত হয়ে পালহীন দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ তরণী সাহায্যে দলে দলে এসে উপস্থিত হল। রক্তপাত, লুণ্ঠন ও অত্যাচার তাদের বিদ্বেষ-বহ্নির উত্তাপ প্রমাণিত করে। তারা খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী ও ভিক্ষুণীদের প্রবল শত্রু ছিল। তারা মঠ ও আশ্রম পুড়িয়ে দিত। মঠবাসী ও আশ্রম-বাসীদের নির্বিচারে হত্যা করে গায়ের জ্বালা মেটাত।

পঞ্চম থেকে নবম শতকের মধ্যে উত্তরাঞ্চলের অর্ণবচারী দুর্দ্ধর্ষ জাতি সকল সমুদ্রের উপর তরণীচালনায় সুদক্ষ ও সাহসী হয়ে উঠল, উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে আইস্‌ল্যাণ্ড, এমন কি তুহিনাবৃত গ্রীণল্যাণ্ডে উপস্থিত হয়েছিল। নবম শতকে তাদের লুণ্ঠন-অভিযান সুসংবদ্ধ আক্রমণের আকার ধারণ করেছিল। ৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে দিনেমারগণ ইংল্যাণ্ডের অনেকখানি অংশ জয় করে। ইংল্যাণ্ডের রাজা আলফ্রেড্‌ তাদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেন এবং তাদের অধিকৃত স্থান ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। এদেরই আর একজন নেতা ফ্রান্সের তীরভূমি অধিকার করে। তাদের নাম অনুসারে এই স্থানের নাম নর্মাণ্ডি হয়েছে।

ক্রমে দিনেমারগণ ইংল্যাণ্ড এবং নর্মাণ্ডির ডিউক ইংল্যাণ্ডের সিংহাসন অধিকার করে। ওয়েড্‌মোরের সন্ধি অনুসারে দিনেমারগণ খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে। নর্মাণ্ডিতেও রোলফের বংশধরগণ খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হয়, নর্স ভাষা ত্যাগ করে এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা করে।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য। লোম্বার্ডির রাজা পোপের রাজ্য আক্রমণ করলে পোপ শার্লেমেনের সাহায্য প্রার্থনা করেন। শার্লেমেন ইটালিতে উপস্থিত হন এবং শত্রুদের বিতাড়িত করেন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ শার্লেমেনের মস্তকে রোমান সম্রাটের মুকুট স্থাপন করেন। তিনি সিজার ও অগষ্টাস্‌ নামে অভিহিত হন। শার্লেমেন কনষ্টানটিনোপলের সম্রাজ্ঞী আইরিনিকে বিবাহ করে পূর্ব ও পশ্চিম সাম্রাজ্যদ্বয়কে সংযুক্ত করবেন ভেবেছিলেন। পোপ প্রদত্ত সম্রাট উপাধি গ্রহণ করতে বাধ্য হওয়ায় দুইটি সাম্রাজ্য পৃথক হয়ে গেল এবং বাইজানটাইন চার্চ রোম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য ইতিহাসে একটি অদ্ভুত ঘটনা। ইহা পবিত্র নয়, সাম্রাজ্য নয়, রোমানও নয়। বন্ধ্যাপুত্রের মতো এই সাম্রাজ্য ছিল একটি একান্ত কাল্পনিক অলীক বস্তু। হীনবল হৃতগৌরব অর্ধমৃত রোমান সাম্রাজ্যের জীর্ণ কঙ্কালের উপর খ্রীষ্টান ধর্ম ও খ্রীষ্টান রাষ্ট্রের ধারণা সন্নিবেশিত হয়ে একে বৈশিষ্ট্য দান করেছিল। সম্রাট এবং পোপ উভয়েই পৃথিবীতে ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন। একজন ছিলেন রাজনৈতিক বিষয়ে সর্বেসর্বা, আর একজন ছিলেম আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সর্বময় কর্তা। ৮১২ খ্রীষ্টাব্দে বাইজান-টিয়ম শার্লেমেনকে সম্রাট বলে স্বীকার করে, সুতরাং যে রোমান সাম্রাজ্য ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হয়েছিল তা ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের রূপ ধারণ করে চেতনা লাভ করল।

শার্লেমেন অল্পই লেখাপড়া জানতেন। পাণ্ডিত্যের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দেশ-বিদেশের বহু জ্ঞানী এবং সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজ পণ্ডিত অ্যাল্‌সিউন তাঁর রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। এই সকল পণ্ডিত পুরোহিত ছিলেন। তাঁরা খ্রীষ্টান ধর্মতত্ত্ব এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বিষয়ের আলোচনা করতেন। পুরোহিতের সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি গোঁড়ামি কুসংস্কার তাঁদের প্রভুর মনে বাইবেল ও বাইবেল প্রতিপাদিত ধর্মের প্রতি প্রচুর অনুরাগ সৃষ্টি করেছিল। সম্রাট ধর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন, সাম্রাজ্য সংগঠন বা শাসনসংক্রান্ত ব্যাপারে মন দিবার সময় পেতেন না। কেহ দীক্ষা গ্রহণ করতে অস্বীকার করলে কিম্বা দীক্ষার পর মত পরিবর্তন করলে মৃত্যুদণ্ডের বিধান ছিল।

যে রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রনেতা ধর্ম নিরপেক্ষ, যিনি যুক্তি ও প্রজ্ঞাকে গ্রহণ করতে সমর্থ, তিনিই রাষ্ট্রিক দায়িত্বের গুরুভার গ্রহণ করার অধিকারী। প্রাচীন কালে প্রচলিত ধর্মের বিধি নিষেধ ও অনুশাসনের দোহাই দিয়ে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা স্বার্থ কায়েম করে নিতে চেষ্টা করেছে। পুরোহিত ও রাজা, ধর্মনীতি ও রাজশক্তি পরস্পরের হাত ধরাধরি করে পরস্পরের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। ধর্মব্যবস্থায় মন্দিরে ও গির্জায় আড়ম্বরপূর্ণ পূজা ও আরতি কর্ণপটহভেদী বাদ্য এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জাঁকজমকশীল পোষাক পরিচ্ছদ, অভিষেক অনুষ্ঠান সাধারণ মানুষের মনে ভীতি ও সম্ভ্রম সৃষ্টি করেছে। শৈশব কাল থেকে নির্বিচারে গ্রহণ করতে শিক্ষা করে, বিনা আপত্তিতে প্রভুত্ব মেনে নিয়ে মানুষ মনুষ্যত্ব বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

দেশজোড়া অজ্ঞানতার মধ্যে শার্লেমেন ইয়োরোপের জনমনের উপর শিক্ষার আলোকপাত করেন। তিনি স্থাপত্যের উন্নতির জন্য উৎসাহ দিতেন, বহু গির্জা ও মঠ সংলগ্ন বিদ্যালয় স্থাপন করেন, লাটিন সাহিত্য পাঠে উৎসাহ দিতেন, এবং জার্মান ভাষার সঙ্গীত ও গল্প সংগ্রহ করেছিলেন। স্পেনের সারাসেনগণ বোগ্‌দাদের আব্বাসিদ বংশের খলিফার আনুগত্য স্বীকার করতে চায়নি। কনস্টানটিনোপলের সহিত শার্লেমেনের সদ্ভাব ছিল না। এজন্য শার্লেমেন প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বোগ্‌দাদের খলিফার সহিত এবং বোগ্‌দাদের খলিফা স্পেনের স্বাধীন মুসলিম রাজ্যের বিরুদ্ধে পরস্পর মিলিত হতে চেয়েছিলেন।

৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে শার্লেমেনের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে জার্মেনি ও ফ্রান্সের রূপ গ্রহণ করে। চার্লস্ শব্দ থেকে তাঁর বংশের নাম কার্লোভিঞ্জিয়ান

হয়েছে। সম্রাট ওটো দি গ্রেট (৯৬২—৯৭৩) জার্মান জাতি গঠন করেন। হিউ ক্যাপেট দুর্বল কার্লোভিঙ্গিয়ান রাজাদের বিতাড়িত করে ফ্রান্সের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন (৯৮৭)। তখনও ফ্রান্স বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ছিল। সেই সকল অংশে এক একজন স্বাধীন জমিদার ছিল। তারা পরস্পর যুদ্ধ করত, সম্রাট ও পোপকে ভয় করত এবং কখনও বা মিলিত হয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করত। জাতি হিসাবে পরিচিত হওয়ার সময় থেকে ফ্রান্স ও জার্মানি আজ এক হাজার বৎসর পরস্পর কলহ ও যুদ্ধ করে আসছে। মধ্যযুগের প্রারম্ভে (৯৬২—১২৫০) যে তিনটি রাজবংশ জার্মানিতে রাজত্ব করেছিল তাদের ভিতর হাপ্‌স্‌বার্গ বংশ ১৯১৮ সাল পর্যন্ত ক্ষমতাশালী ছিল।

পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে পোপ এবং সম্রাটের ভিতর প্রতিযোগিতা চলে। এর কলহ-কাহিনীতে মধ্যযুগের প্রারম্ভ কণ্টকিত হলেও যীশুখ্রীষ্টের মহনীয় শিক্ষা ও মহিমময় জীবনাদর্শ অসংখ্য নরনারীর জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে মধুর ও সুন্দর করে তুলেছিল।

রাশিয়া। এই সময় রাশিয়া ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হয়। ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে উত্তরাঞ্চল থেকে আগত রুরিক নামে জনৈক ব্যক্তি রুষ রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করে। ইয়োরোপের পূর্বাঞ্চলে সার্বিয়ান ও বুলগারগণ বাস স্থাপন করেছিল। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য এবং রাশিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে ম্যাগিয়ার এবং পোলগণ রাজ্য পত্তন করেছিল।

এদিকে উত্তর ইয়োরোপ থেকে দলে দলে লোক এসে পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চলের দেশগুলিকে আক্রমণ করতে লাগল। এদের নাম নর্স বা নর্মান। এরা ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করে বৃহৎ নদীপথে বিভিন্ন দেশের অভ্যন্তরে গমন করত। লুণ্ঠন গৃহদাহ হত্যা ধ্বংস তাদের যাত্রাপথের সঙ্গী ছিল। তারা রোম লুণ্ঠন করল। কনস্টানটিনোপল আক্রান্ত হওয়ার উপক্রম হল। এই সকল লুণ্ঠনকারী দস্যু উত্তর-পশ্চিম ফ্রান্স, দক্ষিণ ইটালি এবং সিসিলি অধিকার করে তথায় বসবাস করল ও জমিদার বলে' পরিচিত হল। ১০৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই সকল নর্মান উইলিয়মের নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ড জয় করে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে ইয়োরোপের অবস্থা এইরূপ ছিল। এই সময়ে গজনীর মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করছিলেন। প্রায় এই সময়েই বোগদাদের আব্বাসিদ খলিফাদের উচ্ছেদ হয়েছিল এবং পশ্চিম এশিয়ায় সেলজুক তুর্কীদের নেতৃত্বে ইসলামের পুনরভ্যুদয় হয়। স্পেনে আরবদের

ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকলেও তারা স্বদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বোগ্‌দাদের শাসনকর্তাদের সঙ্গে এদের সদ্ভাব ছিল না। উত্তর আফ্রিকা প্রায় স্বাধীন হয়ে গেল। কেবলমাত্র মিশর স্বাধীন হয়নি। সেখানে একজন পৃথক খলিফা ছিলেন। উত্তর আফ্রিকা কিছুকাল মিশরের খলিফার অধীন ছিল।

'রোমানেস্ক' স্থাপত্য ও শিল্প। মানুষের মনের গতি ও প্রকৃতি বিচিত্র। এজন্য তার ভাবের ও রীতির আত্মপ্রকাশ ও রূপ-কল্পনাও বিচিত্র। বিভিন্ন যুগের সভ্যতা, বিভিন্ন দেশের ও জাতির শিল্পের রূপ বিভিন্ন আকারে প্রকাশিত হয় এবং তাতে যুগোচিত ধর্ম ও মনোভাব প্রতিফলিত হয়। রোমান স্থাপত্য-রীতির বিলয় এবং গথিক স্থাপত্য রীতির প্রবর্তনের মধ্যবর্তী কালে, পঞ্চম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে স্থাপত্য শিল্পরীতি প্রচলিত ছিল তার নাম রোমানেস্ক। রোমান সাম্রাজ্যিক যুগের স্থাপত্য শিল্পরীতি সঙ্গতি ও সামঞ্জস্য প্রধান। পামিরা ও ব্যালবাকের স্থাপত্যশিল্প খ্রীষ্টধর্ম প্রভাবিত বাইজানটাইন রীতির অবাস্তব সৌন্দর্য উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়েছিল। পশ্চিম অঞ্চলের স্থাপত্য শিল্প প্রায় অনুরূপ আকার ধারণ করেছিল।

'রোমানেস্ক' শিল্পে রোমান রীতি প্রতিফলিত হলেও তার ভিতর জাতি ও সমাজের নূতন পরিস্থিতির প্রভাব বিস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই নির্মাণ শিল্পে গ্যালারি-যুক্ত রঙ্গালয়, বৃহৎ জলাধার, বিজয় তোরণ, দেবালয়ের পরিবর্তে দুর্গ ও প্রাসাদ, গোলাকার বা চতুষ্কোণ বিরাট গির্জা ও ভজনালয় স্থান পেয়েছিল। মিশরের হেলিনিক এবং রোমান স্থাপত্য উর্ধ্বগামী ছিল না। কিন্তু যে যুগে দুদ্ধর্ষ আরব ও জলদস্যুদের অবাধ লুঠতরাজ দেশে দেশে অশান্তির আগুন জেলে দিয়েছিল, যখন উত্তরাঞ্চলের লোক, সারাসেন ও হাঙ্গেরিয়ানরা লুণ্ঠন হত্যা ও ধ্বংসের অভিনয় করে মানবের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছিল, তখন দুর্গের প্রয়োজনীয়তা অবিসংবাদী হয়ে উঠল। একসঙ্গে দলবেঁধে উপাসনার জন্য গির্জা প্রয়োজন হল। লোকজনকে উপাসনার জন্য আহ্বান করার উদ্দেশ্যে মস্‌জিদের উপর চূড়া থেকে ঘণ্টাধ্বনি করার জন্য উচ্চ মঞ্চ আবশ্যক হল। পূর্বকালের অন্ধকারময় মন্দিরের পরিবর্তে বহু লোকের একত্র মিলিত হওয়ার উপযোগী পরিসরযুক্ত গির্জা নির্মিত হল।

ষোল

বৃহত্তর ভারত

আর্যদের ভারতবর্ষে প্রবেশের পূর্বে ভারতবর্ষে অষ্ট্রিক-দ্রাবিড় সভ্যতা বর্তমান ছিল। ক্রমে উত্তর ভারতে আর্য ভাষা গৃহীত হল, হিন্দু জাতির জন্ম হল, হিন্দুধর্ম, এবং ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের উৎপত্তি হল। অনার্য কথা ও কাহিনী অবলম্বন করে, অনার্য দেবদেবী আচার অনুষ্ঠান প্রভৃতি গ্রহণ করে আর্যরা উত্তর ভারতে গঙ্গার উপত্যকায় যে সভ্যতা সৃষ্টি করেন কালক্রমে তা সমগ্র ভারতে, পূর্বদিকে বাংলা দেশে, পশ্চিমে সিন্ধু ও সৌবীরে, দক্ষিণে অন্ধ্র কর্ণাট দ্রাবিড় কেরলে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। তারপর এই সভ্যতা ভারতের সীমা অতিক্রম করে ব্রাহ্মণ্যধর্মী বণিক এবং রাজা গুরু পুরোহিতদের সাহায্যে ইন্দোচীনে ও দ্বীপময় ভারতে উপস্থিত হল।

ভারতীয় সভ্যতা-নদী তিনটি স্রোতে বিভক্ত হয়ে প্রবাহিত হয়। একটি স্রোত উত্তরদিকে চীনে এবং চীন থেকে কোরিয়া ও জাপানে আসে। এজন্য ভারতীয় প্রভাব জাপানের ধর্মে ও জীবনে অনুস্যূত আছে। দ্বিতীয় স্রোতটি ইরাণ ও গ্রীসের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপে উপস্থিত হলেও, ইয়োরোপ একে স্বীকার করেনি। তৃতীয় স্রোতটি মালয় শ্যাম ইণ্ডোচীন ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে উপস্থিত হয়েছে।

ভারতীয় সভ্যতার সুধাভাণ্ড হস্তে ধারণ করে যারা দেশ-বিদেশে গমন করেছিল তারা আসুরিক বলের আশ্রয় নেয়নি, ধর্মপ্রচার বা ব্যবসার অজুহাতে দুর্বল ও অনুন্নত দেশে শাসন ও শোষণের পথ প্রস্তুত করেনি। তারা মৈত্রী ও করুণার দূত হয়ে গিয়েছিল, জ্ঞানের আলো বিস্তার করে বর্বর অর্ধসভ্য অথবা সভ্য মানসের সংস্কার করেছিল। তারা বলেছে, ধম্মদানং সব্বদানং জিনাতি—ধর্মদান অন্য সকল দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। এজন্য চীন ধর্মে ও শিল্পে ভারতের কাছে ঋণী। বৌদ্ধধর্ম ও নূতন ভাব সম্পদের গঙ্গোত্রীধারায় চীনের অন্তর্জীবন অভিষিক্ত হয়েছিল।

ইয়োরোপের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির প্রাধান্য দেন এবং প্রশান্ত

মহাসাগরের দ্বীপ বা তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলি সম্বন্ধে উদাসীন থাকেন। একদিকে যেমন গ্রীক সভ্যতার ধারা পশ্চিম ইয়োরোপের উপর প্রবাহিত হয়ে তাকে নূতন ভাবসম্পদে সরস ও সুশ্যামল করে তুলেছে, অপর দিকে তেমনি ভারতীয় সভ্যতার বাণী চীন ও জাপানে এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জনবহুল দেশগুলিতে উপস্থিত হয়ে তাদের অন্তর্জীবন আলোকিত করেছে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক থেকে উপনিবেশ স্থাপন চলেছিল। ভারতীয়গণ মালয় যবদ্বীপ সুমাত্রা কাম্বোডিয়া ও বোর্ণিও দ্বীপে গমন করে ভারতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিল। ব্রহ্মদেশ শ্যাম ও ইন্দোচীনে বহু ভারতীয় ঔপনিবেশিক ছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থানের নাম অনুসারে তারা ঐ সকল দেশের নাম দিয়েছিল। ভারতীয় শিল্পী ও স্থপতি বহু গৃহ ও মন্দির নির্মাণ করেছিল। এখনও তাদের ধ্বংসাবশেষ এবং কোন কোন মন্দির বর্তমান আছে। পল্লব রাজ্যের প্রজারা উপনিবেশ স্থাপনে সমধিক আগ্রহশীল ছিল। যবদ্বীপ সুমাত্রা প্রভৃতি দ্বীপে এমন কি ইস্‌লামের আবরণের নিচে হিন্দু সংস্কৃতির আভাস পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রভাব ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, এমন কি ফরমোসায় বিস্তৃত হয়েছিল। এইভাবে এশিয়ায় বৃহত্তর ভারত স্থাপিত হয়েছিল।

দাক্ষিণাত্যের সঙ্গে ইয়োরোপের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। এখান থেকে মুক্তা চাউল সোনা প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য বাবিলোন গ্রীস ও রোমে প্রেরিত হত। দাক্ষিণাত্যে বহু রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। মালাবার উপকূলে আলেকজান্দ্রিয়ার বহু ঔপনিবেশিক ছিল এবং বহু ভারতীয় ঔপনিবেশিক আলেকজান্দ্রিয়ায় বাস করত। অন্ধ্রগণ জাহাজ নির্মাণে এবং সামুদ্রিক ব্যবসায়ে কতখানি অগ্রসর ছিল তা খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকের অন্ধ্র মুদ্রার উপর দুইটি মাস্তুলযুক্ত জাহাজের ছাপ প্রমাণিত করে।

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় দুই হাজার পাঁচশত বৎসর পূর্বে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ এশিয়ার সহিত সংযুক্ত ছিল। মালয়ের লোকেরা যবদ্বীপ ও সুমাত্রা থেকে বোর্ণিওর ভিতর দিয়ে সেখানে হিন্দু সংস্কৃতি বহন করে নিয়ে যায়। ভারতীয় প্রভাব ফিলিপাইনদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে প্রতিফলিত হয়েছিল। তাদের টাগালোক নামক কথ্য ভাষায় বহু সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হয়। ভারতীয় সংস্কৃতি মালয়ের স্থলপথে শ্যাম ও ইন্দোচীনে উপস্থিত হয়েছিল। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ কেডার ভিতর দিয়ে উত্তর ও দক্ষিণ শ্যামে লেওস্‌ কাম্বোজ

এবং চম্পায় গমনাগমন করত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে পল্লবদের আগমনের সহিত মালয় রাজ্যের নাম লংকাসুকা হয়। ভুজঙ্গ নদীর তীরে রাজধানী লংকাসুকা নগর সপ্তম ও অষ্টম শতকে সমৃদ্ধিশালী হয়ে উঠে। এখানে বহু ভগ্ন শিবমন্দির আবিষ্কৃত হয়েছে। পল্লবদের পর রাজেন্দ্র চোল মালয়ের উপর রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করেন। এখানে বহু হিন্দু দেবদেবী গণেশ প্রভৃতির মূর্তি দেখে মনে হয় মালয় প্রধানতঃ হিন্দু ছিল। সপ্তম শতকে দক্ষিণ-পূর্ব সুমাত্রায় শ্রীবিজয় রাজ্য লিগর পর্যন্ত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করে। ৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীবিজয় রাজ্য শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। শৈলেন্দ্র রাজারা কলিঙ্গ এবং মহীশূরের গঙ্গাবংশের অন্তর্গত ছিল। তারা মহাযান ধর্ম গ্রহণ করেছিল। অষ্টম শতকের মধ্যভাগে তারা লিগর থেকে কাম্বোডিয়া চম্পা ও সিংহলে আধিপত্য স্থাপন করে। তারা দেবনাগরী লিপি প্রচলন করেছিল এবং মালয়ের কলিঙ্গ নাম দিয়েছিল। পরে থাইদের এবং যাবানীদের যুগপৎ আক্রমণের ফলে এই সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায়।

অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত ইণ্ডোচীনে তিনটি হিন্দুরাজ্য ছিল। নবম শতাব্দীর প্রথমে ২য় জয়বর্মণ তিনটি রাজ্যকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করে একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি প্রথমে বৌদ্ধ ছিলেন, পরে শৈবধর্মের অনুরাগী হন। জয় বর্মার পৌত্র ইন্দ্রবর্মা অ্যাংগকর বা ওঁকার ভাট নামক স্থানে রাজধানী নির্মাণ করতে আরম্ভ করেন। অ্যাংগকর থোম নগরে রাজা বাস করতেন। ঐশ্বর্যে ও জাঁকজমকশীলতায় এই নগর অদ্বিতীয় ছিল। এখানে দশ লক্ষ লোকের বাস ছিল। এর নিকটে অ্যাংগকর বাট বা বিষ্ণুর বাটী নামে বিরাট মন্দির ছিল। ত্রয়োদশ শতকে একদিকে শত্রুর আক্রমণে, অন্যদিকে মেকং নদীর মুখ বন্ধ হয়ে কাম্বোডিয়া দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এর স্বাধীন রাষ্ট্রিক সত্তা লোপ পায়। অ্যাংগকর ভাটের বিরাট মন্দিরের ধ্বংসস্তূপ এখনও অ্যাংগকর মহানগরীর ঐশ্বর্য, তার অধিবাসীদের বাণিজ্যিক ও শিল্প উন্নতির উজ্জ্বল প্রমাণরূপে দর্শকের বিস্ময় উৎপাদন করে।

খ্রীষ্টীয় সাত শতকে থাইল্যাণ্ড বা শ্যামের নাম দ্বারাবতী ও রাজধানীর নাম অযোধ্যা ছিল। শ্যামের অপর নাম সুখোদয়। এই রাজ্যের লোক বৌদ্ধ হীনযান ধর্মাবলম্বী ছিল। এই দেশের আচার অনুষ্ঠানের সহিত বাংলাদেশের আচার অনুষ্ঠানের কিছু সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। শ্যাম থেকে বোর্ণিও দ্বীপে এবং সুমাত্রা থেকে চম্পায় সংস্কৃত ভাষা বিস্তৃত হয়েছিল। এই সকল দ্বীপের

ভাস্কর্যে গুপ্তশিল্পের প্রভাব পরিস্ফুট। শ্যাম ও মালয় উপদ্বীপের পূর্বাংশে বিষ্ণু অর্ধনারীশ্বর এবং কয়েকটি যক্ষ মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। শ্যামের চিত্রকলায় ভারতীয় যক্ষ কিন্নর গরুড় প্রভৃতির বিষয়বস্তু প্রবেশ করেছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে দক্ষিণ ভারতের পল্লবগণ সুমাত্রায় উপনিবেশ স্থাপন করে। মালয় সুমাত্রা রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এর রাজধানীর নাম শ্রীবিজয়। পলেমবং নদীর মুখে এর বন্দর ছিল। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত শ্রীবিজয় হিন্দু সাম্রাজ্য ছিল। শ্রীবিজয়ের এক রাজা যবদ্বীপে চণ্ডী কলসং নামে একটি মন্দির নির্মাণ (৭৭১) করে—তাকে বৌদ্ধ তারা-দেবীর পীঠস্থানে পরিণত করেন।

কাণ্টন এবং সিংহলের মধ্যবর্তী সকল দ্বীপ শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যবদ্বীপের পূর্বাংশ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যরূপে বর্তমান ছিল। পূর্ব যবদ্বীপ শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিল। এর ধ্বংসস্তূপের উপর মজ্-পহিত নামে আর একটি সাম্রাজ্য স্থাপিত হল। মন্দির নির্মাণ শিল্পে শ্রীবিজয় শ্রেষ্ঠতা অর্জন করেছিল। এর মন্দিরের সংখ্যা পাঁচ শতেরও বেশী।

ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র রাজাদের সঙ্গে উড়িষ্যার শৈলোদ্ভব বংশের সম্পর্ক ছিল।

অষ্টম শতকে শৈলেন্দ্র রাজারা মধ্য যবদ্বীপে কতগুলি অতি সুন্দর বুদ্ধ মন্দির নির্মাণ করেন। এদের ভিতর 'বরবুদুর' অর্থাৎ বুদুর গ্রামের বিহার প্রধান এবং পৃথিবীর এক আশ্চর্য বস্তু। নবম শতকের পূর্বেই শৈলেন্দ্র রাজারা যবদ্বীপ থেকে বিতাড়িত হলে পুনরায় যবদ্বীপে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী রাজাদের অভ্যুত্থান ঘটে। নবম শতকে সেখানে হিন্দু সভ্যতা নূতন বলে শক্তিশালী হয়ে উঠে। বরবুদুরের শৈলেন্দ্র রাজাদের বৌদ্ধ কীর্তিকে যেন ম্লান করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে যবদ্বীপের স্বাধীন রাজারা প্রাম্বাননের বিরাট মন্দির শ্রেণী নির্মাণ করেন। এগুলি যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার অক্ষয় কীর্তি।

এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের তিনটি মন্দির এবং তাদের চতুর্দিকে দেড় শতেরও বেশী ছোট মন্দির আছে। প্রাম্বাননের শিব মন্দিরের গাত্রে রামায়ণের চিত্র খোদিত আছে। বরবুদুরের গাত্র-খোদিত বৌদ্ধ চিত্রাবলী এবং প্রাম্বাননের মন্দির গাত্র-খোদিত রামায়ণের চিত্র ভারতের বাহিরে ভারতীয়

শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নবম শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছয় শত বৎসর যবদ্বীপে হিন্দু সভ্যতার গৌরবময় যুগ।

ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে যবদ্বীপের পূর্বাঞ্চলে মজ্‌পহিত নামে একটি নগর স্থাপিত হয়। এই নগর ক্রমে বর্ধিত হয়ে মজ্‌পহিত সাম্রাজ্যে পরিণতি লাভ করে। এই সাম্রাজ্যের শক্তি ও ঐশ্বর্য সুশিক্ষিত সৈন্য ও নৌবহরের উপর নির্ভর করত। রাণী সুহিতার আমলে শাসন ব্যবস্থা নানা বিভাগে বিভক্ত হয়। উপনিবেশ বাণিজ্য স্বাস্থ্য যুদ্ধ প্রভৃতি বিষয় এক একটি বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়েছিল সাত জন বিচারক এবং দুই জন সভাপতি নিয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয় গঠিত হয়েছিল। শুল্ক ও কর আদায়ের সুব্যবস্থা ছিল। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের ভার মন্ত্রীর উপর ছিল। মজ্‌পহিত নগরের মধ্যস্থলে একটি শিব মন্দির ছিল। যবদ্বীপে বহু নগর ও বন্দর ছিল। চীনের সহিত বিবাদ এবং দুর্ভিক্ষের জন্য এই সাম্রাজ্যের পতন হয়। পশ্চিম যবদ্বীপের দেমাক রাজ্যের মুসলমান রাজার হস্তে হিন্দু রাজ্য মজ্‌পহিত ধ্বংস হয়ে যায়। একটি সাম্রাজ্যের স্থানে চারিটি মুসলমান রাজ্যের উদ্ভব হয়। পরে দেশটি ডচ্‌দের হস্তগত হয়।

বলিদ্বীপ একটি অপূর্ব দেশ। সুনীতি বাবু বলেন, ভারতবাসীর পক্ষে এই দেশ একটি তীর্থস্বরূপ। বলিদ্বীপের লোকেরা পূর্বের মতো সরল নির্ভীক ও তেজস্বী। তাদের জীবন সুষীম ও সুন্দর। বলিদ্বীপে অনেকগুলি বৌদ্ধ ও হিন্দু মন্দির আছে। বলি ও যবদ্বীপে ভারতীয় শকাব্দ ব্যবহৃত হয়।

ভারতীয়গণ মালয় এশিয়ায় যে তিনটি সাম্রাজ্য স্থাপন করেছিল ক্রমে ক্রমে তাদের এক একটি কালের প্রবল স্রোতে ভেসে গেল। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের প্রারম্ভে এরা এই সকল দ্বীপে প্রথম আবির্ভূত হয় এবং একটির পর একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করে। কাম্বোডিয়া শ্রীবিজয় এবং মজ্‌পহিত বহু শত বৎসর স্থায়ী হয়েছিল। তাদের স্থায়িত্ব তাদের প্রচুর প্রাণশক্তির পরিচয় দেয়। স্থাপত্য শিল্প তাদের বিশেষ প্রিয় ছিল। বাণিজ্য তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল। তারা ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক বাহক ও প্রচারক হয়েছিল এবং এই সংস্কৃতির সহিত চৈনিক সংস্কৃতির সামঞ্জস্য বিধান করে এক অভিনব সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইসলাম ও খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও যাবানীদের চরিত্রে ও জীবনে হিন্দু প্রভাব সুস্পষ্ট। বলির অধিবাসীরা প্রধানতঃ হিন্দু। যবদ্বীপ এবং বলিদ্বীপ এখনও প্রাচীন এশিয়া এবং বীর যুগের ভারতের অপরিহার্য অংশ-রূপে ভারতীয় সভ্যতার মহিমা প্রচার করছে।

ভারতের সহিত ইন্দোনেশিয়া বা দ্বীপময় ভারতের নাড়ীর টান আছে। স্বাধীন ভারত এক্ষণে সেই টানকে সুদৃঢ় করতে ইচ্ছা করে। অতীত কালে সভ্যতায় ও ধর্মে যে সকল দেশ ভারতবর্ষের অংশ হয়ে যায় তাদের সমষ্টিগত নাম বৃহত্তর ভারত। আফ্‌গানিস্তান বা ক্ষুদ্র ভারত, সিবিণ্ডিয়া বা মধ্যএশিয়া, ইন্দোচীন বা কাম্বোজ, চম্পা বা কোচিন চীন. লাও্‌স আনাম শ্যাম ও বর্মা এবং ইণ্ডোনেশিয়া বা মালয় দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত।

মধ্য যবদ্বীপেই যবদ্বীপের হিন্দু সভ্যতার প্রাচীনতম বিকাশ। পূর্ব যবদ্বীপে কেদেরি ও মজ্‌পহিত নগরকে আশ্রয় করে এই সভ্যতা নূতন রূপ পায়। বহু সংস্কৃত শব্দ যবদ্বীপের ভাষার সঙ্গে মিশে গেছে। এখানে ভারতীয় নৃত্যকলা একটি বিশিষ্ট রূপ পেয়েছে। এখনও এদেশে হাতের নানা ভঙ্গীকে মুদ্রা বলা হয়। সুনীতি বাবু বলেন, "যবদ্বীপীয় সংস্কৃতির উদ্যানে এই নাম একটি অনিন্দ্য সুন্দর পুষ্প—দেবতার অর্চনাতেই মুখ্যতঃ এটি নিবেদিত হয়। পুতুল নাচ ও মুখোস পরে অভিনয়, রামায়ণ ও মহাভারতের আদর ও লোকপ্রিয়তা, প্রাম্বানান ও বরবুদুর মন্দিরগুলির শিল্পনৈপুণ্য ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের অপূর্ব নিদর্শন।

বরবুদুরের গাত্রে উৎকীর্ণ চিত্র এবং প্রাম্বানানের চিত্রাবলী "যবদ্বীপী ভাস্কর্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন; হিন্দু তথা বিশ্বশিল্প, এই খোদিত চিত্রাবলীর মহিমায় উদ্ভাসিত। * * * বর-বুদুরের ভাস্কর্যের মূলকথা শান্তি; আর সমাধিতে শক্তির সংহরণ, আর একটি ধীর ললিত গতি; প্রাম্বানানের ভাস্কর্যে পাই জীবনলীলা, কার্যে শক্তির স্ফুরণ, জীবনের দ্রুত মনোহর গতি। রামলক্ষ্মণ প্রভৃতির যে চিত্র খোদিত হয়েছে তা সর্বতোভাবে বাল্মীকির মহাকাব্যের উপযুক্ত। * * যবদ্বীপের ,কতকগুলি শিবমূর্তি. হিন্দু চিন্তা আর হিন্দু শিল্পের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, আর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। ইহারা 'হিন্দু জাতির অপরিসীম ঈশ্বরনিষ্ঠার আর বিশ্বাত্মবোধের, তার চিন্তার আর চেষ্টার, তার সুষমাবোধের আর শিল্প বিজ্ঞানের অবিনশ্বর নিদর্শন। ইহা যেন প্রাচীন ভারতের জ্ঞান ভক্তি আর কর্মের ত্রিবেণীধারা"।—(সুনীতিকুমার)

যোগজাকর্তার কাছে চণ্ডী লেমবেং, চণ্ডী মেবু. চণ্ডী প্লাওসান এবং চণ্ডী কলসন নামে বরবুদুর ও প্রাম্বানান যুগের চারিটি বৌদ্ধ মন্দির আছে। মধ্যের বিরাট মন্দিরটির চতুর্দিকে প্রায় ২৪০ ছোট মন্দির আছে। চণ্ডী প্লাওসান-এ বৌদ্ধ দেবমূর্তিগুলির ভিতর মৈত্রেয় মূর্তি অতি সুন্দর। বরবুদুরের কাছাকাছি চণ্ডী মেন্দুৎ এবং চণ্ডী-পাত্তন মন্দির দুইটি নির্মিত। চণ্ডী-মেন্দুৎ মন্দিরে

অবলোকিতেশ্বর ও মঞ্জুশ্রীর দুইটি মহনীয় সুন্দর মূর্তি বর্তমান। বরবুদুর টিলার মতো উঁচু জায়গা'র উপর বিশাল চৈত্যটিকে সুনীতি বাবু "প্রস্তরময় মহাকাব্য" বলেছেন।

যবদ্বীপের বরবুদুর প্রাম্বানান এবং কাম্বোজের আঙ্কর থোম ভারতের শাশ্বত চিন্তা ও কল্পনা শক্তির বিরাট প্রকাশ, ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্ত বিগ্রহ, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ সাধনার চরম গৌরব এবং বিশ্ব সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদান।

সতের

জাপান ও জাপানী সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

জাপান। কোরিয়া ও জাপান চীনের নিকট প্রতিবেশী এবং চীনীয় সভ্যতার সন্তান। প্রশান্ত মহাসাগরের উচ্ছ্বসিত নীলাম্বুরাশি পরিবেষ্টিত জাপান বহুকাল ধরে তার আত্মকেন্দ্রিক স্বাধীনতা ভোগ করে এসেছে ও তার জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত বর্তমান ছিল। তখন জাপান ইয়োরোপের সর্বনাশী বৈজ্ঞানিক সভ্যতার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেনি। একমাত্র চীনীয় সভ্যতা তার জাতীয় জীবনের উপর আলোকপাত করেছিল। সভ্যতায় শিল্পে ও ধর্মে জাপান চীনের কাছে ঋণী কিন্তু চীনকে বিধ্বস্ত করে সে সেই ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করেছিল। ভারতীয় সভ্যতা ও চিন্তার অবদান চৈনিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির রঙে রঞ্জিত হয়ে তার চিন্তায় কর্মে ও জীবনে অভিব্যক্ত হয়েছিল।

এতকাল বাহিরের কোন জাতি কখনও জাপানের উপর কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারেনি। আভ্যন্তরীণ বিরোধ ছাড়া অন্য কোন অসুবিধা তাকে ভোগ করতে হয়নি। জাপানের পূর্বপুরুষগণ সম্ভবতঃ কোরিয়া, তাদের মধ্যে কেউ বা দক্ষিণে মালয়-এশিয়া থেকে এসেছিল। জাপানীরা মঙ্গোলীয় শাখার অন্তর্গত। এখানকার আদিম অধিবাসীদের নাম আইনু। আইনুদের রঙ উজ্জ্বল। তাদের গায়ে বড় বড় লোম ছিল। বিতাড়িত হয়ে তারা এক্ষণে জাপান দ্বীপের উত্তরাংশে বাস করে। প্রায় ২০০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে এক রাণী রাজত্ব করতেন। তাঁর নাম জিঙ্গো। ইংরেজি ভাষায় জিঙ্গো শব্দের অর্থ সাম্রাজ্যবাদী। সাম্রাজ্যবাদীরা বাগাড়ম্বরপূর্ণ ও সংগ্রামশীল।

জাপানের প্রাচীন নাম ইয়ামেটো। চীনা সাহিত্য কোরিয়ার ভিতর দিয়ে জাপানে আসে। বৌদ্ধধর্মও এইভাবে আমদানী হয়েছিল। ৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় পাকৃচী রাজ্যের শাসনকর্তা ইয়ামেটোর রাজার নিকট একখানি সোনার বৌদ্ধমূর্তি, কয়েকজন প্রচারক এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ প্রেরণ করেন। জাপানের দেশী ধর্মের নাম শিন্‌টো। চীনা ভাষায় শিন্‌টো শব্দের অর্থ 'দেবযান'। এই ধর্ম প্রকৃতি ও পিতৃপুরুষ পূজা শিক্ষা দেয়। শোটোকু তেইশির (৫৭৪—৬২২) বৌদ্ধধর্মে দীক্ষার পর নবধর্মের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রশমিত হয়। তিনি শিনটো ধর্মের সহিত নবাগত বৌদ্ধধর্মের মিলন স্থাপন করে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের পথ প্রশস্ত করে দেন। সম্রাজ্ঞী সুইকোর প্রচেষ্টায় এই যুগের জাপানের সংস্কৃতি ও ভাবধারায় যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তাতে জাপানের দ্বৈপায়ন মানসের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হয়ে তাকে প্রাচ্য জগতের একটি প্রথম শ্রেণীর শক্তিরূপে স্থান গ্রহণ করতে প্রেরণা দিয়েছিল।

চীন সম্রাট জাপানের শাসন কর্তাকে তাই-নিক্‌-পুং-কোক্‌ অর্থাৎ সূর্যোদয়ের বিরাট রাজ্যের সম্রাট বলে একখানি পত্র লিখেছিলেন। তারপর থেকে জাপানীরা নিজেদের দেশকে ইয়ামেটো না বলে 'দাই নিপুন' অর্থাৎ 'সূর্যোদয়ের দেশ' বলত। এখনও জাপান এই নামে পরিচিত। 'জাপান' নিপুন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। ইটালির পর্যটক মার্কো পোলো চীনে যান, জাপানে যাননি। তথাপি জাপানের বিষয় তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিখে গেছেন। নিক্‌-পুং-কোক্‌ নামের পরিবর্তে তিনি চিপানগো শব্দ ব্যবহার করেন। 'চিপানগো' থেকে 'জাপান' নামের উৎপত্তি।

জাপানের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। জাপানীরা চীনের নিকট প্রতিবেশী। সভ্যতায় এবং শিল্প ও সংস্কৃতিতে তারা চীন ও ভারতবর্ষের কাছে ঋণী কিন্তু তাদের চরিত্র সম্পূর্ণ বিপরীত। চৈনিক সভ্যতা শান্তিরসাশ্রিত, চীনাদের প্রকৃতি প্রসাদগুণসম্পন্ন। তাদের স্বভাব কোমল, ব্যবহার মধুর, জীবনবীক্ষা সাত্ত্বিক। ভারতবর্ষ মননধর্মী আদর্শবাদী সংযমনিষ্ঠ ও অধ্যাত্মপরায়ণ। চীনারা প্রাণধর্মী বাস্তববাদী ও কর্মকুশল। জাপানীরা ক্ষাত্রতেজদৃপ্ত ও বীর্যবন্ত। নেতার উপর অবিচলিত বিশ্বাস, সহকর্মীর প্রতি অনুরক্তি যোদ্ধার প্রধান গুণ। ইহাই জাপানী চরিত্রের দৃঢ়তা ও কঠোরতার কারণ। শিন্‌টো ধর্মের শিক্ষাও তাই। নেতার আদেশ পালন করা অথবা বন্ধুকে ভালোবাসা সদ্‌গুণ সন্দেহ নাই কিন্তু এই দুইটি বৃত্তির সুবিধা নিয়ে অন্যের উপর

প্রভুত্ব করা অন্যায়। রোমের ক্যাথলিক ধর্ম ও শিন্‌টো ব্যক্তিপ্রাধান্য সৃষ্টি করেছে, ধর্মের দোহাই দিয়ে মানুষের বিচারশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির খর্বতা সাধন করেছে। বশ্যতা ও প্রভুভক্তি শিক্ষা দেয় বলে জাপানের অভিজাতগণ শিন্‌টোর পক্ষপাতী। জাপানে বৈপ্লবিক বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব তাদের সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটিয়েছিল। এজন্য উচ্চশ্রেণী ও শাসক সম্প্রদায়ের ভিতর এর বেশী আদর হয়নি।

চীনের প্রাণধর্ম, ভারতের সৌন্দর্যবোধ, ইয়োরোপের বিজ্ঞানবুদ্ধি এবং শিন্‌টোর প্রভুভক্তির সম্মিলনে জাপানীদের আধুনিক চরিত্র গঠিত হয়েছে এবং তাদের সভ্যতার বৈশিষ্ট্য দান করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সভ্যতার উত্থান ও পতন, যুগান্তকারী রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লব তার জাতীয় জীবনের উপর বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারেনি। সভ্যজীবন গঠনোপযোগী কিছু কিছু উপাদান প্রাচীনকালে সে চীন ও ভারতবর্ষ থেকে এবং অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে পশ্চিম দেশ থেকে গ্রহণ করেছে। বিশ্ব-সভ্যতায় তার দান নগণ্য।

আঠার

ফিউডাল প্রথা বা সামন্ততন্ত্র

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্য পতনের সহিত ইয়োরোপের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। দেশব্যাপী বিশৃঙ্খলা অস্থিরতা ও অন্ধকারের মধ্যে সেণ্ট বেনিডিক্ট বা কাসিওডোরাসের ন্যায় দুই একজন মনীষী জ্ঞানের প্রদীপ জেলে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন। গোলমালের সুযোগ নিয়ে ছোট বড় বহু ভাগ্যান্বেষী গায়ের জোরে দুর্গ প্রাসাদ বা স্থান দখল করে পরস্পরের উপব প্রাধান্য লাভের জন্য যুদ্ধ করতে থাকে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ কয়েকটি অংশে বিভক্ত হয়ে এক একজন শাসনকর্তার অধিকারভুক্ত হয়। আয়র্ল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড ওয়েলস্‌ এবং কর্ণওয়ালে জমিদারগণ শক্তিশালী হয়ে উঠে। ইংরেজ বিজেতাগণও কেণ্ট ওয়েসেক্স ইসেক্স প্রভৃতি স্থানে এক একটি রাজ্য স্থাপন করে এবং প্রাধান্য লাভের জন্য পরস্পর কলহ ও যুদ্ধ করতে থাকে।

তখন রোমের অবস্থাও শোচনীয়। এর ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ভুঁইফোড় অভিজাত ভাগ্যান্বেষীগণ প্রাধান্য লাভের জন্য এমন কি রাজপথের উপর পরস্পর যুদ্ধ করতে থাকে। স্পেনও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হয়েছিল। স্পেনের ইহুদীরা খলিফার দিগ্বিজয়ী সৈন্যদলকে সাহায্য করে ইয়োরোপ জয়ের পথ পরিষ্কার করে দিল। আরবগণ ও ইস্‌লামধর্মে দীক্ষিত আফ্রিকার মরু ও পর্বতবাসী হেমিটিক সৈন্যগণ ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম গথদের পরাজিত করে এবং কয়েক বৎসরের ভিতর সমগ্র স্পেন অধিকার করে। তারপর ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ইস্‌লামের অর্ধচন্দ্রলাঞ্ছিত পতাকা পিরিনিজ্ পর্বতমালার সানুদেশে প্রোথিত হয় কিন্তু নবগঠিত ফ্রাঙ্ক রাজ্যের বাহুবল তাদের অগ্রগতির পথ রোধ করে। পূর্বদিকে টরাস পর্বতের পশ্চাতে বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সমুন্নত শক্তিতে এবং পশ্চিম দিকে পিরিনিজ পর্বতের পশ্চাতে ফ্রাঙ্কিস রাজ্যের বাহুবলে ইস্‌লামের বিশ্বজয়ী প্রাণশক্তি প্রতিহত ও পরাভূত হয়।

ফিউডাল প্রথার জন্ম। অষ্টম শতকে পশ্চিম ইয়োরোপের সভ্যতা ভেঙ্গে পড়েছিল। এর শাসনশৃঙ্খলা ও আইন-কানুনের দুর্বলতাসত্ত্বেও এর অধিবাসীদের মনে সভ্যজীবনের ধারণা একেবারে ম্লান হয়ে যায় নি। পূর্ব ইয়োরোপ তখনও বর্বর। তার চিন্তা ও মনোভাব সংকীর্ণ ও অসংস্কৃত। সেকালে বিবাদ ও অশান্তির সময় মানুষ নিজের উপর নির্ভর করতে পারত না। তখনকার দুর্যোগাচ্ছন্ন সমাজে মানুষ ছিল একক, একান্ত নিঃসঙ্গ, নিতান্ত অসহায়। আত্মরক্ষার জন্য সে নির্ভর করত কোন শক্তিশালী জননেতার উপর। কোন চতুর পুরোহিত অথবা তেজস্বী কৌশলী ব্যক্তি, অথবা কোন অভিজাত বংশের সন্তানকে কেন্দ্র করে এক একটি দল গড়ে উঠত। আত্মরক্ষা ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য মানুষ এক একটি দলে যোগ দিতে বাধ্য হত। কোন গ্রাম বা জেলার একক দুর্বল ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী নেতার অনুগত হত। আবার কোন ক্ষুদ্র স্থানের দুর্বল নেতা তদপেক্ষা বলিষ্ঠ নেতার উপর নির্ভর করত। এইভাবে দলপুষ্টির সহিত বিপদের সম্ভাবনাও অল্প হত। এই ধরণের রক্ষাকর্তা বা নেতার সহিত অধস্তন ব্যক্তির স্বাভাবিক মিলনে যে সামাজিক অবস্থার জন্ম হয়েছিল তাই ফিউডাল প্রথা বা সামন্ততন্ত্র নামে পশ্চিম ইয়োরোপে পরিচিত।

কৃষকগণ সঙ্ঘবদ্ধ ছিল না, দস্যু-নেতাদের হস্ত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারত না। কেন্দ্রীয় শাসন-প্রতিষ্ঠান তাদের রক্ষা করতে অসমর্থ ছিল।

এজন্য তারা নিকটবর্তী সামন্ত বা দুর্গ স্বামীর সঙ্গে চুক্তি করেছিল। তারা যে শস্য উৎপাদন করত তার কিয়দংশ সামন্তকে দিতে হত। অপর কোন সামন্তের অত্যাচার থেকে তিনি তাদের রক্ষা করতেন। ক্ষুদ্র সামন্ত আত্মরক্ষার জন্য অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী সামন্তের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ থাকত। তারা চাষ করত না। এজন্য শস্যের বিনিময়ে প্রভুর সপক্ষে যুদ্ধ করতে বাধ্য থাকত। সামন্তদের নীচে কৃষক থেকে সর্বোচ্চস্থানে রাজা পর্যন্ত সমাজস্তরের কয়েকটি ধাপ ছিল।

সমাজ-পিরামিডের ভিত্তিভূমি কৃষক এবং সর্বোচ্চ শৃঙ্গের উপর ছিলেন রাজা। রাজা ও কৃষকের মধ্যে ছোট বড় অনেকগুলি জমিদার ছিল। জমিদার ছিলেন জমির একমাত্র এবং জমির অধিবাসীদের প্রভু।

এইরূপ সমাজ ব্যবস্থায় বহু স্তর ও শ্রেণী ছিল। এতে কেউ কারুর সমান ছিল না। এর সর্বনিম্ন স্তরে ছিল ক্ষেত্র-দাসগণ। তারা উপরের ক্ষুদ্র বৃহৎ ও বৃহত্তম প্রভুদের চাপে ক্লিষ্ট ও পিষ্ট হত। চার্চের ব্যয় তাদেরই বহন করতে হত। প্রভুরা পরিশ্রম করতেন না. উৎপাদন করতেন না, তাঁদের প্রধান কাজ ছিল যুদ্ধ। শিকার, কুস্তি বা মল্লযুদ্ধ তাঁদের অবসরের চিত্ত বিনোদন করত। যুদ্ধ ভোজন ও মদ্যপান ছিল তাঁদের জীবন উপভোগের একমাত্র উপায়।

ফিউডাল ব্যবস্থার প্রধান কথা শ্রেণী বৈষম্য। ভূস্বামীরা ছিল সর্বেসর্বা। রাজার কোন ক্ষমতা ছিল না। পৃথিবীর সকল দেশের জমিদারগণ কৃষকের মুখের অন্ন কেড়ে নেয়, ভূমিসংক্রান্ত আইন রচনা করে, অভিজাত বলে পরিচিত হয়। পুরোহিতরা এসে দরিদ্রদের ধর্মের কথা শোনায় এবং অট্টালিকাবাসী অভিজাতদের কার্য অনুমোদন করে।

ভারতবর্ষে অনুরূপ সমাজ ব্যবস্থা না থাকলেও বর্ণবিভাগ মানুষের ভিতর ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। চীন দেশে এই প্রকারের ভেদনীতি শ্রেণীবৈষম্য সৃষ্টি করেনি। ফিউডাল ব্যবস্থায় স্বাধীনতা বা সাহায্যের ধারণা ছিল না। এতে ছিল একদিকে দাবী, অন্যদিকে কর্তব্য; একদিকে প্রভু, অন্যদিকে দাস। প্রভু ও দাসের মধ্যে মনুষ্যধর্ম স্থান পায় না। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের মতো এমন জঘন্য সম্পর্ক আর নাই। এই দূষিত আবহাওয়ার ভিতর ইয়োরোপের মানুষ স্বাধীন সত্তার কথা ভুলে গেল।

বণিকসঙ্ঘ। ফিউডাল বিধির প্রধান উপাদান ছিল জমিদার ও কৃষক, ভূস্বামী ও ক্ষেত্রদাস। বণিক শিল্পী ও কারিগরের সংখ্যা অল্প হলেও তারা

ফিউডাল ব্যবস্থার বাইরে ছিল। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধির সহিত বাণিজ্যের প্রসার হল। ভৌগোলিক আবিষ্কারের পর বণিক সম্প্রদায় দেশ বিদেশে পণ্য বিক্রয় করে ঐশ্বর্যশালী হল। ভূস্বামীগণ তাদের কাছে ঋণ গ্রহণ করত। তারাও ভূস্বামীদের কাছে কিছু কিছু বিশেষ অধিকার বা সুবিধা আদায় করে নিল। ছোট ছোট সহর গড়ে উঠল। কারিগর ও শিল্পীগণ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য নগরে নগরে সমিতি বা সংঘ স্থাপন করল। এই সকল সমিতির প্রধান কর্মক্ষেত্র 'জনপৌরভবন' নামে পরিচিত হল। ক্রমে ইহাই পৌরমণ্ডপ বা টাউন হল নাম গ্রহণ করেছে।

বৃহৎ নগরের প্রতিষ্ঠা হল। কলোন ফ্রাঙ্কফোর্ট হামবুর্গ প্রভৃতি নগর ফিউডাল ভূস্বামীদের ক্ষমতার সহিত প্রতিযোগিতা করতে লাগল। একটি নূতন শ্রেণীর অভ্যুদয় হল। এই বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায় অভিজাতদের অগ্রাহ্য করতে লাগল। দুই শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ ও সংগ্রাম চলতে লাগল। রাজাও বহুবার নগরের বণিকদের পক্ষ অবলম্বন করতেন।

ফিউডাল সমাজের মূল সূত্র। ফিউডাল যুগে মানুষ বৃহত্তর সমাজ ও বৃহত্তর দেশের কথা ভাবত না। এতে ছিল একদিকে কর্তব্য ও বশ্যতা, অপর দিকে দাবী ও পাওনা। এই সমাজের মূল সূত্র ছিল দেনা-পাওনা। সমাজের অত্যুচ্চ শৃঙ্গে সমাসীন রাজার অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে পাদপীঠে অবস্থিত সাধারণ মানুষ অনভিজ্ঞ ছিল। সকলেই তাদের উচ্চতর প্রভুকে সেবা করার কথা ভাবত, দেশ বা জাতিকে সেবা করার কর্তব্য তাদের মনে স্থান পায় নি। তখনও জাতীয়তার জন্ম হয় নি। পরবর্তী কালে তার জ্বালাময় বিষবাষ্পে বিশ্বসভ্যতা বিপন্ন হয়ে ওঠে।

খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্রকে

এশিয়া ও ইয়োরোপের পরিস্থিতি

ইয়োরোপ ও এশিয়ার প্রভেদ। খ্রীষ্টের মৃত্যুর পর প্রথম সহস্রকে ইয়োরোপে এবং এশিয়ায় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক পরিস্থিতি কেমন ছিল দেখলে আমরা বুঝতে পারব বিশ্বের ইতিহাসের ধারা কিভাবে এবং কোন খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে যে মর্মান্তিক প্রভেদ তা এক হাজার বৎসর পূর্বেও স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। রোমান সাম্রাজ্য ও সভ্যতার উত্থান ও পতন, ফ্রাঙ্কিস সাম্রাজ্যের গঠন্ ও তিরোধান, রোমান চার্চের অভ্যুত্থান, প্রভুত্ব প্রয়াস ও দুর্বলতা, সামন্ত প্রথায় সমাজ সংস্থান এবং ক্রুজেডের যুদ্ধবিলাস একটি বিরাট সত্যকে নিঃসংশয় প্রমাণিত করে। পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগৌরবকে জীবনের চরম লক্ষ্য করেছে, প্রাচ্য এর প্রতি উদাসীন। পাশ্চাত্যের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির মূলে বিরোধ, প্রাচ্যের সভ্যতার মূলে মিলন। ইয়োরোপ চেয়েছে পরকে নির্মূল ও উৎসাদন করে নিজেকে নিরাপদ করতে, ভারতবর্ষ তথা এশিয়া চেয়েছে ধর্মকে আশ্রয় করে বহুর ভিতর ঐক্যের সন্ধান দিতে। আজ এই এক সহস্র বৎসর পরেও পাশ্চাত্য জাতিগুলি তাদের সেই চিরাচরিত পথ অনুসরণ করে বিশ্বসভ্যতাকে কলুষিত ও কলঙ্কিত করছে।

চীন। চীনে ট্যাং বংশের পর সুং-বংশ রাজত্ব করেছিল। গৃহ-কলহ এবং খিটানদের আক্রমণ সত্ত্বেও তারা দেড় শত বৎসর রাজত্ব করেছিল। নিজেদের দুর্বলতাবশতঃ তারা আর একটি বর্বর জাতি কিনদের সাহায্য প্রার্থনা করল। কিনরা চীনে প্রতিষ্ঠিত হল এবং সুংগণ দক্ষিণে সরে গিয়ে আরও দেড়শত বৎসর রাজত্ব করতে লাগল, কলাশিল্প, চিত্রবিদ্যা এবং পোরসিলেন শিল্পের উন্নতি করল।

কোরিয়া ও জাপান। ৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়ায় একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হল। এর স্বাধীনতা ৪৫০ বৎসর স্থায়ী ছিল। কোরিয়া চীনের কাছে সভ্যতা, শিল্প এবং শাসন প্রণালী শিক্ষা করল। ভারতবর্ষ থেকে ধর্ম ও শিল্প চীনের ভিতর দিয়ে কোরিয়ায় এবং কোরিয়া থেকে জাপানে বিস্তৃত হল। জাপান পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রশান্ত-মহাসাগরের প্রহরীর

ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল। প্রথমে ফুজিওয়ারা বংশ এবং তারপর শোগুনরা ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল।

দ্বীপপুঞ্জ। মালয়-এশিয়া এবং দ্বীপপুঞ্জে ভারতীয় ঔপনিবেশিকদের ক্ষমতা বর্ধিত হল। অ্যাংগকর ক্যাম্বোডিয়ার রাজধানী ছিল। এই রাজ্য ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার উচ্চশিখরে উঠেছিল। সুমাত্রায় শ্রীবিজয় বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের রাজধানী হল। এর শক্তি ও ব্যবসা-বাণিজ্য দ্বীপময়ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বীহীন হয়ে উঠল। পূর্ব যবদ্বীপে একটি হিন্দু-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল এবং শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করে দিল।

ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের উত্তর অংশ দক্ষিণাংশ থেকে পৃথক হয়ে গেল। উত্তরাঞ্চলে গজনীর মামুদ কালান্তক যমের মতো—রক্তপ্লাবনে দেশ ভাসিয়ে দিল এবং পাঞ্জাবকে তার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নিল। দক্ষিণে চোল সাম্রাজ্য রাজরাজ এবং তাঁর পুত্র রাজেন্দ্রের রাজত্বকালে শক্তিশালী হয়ে উঠল। তারা দাক্ষিণাত্যে একাধিপত্য করতে লাগল, আরব ও বঙ্গোপসাগরে কর্তৃত্ব স্থাপন করল। তারা সিংহলে, দক্ষিণ ব্রহ্মে এবং বাংলাদেশে অভিযান চালাতে লাগল।

পশ্চিম এশিয়া। মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় আব্বাসিদ সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে গেল। বোগ্‌দাদ সেলজুক্ তুর্কীদের অধীনে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেও এর পূর্বের সাম্রাজ্য বহু রাজ্যে বিভক্ত হয়ে গেল। ইসলাম এক্ষণে ছোট ছোট বহু রাজ্যের ও বহু জাতির ধর্ম হয়ে গেল। আব্বাসিদ সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপ থেকে গজ্‌নী রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়াল। এই রাজ্যের শাসনকর্তা মামুদ ভারতবর্ষ বার বার আক্রমণ করল। মধ্য-এশিয়ায় বোখারা সমরকন্দ প্রভৃতি বহু নগর ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠল এবং পরস্পরের সহিত ব্যবসা করতে লাগল।

মঙ্গোলিয়া। মঙ্গোলিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী স্থানে যাযাবর জাতিরা সংখ্যায় ও শক্তিতে বর্ধিত হয়ে এশিয়ার উপর অভিযান চালিয়েছিল। চীনারা তাদের পশ্চিমে ঠেলে রাখলেও তারা ইয়োরোপ ও ভারতবর্ষে বিস্তৃত হয়েছিল। সেলজুক তুর্কীগণ পশ্চিমে বিতাড়িত হয়ে বোগদাদ্ সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ও শক্তির উদ্বোধন করেছিল এবং কনষ্টানটিনোপলের প্রাচ্য রোমান সাম্রাজ্যকে পরাজিত করেছিল।

মিশর ও স্পেন। মিশর বোগ্‌দাদের অধীনতা স্বীকার করেনি। সেখানে একজন স্বাধীন খলিফা ছিল। উত্তর আফ্রিকাও একজন স্বাধীন মুসলিম রাজার অধীনে ছিল। সেখানে স্বাধীন কর্ডোভা সাম্রাজ্য আব্বাসিদ খলিফাদের অধীনতা

স্বীকার করেনি। চার্লস মার্টেল মুসলিমদের পরাজিত করে এদের ফ্রান্স অধিকার করার স্বপ্ন ভেঙ্গে দেন। এই সময়ে কর্ডোভা সাম্রাজ্য শিল্পে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে ইয়োরোপের অপরাপর রাজ্যের চেয়ে উন্নত ছিল।

ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড। স্পেন ছাড়া ইয়োরোপ বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারিত ও ব্যাখ্যাত হয়ে সমগ্র মহাদেশে বিস্তৃত হয়েছিল। প্রাক্-খ্রীষ্টান যুগের দেব-দেবী ও বীরপূজা অন্তর্হিত হয়েছিল। বর্তমান ইয়োরোপের রাজ্যগুলি গঠিত হচ্ছিল। হিউ ক্যাপেটের অধীনে ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স আবির্ভূত হল। ইংল্যাণ্ডে ক্যানিউট ১০১৬ সালে রাজত্ব করছিলেন এবং পঞ্চাশ বৎসর পরে নর্ম্যাণ্ডির উইলিয়াম ইংল্যাণ্ড জয় করেন। বহু রাজ্যে বিভক্ত জার্মেনি একটি বিশিষ্ট দেশের আকার ধারণ করছিল। রাশিয়ার ক্ষমতা পূর্বাঞ্চলে বিস্তৃত হচ্ছিল। পোল্যাণ্ডে এবং হাঙ্গেরিতে ম্যাগিয়ারগণ বাস করেছিল। বুলগার ও সার্বগণ রাজ্য স্থাপন করছিল।

ইয়োরোপে এইভাবে ভাঙ্গা-গড়া চলেছিল। বিভিন্ন দেশের লোক তখনও এক একটি স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে উড়ে উঠেনি। কৃষকদের অবস্থা শোচনীয় ছিল। জার্মেনি ও ইটালিতে বড় বড় নগর পত্তন হল। প্যারিস তখন একটি বিখ্যাত নগর ছিল। এই সকল নগরের অধিবাসীরা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। ক্রমে এরা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীতে পরিণত হল।

ইয়োরোপে তৎকালে জাতীয়তার ধারণা বর্তমান ছিল না। উচ্চ শ্রেণীর লোকের ভিতর খ্রীষ্টান ধর্ম-রাজ্যের ঐক্যের ধারণা ছিল। এজন্য চার্চ এবং রোমের পোপের ক্ষমতা বর্ধিত হয়েছিল। ক্রমে পোপ পশ্চিম ইয়োরোপের মুকুটহীন সম্রাট হয়ে উঠলেন। পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের সহিত তাঁর যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। সেলজুক তুর্কী আক্রমণের ভয়ে কনষ্টানটিনোপল রোমের পোপ সপ্তম গ্রীগরীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করে। হিলডিব্রাণ্ড ৭ম গ্রীগরী নাম ধারণ করে রোমের প্রধান ধর্মযাজক হন।

খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পূর্বেই ভারতীয় সভ্যতা চীনে ও প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে এবং চৈনিকসভ্যতা কোরিয়া ও জাপানে প্রসৃত হয়েছিল। পশ্চিম এশিয়ায় আরব সভ্যতা আরবে প্যালেষ্টাইনে, সিরিয়ায় এবং মেসোপোটেমিয়ায় বিরাজিত ছিল। ইরাণে প্রাচীন পারসিক সভ্যতার সহিত নবজাত আরব সভ্যতার মিশ্রণ চলেছিল। মধ্য-এশিয়ার কয়েকটি দেশে আরব-পারস্যের মিশ্র সভ্যতা এবং ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতায় প্রভাবিত হয়েছিল।

এই যুগের এশিয়ার সভ্য দেশগুলির সহিত তুলনায় ইয়োরোপ অনগ্রসর ও অর্ধসভ্য। গ্রীস ও রোমের সভ্যতা মৃত ও স্মৃতিমাত্রে পর্যবসিত। তাদের ব্যবসা-বণিজ্য ছিল না বললেও চলে। ইয়োরোপের পূর্বে ও পশ্চিমে কনষ্টান্টিনোপল এবং স্পেন থেকে আলোর ক্ষীণ রশ্মি দেখা যাচ্ছিল।

এশিয়ার সভ্যতার প্রতীক ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতা। আরব ও সেলজুক তুর্কীগণ এশিয়ার বাহুবলের প্রতীক। প্রকৃতির রাজ্যে এমন গাছ আছে যার শাখা-প্রশাখা পত্রপ্রাচুর্যের শ্যামলিমায় রিক্ত হলেও পুষ্পপ্রাচুর্যে দীন নয়। তেমনি বাহুবলে দুর্বল হয়ে গিয়েও, শারীরিক বলিষ্ঠতার অভাবসত্ত্বেও চিত্তসম্পদে ঐশ্বর্যশালী স্থবির ভারতবর্ষ এবং বৃদ্ধ চীন অস্তগামী সূর্যের অরুণিমায় সান্ধ্য আকাশের ন্যায় সুকুমার শিল্প ও সাহিত্য ধর্মের আলোক দীপ্তি লাভ করেছিল কিন্তু এই দীপ্তি ক্রমে ক্ষীণ ও ম্লান হয়ে রাত্রির অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেল।

জাতির পতনের কারণ। মানসিক অধঃপতন জাতির পতনের প্রধান কারণ। বর্বর জাতিদের আক্রমণের পূর্বেই রোম মননশীলতায় দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। তাদের আক্রমণ রোমের পতনের সাহায্য করেছিল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন হওয়ার পূর্বে তার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন থেমে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের আদর্শে কর্মের স্থান নীচে। তার কার্যপ্রণালী সহজ অনাড়ম্বর সরল ও দৃঢ় ছিল। তাতে শক্তির অনাবশ্যক অপব্যয় ছিল না। বৈরাগ্যের উদার গাম্ভীর্য ও নিষ্ঠার কঠোর সংযম তাকে চারিত্রিক বল দিয়েছিল এবং চারিত্রিক বলই তার সভ্যতাকে এখনও রক্ষা করছে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রবল বিদেশী উন্মত্ত বরাহের ন্যায় ভারতবর্ষকে একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত দন্ত দ্বারা বিদীর্ণ করিয়া ফিরিয়াছিল। তখনো ভারতবর্ষ আপন বিস্তীর্ণ একাকিত্ব দ্বারা পরিরক্ষিত ছিল—কেহই তাহার মর্মস্থানে আঘাত করিতে পারে নাই। এজন্য ভারতীয় সভ্যতা অমর হয়ে আছে। অন্যান্য সভ্যতার উত্থান উল্কার ন্যায় যেমন উজ্জ্বল তাদের পতনও তেমনি আকস্মিক।

গজনীর মামুদের ভারত আক্রমণের পূর্ব থেকে ভারতবর্ষের পতনের সূচনা হচ্ছিল। ভারতীয়দের সৃষ্টি করার ক্ষমতা হ্রাস হয়েছিল। চর্বিত-চর্বণ পুনরুক্তি ভাষ্য-টীকা-টিপ্পনী রচনা ও অনুকরণ চলেছিল। ভারতবর্ষ চিন্তাশক্তির প্রাচুর্য ও সামর্থ্য হারিয়েছিল। সে তখনও ভাস্কর্যে ও খোদাই-এর কাজে শিল্পনৈপুণ্য দেখিয়েছিল কিন্তু তাতে মৌলিকতা ছিল না। অলংকার পারিপাট্য আড়ম্বর ও জাঁকজমকশীলতায় তা আড়ষ্ট ও প্রাণহীন হয়ে গিয়েছিল। সত্য সহজ ও

সরল, জটিলতা তাকে ভারাক্রান্ত করে না। কলাশিল্প বিলাসের বস্তু হিসাবে অল্প সংখ্যক অভিজাত ও বিত্তশালীর মানস রঙীন করে তুলেছিল। সংখ্যা-গরিষ্ঠ বিত্তহীন ব্যক্তিরা পূর্বাপর শোষিত ও অত্যাচারিত হয়েছিল। জাতির সুখসম্পদ বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়নি।

এইরূপ পরিস্থিতি জাতির জীবন-নাট্যের উপর যবনিকা পতনের সূচনা করে। সৃষ্টিই জীবনীশক্তির পরিচয়, অনুকরণ ও পুনরাবৃত্তি শক্তির রিক্ততা প্রমাণিত করে। অবশ্য ভাবতীয় ও চৈনিক সভ্যতা মৃত্যুর অন্ধকারে একেবারে অবলুপ্ত না হলেও তার সঞ্জীবতা হারিয়েছিল, আচার-কাঠিন্য ও জড়তা তার গতিবেগ রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

গিজো বলেছেন, প্রাচীন সভ্যতা-মাত্রেই একভাবের কর্তৃত্ব ছিল। মিশরে পুরোহিত শাসনতন্ত্র সমস্ত সমাজ নিয়ন্ত্রণ করত, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র সমাজ পরিচালনা করত, চীনে কন্‌ফিউশীয় নীতিবাদ তার সমাজ ও পরিবারকে সংযত করেছিল, গ্রীস, রোম এবং আধুনিক ইয়োরোপের সভ্যতায় রাষ্ট্রিক স্বার্থ প্রাধান্য লাভ করেছে। গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল কিন্তু ভারতীয় ও চৈনিক সভ্যতা জীবিত থাকলেও গতিহীন ও অচল হয়ে পড়ল।

সুতরাং পৃথিবীর দুইটি বৃহৎ স্থানে—প্রাচ্যে ও প্রতীচ্যে—এই যুগের সভ্যতা সমতালে পা ফেলে অগ্রসর হয়নি। আঘাতের পর আঘাত খেয়ে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে ভারতবর্ষ ও চীন ঝিমিয়ে পড়েছিল। পাশ্চাত্য দেশগুলি নিজেদেব শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল, নবজীবনোচ্ছ্বাসের তরঙ্গলীলায় উদ্বেলিত হয়ে পৃথিবীতে আত্মজাহিব করতে সমর্থ হয়েছিল।

মামুদ যোদ্ধা ও সাহসী বীর ছিলেন। লুণ্ঠনের লোভে তিনি ভারতবর্ষে আসেন। এমন কি তিনি সিন্ধুপ্রদেশের মুসলিম রাজাদের নিকট কর আদায় করেছিলেন। তিনি বোগদাদেব খলিফার নিকট সমরকন্দ দাবী করেন। মামুদ বহু ভারতীয় স্থপতি ও শিল্পী গজনীতে নিয়ে যান এবং সেখানে একটি সুন্দর মসজিদ নির্মাণ করেন।

সম্রাট হর্ষের সময় থেকে মামুদের ভারত আক্রমণের সময় পর্যন্ত তিন শত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারতে বহু রাজ্যের উত্থান হয়েছিল। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় রচিত হচ্ছিল। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ভারতবর্ষের সহিত পারস্যের, তারপর চীন ও গ্রীসের সম্পর্ক স্থাপন ও সভ্যতার আদান-প্রদান চলতে থাকে। তারপর শক হূণ প্রভৃতি বহু জাতি ও বহু সভ্যতা

বৈদিক সভ্যতার গাত্রে বিলীন হয়। এইভাবে বহু জাতি বহু সভ্যতা ও বহু মতবাদকে আত্মসাৎ করে হিন্দুসভ্যতা বিরাট রূপ ধারণ করে। বহু মতবাদ ও বহু জাতির সমন্বয় সাধন হিন্দু সভ্যতার আদর্শ ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতকের পর মুসলমান বিজেতার প্রতি পরাজিত হিন্দুর বিদ্বেষ চিরকাল তাকে পৃথক করে রেখেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানগণ ভারতে অবস্থান করে ধীরে ধীরে তার সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে হিন্দু সভ্যতার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছিল। বর্তমানের ভারতীয় সভ্যতা হিন্দু ও মুসলমান সংমিশ্রণের ফল অস্বীকার করা চলে না। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান কেহই এ বিষয়ে কোন দিন সচেতন হতে পারে নি।

মামুদের ভারত আক্রমণের সহিত ইসলাম উত্তর ভারতে আবির্ভূত হয়। দক্ষিণ ভারত, এমন কি বাংলাদেশও আরও প্রায় দুই শত বৎসর মুসলমান আক্রমণ থেকে মুক্ত ছিল। বৈদেশিক আক্রমণের প্রচণ্ড আঘাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য হিন্দু সভ্যতা একটি অভিনব পন্থা অবলম্বন করল। আঘাত পেলে কূর্ম যেমন হাত-পা গুটিয়ে নেয়, হিন্দু সভ্যতাও তেমনি নিজের চতুর্দিকে একটি শক্ত আবরণ সৃষ্টি করল। হিন্দুর জাতিভেদ প্রথা সুনির্দিষ্ট ও কঠিন আকার গ্রহণ করল। স্ত্রীস্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়ে গেল। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ শাসন ব্যবস্থার ভিতর দুর্বলতা প্রবেশ করল। এই সংঘাত হিন্দু সভ্যতার সহিত আরবের সংঘাত নয়—এই সংঘাত মধ্য এশিয়া থেকে নবাগত ইসলাম দীক্ষিত উল্কাধর্মী বর্বর লুণ্ঠনকারী বিজেতার সহিত প্রাচীন জীর্ণ হিন্দু ও হিন্দুসভ্যতার সংঘাত। মামুদের দস্যুতা ও বর্বরতার সহিত ইসলামের সম্পর্ক দেখে ভারতীয়রা মুসলমানদের প্রতি যে বিদ্বেষ পোষণ করতে আরম্ভ করেছিল তা কালক্রমে বর্ধিত হয়ে এই দুইটি জাতির মিলনের অন্তরায় হয়েছে এবং অবশেষে ইংরেজের কুচক্রে ধর্মের ভিত্তিতে দুই জাতিকে দুইটি পৃথক দেশের অধিবাসী বলে বিভক্ত করে দিয়েছে।

দ্বাদশ শতকের শেষভাগে (১১৮৬) উত্তর পশ্চিমাঞ্চল থেকে নূতন আক্রমণের স্রোত প্রবাহিত হল। শাহবুদ্দীন ঘোরী গজনী বংশ উচ্ছেদ করে লাহোর অধিকার করলেন এবং দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। দিল্লীর রাজা পৃথ্বীরাজের নেতৃত্বে উত্তর ভারতের রাজারা সম্মিলিত হয়ে আক্রমণকারীর গতিরোধ করলেন। শাহবুদ্দীন পরাস্ত হয়ে চলে যেতে বাধ্য হন। পর বৎসর বহু সৈন্য নিয়ে তিনি পুনরায় আক্রমণ করলেন। পৃথ্বীরাজ পরাজিত ও নিহত হলেন। কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তাকে নিয়ে পৃথ্বীরাজের পলায়ন

কাহিনী ভারতবর্ষে সুপরিচিত। পৃথ্বীরাজের সহিত জয়চন্দ্রের বিরোধ মুসলমান বিজয়ের রাস্তা প্রস্তুত করে দিয়েছিল।

১১৯২ সালে শাহবুদ্দীনের বিজয় ভারতবর্ষে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। বিজেতাগণ ক্রমে দক্ষিণ ও পূর্বদিকে অগ্রসর হল। দেড় শত বৎসরের মধ্যে (১৩৪০) দক্ষিণাঞ্চলের অধিকাংশ স্থান তাদের পদানত হল। কিন্তু কয়েকটি নূতন হিন্দু ও মুসলিম রাজ্যের, বিশেষতঃ বিজয়নগরের হিন্দু রাজ্যের অভ্যুদয় ইস্‌লামের অগ্রগতির পথে অন্তরায় হয়েছিল। দুইশত বৎসর পরে সম্রাট আকবরের বাহুবলে ইসলাম সমগ্র ভারতে প্রাধান্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় দশম শতকে ভারতীয় সভ্যতা। খ্রীষ্টীয় প্রথম সহস্র বৎসরের মধ্যে বৈদেশিক শক্তির সহিত ভারতবর্ষেব কয়েকবার সংঘর্ষ হয়েছিল। কিন্তু তাতে ভারতীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত শক্তি নষ্ট হয়ে যায়নি, বরং ভারতীয় মানসের পরিসর বর্ধিত হয়ে নানা দেশ ও জাতিকে আলিঙ্গন করেছিল। ইরান চীন হেলিনিক জগৎ মধ্য এসিয়া এবং প্রাচ্য দ্বীপাবলী এর শক্তিকেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ভারতের মানসিক উৎকর্ষ ও সৌন্দর্যসাধনার ধারক ও বাহকস্বরূপ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়েছিল। গুপ্তযুগ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণ যুগ। এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্য প্রসাদগুণসম্পন্ন শান্তরসাশ্রিত, এবং আপন শক্তিতে সচেতন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের সময় উভয় ভারতে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। স্বর্ণ যুগ অবসানের পূর্বেই দুর্বলতা ও অবসাদ দেখা দিলেও সপ্তম শতকে হর্ষের রাজত্বকালে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পুনরুত্থান ঘটে। উজ্জয়িনী শিক্ষা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে পরিণত হল। নবম শতকে গুজরাটের মিহিরভোজ উত্তর ও মধ্য ভারতে একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে কনৌজে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। মনীষী রাজশেখরকে কেন্দ্র করে একটি সাহিত্য পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। একাদশ শতকে উজ্জয়িনীর ভোজরাজ স্বয়ং একজন সংস্কৃতিবান মনীষী ছিলেন। তিনি একাধারে বৈয়াকরণিক ও আভিধানিক এবং চিকিৎসাশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি কবি ও লেখক ছিলেন। তিনি লোকসাহিত্যে সুপরিচিত।

উত্তর ভারত বহু রাজ্যে খণ্ডিত হলেও সেখানে জীবনের গতি বেগবান ছিল।

বারাণসী ধর্ম ও দর্শনচর্চার ক্ষেত্র ছিল। কাশ্মীরে বৌদ্ধ ও হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা হত। নালান্দা বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান ছিল। চীন, জাপান, তিব্বত কোরিয়া মঙ্গোলিয়া এবং বোখারা থেকে অনেক ছাত্র সেখানে আসত। ধর্ম ও দর্শন ছাড়াও শিল্প স্থাপত্য চিকিৎসাশাস্ত্র কৃষ্টি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। বিহারে বিক্রমশীলা, কাথিয়াবাড়ে বল্লভী উজ্জয়িনী এবং অমরাবতীতে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলাদেশে মাৎস্যন্যায় প্রবলবেগে চলতে থাকে। সেখানকার লোক গোপালকে রাজা নির্বাচন করে মাৎস্যন্যায়ের অবসান ঘটায়। পালসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহিত (৭৫০) বাংলা সাহিত্য ও শিল্প জন্মলাভ করে। আর্যভারতের সৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষা বাংলা ভাষার আকার ধারণ করে।

অষ্টম শতকে দর্শনে আচার্য শঙ্কর, এবং সাহিত্যে ভবভূতি এবং দ্বাদশ শতকে অঙ্কশাস্ত্রে ২য় ভাস্কর ভারতীয় মানসের শেষ সার্থক সৃষ্টি। নবম শতকে দক্ষিণ ভারত থেকে অধিক সংখ্যায় ঔপনিবেশিক পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে গমন করেছিল। একাদশ শতক পর্যন্ত চোলগণ সমুদ্রের উপর শক্তিশালী ছিল। তারা শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে তার উপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল।

বেদোত্তর যুগে একচ্ছত্র সাম্রাজ্য স্থাপনের ইতিহাস নন্দরাজাদের সময় থেকে আরম্ভ হয়েছিল। মৌর্যযুগে এই সাম্রাজ্য চরম আকারে ইরাণের সীমান্ত থেকে দক্ষিণভারতের মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কৌটিল্য রাষ্ট্রনীতির প্রধান কথা—জোর যার মুল্লুক তার। মৌর্য রাজনীতির প্রধান কথাও ছিল তাই। কৌটিল্য নীতি বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যকে বাঁচিয়ে রাখতে পারেনি, এমন কি অশোকের ধর্মনীতিও না। অশোকের মৃত্যুর পর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহিঃশত্রুর আক্রমণে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যসৌধ তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল। এমন কি পরবর্তীকালে গুপ্তসাম্রাজ্য যুধ্যমান ছোট ছোট রাজ্যে খণ্ডিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতের সাম্রাজ্যলিপ্সু স্বেচ্ছাচারী রাজাদের রাজনীতির ভিত্তি ছিল গায়ের জোর। ভারতীয় রাষ্ট্র কোনদিন জনসাধারণের রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি। ভারতীয় রাষ্ট্রের এই দুর্বলতা তার স্থায়িত্বের প্রতিবন্ধক হয়েছিল। সামন্ত-তান্ত্রিক সঙ্কীর্ণতা বৃহত্তর জীবন-বোধ ও সমগ্র দৃষ্টির স্থান গ্রহণ করেছিল।

ইতিহাসে সভ্যতার পতনের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। দুর্ধর্ষ বর্বর জাতিদের আক্রমণের বহু পূর্বেই রোমের মানসিক অধঃপতন হয়েছিল। তার অর্থনৈতিক অবস্থা সংকীর্ণ, তার শিক্ষা ক্ষীণ, তার নগর বিশীর্ণ ও দরিদ্র, তার কৃষক ক্ষেত্রদাস

হয়ে গিয়েছিল। রাষ্ট্রিক পরাধীনতায় সাংস্কৃতিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী কিন্তু জাতির অন্তরের দৈন্য রাষ্ট্রিক আনুগত্যের পূর্বগামী। ভারতের প্রাণশক্তি ধীরে ধীরে কয়েক শতাব্দী ধরে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। নিষ্ক্রিয়তা ও সন্ন্যাস মনোবৃত্তি, মায়াবাদ ও নিরাসক্তি, বাস্তবকে অস্বীকার, পার্থিব জীবনের তুচ্ছতা প্রচার, জীবনের প্রতি ঔদাসীন্য ভারতীয় সভ্যতার শক্তিকেন্দ্রকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

সভ্যতার অর্থ সংগঠন, পরস্পরের সাহচর্যে ও সহযোগীতায় জীবনের বিকাশ। কিন্তু ভারতীয় মানসে আত্মসংকোচনের ভাব দেখা দিয়েছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদ ও বৈষম্য সৃষ্টি হয়েছিল। যারা ভারতের বাইরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গিয়েছিল তাদের মন ও সমাজব্যবস্থা সরল ও উদার ছিল, জাতি-ভেদের কঠিন নিগড় তাদের প্রাণশক্তির বিকাশে বাধা জন্মাতে পারেনি। ভারতীয় সমাজে বর্জনশীলতা তীব্র আকার ধারণ করেছিল। জাতিভেদের প্রচণ্ডতা সঙ্কীর্ণ মনোভাব সৃষ্টি করে মানুষকে মানুষ থেকে পৃথক করে দিয়েছিল। এই যুগের সাহিত্যে সৃজনী-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। টীকা-টীপ্পনী ভাষ্য অনুভাষ্য গতানুগতিকতা ও চর্বিতচর্বণ ভাবদীপ্তির অভাব সূচিত করে। একমাত্র শিল্পের ক্ষেত্রে এর ব তিক্রম হয়েছিল। সপ্তম বা অষ্টম শতক থেকে চতুর্দশ শতক পর্যন্ত ভারতীয় আর্টের শ্রেষ্ঠ যুগ। ষোড়শ শতকে প্রাচীন কলা-শিল্পের সৃষ্টিধর্ম অবসাদগ্রস্ত ও আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল।

ক্রুজেড বা ধর্মযুদ্ধ

আমরা দেখেছি কি ভাবে পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য পশ্চিম ইয়োরোপের সভ্যতার পটভূমির উপর আবির্ভূত হয়েছিল এবং এর অবসান পশ্চিম ইয়োরোপের সমাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে বিপর্যয় ও দুর্যোগ সৃষ্ট করেছিল। পশ্চিম ইয়োরোপের সভ্যতার উপর উত্তরাঞ্চলের নর্সগণ এবং বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের উপর সারাসেনগণ আক্রমণ চালিয়েছিল।

খ্রীষ্টান ইয়োরোপের বহু গোঁড়া ধার্মিক লোক বিশ্বাস করত যে খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বৎসর পরে যে মহাপ্রলয় হবে তার পরবর্তীকালে নূতন জগৎ নূতন সমাজ ও নূতন মানুষের সৃষ্টি হবে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা গৃহ ও সম্পত্তি বিক্রয় করে প্রলয়কালে তীর্থক্ষেত্রে বাস করার অভিপ্রায়ে জেরুসেলেমে উপস্থিত হয়। কিন্তু প্রলয় হল না, পৃথিবী যেমন ছিল তেমনই থেকে গেল।

ধর্মভীরু মূঢ় লোকদের ভ্রম ভেঙে গেল। জেরুসেলেমে তারা তুর্কীদের দুর্ব্যবহারে জর্জরিত হয়ে রাগে ও অপমানের জ্বালায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে। তীর্থ স্থানে বিধর্মীদের অত্যাচার ও খ্রীষ্টানদের অপমানের কাহিনী ইয়োরোপের দেশে দেশে প্রচারিত হল। ভুক্তভোগীদের অন্যতম সন্ন্যাসী পিটার ক্রশ স্কন্ধে তুর্কীদের অত্যাচার কাহিনী প্রচার করতে করতে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। জনমন বিক্ষুব্ধ হল। পবিত্র স্থানকে বিধর্মীদের হস্ত থেকে উদ্ধার করার বাসনা জাগ্রত হল। উত্তেজনা ও উন্মাদনায় লোক অধীর হয়ে উঠল।

এই সন্ধিক্ষণে বিধর্মীদের হস্ত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য কনস্টানটিনোপল রোমের পোপের সাহায্য প্রার্থনা করল। তখন হিল্ডিব্রাণ্ড বা ৭ম গ্রীগরী পোপ ছিলেন। তিনি চার্চের আভ্যন্তরীণ সংস্কার করেন। ১০৯৫ সালে পোপ আর্বান ক্লারমণ্টে দ্বিতীয়বার খ্রীষ্টানদের যে সভা আহ্বান করেন তাতে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সপ্তম শতকের প্রারম্ভে স্বার্থান্বেষীদের নির্বিবেক কার্যের ফলে পশ্চিম ইয়োরোপে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা জনমনে হতাশা ও চিন্তা দৈন্য সৃষ্টি করেছিল, আজ এই চারিশত বৎসর পরে একটি সাধারণ চিন্তা বিশ্বাস ও ধারণা, একটি নূতন প্রেরণা সমগ্র খ্রীষ্টান ইয়োরোপের মনে নাড়া দিয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—মানুষের ইতিহাসকে দেখলে মনে হয় ধারাবাহিক কিন্তু—সেটা আকস্মিকের মালা গাঁথা। ধর্মযুদ্ধকে উপলক্ষ্য করে এই আকস্মিক নূতন সাজে আবির্ভূত হল। ক্রুজেড বা ধর্মযুদ্ধ শ্রেণীগত, জাতিগত, দেশগত ও ভাষাগত বৈষম্য ও প্রভেদের বাঁধ ভেঙে দিয়েছিল। ভৌগোলিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধি এই মিলনের অন্তরায় হয়নি। সমুদ্রের প্লাবন যেমন সমস্ত দেশের হ্রদ, নদী, নালা ও পুষ্করিণী ভাসিয়ে একাকার করে দেয়, তেমনি ভাব ও আদর্শের ঐক্য খ্রীষ্টান জগতের আবালবৃদ্ধবণিতার মানসে অন্তর্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছিল এবং এরই ফলে যে ব্যক্তিস্বরূপের আদর্শনিষ্ঠার ও নবতর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিব্যক্তি হয়েছিল তার ভিতরই অনাগত কালের ইয়োরোপে নূতন মানব সমাজ পত্তনের সাম্ভব্যতাকে পরিস্ফুট করে দিয়েছিল।

এই যুদ্ধে ধর্মের উন্মাদনার সহিত নীচতা স্বার্থসিদ্ধি ও কুটিল মনোবৃত্তির জঘন্য-ভাবের সংযোগ ছিল। এই যুদ্ধ ১০৯৫ সালে আরম্ভ হয়ে এক শত

পঞ্চাশ বৎসর চলেছিল। কিন্তু এ একটানা যুদ্ধ ছিল না। এর ভিতর মাঝে মাঝে বিরাম বা যতি ছিল। খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত ইস্‌লামের এই দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের ফলে খ্রীষ্টানরা "পবিত্র ভূমির" জন্য যুদ্ধ করে দলে দলে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করে নিয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মুসলিম মৃত্যু আলিঙ্গন করেছিল। প্যালেষ্টাইনের মাটি নর-শোণিতে কর্দমাক্ত হয়ে গেল।

ধর্মযুদ্ধ বিভিন্ন প্রকৃতির লোকের মনে বিভিন্ন ভাব উদ্রেক করেছিল। তীর্থস্থান জেরুসেলেমকে বিধর্মী মুসলমানদের হস্ত থেকে রক্ষা করার মহৎ আদর্শ বহু লোকের মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল। এর আতিশয্যে তারা গৃহ পরিবার আত্মীয়-স্বজনের মায়া কাটিয়ে সুদূব প্রাচ্যে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। ধর্মযুদ্ধে বিধর্মীদের বিতাড়িত করে পবিত্র তীর্থস্থান উদ্ধার করতে পারলে পোপ পাপ থেকে মুক্তি দেবেন, পোপের এই বাণী অশিক্ষিত ধর্মান্ধ খ্রীষ্টানদের মন আকৃষ্ট করেছিল। তারা পতঙ্গের মতো দলে দলে যুদ্ধের আগুনে ঝাঁপ দিয়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। গুণ্ডা প্রকৃতির বেকার যুবক দল ধর্মযুদ্ধকে উপলক্ষ্য কবে বিদেশে রাজ্যলুণ্ঠন ও অর্থাগমের পথ অন্বেষণ করেছিল। দুই এক জন রাজা ও সৈনিক শৌর্য-বীর্য প্রদর্শন করে বীর বলে পরিচিত হওয়ার মোহে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। রোমের কৌশলী পোপ বিধর্মী তুর্কীদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণার অছিলায় কনষ্টান্টিনোপলের সহিত রোমান চার্চের প্রাধান্য স্থাপনের দ্বন্দ্বেব চবম মীমাংসা করে নিতে চেয়েছিলেন। সেলজুক তুর্কীরা প্রাচ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ করেছিল দেখে ভেনিস জেনোয়া প্রভৃতি ক্রমবর্ধনশীল নগরের বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন বণিকরা বাণিজ্য-স্বার্থরক্ষার জন্য তুর্কীদের ধ্বংস করাব উদ্দেশ্যে ক্রুজেডে যোগ দিয়েছিল।

ইয়োরোপের সাধারণ মানুষ এই যুদ্ধের প্রকৃত কারণ জানত না। রাষ্ট্রের কর্ণধারগণ কোন যুদ্ধের প্রকৃত কারণ সাধারণ মানুষকে জানতে দেয় না। তারা মুখে দেশ, ধর্ম, জাতি, ন্যায় ও সত্যের জয় গান করে সাধারণ মানুষের সরল বিশ্বাস-প্রবণ মনের সুযোগ নিয়ে দেশভক্তির উদ্দীপনাময় বক্তৃতায় তার মন আকৃষ্ট করে ঘাতক-বৃত্তি গ্রহণ করতে প্রয়োচনা দেয়, মিথ্যা প্রচারের ঘটায় সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করে সরলমতি সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে।

বিভিন্ন প্রকৃতির লক্ষ লক্ষ লোক প্যালেস্টাইনের দিকে যাত্রা করল। ধর্মের জন্য যুদ্ধ করতে যাওয়ায় পথে অনেকে লুটপাট ও ইন্দ্রিয় লালসা চরিতার্থ

করেছিল। অনেকে ইয়ুদীদের, এমন কি স্বধর্মাচারী খ্রীষ্টানদের হত্যা করতে করতে অগ্রসর হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের কৃষকদের আক্রমণে বহু উচ্ছৃঙ্খল ধর্মযোদ্ধা রাস্তায় নিহত ও বিতাড়িত হয়েছিল।

অবশেষে ক্রুজেডের যোদ্ধারা গড্‌ফ্রে নামক জনৈক নর্মান নেতার অধীনে কোন রকমে প্যালেষ্টাইনে উপস্থিত হয়। তারা জেরুসেলেম আক্রমণ করে। বহু মুসলিম সৈন্য নিহত হয়। সপ্তাহকাল ব্যাপী হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়। রক্তের উজান বয়ে চলে। জেরুসেলেম অধিকার হল। গড্‌ফ্রে জেরুশেলেমের রাজা হলেন। সত্তর বৎসর পরে মিশরের সম্রাট সালাডিন খ্রীষ্টান বিজেতাদের হাত থেকে জেরুসেলেম কেড়ে নিলেন (১১৮৭)। এই সংবাদ ইয়োরোপের মানুষের মনে পুনরায় বিক্ষোভ ও উন্মাদনা সৃষ্টি করল। কয়েকবার ধর্মযুদ্ধ হল। ইয়োরোপে কোন কোন রাজা এবং সম্রাট্ ধর্মযুদ্ধে সৈন্যচালনা করেছিলেন। ধর্মের জন্য যুদ্ধ করতে এসেও অধিনায়কত্বের জন্য তাদের স্বভাবসিদ্ধ নীচতার পরিচয় দিতে তারা কুণ্ঠিত হয়নি। ক্রুজেডের যুদ্ধ কাহিনী একদিকে যেমন পাপাচরণের কালিমা লিপ্ত, অপরদিকে আবার মনুষ্য-চরিত্রের উচ্চতর গুণ-বিকাশের সৌরভে সুরভিত।

প্যালেস্টাইনে যে সকল বিদেশী রাজা গিয়েছিলেন, ইংলণ্ডের রাজা রিচার্ড তাঁদের অন্যতম। রিচার্ডের প্রচণ্ড বাহুবল, সাহস, শূরত্ব ও সৌজন্য সকলের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করেছিল। ক্রুজেডের যুদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যে বহু রমন্যাসের উপাদান যুগিয়েছে।

ক্রুজেডের একদল সৈন্য কনষ্টানটিনোপোলের গ্রীক সম্রাটকে বিতাড়িত করে লাটিন রাজ্য এবং রোমান চার্চ প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সেখানকার লাটিন রাজ্য বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে গ্রীকরা পুনরায় কনষ্টানটিনোপল পুনরুদ্ধার করে। ক্রুজেডের যোদ্ধাদের কনষ্টানটিনোপল আক্রমণ ও অধিকার সেখানে রোমান চার্চ ও পোপের প্রাধান্যলাভের আগ্রহ প্রমাণিত করে।

ফ্রান্স ও জার্মেনীর বহু বালক ধর্মযুদ্ধের উত্তেজনাবশে একটি বালক-সেনা-বাহিনী গঠন করে প্যালেষ্টাইন যাত্রা করে। তাদের ভিতর অনেকে রাস্তার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে মৃত্যু আলিঙ্গন করে, অনেকে নিখোঁজ হয় এবং অনেকে মার্সেলস্ নগরে উপস্থিত হয়। দাস ব্যবসায়ীগণ পবিত্র স্থানে নিয়ে যাওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে বালকদের জাহাজে তোলে এবং মিশরে

তাদের দাসত্বে বিক্রয় করে। ক্রুজেডের যুদ্ধে এর মতো শোচনীয় ঘটনা আর নাই।

ইংলণ্ডের রাজা পথে শত্রুগণ কর্তৃক পূর্ব ইয়োরোপে বন্দী হন এবং প্রচুর অর্থ বিনিময়ে মুক্তিলাভ করেন। ফ্রান্সের এক রাজাকেও প্যালেষ্টাইনে বন্দী করা হয়। মুক্তিলাভের জন্য তাঁকেও প্রচুর অর্থ দিতে হয়। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট ফ্রেডেরিক বার্বারোসাকে প্যালেষ্টাইনের একটি নদীর জলে ডুবিয়ে মারা হয়।

ক্রমে ধর্মযুদ্ধের মাদকতা কেটে গেল। এর ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেল। জেরু-সেলেম পুনরায় মুসলিম হস্তে পতিত হল কিন্তু ইয়োরোপের লোক ও রাজারা তাকে উদ্ধার করার জন্য আর বৃথা অর্থব্যয় ও লোকক্ষয় করতে রাজী হয়নি।

১১৯৩ সালে সালাডিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আরব সাম্রাজ্য বিভক্ত হয়ে যায়। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অংশে বিশৃঙ্খলা চলতে থাকে। ছোট ছোট সামন্ত রাজারা প্রবল হয়ে ওঠে। ১২৪৯ সালে ফ্রান্সের লুই-এর নেতৃত্বে ক্রুজেডের শেষ যুদ্ধ হয়। লুই পরাজিত হয়ে বন্দী হন।

উত্তেজনা অসাধ্য সাধন করে কিন্তু উত্তেজনাই জীবন নয়। উত্তেজনা সাময়িকভাবে কার্যকরী হয়। কিন্তু ক্রমাগত উত্তেজনা সৃষ্টি করলে ব্যক্তির স্নায়ুর ন্যায় জাতীয় স্নায়ু দুর্বল ও শিথিল হয়ে যায়। ক্রুজেড ক্রমে দৈনন্দিন ঘটনায় পর্যবসিত হল। যখনই পোপ কাহারও সহিত ঝগড়া করতেন তখনই তিনি ক্রুজেড ঘোষণা করতেন। কিম্বা যখনই তিনি কোন শক্তিশালী সম্রাটের ক্ষমতা চূর্ণ করার প্রয়োজন বোধ করতেন তখনই তিনি বিদেশে যুদ্ধ করে শক্তি ক্ষয় করার জন্য ক্রুজেড ঘোষণা করতেন। পোপ কথায় কথায় ক্রুজেড ঘোষণা করতে লাগলেন। ধর্মবিশ্বাস পোপের শক্তির উৎস ছিল কিন্তু তিনি সেই বিশ্বাসের অসদ্ব্যবহার ও অপব্যবহার করে নিজের শক্তি ও পদমর্যাদার মূলে কুঠারাঘাত করেছিলেন।

স্পেনে আরব সভ্যতা

টুর্সের যুদ্ধে আরবগণ চার্লস মার্টেলের হস্তে পরাজিত হয়ে স্পেনেই রাজত্ব করতে লাগল; আর কখনও উত্তর দিকে অগ্রসর হয়নি। স্পেন বিশাল আরব সাম্রাজ্যের অংশ হয়ে গেল। এই সাম্রাজ্য স্পেন থেকে মঙ্গোলিয়ার সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল কিন্তু বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। আব্বাসিদরা ওমিয়াদ

খলিফাদের বিতাড়িত করল। স্পেনের শাসনকর্তা আব্বাসিদ খলিফার বশ্যতা স্বীকার করলেন না। সুতরাং স্পেন আরব সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

এইভাবে মাতৃভূমির সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে বহুদূরে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিজিত জাতির মধ্যে অসহায় অবস্থায় অবস্থান তাদের পক্ষে নিরাপদ না হলেও আত্ম-শক্তিতে গভীর বিশ্বাসবশতঃ তারা বিপদকে গ্রাহ্য করত না। উত্তরের খ্রীষ্টান জাতিদের ক্রমাগত চাপ সত্ত্বেও তারা স্পেনে পাঁচ শত বৎসর রাজত্ব করে এবং পরে আরও দুই শত বৎসর তারা স্পেনের দক্ষিণে একটি ছোট রাজ্য শাসন করতে থাকে।

কর্ডোভায় আরব বা মুররা যে সভ্যতা স্থাপন করে তা একটি আশ্চর্যের বস্তু। এই সভ্যতার আলোক-শিখায় মধ্যযুগের তমসাচ্ছন্ন ইয়োরোপ জ্যোতির্ময় ও ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। কর্ডোভা পাঁচ শত বৎসর তাদের রাজধানী ছিল। এখানে দশ লক্ষ লোক বাস করত। উদ্যান-পরিশোভিত মহানগরী দৈর্ঘ্যে দশ মাইল এবং এর শহরতলি চব্বিশ মাইল ছিল। এর ষাট হাজার বিরাট প্রাসাদ, দুই লক্ষ গৃহ, আশী হাজার দোকান, তিন হাজার আট শত গির্জা এবং সাধারণের জন্য শত শত স্নানাগার এই নগরের বিপুল ঐশ্বর্য ও বিরাটত্ব প্রমাণিত করে। এখানে অসংখ্য পুস্তকালয় ছিল। আমীরের গ্রন্থাগারে চারি লক্ষ পুস্তক সংগৃহীত হয়েছিল। কর্ডোভার বিশ্ববিদ্যালয় ইয়োরোপেব এমন কি পশ্চিম এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বিদ্যায়তন ছিল। দরিদ্রদের শিক্ষার জন্য অসংখ্য পাঠশালা ছিল। সে যুগের স্পেনের প্রায় প্রত্যেক লোক লিখতে ও পড়তে পারত। তৎকালে একমাত্র ধর্মযাজকগণ ছাড়া ইয়োরোপের অভিজাত শ্রেণীর লোকেরাও একেবারে নিরক্ষর ছিল। জ্ঞান ও বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র কর্ডোভা, ঐশ্বর্য, বিলাস ও সভ্যতার লীলা-স্থান কর্ডোভা বোগ্‌দাদ নগরের গৌরবের সহিত প্রতিযোগিতা করেছিল। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে অসংখ্য বিদ্যার্থী এর বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে আসত। আরবিক দর্শন প্যারিস অক্সফোর্ড উত্তর ইটালির বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

স্পেনে সামন্ততন্ত্র প্রচলিত ছিল। সেখানে বহু ক্ষুদ্র জমিদার ও অভিজাত বংশের লোক ছিল। আমীরের সহিত তাদের যুদ্ধ প্রায়ই লেগে থাকত। ফলে রাষ্ট্র দুর্বল হয়ে গেল। উত্তর স্পেনের কতকগুলি শক্তিশালী খ্রীষ্টান রাজ্য আরবদের উপর চাপ দিতেছিল। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় সমগ্র স্পেন আমীরের রাজ্যের অন্তর্গত হয়, এমন কি ফ্রান্সের দক্ষিণে কতকটা স্থান তাঁর

অধিকারে আসে। গৃহযুদ্ধ একে দুর্বল করে দিয়েছিল। এর পতন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল।

আরবের সভ্যতা বাহুবলের উপর নির্মিত হয়েছিল। উপরের কয়েকজন লোক ধনী ও স্বাধীন ছিল। নিম্নের বহুতর লোক দরিদ্র ও পরাধীন ছিল। নিপীড়িত জনসাধারণ বিদ্রোহ করল। গৃহযুদ্ধ ব্যাপকভাবে দেখা দিল। প্রদেশ-গুলি স্বাধীন হয়ে গেল। আরব সাম্রাজ্যের পতন হল। অবশেষে কর্ডোভা ১২৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কাষ্টাইলের খ্রীষ্টান রাজার অধিকারভুক্ত হয়ে গেল। আরবরা দক্ষিণে বিতাড়িত হল কিন্তু তারা সংগ্রাম করতে ছাড়ল না। তারা গ্রানাডায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে আরবিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি রক্ষা করতে লাগল।

গ্রানাডায় সুবিখ্যাত আলহামব্রা মসজিদ, তার সুন্দর চাঁদা ও স্তম্ভরাজী ঐ যুগের স্থাপত্য শিল্পের গৌরব ঘোষণা করে। আরবীতে এর নাম অল্-হামরা অর্থাৎ লাল প্রাসাদ। লতাপাতা ফলপুষ্পাদিযুক্ত উৎকীর্ণ শিল্পচাতুর্য ও অলংকার আরবিক স্থাপত্য শিল্পের বৈশিষ্ট্য। ইসলাম মূর্তি-চিত্রণের বিরোধী। এজন্য মুসলিম স্থপতি বা ভাস্করগণ অলংকার প্রাচুর্যে তাদের সৌন্দর্য-পিপাসা সার্থক করত। কোর্-আনের শ্রেষ্ঠাংশ উদ্ধৃত করে মসজিদ বা অট্টালিকা-গাত্রে উৎকীর্ণ করা হত।

গ্রানাডা দুই শত বৎসর স্থায়ী ছিল। স্পেনের খ্রীষ্টান রাজ্যগুলি গ্রানাডাকে ক্রমাগত আক্রমণ করে পর্যুদস্ত করতে লাগল। মাঝে মাঝে গ্রানাডা কাষ্টাইলকে কর দিতে স্বীকার করত। আরাগনের ফার্ডিনাণ্ডের সহিত কাষ্টাইলের ইজাবেলার বিবাহসূত্রে কাষ্টাইল আরাগন এবং লিওয়ন সংযুক্ত হল। ফার্ডিনাণ্ড এবং ইজাবেলা গ্রানাডার বিরুদ্ধে প্রবলবেগে সৈন্য চালনা করলেন। মুসলিমগণ তাদের ক্ষুদ্ররাজ্যে অবরুদ্ধ হল এবং ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে তারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। পশ্চিম ইয়োরোপের শেষ মুসলিম রাজ্যের উপর যবনিকা পড়ে গেল। বহুসংখ্যক সারাসেন স্পেন ত্যাগ করে আফ্রিকায় চলে গেল। যারা স্পেনে থেকে গেল তাদের উপর নির্দয় অত্যাচার ও হত্যা চলতে লাগল। ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে পোপ গ্রিগরী বিধর্মীদের আগুনে পুড়িয়ে মারার প্রথা প্রবর্তিত করেন। সারাসেনদের আমলে ইয়ুদীরা সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল। তারা নিজেদের ধর্ম পরিত্যাগ করে খৃষ্টান হতে বাধ্য হল। যারা ধর্মত্যাগ করল না তাদের পুড়িয়ে মারা হল। এমন কি স্ত্রীলোক ও

শিশু অব্যাহতি পেল না। বিজেতাদের টুপী ও পায়জামা পরতে সারাসেনদের বাধ্য করা হল। তাদের ভাষা আচার ব্যবহার প্রথা, এমন কি তাদের নাম ব্যবহার করতে পারল না। তারা বিদ্রোহ করলে কঠোর নির্দয়তার সহিত তাদের বিদ্রোহ দমন করা হল। গৃহের বাহিরে তাদের স্নান করতে দেওয়া হল না। তাদের স্নানাগার ভেঙে দেওয়া হল।

লক্ষ লক্ষ সারাসেন স্পেন থেকে আফ্রিকায় বিতাড়িত হল। অনেকে ফ্রান্সে চলে গেল। অনেকে সুইজারল্যাণ্ডে বাস করতে লাগল। স্পেনে সারাসেন রাজ্য ও সভ্যতার সমাধি হয়ে গেল। ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলার আমলে স্পেন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের ফলে স্পেনের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা বেড়ে গেল। কিছু কালের জন্য স্পেন ইয়োরোপের উপর আধিপত্য করতে লাগল।

আরব সভ্যতা শক্তিপ্রধান ও বস্তুপ্রধান—এতে প্রকৃত ধর্ম ও মঙ্গলের স্থান অল্প ছিল। স্পেন নবাবিষ্কৃত মহাদেশ থেকে ধনরত্ন লুণ্ঠন করে এনে বাহ্যসম্পদ বৃদ্ধি করেছিল। মুর বিতাড়নের পর স্পেনীয় সভ্যতা রাহুমুক্ত হল। এর মূল আশ্রয় ঐশ্বর্য। এর আপাত উন্নতি ও ঔজ্জ্বল্য ঐশ্বর্য ক্ষয়ের সহিত ম্লান হয়ে গেল। এর পতন ও ধ্বংস যেমন অনিবার্য, এর পুনরুত্থান তেমনি সুদূর-পরাহত হয়েছিল।

শ্রীহর্ষের সময় থেকে গজনীর মামুদের ভারত আক্রমণের সময় পর্যন্ত ভারতের অবস্থা

৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অধঃপতন উপস্থিত হয়। এর আরও কিছুকাল পূর্ব থেকে ভারতের ক্ষাত্রশক্তি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। এই দুর্বলতার প্রধান কারণ হিন্দুধর্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সংঘর্ষ। হর্ষের পর উত্তর ভারত কতকগুলি ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এদের পরস্পরের ভিতর কলহ ও বিরোধ চলতে থাকে।

হর্ষের পরবর্তী তিন শত বৎসরের মধ্যেও শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি হয়েছিল।' রাজশেখর ভবভূতি রাজা ভোজ প্রভৃতি সাহিত্য মহারথীরা সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করে এর অন্তঃশক্তি প্রমাণিত করেন। উত্তর ভারতের গৌরব

ম্লান হওয়ার সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে চালুক্য চোল পল্লব এবং রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। আচার্য শঙ্কর অদ্বৈত সাধনায় আত্মার প্রাধান্য দিয়ে নিবৃত্তিপ্রধান ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করেন। শঙ্করের অপূর্ব প্রতিভা ক্ষুরধার বুদ্ধি ও মনীষা-বলে বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। কিন্তু ঠিক সেই সময় আর একটি নূতন ধর্ম ভারতের পশ্চিম দ্বারে উপস্থিত হয়ে তদানীন্তন সামাজিক পরিস্থিতির ভিতর আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

এমন কি হর্ষের জীবদ্দশায় আরবরা ভারতের প্রত্যন্ত দেশে উপস্থিত হয় এবং কিছু পরে সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করে। ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাশিম নামে একজন সপ্তদশবর্ষীয় যুবক একদল আরব সৈন্য নিয়ে সিন্ধু উপত্যকায় পশ্চিম পাঞ্জাবের মুলতান পর্যন্ত জয় করে। উত্তর ভারত তখন দুর্বল ছিল। সুতরাং ইচ্ছা করলে তারা আরও অধিকদূর অগ্রসর হতে পারত। তাদের এই অভিযানের রাজনৈতিক মূল্য না থাকলেও আরবদের সঙ্গে ভারতীয়দের সম্পর্ক সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে সুফল প্রসব করেছিল।

আরবদের সঙ্গে রাষ্ট্রকূটদের সংস্পর্শ ছিল। বহু আরব ভারতের পশ্চিমাংশে বাস করতে লাগল। তারা গির্জা নির্মাণ করেছিল। আরব পর্যটক ও বণিক ভারতের বিভিন্ন অংশ পরিদর্শন করতে লাগল। বহু আরব ছাত্র তক্ষশীলার প্রাচীন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করতে এল। কথিত আছে হারুন-অল-রসিদের রাজ-সভায় ভারতীয় পণ্ডিতদের সমাদর ছিল। ভারতবর্ষ থেকে বহু-চিকিৎসক বোগ্‌দাদের হাসপাতাল এবং চিকিৎসা-বিদ্যালয় গঠনে সাহায্য করেন। অঙ্কশাস্ত্র ও জ্যোতির্বিদ্যার বহু সংস্কৃত পুস্তক আরবীতে অনূদিত হয়েছিল। ভারতীয় আর্য-সংস্কৃতি, পারসিক ও হেলিনিক সংস্কৃতির ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন করে যৌবন-বল-দৃপ্ত আরব জাতি সারাসেনিক সভ্যতার যে বিরাট আলোক-মঞ্চ নির্মাণ করেছিল তার রশ্মিচ্ছটায় ইয়োরোপের অন্ধকার যুগ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আরবদের সতেজ মন ও বলিষ্ঠ হৃদয় পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ও প্রকৃতিকে আত্মসাৎ করে তাকে জাতির সুচিরাগত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রসে পরিপাক করে নূতন সৃষ্টির আনন্দে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কিন্তু স্থবির গর্বিত ও আচারনিষ্ঠ আর্য পারসিক ও হেলেনিক জাতিগুলির কঠিন হৃদয় আরবের মরুউদ্যানের স্বচ্ছ উৎসধারায় অভিষিক্ত হয়নি। আরবের সহিত ভারতের সংস্পর্শ কয়েকশত বৎসর চলতে থাকলেও ভারতবর্ষের উপর এর প্রভাব অল্পই হয়েছিল।

ব্যক্তির ন্যায় জাতিও বয়োবৃদ্ধির সহিত শিক্ষাপটুতা হারিয়ে ফেলে। শৈশবে ও যুবা বয়সে মানুষের মন গতিমান সতেজ ও কোমল থাকে। নূতন আগ্রহ ও কৌতূহল নবনব ভাব ও চেতনা আনে। বার্ধক্য মানুষকে স্থবির ও স্থিতিশীল করে তোলে, তখন নূতন কিছু গ্রহণ করার মতো শক্তি অন্তর্হিত হয়। তখন সে পরিবর্তনের বিরোধী হয়ে ওঠে, আত্মরক্ষার জন্য বিপন্ন হয়ে কূর্মবৃত্তি অবলম্বন করে। আরবের মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আসত, ধর্ম প্রচার করত, মসজিদ নির্মাণ করত, কখনও বা দুই একজন লোককে মুসলমান ধর্মে দীক্ষা দিয়ে চলে যেত। তখন হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর বিরোধ ছিল না, বরং পরস্পরের ভিতর চিন্তা ও ভাব আদান-প্রদানের ফলে পরস্পরকে জানার ও বোঝার সুবিধা হয়েছিল। পরস্পরেব ধর্ম সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে পরস্পরের জ্ঞান লাভ করার সুযোগ ছিল। কিন্তু একাদশ শতকে ইসলাম তরবারি হস্তে বিজেতার রূপ ধারণ করে ভারতবর্ষে আবির্ভূত হল। তখন হিন্দুর সহজাত ও চিরাভ্যস্ত পরমতসহনশীলতাব বাঁধ ভেঙে গেল, নবাগতদের প্রতি ভারতীয় হিন্দুর ঘৃণা ও বিদ্বেষ কায়েম হয়ে গেল, সম্প্রসারণের বা সমন্বয়ের অবকাশ সঙ্কীর্ণ হয়ে গেল।

বৈনাশিকতার মূর্তি ধারণ করে তরবারি হস্তে নরশোণিতসিক্ত পথে যিনি প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ কবেন তাঁর নাম গজনীর মামুদ। গজনী এক্ষণে আফগানিস্তানের একটি ক্ষুদ্র সহর মাত্র। দশম শতকে গজনীকে কেন্দ্র করে একটি রাজ্য গড়ে ওঠে। মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রগুলি নামমাত্র বোগ্‌দাদের খলিফার অধীন ছিল। হারুন-অল্‌-রসিদের মৃত্যুর পর খলিফা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং তাঁর সাম্রাজ্য কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। সবুক্তিগীন নামে একজন তুর্কী দাস ৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গজনী ও কান্দাহারের নিকট একটি রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। লাহোরের রাজা জয়পাল তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করে কাবুল উপত্যকায় উপস্থিত হন। সবুক্তিগীনের মৃত্যুর পর মামুদ সিংহাসন লাভ করেন এবং বৎসরের পর বৎসর ভারতবর্ষ আক্রমণ ও ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশে চলে যেতেন। তিনি সতের বার ভারতবর্ষ আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। হাজার হাজার লোক হত ও আহত হল, উত্তর ভারতে রক্তের নদী বয়ে গেল। তাঁর কাশ্মীর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। তিনি পাটলিপুত্র, মথুরা এবং সোমনাথ পর্যন্ত অগ্রসর হন। কথিত আছে থানেশ্বর থেকে তিনি দুই লক্ষ বন্দী

ও প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে যান। তাঁর সোমনাথের মন্দির আক্রমণ ও ধ্বংস ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। মামুদ সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করতে আসছেন শুনে সহস্র সহস্র ভয়ার্ত নরনারী দেবতার মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। তারা ভেবেছিল দেবতা তাদের রক্ষা করবেন। ভক্তদের আশা বিফল হল। মামুদ দেবতার মন্দির ভেঙে দিলেন, বহুকাল সঞ্চিত ধনরত্ন লুণ্ঠন করলেন, পঞ্চাশ হাজার লোক হত্যা হল। ১০৩০ সালে মামুদের মৃত্যুর সময় সমগ্র পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশ তাঁর অধিকারে ছিল।

ক্রুজেডের সময় ইয়োরোপ

একাদশ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত ইসলামের সংঘর্ষ চলেছিল। রাশিয়াব অধিবাসীবা সকলের শেষে এই ধর্ম গ্রহণ করে। ক্রুজেডের সময় পোপের ক্ষমতা চরমে উঠেছিল। তিনি রোমে বসে ধর্মযুদ্ধের জন্য রাজা ও প্রজাসাধাবণকে আহ্বান করেছিলেন। তারা খ্রীষ্টানদের তীর্থক্ষেত্র উদ্ধারের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করার জন্য প্যালেষ্টাইনে গিয়ে দুঃখ ও মৃত্যু বরণ করেছিল।

১১৫২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনির হোহেনস্টুফেনের ১ম ফ্রেডেরিক সম্রাট হন। তিনি ফ্রেডেরিক বার্বারোসা নামে পরিচিত। তাঁর সঙ্গে পোপের সংঘর্ষ হয়। ফ্রেডেরিক পোপের বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। বার্বারোসার পৌত্র ২য় ফ্রেডেরিক 'পৃথিবীর আশ্চর্য মানুষ' বলে অভিহিত হন। তিনি পোপের কাছে বশ্যতা স্বীকার করেননি। পোপ তাঁকে সমাজচ্যুত করলেন। কিন্তু তিনি পোপের এই মরচে-ধরা অস্ত্রকে গ্রাহ্য করেননি।

ফ্রেডেরিক ছিলেন ক্যাথলিক চার্চের অবাধ্য সন্তান। সন্দেহবাদী ফ্রেডেরিক মনে করতেন ধর্ম প্রতারণার উপায়। একাদশ শতাব্দী ছিল অজ্ঞতা ও অন্ধ-বিশ্বাসের যুগ, ত্রয়োদশ শতাব্দী ছিল সন্দেহের, ভ্রান্তিমুক্তির যুগ। ফ্রেডেরিক রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পোপের প্রভুত্ব মেনে নিতে অস্বীকার করেন। ধর্মগুরু পোপ ধর্মের উচ্চাসনে উপবিষ্ট হয়ে জাগতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন, রাষ্ট্রিক ক্ষমতা লাভের জন্য কলহ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থেকে ধর্মের অবমাননা করছেন, ধর্মসম্রাটের এই হীন ও জঘন্য মনোবৃত্তি ও ক্রিয়াকলাপে ইয়োরোপের জনমন

যে বিক্ষুব্ধ হচ্ছিল, এই কথা ফ্রেডেরিকের লেখনীমুখে দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। পোপ নবম গ্রীগরী তাঁকে সমাজচ্যুত করে ফতোয়া জারি করলেন। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে রাজার ক্ষমতা ও প্রভুত্বকে অগ্রাহ্য করে পোপ ইয়োরোপের খ্রীষ্টান রাজ্য সকলের উপর একাধিপত্য করার দাবী করছেন, ফ্রেডেরিক সেই দাবীর অসারতা ও অযৌক্তিকতা প্রমাণ করে পোপের অন্যায় দাবী অস্বীকার করার জন্য সকলকে আহ্বান করলেন। গ্রীগরী তাঁকে দ্বিতীয়বার সমাজচ্যুত করলেন। ফ্রেডেরিক নির্ভীকভাবে যাজক সম্প্রদায়ের অধর্মাচরণের কথা প্রচার করলেন এবং চার্চের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে নেওয়ার জন্য সমসাময়িক রাজাদের নিকট প্রস্তাব করলেন। পরবর্তী যুগে ইয়োরোপের রাজন্যবর্গ তাঁর এই প্রস্তাব বর্ণে বর্ণে পালন করেছিলেন। চার্চের বিপুল সম্পত্তিকে রাষ্ট্রের সম্পত্তিতে রূপান্তরিত করে রাজারা তাদের বিষ-দাঁত ভেঙে দিয়েছিলেন।

ফ্রেডেরিক ছিলেন নূতন যুগের বার্তাবহ। তাঁর সদাজাগ্রত জিজ্ঞাসু মন চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। তাঁর সভা ছিল ইহুদী মুসলিম ও খ্রীষ্টান দার্শনিকদের ত্রিবেণী সঙ্গম। তাঁরই চেষ্টার ফলে ইটালিয় মানস সারাসানিক ভাবধারায় সিঞ্চিত হয়েছিল। তিনিই খ্রীষ্টান শিক্ষার্থীদের আরবের সংখ্যাতত্ত্ব ও বীজগণিতের সহিত পরিচিত করেছিলেন। তাঁর সভায় দার্শনিকদের অন্যতম মাইকেল স্কট্ আরিষ্টটলীয় দর্শনের উপর আভিরোসের টীকার কতকাংশ অনুবাদ করেছিলেন। ১২২৪ সালে ফ্রেডেরিক নেপলসের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রচুর অর্থ সাহায্য করে তিনি সেলের্নোর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষার উন্নতি করেন। তিনি একটি পশুশালা স্থাপন করেন। তিনি বাজপাখির সাহায্যে অন্য পাখি শিকার সম্বন্ধে একখানি পুস্তক রচনা করেন। এতে পাখির জীবন ও পাখিতত্ত্বে তাঁর সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি ইটালিয় ভাষায় কবিতা লিখতেন। ইটালিয় কবিতা তাঁর সভায় প্রথম জন্মলাভ করেছিল। তিনি ছিলেন নূতন যুগের প্রথম আধুনিক। মৌলিকতা তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার মানদণ্ড। এক সময়ে কোন কারণে সোনার অভাব হলে তিনি চামড়ার উপর রাজার নামের মোহর-ছাপ লাগিয়ে নোট প্রচলন করেন। তিনি জনমনে যে বৈপ্লবিক চিন্তার বীজ ছড়িয়েছিলেন তা পরবর্তী কালে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ভগবান পরলোক পাপ প্রভৃতির দোহাই দিয়ে রোমের ধর্মসম্রাট ইয়োরোপের অজ্ঞ জনসাধারণ ও দুর্বল রাজাদের উপর প্রভুত্ব করছিলেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ

করার সাহস কাহারও ছিল না। পোপের গর্বান্ধ চক্ষু দেখতে পায়নি যে ইয়োরোপ সাবালক হচ্ছিল।

রোমের ধর্মগুরুগণ প্রভুত্বলাভের বশবর্তী হয়ে যীশুর আদর্শ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। পুরোহিত-তন্ত্র গড়ে উঠেছিল। রাজতন্ত্রের উদ্দেশ্য নিরঙ্কুশ একাধিপত্য স্থাপন। পুরোহিত তন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল পোপের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা। কূটবুদ্ধি অত্যাচার ধর্মান্ধতা লোভ প্রবঞ্চনা মিথ্যাচরণ সত্যভঙ্গ ধর্মের উচ্চতর নীতিকে পীড়িত করেছিল। বাহ্য অনুষ্ঠান ও প্রাণহীন মন্ত্র-তন্ত্রের চাপে প্রকৃত ধর্মের শ্বাসরোধ হয়েছিল। এমন কি ২৭৭ সালে চার্চের ধর্মগুরুগণ মণির ধর্মের গভীরতত্ত্বের মর্ম বুঝতে না পেরে তাঁকে ক্রুশবিদ্ধ করেছিল। দক্ষিণ ফ্রান্সে মণির ধর্মাবলম্বী কাথারগণ খ্রীষ্টান বলে পরিচয় দিত কিন্তু পোপের ধর্মমতে ও বাইবেলের সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যায় তাদের আস্থা ছিল না। ওয়াল্ডো প্রকৃত প্রস্তাবে ক্যাথলিক ধর্মশিক্ষার অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি যাজক সম্প্রদায়ের বিলাসিতা ও বিষয়বুদ্ধির তীব্র সমালোচনা করতেন। পোপ তাঁর শিষ্যদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন। তাদের উপর যে নির্যাতন হয়েছিল তা বর্ণনাতীত।

পোপ এতদূর দাম্ভিক ও গর্বিত হয়ে উঠলেন যে সামান্য মতানৈক্য বা বিরুদ্ধ সমালোচনা সহ্য করতে পারতেন না। গোঁড়া পুরোহিতগণ সাম্প্রদায়িক ধর্মশিক্ষা ব্যতীত জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা সহ্য করতে পারত না। তারা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানবুদ্ধির পরম শত্রু ছিল। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক লোকের মনে সমালোচনী বৃত্তি ও সন্দেহ সৃষ্টি করেছিলেন। তার প্রভাবে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে কয়েকজন বিদ্রোহীর সৃষ্টি হয়েছিল। তারা প্রকাশ্যভাবে চার্চের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করে চার্চের বাইরে ধর্মজীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।

আসিসির সেণ্ট ফ্রান্সিস্ (১১৮১-১২২৬) এইরূপ একজন বিদ্রোহী ছিলেন। তিনি ঐশ্বর্যকে জীর্ণ কাঁথার মতো পরিত্যাগ করে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি আতুর বিশেষতঃ কুষ্ঠ রোগীদের সেবায় আত্ম নিয়োগ করেন। তিনি যে সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করেন তার নাম ফ্রান্সিসকান সম্প্রদায়। তাঁর শিষ্যরা আসিসিতে একটি গির্জা ও মঠ স্থাপন করে গুরুর স্মৃতি রক্ষা করেছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর অন্তরঙ্গ শিষ্যদের উপর অমানুষিক অত্যাচার চলেছিল। ১৩১৮ সালে চারি জন ফ্রানসিসকানকে অবিশ্বাসী বলে পুড়িয়ে মারা হয়। সেণ্ট ডমিনিক (১১৭০-১২২১) বিচার-বিতর্কের সাহায্যে অবিশ্বাসীদের ধর্মপথে

আনতে চেষ্টিত হন। পোপ তাঁকে ধর্ম প্রচারের জন্য নিযুক্ত করেন। ডমিনিকের শিষ্যদের নিয়ে যে সম্প্রদায় গঠিত হয় তার নাম ডমিনিক সম্প্রদায়। ত্রয়োদশ শতকে রোমান ক্যাথলিক ধর্মমতের বিরুদ্ধে যারা মত প্রকাশ করত তাদের শাস্তি দিবার জন্য ইনকুইজিসন প্রবর্তিত হল। বিরুদ্ধবাদীদের পুড়িয়ে মারার ব্যবস্থা হল। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশের প্রকাশ্য স্থানে চার্চের পাণ্ডাগণ বহু দরিদ্র ও সামান্য ব্যক্তিদেরও ক্যাথলিক ধর্মে আস্থাহীন বলে জ্বলন্ত আগুনে আহুতি দিয়ে পৃথিবীতে ক্যাথলিক ধর্মের আদর্শ প্রচার করেছিলেন।

উইক্লিফ্ (১৩২০-১৩৮৪) চার্চের অনাচার ও নির্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য-ভাবে কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন। সমস্ত ইংল্যাণ্ডে নিজের মত প্রচারের জন্য তিনি কতকগুলি দরিদ্র পুরোহিত নিয়ে একটি সম্প্রদায় গঠন করেন। সাধারণ লোক বাইবেল পড়ে যাতে তাঁর মতের যাথার্থ্য নিরূপণ করতে পারে এজন্য তিনি বাইবেলের ইংরেজি অনুবাদ করেন। পোপের আদেশে কারারুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তাঁর মৃত্যু হয়। পোপের আদেশে বিশপ ফ্লেমিং ১৪২৮ সালে উইক্লিফের কঙ্কালকে গোর থেকে তুলে আগুনে পুড়িয়ে দেন।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী গির্জা নির্মাণের যুগ। রোমানেস্ক স্থাপত্য রীতি গথিক শিল্পে পরিণতি লাভ করেছিল। প্রশস্ত ছাদযুক্ত উচ্চ মঞ্চ ক্রমসূক্ষ্মাগ্র চূড়ায় পরিণত হয়ে উর্ধ্বে প্রসৃত হল, তীক্ষ্ণাগ্র চাঁদা প্রবর্তিত হল, নানারকমের জানালা ও রঙিন কাঁচ ব্যবহৃত হল। যাজক সম্প্রদায়ের ঐশ্বর্য ও বিলাসিতা নূতন স্থাপত্য রীতির উন্নয়নে সাহায্য করেছিল। প্যারিসের নোটার ডেম ও আমিয়েনস্-এর গির্জা গথিক স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ-নিদর্শন। গথিক নির্মাণ-শিল্প ইটালিতে প্রবিষ্ট হয়নি। মুরদের বিতাড়িত করে খ্রীষ্টান শক্তির অভ্যুদয়ের সহিত স্পেনে এর বিস্তার হয়েছিল।

ইতিহাসে আকস্মিক নূতন সাজে আবির্ভূত হয়। ব্যবহারিক জীবনের উপর প্রতিফলিত হয় সমাজের পরিবর্তন এবং এরই প্রতিক্রিয়া হয় মনজগতে। সমসাময়িক শিল্প ও সাহিত্য তাকেই প্রকাশ করে। যুগের পর যুগ শিল্প পরিবর্তিত হয় জীবনবোধের প্রেরণায় বা তাড়নায় এমন কি তার আঙ্গিকও নূতন সৃষ্টির পথে প্রকাশিত হয়। একদিকে রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগ এবং অপরদিকে মধ্যযুগ, এই যুগদ্বয়ের মধ্যবর্তী সময়ে বাস্তব-নিরপেক্ষ কলাশিল্প প্রচলিত ছিল। মৃৎশিল্প বা ভাস্কর্য বস্তুঅনুকরণ সাপেক্ষ।

কিন্তু এই যুগের খ্রীষ্টান ধর্মের বা ইসলামের সৌন্দর্য চর্চা নির্মাণ শিল্পের রেখার সাবলিল গতিছন্দে অলঙ্করণ সম্পদে ঐশ্বর্যশালী হয়েছিল।

সঙ্গীতেও বিশেষ পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল। এতকাল সঙ্গীতে স্বর সঙ্গতির বা মিলনের চেষ্টা ছিল না। সঙ্গীত ছন্দ ও তালসর্বস্ব ছিল। এক্ষণে ঐকতান সঙ্গীতের প্রবর্তন হল। এর সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতের বহুধ্বনিত্ব প্রকাশের সুবিধার জন্য স্বরলিপি সৃষ্টি হল। স্থাপত্যে যেমন সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তেমনি শিল্পীর নূতনতর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছিল।

এই যুগ ছিল বাহুবল ও বীরত্বের যুগ। যোদ্ধাগণ অসমসাহসিকতার কর্মে আত্মনিয়োগ করে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করত। গায়কগণ অভিজাত নর-নারীর আনন্দ বর্ধনের জন্য প্রাসাদে প্রাসাদে গান করে বেড়াত। ফ্রান্সের ট্রুবেডুর কবিরা স্বরচিত গান গেয়ে লোকের চিত্তবিনোদন করত। ক্রমে বীণা বেহালা অর্গান প্রভৃতি যন্ত্র প্রচলিত হল। চার্চের চতুঃসীমার মধ্যে গান ঐকতান বা সমবেত ধর্ম-সঙ্গীত চার্চের সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর জনসমাজে মুক্তি লাভ করেছিল। ক্রমে ধর্মবিষয়ক গান ঈশ্বরীয় প্রেম করুণা ও প্রার্থনার শুষ্ক নীরস সঙ্গীতের পরিবর্তে মানুষী প্রেমের আনন্দ ও বেদনায় স্বচ্ছন্দ বিকাশ লাভ করল।

ধর্মবিশ্বাসের যুগের অবসানের সহিত উপাসনা-মন্দির নির্মাণের স্রোতে ভাঁটা পড়েছিল। ধর্ম পরজগৎ প্রভৃতি ভাব বিলাসের কথা ছেড়ে মানুষের চিন্তা এক্ষণে জাগতিক ব্যাপারে আকৃষ্ট হল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য, রাষ্ট্র প্রভৃতি অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে মনোযোগ দিল। গির্জার পরিবর্তে সাধারণের সম্মিলনের জন্য বিরাট কক্ষ বা গৃহ নির্মিত হতে লাগল। জীর্ণ পুরাতন নগরের সংস্কার বা পুনর্গঠন হল। নূতন নগর পত্তন হল। নাগরিক জীবন, নূতন সমাজ, নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি হল। রোমান সাম্রাজ্যের গৌরবময় যুগে ভূমধ্য সাগরের তীরভূমির উপর বহু সহর ও নগর স্থাপিত হয়েছিল কিন্তু রোমের ও গ্রীকো-রোমান সভ্যতার পতনের সহিত তাদের গৌরব ম্লান হয়ে গিয়েছিল। আরবশাসিত স্পেনের বাহিরে একমাত্র কনষ্টানটিনোপল ব্যতীত ইয়োরোপে আর কোন বৃহৎ নগর ছিল না বললেও চলে।

অর্থনীতির নূতন প্রভাব নূতন সমাজ সৃষ্টি করল। সভ্যতা ও উৎকর্ষ নগরের অনুগামী। ইটালিতে বহু নূতন নগর স্থাপিত হল। এরা নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষায় সচেতন ছিল। এজন্য তারা পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের

সম্রাটের চক্ষুশূল হয়েছিল। ইটালি ও অন্যত্র নবপ্রতিষ্ঠিত নগরের অধিবাসিগণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য দেশ-বিদেশে গমনাগমন করত। বণিক ধনিক ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় হল। আড্রিয়াটিক উপসাগরের তীরে ভেনিস একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রশাসিত নগর ছিল। পূর্বে এই স্থানটি জলাভূমি প্রধান ছিল। হুণ বীর আটিলার প্রচণ্ড আক্রমণে অ্যাকুইনিয়া বিপর্যস্ত হলে কতকগুলি লোক প্রাণভয়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছিল। এরাই ভেনিস নগর পত্তন করে। এর অধিবাসিগণ কখনও পরাধীন হয়নি। ভারতবর্ষ ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশের সহিত বাণিজ্যে এরা ঐশ্বর্যশালী হয়ে ওঠে। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য এরা জাহাজ নির্মাণ করে। ক্রমে এরা নৌবহর নির্মাণ করে নৌশক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। এখানে ধনিকরা যে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে তার সভাপতির নাম ডজ্। ১৭৯৭ সালে বিজয়ী নেপোলিয়নের ভেনিস প্রবেশের সময় সর্বশেষ বৃদ্ধ ডজ্ ভয়ে মূর্ছিত হয়ে মৃত্যু আলিঙ্গন করেন।

ইটালির অপর দিকে ভেনিসের প্রতিদ্বন্দ্বী জেনোয়া অবস্থিত ছিল। এর অধিবাসিগণও সমুদ্রপথে বাণিজ্য করত। এই দুইটি স্বাধীন ও প্রজাতন্ত্র-শাসিত নগরের মধ্যবর্তী স্থানে বোলোনা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিসা ভেরোনা ও ফ্লোরেন্স বর্তমান ছিল। মেডিচি বংশের শাসনকালে ফ্লোরেন্সে বহু শিল্পীর উদয় হয়। ইটালির উত্তরে মিলান শ্রমশিল্পের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছিল এবং দক্ষিণে নেপলসের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছিল। হিউ ক্যাপেটের সময় প্যারিস ফ্রান্সের রাজধানী হয়। তদবধি প্যারিস ফ্রান্সের হৃদপিণ্ড-স্বরূপ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। লিয়নস্ মার্সেলস্ আর্লয়েনস্ বোর্দো এবং বোলোন ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠেছিল। জার্মেনিতে হামবুর্গ ব্রিমেন কলোন ফ্রাঙ্কফোর্ট মিউনিক ডানজিগ নুরেমবার্গ প্রভৃতি নগর ক্রমবর্ধিত হচ্ছিল। নেদারল্যাণ্ডেও অ্যাণ্টওয়ার্প ব্রুসেলস ও ঘেণ্ট বাণিজ্য কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশের নগরগুলির ঐশ্বর্য শক্তি ও বাণিজ্য প্রসারের সহিত লণ্ডন প্রতিযোগিতা করতে পারেনি। তবে অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজ বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। ভিয়েনা এবং রাশিয়ায় মস্কো কিভ্ ও নভগোরভ্ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল।

নূতন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ফলে ইয়োরোপে বহু নূতন নগরের জন্ম হয়েছিল। প্রাচীনকালে নগর প্রতিষ্ঠা করতেন রাজা সম্রাট বা দিগ্বিজয়ী বীর। এ যুগের নগর প্রতিষ্ঠা করেছিল ব্যবসায়ী সওদাগর ও বণিক। এরা দেশ-বিদেশে গমনাগমন করত, পণ্য আমদানী ও রপ্তানী করে প্রচুর অর্থ লাভ

করত। এইভাবে বুর্জোয়া অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল। ক্রমে এরা শক্তি বৃদ্ধি করল। তখন পুরাতন বনেদী স্বার্থের সহিত এদের সংঘর্ষ উপস্থিত হল। এর নাম শ্রেণীসংঘর্ষ। ক্রমে বুর্জোয়া শ্রেণী পুরাতন বনেদী স্বার্থের সঙ্গে একমত হয়ে একই পন্থা অবলম্বন করল অর্থাৎ জনগণকে শোষণ করতে লাগল। এর ফল পরে বিষময় হয়ে উঠেছে।

নগর ও সভ্যতা যুগপৎ আবির্ভূত হয়। নগর প্রতিষ্ঠার ফলে বিদ্যাচর্চা ও স্বাধীন মনোভাব সৃষ্টি হয়। গ্রামের লোক সংখ্যায় বেশী কিন্তু তারা কূপমণ্ডুক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়। গ্রামের সংকীর্ণ বেষ্টনী তাদের মনে সংকীর্ণতা আনে। তারা কঠোর পরিশ্রম করে, জমিদারের আদেশ মেনে চলে, সীমাবদ্ধ পরিবেশে তাদের মন অনড় হয়, অচলায়তন প্রথার চাপে তারা পিষ্ট হয়ে যায়। নগরে বহু লোক একত্র বাস করে। তারা পরস্পরের সহিত সহজে মেলামেশা করে, বিদ্যাচর্চা চিন্তা বিচার সমালোচনা ও বিতর্ক করার সুযোগ পায়।

এই যুগে একদিকে সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার রথচক্র, অন্যদিকে চার্চধর্ম-তন্ত্রের শৃঙ্খল—এই উভয় সঙ্কটের মধ্যপথে মুক্তিসাধনা চলেছিল। অন্ধ বিশ্বাসের যুগের অবসান হল, সন্দেহ ও জিজ্ঞাসার যুগ আরম্ভ হল। পোপের ক্ষমতা এবং চার্চের প্রভুত্ব সকলে নির্বিচারে গ্রহণ করতে চায়নি। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক ধর্মগুরুর নির্বিবেক আদেশ অমান্য করেছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সাহস ও শক্তি বর্ধিত হচ্ছিল। দ্বাদশ শতক থেকে মানুষের মন বিদ্যা ও জ্ঞানের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ইয়োরোপের বিদগ্ধ-সমাজ লাটিন ভাষা ব্যবহার করতেন। বহু ছাত্র বিদ্যাপীঠ সমূহে শিক্ষা লাভ করছিল। ত্রয়োদশ শতকে ইটালিতে দান্তে আলিঘিরি ও পেট্রার্ক এবং ইংল্যাণ্ডে মহাকবি জিওফ্রি চসারের অভ্যুদয় হয়েছিল। তাঁদের অনবদ্য কাব্যপ্রতিভার আলোকে ইয়োরোপের মসীলিপ্ত সাহিত্যাকাশ ভাস্বর হয়ে উঠল। ত্রয়োদশ শতকেই অক্সফোর্ড থেকে রোজার বেকনের বৈজ্ঞানিক প্রতিভার রশ্মি তিমির যুগের অন্ধকার ভেদ করে অদূর ভবিষ্যতের বিজ্ঞান সাধনার পথ আলোকিত করেছিল।

ইয়োরোপের নবজন্ম ও ভারতবর্ষ

ইয়োরোপের মানস। ক্যাথলিক চার্চের অতিমাত্র প্রভুত্বলিপ্সা ইয়োরোপের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের মনে চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলেছিল। চার্চের সহিত সংগ্রামের অগ্নিপরীক্ষায় আধুনিক ইয়োরোপের জন্ম হচ্ছিল। চতুর্দশ শতকে এবং তৎপরবর্তী যুগে ধর্মের অন্ধ আনুগত্য থেকে মুক্তির এই প্রয়াস এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম, একই মনোবৃত্তির দ্বৈত বিকাশ মাত্র। ইয়োরোপের দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত হচ্ছিল—নবজন্মের বেদনায় সে অস্থির হয়েছিল। একদিকে সে ধর্মের অনুশাসন এবং পোপের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল, অন্যদিকে নির্বিবেক আইন ও রাজার ভগবৎ প্রদত্ত ক্ষমতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

এতদিন সে শুনে এসেছে, বশ্যতা মনুষ্য চরিত্রের মহৎ গুণ, ব্যক্তি—জীবনের দৈনন্দিন ব্যাপারেও স্বাধীন চিন্তা অন্যায়। একদিকে অন্ধ বিশ্বাস নির্বিবেক আনুগত্য ও বশ্যতা, অপর দিকে বুদ্ধি দীপ্তি, বিচারশক্তি—এই দুইটি পর পর মনোভাবের সংঘর্ষের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপীয় মানস আপন স্বার্থকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। বুদ্ধি-মুক্তির সংগ্রামে জয়ী হতে ইয়োরোপ কয়েক শতাব্দী চেষ্টা করেছিল এবং তার চেষ্টা ফলবতী হয়েছিল কিন্তু চিন্তায় ও রাষ্ট্রে ব্যক্তি স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার পর অর্থনীতি ক্ষেত্রে অসাম্য স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থনৈতিক অসাম্য ও দারিদ্র্য প্রকৃত স্বাধীনতার লক্ষণ নয়। রাজনীতি ক্ষেত্রে যে মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছিল তারই তাড়নায় ইয়োরোপের মানুষ দেশ দেশান্তরে, সশস্ত্র অভিযান চালিয়েছিল। ক্রমে সাম্রাজ্যবাদের বিকাশে তা আত্মপ্রকাশ করল। গণতন্ত্রের আবরণে সামাজিক বৈষম্য ও অন্যায় চিরকাল ঢেকে রাখা সম্ভব হয়নি। এজন্য সংঘর্ষ এখন ব্যাপক হয়ে একটি বিরাট সমস্যার আকারে দেখা দিয়েছে এবং পৃথিবীব্যাপী বিপ্লব সূচনা করছে।

হিন্দু মানস। প্রাচীন ভারতে চিন্তার স্বাধীনতা ছিল, বিবেকের বন্ধন ছিল না। মতামতের জন্য কাহাকেও নির্যাতন সহ্য করতে হয়নি। চিন্তায় অতিমাত্র স্বাধীনতার জন্য মতভেদ, চুলচেরা বিচার, দলসৃষ্টি, সম্প্রদায় গঠন, দার্শনিকতা, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী, অ-দৃষ্ট পরলোকের তত্ত্বালোচনা, দৃষ্ট বা বাস্তবজীবনের প্রতি উদাসীনতা, পার্থিব বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা, ব্যবহারিক

জীবনের বিড়ম্বনাকে ভুলে থাকার জন্য পরজীবনের জন্য সুখস্বর্গ রচনা ইত্যাদি হিন্দু মানসে স্থিতিশীলতা ও নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টি করেছিল।

ভারতবর্ষে মুসলমান বিজয় রাজনৈতিক। ইসলাম হিন্দুর মনে নাড়া দিলেও সে নিজেকে নিরাপদ করার জন্য কতকগুলি রক্ষাকবচ সৃষ্টি করেছিল। ভারতবর্ষে গ্রামতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। গ্রামের শাসন কর আদায় প্রভৃতি কার্য গ্রামের লোকেরাই করত। গ্রামতন্ত্রের ছায়ায় স্বাধীন জীবনের আস্বাদ পেয়ে তারা পরিতৃপ্ত থাকত, রাজশক্তির ক্ষমতা অর্জন উত্থান-পতনের সংবাদ তাদের কর্ণে পৌছত না অথবা পৌছুলেও তারা তাতে বিচলিত হত না। ফলে সমস্ত ক্ষমতা রাজার হস্তগত হয়ে গেল। ক্রমে গ্রামতন্ত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হল। রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার সকল স্তর থেকে স্বাধীনতার চিহ্ন অন্তর্হিত হয়ে গেল।

ইয়োরোপের মানুষ ধর্মে ও রাষ্ট্রে নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বিবেকের মুক্তি ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন করে বৃহত্তর জগতে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেছে. আর ভারতবর্ষ প্রথম থেকে ধর্মে ও রাষ্ট্রে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করেও বিপ্লবকর পরিবর্তন ও নূতন পরিবেশের সহিত সমান তালে পা ফেলতে না পেরে পশ্চাতে হটে গিয়েছিল।

ভারতবর্ষে মোগল সাম্রাজ্য

খ্রীষ্টীয় ১২০৩ সাল থেকে ১৫২৫ সাল পর্যন্ত দিল্লীতে পর পর দাস বংশ, সৈয়দ ও লোদী বংশ রাজত্ব করে। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে পানিপথের যুদ্ধে পরাস্ত করে বাবর দিল্লী ও আগ্রার অধিপতি হন। বাবরের সঙ্গে কামান ছিল বলে পানিপথের যুদ্ধ জয় তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছিল। বাবরের পিতা তাইমুরের বংশধর এবং তাঁর মাতা দিগ্বিজয়ী মোগল বীর জেঙ্গিস্ খাঁর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এজন্য বাবর যে বংশ স্থাপন করেন তার নাম মোগল বংশ।

খানুয়ার যুদ্ধের পর (১৫২৭) বাবর তিন বৎসর মাত্র জীবিত ছিলেন। তিনি ধৈর্যশীল উৎসাহী নির্ভীক ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন। তিনি ভোগবিলাস ভালোবাসতেন না। তিনি বেশ লেখাপড়া জানতেন ও সংগীতাদি

বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি পার্শী ভাষায় কবিতা রচনা করতে পারতেন। তাঁর জীবনচরিতে তাঁর নিজের এবং সেকালের অনেক বিবরণ জানতে পারা যায়।

বাবরের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন হিন্দুস্থানের অধীশ্বর হলেন। তিনি পিতার ন্যায় সাহসী যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু রাজ্যরক্ষা করার মতো উদ্যম ও কার্যতৎপরতা তাঁর ছিল না। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ্ মালব জয় করে মেবারের রাজধানী চিতোর অবরোধ করেন। হুমায়ুন বাহাদুর শাহ্‌কে পরাস্ত করে মালব ও গুজরাট অধিকার করলেন। এদিকে শের খাঁ বিহার অধিকার করে শক্তিশালী হয়ে উঠলেন। হুমায়ুন শের খাঁর নিকট পরাজিত হয়ে পলায়ন করলেন (১৫৩৯)। নানাস্থানে ঘুরে কোথাও কিছু করতে না পেরে অবশেষে সিন্ধু প্রদেশের মরুভূমি পার হয়ে তিনি পারস্যে পলায়ন করলেন। পথে অমরকোটে তাঁর ভুবনবিখ্যাত পুত্র আকবরের জন্ম হয় (১৫৪২)।

১৫২৬ সালে বাবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেন এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষে বিদেশীই থেকে যান। ইরাণী শিল্প ও সাহিত্যের অনুশীলনে তাইমুরের যুগে মধ্য এশিয়ায় যে সাংস্কৃতিক জাগরণ হয়েছিল বাবর তার প্রভাব অনুভব করেছিলেন। ভারতবর্ষে এসেও তিনি জন্মভূমির তুষার-কিরীটী পর্বতমালা, ফরগনার মাংস পুষ্প ও ফলের সুখময় স্মৃতি ভুলতে পারেন নি। হিন্দুস্থান তাঁর নিকট একটি আশ্চর্য ও সুন্দর দেশ ছিল। কনষ্টানটি-নোপল থেকে একজন বিখ্যাত স্থপতি আনিয়ে তিনি আগ্রায় একটি সুন্দর রাজধানী নির্মাণ করেন। ভারতীয়দের সৃজনী প্রতিভার অবসাদ ও সাংস্কৃতিক দৈন্য তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি এড়াতে পারেনি।

আফগানগণ ভারতবর্ষে বসবাস করে ইতিপূর্বেই ভারতীয় হয়ে গিয়েছিল। দেশ অধিকার করার পর তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হয়েছিল। তারা প্রজাদের হৃদয় জয় করতে চেষ্টিত হয়েছিল। ভারতীয় চিন্তা ও ভাবের সহিত তাদের চিন্তা ও ভাব বিনিময়ের ফলে সমাজের শীর্ষদেশে যে সমন্বয় সাধিত হচ্ছিল তাতে বৃহত্তর সমাজের স্বতঃউৎসারিত উদার ভাবধারার সমর্থন অল্প ছিল না। এরই ভিত্তির উপর আকবর তাঁর উদারনীতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আকবর যেমন অসমসাহসী কর্মী ও যোদ্ধা তেমনি আদর্শবাদী ছিলেন। ভারতবর্ষে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করলেও তিনি প্রজাদের হৃদয়ের

উপর সিংহাসন স্থাপন করতে অধিকতর আগ্রহশীল ছিলেন। অখণ্ড ভারতের স্বপ্নে তিনি বিভোর ছিলেন। সমগ্র ভারতবর্ষ এক রাজ্য হবে, ভারতবর্ষের বহুজাতি একটি মহাজাতিতে পরিণত হবে, ধর্মের সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে নানা ধর্মের লোক মিলিত হবে, ইহাই ছিল তাঁর দিবসের চিন্তা ও নিশীথের স্বপ্ন। বহু গর্বিত রাজপুত সামন্ত তাঁর মধুর ব্যবহারে তাঁর পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তিনি স্বয়ং এক রাজপুত রমণীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। এজন্য তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীরের শিরায় মোগল ও হিন্দু রক্ত প্রবাহিত ছিল। জাহাঙ্গীরের পুত্র শাহজাহানও রাজপুত রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের উপায় অবলম্বন করেছিলেন। রাজপুতদের সহিত মোগলদের সহযোগিতা ও সৌহার্দে একদিকে যেমন শাসন ও সৈন্যবিভাগ অন্যদিকে তেমনি শিল্প সভ্যতা জীবনধারণ প্রভাবিত ও পরিপুষ্ট হয়েছিল। একমাত্র মিবারের রাণা প্রতাপ ব্যতীত রাজপুতানার প্রায় সকল রাজা তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। রাণা প্রতাপের জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেম ও অনমনীয় আভিজাত্য-গৌরব তার বিরুদ্ধাচরণ করেছিল।

আকবরের রাজসভায় বহু গুণী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি সমবেত হয়েছিলেন। আবুল ফজল ও ফৈজী বীরবল রাজা মানসিংহ এবং আবদুর রহিম খানখানা তাঁদের অন্যতম। তাঁর রাজসভা নানা ধর্মের নানা মতের লোকের সম্মিলন স্থান ছিল। তাঁর জিজ্ঞাসু মন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়ের জ্ঞানার্জনে উন্মুখ ছিল। ভোজন বিলাসীর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা যেমন নানা সামগ্রীকে একেবারে গলাধঃকরণ করতে চায়, আকবরের কৌতূহলী মন তেমনি নানা বিষয়ের জ্ঞানার্জনে অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করত। তাঁর বিরাট ব্যক্তিত্বে শার্লেমেন নেপোলিয়ন এবং মার্কাস অরিলিয়াসের গুণের সমন্বয় হয়েছিল। তাঁর কৌতূহলী চিত্ত ও তীক্ষ্ণদৃষ্টি সত্যানুসন্ধানে সদাজাগ্রত ছিল।

আশ্চর্যের বিষয় এই যে আকবর নৌশক্তি বৃদ্ধির দিকে লক্ষ্য দিবার সময় পাননি। স্বদেশীয়দের বিদেশে প্রেরণ করে যুদ্ধকৌশল ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দিবার কথা তার মনে স্থান পায়নি। যেসুটগণ আকবরকে মুদ্রিত বাইবেল উপহার দিয়েছিল। তথাপি মুদ্রাযন্ত্র আমদানী ও পুস্তক মুদ্রণ সম্বন্ধে তিনি অবহিত হননি। জলঘড়ি বা সূর্যঘড়ির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঘড়ি নির্মাণ করার কথা তাঁর মনে উদয় হয়নি।

৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রথম মুসলিম অভিযানের সহিত ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন যুগের অবসান এবং মধ্যযুগ আরম্ভ হয়। কনষ্টানটিনোপলের পতনের (১৪৫৩) সহিত ইয়োরোপের মধ্যযুগ শেষ হয়। ভারতবর্ষের মধ্যযুগ ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চলে। আফগানদের দৃষ্টিভঙ্গী ও সভ্যতা সামন্ততান্ত্রিক, মধ্য-যুগীয়। মোগল রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান অর্ধ সামন্ততান্ত্রিক ছিল। রাশিয়ায় পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ায় এবং চীনে চেঙ্গিস খাঁর বংশধরগণ যে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন তার স্থায়িত্ব ছিল না। দক্ষিণ এশিয়ায় গোল্ডেন হোর্ড কারাকোরাম অথবা পিকিংএ অবস্থিত রাজার শাসন-ব্যবস্থার ব্যয় নির্বাহের জন্য কর স্থাপন ও রাজস্ব আদায় করা ছাড়া তাঁরা প্রজা সাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি, তাদের জীবনধারা-প্রণালীর উন্নতি ও উপকারের জন্য বিশেষ কিছু করেননি। বিচ্ছিন্ন ও বিবদমান অসংখ্য রাজ্য ও জাতির ভিতর ঐক্যের সন্ধান সূক্ষ্মদর্শী আকবরই প্রথম পেয়েছিলেন। সকলকে একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে তাদের ভিতর একরাষ্ট্রসত্তা বোধ জাগ্রত করেছিলেন। সুতরাং তিনি যে রাষ্ট্র গঠন ও প্রতিষ্ঠা করেন তাকে মোগল মুসলিম রাজপুত আর্য দ্রাবিড় বা হিন্দু নামে অভিহিত করা যায় না, তার নাম ভারতীয় রাষ্ট্র। ভারতবর্ষে এক জাতি এক রাষ্ট্র গঠনের উদগ্র কামনা তাঁর সমস্ত মন অধিকার করেছিল। তিনি ধর্ম বিশ্বাসকে বুদ্ধি-মুক্তির দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করতে চেষ্টা করেছিলেন। সকল জাতির শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অবদানে তাঁর রাষ্ট্র সংগঠিত হয়েছিল। এজন্য তাঁর অদূরদর্শী বংশধরগণের অনুদার নীতির প্রয়োগ সত্ত্বেও এই রাষ্ট্র তাঁর মৃত্যুর পর আরও একশত বৎসর জীবিত ছিল।

ঐশ্বর্য ও জাঁকজমকশীলতার জন্য মোগল রাজদরবারের খ্যাতি এশিয়া ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হয়েছিল। আগ্রা ও দিল্লীতে বহু সুন্দর গৃহ নির্মিত হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় নির্মাণশিল্পের সহিত ইসলাম স্থাপত্য রীতির রৈখিক সরলতা সংযুক্ত হয়ে এই যুগের নির্মাণশিল্পের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল। মোগল স্থাপত্য শিল্পের সাবলীল অনাড়ম্বর প্রকৃতির সঙ্গে তুলনা করলে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অলংকারবহুল মন্দির-শিল্প-রীতির দুর্বলতা স্পষ্ট ধরা পড়ে।

যখন অনুপম সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে ভের্সাই প্রাসাদ ইয়োরোপের আকাশে মস্তক উত্তোলন করছিল, ঠিক তেমনি সময়েই আগ্রার তাজমহলের স্বপ্নপুরী সম্রাট কবির কল্পনা-লোক থেকে মুক্ত হয়ে মর্মর প্রস্তরে আত্মপ্রকাশ করেছিল,

তখন সে স্থানের মতি মস্‌জিদ ।দিল্লীর জুম্মা মস্‌জিদ এবং দেওয়ানি আম ও দেওয়ানি খাস্‌ সম্রাটের প্রাসাদের শোভা বর্ধন করেছিল, আবার ঠিক সেই সময় রাজদরবারের ময়ূর সিংহাসন মোগল সাম্রাজ্যের শক্তি ও সম্পদের পরিচয় দিয়ে বৈদেশিক পরিব্রাজকদের চক্ষু ঝল্‌সে দিয়েছিল।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তির অভ্যুদয় ও বিস্তার হচ্ছিল। আকবরের সময় পর্তুগীজরা ভারতবর্ষে এসেছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে ব্রিটিশ নৌশক্তি পর্তুগীজদের পরাজিত করেছিল। ১ম জেমসের দূত স্যার টমাস মন্‌রো ১৬১৫ সালে জাহাঙ্গীরের সহিত সাক্ষাৎ করে ভারতবর্ষে ইংরেজদের বাণিজ্য করার অনুমতি লাভ করেন। সুরাট ও মাদ্রাজে ইংরেজদের কুঠী নির্মিত হল (১৬৩৯)। এর পর প্রায় একশত বৎসর কেহ ইংরেজদের দিকে লক্ষ্য করেনি। তারা যে পর্তুগীজদের পরাজিত করে সমুদ্রের উপর সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছিল, ইহাও মোগল সম্রাটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। যখন ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে মোগল সাম্রাজ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল তখন ইংরেজরা রাজ্য বৃদ্ধি করার জন্য যুদ্ধ করতে ছাড়েনি। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সম্রাট তাদের পরাস্ত করলেন বটে কিন্তু এর পূর্বে ফরাসিরাও ভারতবর্ষে পদার্পণ করেছিল, ইয়োরোপের নবজাগ্রত শক্তির প্লাবন ভারতবর্ষে ও প্রাচ্যখণ্ডে উপস্থিত হয়েছিল।

ফ্রান্সে চতুর্দশ লুই ফরাসী বিপ্লবের ভূমিকা রচনা করছিলেন। ইংল্যাণ্ডের লোকেরা রাজার মস্তক কর্তন করে ক্রমওয়েলের রিপাব্লিক স্থাপনের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। দ্বিতীয় চার্লস্‌ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েও দেশত্যাগ করলেন। দ্বিতীয় জেমস্‌ও দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পার্লামেণ্ট রাজার শক্তি খর্ব করে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠল।

ঠিক এই সময় ঔরঙ্গজেব ভ্রাতৃরক্তে হস্ত কলুষিত করে বৃদ্ধ পিতাকে কারারুদ্ধ করে ভারতবর্ষের সিংহাসন লাভ করেন। পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি সচেতন হননি। তাঁর গোঁড়ামি ও হিন্দুবিদ্বেষ তাঁর সাম্রাজ্যের সমাধি রচনা করেছিল। তাঁর অনুদার নীতি ও সাম্প্রদায়িক মনোবৃত্তি সাম্রাজ্যের স্তম্ভস্বরূপ রাজপুতদের বিরক্তি উৎপাদন করল। তাঁর অত্যাচারে শান্তিপ্রিয় শিখগণ দুর্দ্ধর্ষ যোদ্ধৃ সম্প্রদায়ে পরিণত হল। দাক্ষিণাত্যে শিবাজীকে কেন্দ্র করে হিন্দু জাতীয়তাবাদের জন্ম হল। ইহা কেবলমাত্র মারাঠাদের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, বৃহত্তর হিন্দু সমাজ-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। শিবাজী মারাঠাদের একটি শক্তিশালী জাতিরূপে গঠন করেছিলেন এবং ইহাই অবশেষে মোগল সাম্রাজ্য ধ্বংস করেছিল।

জাতি সাধারণের অসন্তুষ্টি জাঠ ও সৎনামীদের বিদ্রোহে আত্মপ্রকাশ করেছিল। বিভিন্ন সম্প্রদায় জাতি ও বিভিন্ন ধর্মের লোক নিয়ে ভারতীয় মহাজাতি গঠনের আদর্শ অতীতে হিন্দু রাজাদের আমলে বা মধ্য যুগে কাহারও মনে উদয় হয়নি। ইহা আধুনিক যুগের সাধনার বস্তু। এই আদর্শ অতীতে চন্দ্রগুপ্ত সমুদ্রগুপ্ত ও শশাঙ্কের মনে স্থান পেলে বৈদেশিক লুণ্ঠনকারীদের হাতে ভারতবর্ষকে এত লাঞ্ছনা ভোগ করতে হত না। এই আদর্শ মধ্যযুগে আকবর বা শিবাজীর মনে উদয় হলে পরবর্তী দুই শত বৎসর ভারতবর্ষ ইংরেজের লৌহমুষ্টির ভিতর শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠত না।

মধ্যযুগে সাহিত্য ও বিজ্ঞান-সাধনা

ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভ থেকে পঞ্চদশ শতকের শেষ পর্যন্ত মোগলদের বিভিন্ন শাখা তদানীন্তন পরিচিত পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপন করেছিল। মোগল অথবা তুর্কী বিজেতা ও সম্রাটগণ চীনে ভারতবর্ষে পারস্যে মিশরে উত্তর আফ্রিকায় বল্কান উপদ্বীপে হাঙ্গেরি ও রাশিয়ায় সাম্রাজ্য স্থাপন ও শাসন করছিল। এই কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনে হয় যেন সমগ্র পৃথিবী মোগলদের শক্তিবলে অভিভূত হতে চলেছে। ১৫৭১ সালে লিপান্টোর জলযুদ্ধে খ্রীষ্টান শক্তির বিজয় তুর্কী নৌবহরের অপরাজেয়তার ভ্রান্তি দূর করে। এর ভিতর পশ্চিম ইয়োরোপের অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

কনস্টানটিনোপলের পতনের পর ইয়োরোপে যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তন সৃষ্টি হয়েছিল, সমাজে ধর্মে জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনায় সাহিত্যে যে নবযুগের জন্ম হয়েছিল তার প্রেরণা মধ্যযুগের অবগুণ্ঠিত পটভূমি থেকেই এসেছিল। পোপের প্রভুত্ব লাভের উগ্র কামনা এবং ব্যক্তি স্বাধীনতা-অর্জনের আপ্রাণ প্রচেষ্টা,—এই দুইটি বিপরীতমুখী মনোভাবের দ্বন্দ্ব কলোচ্ছ্বাসের ভিতরও জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার ধারা আত্মপ্রকাশ করেছিল।

মধ্যযুগে আরিষ্টটলের ন্যায়শাস্ত্র পণ্ডিতদের আলোচনার একমাত্র বিষয় ছিল। প্যারিস্ অক্সফোর্ড ও বলোনার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। পণ্ডিতগণ ধর্ম-নীতির চুল-চেরা বিচারে প্রবৃত্ত হলেও জ্ঞানের আলোকবর্তিকা হস্তে ধারণ

করে তিমির যুগের উষর-ভূমি কর্ষণ করছিলেন। ইয়োরোপীয় কৃষ্টির ধারা আরিষ্টটলের প্রতিভা-উৎস থেকে বহির্গত হয়ে অন্য নামে ও ভিন্নরূপে অনাগত কালের দিকে প্রবাহিত হচ্ছিল।

পিটার আবিলার্ড আলবার্টস্ ম্যাগনাস্ এবং টমাস একুইনাস ক্যাথলিক ধর্মকে বিচার-বুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। কিছুকাল পরে ডনস্ স্কোটস্ এবং ওকাম আভিরোসের তর্কশাস্ত্র ও দর্শন এবং ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে সীমা-রেখা নির্ধারিত করেন। ধর্মশাস্ত্রের জন্য উচ্চতর স্থান নির্দিষ্ট করে তাঁরা জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধানের পথ উন্মুক্ত করে দিলেন। ত্রয়োদশ শতকে রোজার বেকন আজীবন জ্ঞানের সাধক ছিলেন। কিন্তু তাঁর অসামান্য প্রতিভা আপন সার্থকতায় বঞ্চিত হয়েছিল। তাঁর সময়ের দুই শত বৎসর পূর্বে তাঁর জন্ম হয়েছিল। মৃত্যুর পাঁচ শত বৎরব পরে তাঁর মনীষা আদৃত হয়েছিল। সমসাময়িক অজ্ঞতার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেছিলেন। তাঁর মতে জ্ঞানসঞ্চয় ও জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য পরীক্ষা একান্ত আবশ্যক। সে যুগের লোক রুদ্ধ গৃহের আরাম কেদারায় বসে আরিষ্টটলের পুস্তকের নীরস লাটিন অনুবাদ পাঠ করে নিজেদের জ্ঞানী মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। তিনি বলেছিলেন, ক্ষমতা থাকলে আমি আরিষ্টটলের সকল বই পুড়িয়ে দিতাম। ঐ সকল বই পড়ে সময়ের অপব্যবহার হচ্ছে, ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সে যুগের লোক আরিষ্টটলের বই পড়ত না, তাঁর পূজা করত। রোজার বেকন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, নিয়মের দাসত্ব ত্যাগ কর। ধর্মের প্রভুত্ব স্বীকার করো না। জগতের দিকে তাকাও, সত্য দর্শন কর। তিনি বলতেন, অজ্ঞানতার চারিটি স্তম্ভ—শক্তির পূজা, নিয়মের দাসত্ব, জনসাধারণের অজ্ঞতা এবং শিক্ষা গ্রহণে মানসিক কাঠিন্য। এই বন্ধন চতুষ্টয় থেকে মুক্ত হলে মানুষ বিশ্বশক্তির রহস্য বুঝতে সমর্থ হবে।

ওকাম এবং রোজার বেকন ইয়োরোপের অন্তরে বিজ্ঞান সাধনার বীজ বপন করে গেছেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে বস্তুর আংশিক পরীক্ষা চলেছিল। আরবরাই বিজ্ঞানচর্চা ও ব্যক্তিগত গবেষণা ও বৈদগ্ধ্যের ধারা ইয়োরোপে প্রবাহিত করেছিল। আলকিমিষ্টগণ কৃত্রিম উপায়ে সোনা তৈরী করতে চেষ্টা করেছিল, মৃতসঞ্জীবনী সুধা আবিষ্কার করে মানুষকে অমর করতে চেয়েছিল। তাদের এই অসাধ্যসাধনের চেষ্টা ফলবতী হয়নি সত্য কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা যে রঞ্জনবিদ্যা ধাতুবিদ্যা প্রভৃতি ব্যবহারিক বিজ্ঞান,

কাচের ব্যবহার, চক্ষুবিদ্যা সংক্রান্ত যন্ত্রাদি আবিষ্কারের জনক তাতে কোন সন্দেহ নাই। জ্যোতির্বিদরা ভাগ্যগণনার উদ্দেশ্যে নক্ষত্রবিদ্যার আলোচনা করেছিল।

আমরা এক্ষণে বিজ্ঞানের বায়ুমণ্ডলে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করছি। এমন কি দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানকে দাসীর মতো কাজে লাগিয়েছি। এই বিজ্ঞানের জন্ম হয়েছিল মধ্যযুগের আলোবাতাসহীন পরিবেশের ভিতর। সে যুগের সাধারণ মানুষ বিজ্ঞান-শিশুর ভাবী শক্তিমত্তা বিষয়ে অজ্ঞ ছিল। একমাত্র চার্চ এর শক্তিসম্ভাবনা সম্বন্ধে সজাগ ছিল। এজন্য চার্চের শ্যেনচক্ষু এর উপর পতিত হয়েছিল। তাই কংসের ন্যায় সে এই নবজাতকের শ্বাসরোধ করে অজ্ঞানতার রাজ্যে একচ্ছত্র সম্রাট হতে চেয়েছিল। যে সকল ব্যক্তি শান্তিপরায়ণ মানুষের নিরাপদ জীবনের সুস্থির চিন্তাসমুদ্রের উপর বিচারবুদ্ধির উর্মি সৃষ্টি করতে চেয়েছিল তারা ছিল এর শত্রু।

একদিকে যেমন পদার্থ বিজ্ঞান অন্যদিকে তেমনি সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যের অভ্যুদয় হয়েছিল। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিক চার্চের বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অচলায়তন চার্চকে শক্তিহীন করার সচেতন প্রয়াসে নবযুগের সূত্রপাত হয়েছিল। বিভিন্ন দেশের মধ্যে ভাব আদান প্রদানের মাধ্যম ছিল লাটিন। কিন্তু প্রোভেন্স ও উত্তর ফ্রান্সে ট্রুবেডুরগণ সাধারণ মানুষের জীবন্ত ভাষায় সংগীত ও কাব্য রচনা করেন। দেশে দেশে সহজ ও প্রাণবন্ত সাহিত্য সৃষ্টি হতে লাগল। জনসাধারণের কথ্যভাষা সাহিত্যে প্রযুক্ত হতে লাগল। টাস্‌কান কথ্য ভাষা থেকে ইটালিয় ভাষার উৎপত্তি। ইটালির অধিকাংশ লোক এই ভাষা ব্যবহার করত। দান্তে বোকাটসিও প্রভৃতি মনীষীগণ টাস্‌কান্ ভাষায় নূতন সাহিত্য রচনা করলেন। র‍্যাব্‌লে এবং মন্টেনের গদ্য সাহিত্য ফরাসি কথ্য ভাষায় রচিত হয়েছিল। লণ্ডন অক্সফোর্ড এবং কেম্ব্রিজের কথ্যভাষাকে বাহন করে উইক্লিফ্ বাইবেল অনুবাদ করলেন, চসার এবং প্রাক্‌এলিজাবেথীয় নাট্যকারগণ কাব্য ও নাটক রচনা করলেন। জার্মেনীতেও অনুরূপ অবস্থা হয়েছিল।

১২৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইটালির ফ্লোরেন্স নগরে দান্তে আলিঘিরির জন্ম হয়। নির্বাসিত অবস্থায় তিনি ডিভাইনা কমিডিয়া নামক একখানি মহাকাব্য রচনা করেন। এই বিপুলায়তন মহাকাব্যে নরক, প্রায়শ্চিত্তের স্থান এবং স্বর্গের অভিজ্ঞতা কবি প্রাণবন্ত ভাষায় বর্ণনা করেছেন। স্বর্গে তাঁর পথপ্রদর্শক

ছিলেন প্রথমে কিছুদূর পর্যন্ত অ-খ্রীষ্টান ভর্জিল কিন্তু শেষে সঙ্গিনী হন বিয়েট্রিস নামে একটি খ্রীষ্টান রমণী। দান্তের কাব্যে মহাকাব্যের উপাদান যথেষ্ট ছিল কিন্তু জীবনদর্শনের সঙ্কীর্ণতা ও উগ্র সনাতনী ধর্মভাবের জন্য ডিভাইনা কমিডিয়া মহাকাব্যের মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়নি। পেট্রার্কের চতুর্দশপদী কবিতা ও গীতি কবিতা ভাষার কমনীয়তায় ও ধ্বনিচাতুর্যে আদর্শ স্থানীয়। বাইআর্ডো এবং আরিষ্টো ইটালির কবিকুঞ্জে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন। ইংল্যাণ্ডে জিওফ্রি চসার এলিজাবেথীয় যুগের সাহিত্য প্রাচুর্যের অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ইংরেজী ভাষার প্রথম কবি। তিনি ইংরেজ জাতির নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করে প্রসাদগুণসম্পন্ন ভাষায় তৎকালীন সমাজের আলেখ্য রচনা করেছেন কিন্তু মানুষের অন্তর্জীবনে তাঁব দৃষ্টি সুগভীর ছিল না। এজন্য তাঁর সাহিত্যিক রূপায়ন নিত্যকালের বস্তু হয়ে উঠেনি। হিউম্যানিষ্ট লেখকদের অন্যতম টমাস মোর-এর শ্রেষ্ঠ পুস্তক ইউটোপিয়া। এর প্রভাব ইয়োরোপীয় সাহিত্যে বহু অনুকরণের ভিতর প্রকাশ পেয়েছে। ইউটোপিয়ায় তিনি একটি কাল্পনিক রাজ্যের বর্ণনা করেছেন। তাঁর মতে ইহা আদর্শ রাষ্ট্র নয়। শুধু বিচার বুদ্ধি দিয়ে যদি মানুষ এত সুন্দর সমাজ গড়ার কথা ভাবতে পাবে তাহলে প্রকৃত ধর্মরাজ্য কত উন্নত, কত মহান! এখনও এক জাতীয় সোস্যালিজমে মোরের চিন্তা ধারার ছাপ সহজেই উপলব্ধি হয়।

কনষ্টানটিনোপলের পতন

চেঙ্গিস্ খাঁর পশ্চিম তুর্কীস্তান আক্রমণের সময় অটোমান তুর্কীগণ মধ্য এশিয়া থেকে পলায়ন করে এশিয়া মাইনরের উচ্চ উপত্যকায় বর্তমান আনাটোলিয়া নামক স্থানে সেলজুক তুর্কীদের রাজ্যে বাস করে। ইতিপূর্বেই সেলজুক বা 'রুম' সাম্রাজ্য বহু অংশে বিভক্ত হয়েছিল। ক্রমে অটোমান তুর্কীগণ শক্তিসঞ্চয় করে প্রাধান্য লাভ কবল। তারপর তারা ইয়োরোপে প্রবেশ করে মাসিডোনিয়া এপিরাস্ ইলিরিয়া জুগো-শ্লাভিয়া এবং বুলগেরিয়ায় অনুপ্রবিষ্ট হল। পূর্বদিকে টরাস পর্বত এবং পশ্চিমে হাঙ্গেরি ও রুমেনিয়া, এই ভূমিখণ্ডে তারা একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করল। আড্রিয়ানোপল তাদের প্রধান নগর হয়ে উঠল। 'জেনিসারি' নামে সুশিক্ষিত সৈন্যদল অটোমান রাষ্ট্রের মেরুদণ্ড ছিল।

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান সুলতান ২য় মহম্মদ কনস্টানটিনোপল অধিকার করলেন। সেখানকার গ্রীক সম্রাট নিহত হল, লুণ্ঠন ও হত্যা অবাধে চলতে লাগল, সেণ্ট সোফিয়ার গির্জা মসজিদে পরিবর্তিত হল। এই ঘটনা ইয়োরোপে ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি করল। মুসলিমদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করার জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল। কিন্তু ধর্মযুদ্ধের উন্মাদনার যুগ অতিবাহিত হয়েছিল। মহম্মদ বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। কনস্টানটিনোপলে প্রবেশ করেই তিনি লুণ্ঠন ও হত্যা বন্ধ করে দিলেন, গ্রীকদের সন্তুষ্ট করলেন এবং কন্স্টানটিনোপলের পূর্ব গৌরব রক্ষায় চেষ্টিত হলেন। কিন্তু সুলতানদের অধীনে কনস্টানটিনোপল আর সে কনস্টানটিনোপল ছিল না। এর বাণিজ্য ও সম্পদ অন্তর্হিত, এর সভ্যতা ও সংস্কৃতি অস্তমিত, এর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলুপ্ত। হৃতগৌরব হৃতসম্পদ এবং হতমান কনস্টানটিনোপলের শাসন ব্যবস্থা হস্তান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার সাংস্কৃতিক প্রাধান্যও স্থানান্তরিত হল।

কনস্টানটিনোপল অধিকার মহম্মদের উচ্চাভিলাষ নিবৃত্তি করতে পারল না। তিনি রোমের দিকে লোলুপ দৃষ্টিপাত করতে লাগলেন এবং অটরাণ্টো অধিকার করলেন। তাঁর পুত্র বায়াজিদ্ (১৪৮১-১৫১২) পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। গ্রীসের অধিকাংশ স্থান তাঁর অধিকারভুক্ত হল। তাঁর পুত্র সেলিম (১৫১২-১৫২০) আর্মেনিয়া ও মিশর জয় করলেন। মিশরের শেষ আব্বাসিদ খলিফা মামেলুক সুলতানের আশ্রয়ে বাস করছিলেন। সেলিম তাঁর নিকট খলিফা পদবী ক্রয় করলেন। অটোমান সুলতান সমগ্র ইসলাম জগতের খলিফা হয়ে গেলেন। সেলিমের পর সুলেমান দি ম্যাগনিফিসেণ্ট (১৫২৩-১৫৬৬) খলিফা হয়ে পূর্বে বোগ্দাদ এবং পশ্চিমে হাঙ্গেরি জয় করলেন। সুলতানের নৌবহর আলজিয়ার্স অধিকার করল। ভেনিসের পরাজয় হল। সুলেমানের রাজত্ব-কালে অটোমান শক্তি গগনস্পর্শী হয়েছিল।

সভ্যতার গতি

প্রাগৈতিহাসিক মানুষ অজ্ঞানতার অন্ধকারে যাত্রা করেছিল। জ্ঞানের সামান্য আলোতেই সে অনেকখানি পথ দেখতে পেয়েছিল। অভিজ্ঞতা আর বুদ্ধির অস্ত্রে তার পঞ্চেন্দ্রিয় যতটুকু রাজ্য দখল করেছিল তারপর থেকে তার অতিদূর বংশধর গৌতম বুদ্ধ বা হোমরের যুগের মানুষ পূর্ব পুরুষের অর্জিত সম্পত্তিতে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। সৃষ্টির রহস্য, জীবনের তত্ত্ব উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মহৎ সাহিত্য রচনায়, বিরাট শিল্প সৃষ্টিতে, দর্শন ধর্ম চিত্রকলার ভিতর দিয়ে সত্য ও সুন্দরের সাধনায়। তীব্র অনুভূতি এবং প্রবল আবেগের চাবিকাঠি দিয়ে সে খুলে দিয়েছে মনের গভীরে রসস্রোতের মুখ।

কিন্তু মানুষ এক রকম জ্ঞানে চিরকাল তৃপ্ত থাকতে পারেনি। সভ্যতার ইতিহাসের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ে ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞানের আবির্ভাব এই সত্যই প্রমাণ করেছে। মনোভঙ্গীর পরিবর্তনে জ্ঞানের কতকটা পরিবর্তন এসেছে কিন্তু জ্ঞান বাইরের বস্তু নয়, এর জন্ম মনের কারখানায়। জ্ঞান মানুষেরই অন্তর্গত। মহাজাগতিক রশ্মির মতো জ্ঞান সৌরমণ্ডলের ওপার থেকে এসে পৃথিবীর ওপর ঝরে পড়েনি। মানুষের মন কখনও কুসংস্কারের আবর্জনায় ঢাকা পড়েছে, কখনও বা প্রভুত্ব প্রয়াসীর নির্মম আঘাতে সংজ্ঞাহীন হয়েছে কিন্তু তার মৃত্যু হয়নি। মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী মন শত শত বাধা ও অন্তরায় সত্ত্বেও আত্মপ্রকাশের পথে অগ্রসর হয়েছে। পূর্বে মানুষ অগ্রসর হতে চেয়েছিল আত্মপ্রকৃতি জয় করে, প্রজ্ঞাপারমিত হতে চেয়েছিল সংজ্ঞা দ্বারা। আধুনিক যুগের উষাকালে এবং তার পরেও সে চেয়েছে অঙ্ক ও যন্ত্র সাহায্যে বাইরের জগতের তত্ত্ব অধিগত করতে।

মধ্যযুগের শেষ অধ্যায় থেকে বিশ্বসভ্যতাব ইতিহাসে মোড় ফিরে গেছে। এর পূর্বে মানুষ জড় প্রকৃতিকে অগ্রাহ্য করে এসেছে। এখন সে প্রকৃতি জয়ে আত্মনিয়োগ করল। এজন্য জড় বিজ্ঞান আধুনিক সভ্যতার প্রধান ভিত্তি হয়ে উঠল। পূর্বে সে সৃষ্টিকে উপলব্ধি করতে গিয়ে স্রষ্টার অনুসন্ধান করেছে, এবং অনেক সময় স্রষ্টাকে উপলব্ধি করেছে। তাই সে চেষ্টা করেছে তাঁকে প্রতিষ্ঠিত করতে ধর্মমন্দিরে, অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের মনোমন্দিরে, যুক্তিবাদী দর্শনের কারখানায়। বিজ্ঞানীর যন্ত্রশালাও বাদ পড়েনি।

সত্যকে জানার ইতিহাস সভ্যতার ইতিহাস। প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাস এই যে জড়বিজ্ঞানের মাধ্যমে সত্যকে অধিগত করার চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে জড়বিজ্ঞানী দেখতে পেয়েছেন সেই সত্য যা জগতের আদি উপাদান। ফলিত বিজ্ঞানের সাহায্যে উৎপাদনের পদ্ধতি ও প্রসার ক্রমে পৃথিবীকে একটি প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করেছে কিন্তু মানুষের মনের এই অসুস্থতা কেটে গেলে শুভবুদ্ধির উদয়ে আমাদের গৃহ ও মন ঐশ্বর্যে ও সম্পদে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

আধুনিক যুগের পূর্বাবস্থা। আধুনিক যুগের পূর্বে দুই হাজার বৎসরের মধ্যে মানবের দ্রুত গমনাগমনের জন্য যান-বাহনের উন্নতি হয়নি। স্থলপথ অতিক্রম করার জন্য ঘোড়া এবং জলপথে যাতায়াতের জন্য তাকে বাতাসের উপর নির্ভর করতে হত। সে বাস করত কুটীরে। তার অভিজ্ঞতা ছিল সঙ্কীর্ণ, খাদ্যের অভাব ও ব্যাধির তাড়নায় তার স্বাস্থ্য ছিল জীর্ণ ও দেহ অসুন্দর। বাষ্প পেট্রোল ও বিদ্যুৎ চাকা, পাল ও লাঙ্গলকে স্থানচ্যুত করেনি।

ধর্ম যুদ্ধের পর ইয়োরোপের মানুষের পৃথিবী ও সমুদ্র সম্বন্ধে জ্ঞান বেড়েছিল। জেনোয়ার লোকেরা সাহারা অতিক্রম করে সুদানে এসেছিল। পর্তুগীজরা আফ্রিকার পশ্চিম ধার দিয়ে দক্ষিণ দিকে গিয়েছিল। ভূমধ্য সাগরের নাবিকগণ আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়েছিল। সমুদ্রের মানচিত্র প্রস্তুত হয়েছিল এবং জাহাজ চালান বিদ্যার উন্নতি হয়েছিল। দক্ষিণ চীনে একটি উপনিবেশ স্থাপিত হয়েছিল। প্রাচ্য দেশ থেকে রেশম ও মশলা আমদানী হত। মশলার ব্যবহারের দরুণ রন্ধন ক্রিয়া একটি উচ্চাঙ্গের শিল্পে পরিণত হয়েছিল। সিরিয়ায় সিসিলিতে ইটালি ও স্পেনে গুটিপোকার চাষ আরম্ভ হয়েছিল। রেশমী কাপড় উৎপন্ন হল। মশলা-ব্যবসা প্রাচ্যের সহিত ইয়োরোপের সংযোগ স্থাপন করল। ১২৬৪-১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইয়োরোপের বহু শিল্পী ও প্রচারক চীনে সমাদর ও শ্রদ্ধা লাভ করেছিল। মোগল শক্তির পতনের সহিত মধ্য-এশিয়ায় পুনরায় বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা চলতে লাগল।

১২৯৯ সালে প্রকাশিত মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দুই শতাব্দী পরে কলম্বসের লোমহর্ষণকর নূতন জগৎ আবিষ্কারের মতো ইয়োরোপের মানুষের মনে বিপ্লবের সৃষ্টি করেছিল। এই রোমাঞ্চকর ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করে তাদের চক্ষু খুলে গিয়েছিল। চীন তাদের কাছে ভৌগোলিক নামমাত্র ছিল।

ভ্রমণ-কাহিনী পাঠ করে তারা জানল, জনসংখ্যায় ও ঐশ্বর্যে চীন অতুলনীয়, সে দেশের লোক কাগজের টাকা ব্যবহার করে, তাদের সভ্যতা ও শাসনব্যবস্থা ইটালির চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। পর্তুগীজরা জাহাজ নির্মাণ করেছিল। তারা আফ্রিকার উপকূল বেষ্টন করে ভারত মহাসাগরে আবির্ভূত হয়েছিল।

কনস্টানটিনোপলের পতন মধ্যযুগের অবসান এবং আধুনিক যুগের প্রারম্ভ সূচনা করে। মুসলিমদের হস্তে এত বড় একটি সুসভ্য নগরের বিপর্যয় দেখে খ্রীষ্টান জগৎ দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়ে। খ্রীষ্টান ধর্মের, ইয়োরোপীয় চিৎপ্রকর্ষের পুণ্য স্থান এই কনস্টানটিনোপল। এর অপ্রত্যাশিত ভাগ্য-বিপর্যয়ে, বিধর্মীর হস্তে অবমাননায় খ্রীষ্টান জগৎ বিচলিত হয়েছিল। সে যুগের পণ্ডিতগণও কনস্টানটিনোপলের পতনে ব্যথিত হয়েছিলেন।

প্রাচ্য দেশে আসার জন্য সমুদ্রপথ আবিষ্কার বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিল, অর্থনৈতিক সমাজনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। পরবর্তী-যুগে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তার, অর্থাগম ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা ইয়োরোপের অন্যান্য জাতির বিস্ময় উৎপাদন করেছিল কিন্তু উত্তর ফ্রান্সের কতকটা স্থান হস্তচ্যুত হওয়ায় তাদের দুঃখের সীমা ছিল না। অর্ণবপোত চালনায় পর্তুগীজদের অশিক্ষিতপটুতার সুযোগ নিয়ে ইংল্যাণ্ডের ভাগ্যদেবী তার জন্য যে অনাগত কালের স্বর্ণসিংহাসন রচনা করেছিলেন তখনও সে তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ইতিহাসে যুগবিভাগ। ইতিহাসে যুগ বিভাগের সীমারেখা স্পষ্ট না হলেও ঐতিহাসিকের দৃষ্টি সভ্যতার বিবিধ পর্যায়ের ভিতর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের সন্ধান দিতে চায়। পরিবর্তনের ধারা কখনো মন্থর ও অস্পষ্ট, কখনো বা আকস্মিক ও উগ্র। মানুষের মন চিরস্থির নয়। সভ্যতা মনের বিকাশ। বিকাশের এক একটি পর্যায় আছে। এই পর্যায়ের নাম যুগ।

পুরাতন ও নূতন সমাজ। যাজকশ্রেণী এবং সাধারণ গৃহস্থ নিয়ে মধ্যযুগের সমাজ গঠিত হয়েছিল। নূতন যুগের সমাজে ধনী ও দরিদ্রের বিভাগ দেখা দিল। মধ্যযুগে স্বাধীন চিন্তার শ্বাসরোধ করা হত। নূতন যুগ বিজ্ঞান আলোচনার অনুকূল হয়েছিল। মধ্যযুগে একমাত্র পুরোহিতরা লেখাপড়ার চর্চা করত। লাটিন ভাষায় পশ্চিম ইয়োরোপের লোক ভাববিনিময় করত ও বই লিখত। একমাত্র রোমান চার্চ রোমান সভ্যতার উত্তরাধিকারী ছিল। রোমান ব্যবহারশাস্ত্রের সূত্রগুলি চার্চের বিধিব্যবস্থায় অনুস্যূত ছিল।

বিদগ্ধ পরিমণ্ডল ও পরিশীলিত সমাজের চিন্তাধারা ধর্ম পুস্তক ও শাস্ত্র আলোচনা একদেশদর্শী যুক্তি-তর্কে ভারাক্রান্ত হয়েছিল। সে যুগের চিন্তাধারা যুক্তিনির্ভর বাস্তব জ্ঞানের অভাবে ভাববিলাসের শূন্যতায় অথবা পাণ্ডিত্যের ঊষরতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীই নবযুগের আগমনী বার্তা প্রথম প্রচার করে। প্রত্যেক দেশে মাতৃভাষা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল। প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন করার চেষ্টা চলতে লাগল। জিজ্ঞাসাবৃত্তির জন্ম হল। চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর শারীর-সংস্থান বিজ্ঞানের আলোচনা করতে লাগলেন। চিকিৎসক শবব্যবচ্ছেদ করলেন। ইংল্যাণ্ডে ফ্রান্সে ও স্পেনে জাতীয় শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল। পোপের নিকট আনুগত্য জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিনিধি রাজার প্রতি ভক্তিতে রূপান্তরিত হল। ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত হল। ভাস্কো-ডি-গামা ও কলম্বাসের সমুদ্রপথ আবিষ্কার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারতা বৃদ্ধি করল। ইয়োরোপের জাতিগণ ভৌগোলিক সীমার সংকীর্ণতার মধ্যে ধর্মের আওতা থেকে মুক্তিলাভ করে বৃহত্তর জগতের আলোকে আত্মপ্রকাশ করল। নূতন উদ্দীপনা ও ভাবাবেগে, বন্ধনহীন প্রাণের দুর্দম প্রেরণায় ইয়োরোপীয় মানস পুরাতনের লৌহশৃঙ্খল ছিন্ন করে, মধ্যযুগের পাণ্ডিত্যাভিমানী পুরোহিতদের "সীসার ফলকের উপর আফিমের অক্ষরে খোদিত" শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও ভাষ্যের ক্লান্তিকর রচনার হস্ত থেকে অব্যাহতি লাভ করল।

মোগল জাতির অভ্যুদয় ও বিস্তার

প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সভ্যতার উপর মোগল অভিযান একটি রূঢ় সত্যের পরিচয় দেয়। প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ইউরো-এশিয়ার মানদণ্ড-স্বরূপ যে পর্বতমালা এই দুইটি মহাদেশকে উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিভক্ত করেছে হিমালয় হিন্দুকুশ ককেশাস কার্পেথিয়ান আল্পস্ ও পিরিনিজ্ গিরিশ্রেণী তার অন্তর্গত। দয়াশীলা প্রকৃতি এই পর্বত-প্রাকার নির্মাণ করে যেন উত্তরের বর্বর ও দুর্দ্ধর্ষ যাযাবর জাতিগণকে দক্ষিণের প্রাচীন সুসভ্য জাতিদের থেকে পৃথক করে রেখেছিলেন। এই সকল যাযাবর জাতি খাদ্যের অন্বেষণে অন্তহীন রুক্ষ প্রান্তরের বুকের উপর অশান্ত বুভুক্ষু দানবের

মতো বিচরণ করে বেড়াত। অশ্ব তাদের একমাত্র অনুচর ও জীবিকা অর্জনের উপায় ছিল। তারা অশ্বদুগ্ধ পান করত, প্রয়োজন হলে মৃত বা জীবিত অশ্বের মাংস ভক্ষণ করত। অশ্ব তাদের বাহক, অশ্বপৃষ্ঠ তাদের গৃহ ছিল। ক্রমে তারা রুক্ষ সংকীর্ণ বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করে প্রবল বন্যার মতো দক্ষিণাঞ্চলের উর্বর সমতল ভূমির সুসভ্য ও ধনরত্নপূর্ণ নগর ও জনপদগুলির উপর পড়ত এবং নিষ্ঠুর অত্যাচার হত্যা ও লুণ্ঠন চালিয়ে আবার অজানা প্রান্তরের অন্ধকারে বিলীন হয়ে যেত।

ইতিহাসের উষাকাল থেকে বর্বরতার সঙ্গে সভ্যতার এই দ্বন্দ্ব চলে এসেছে। সেমিটিক এবং ইলামাইট্গণ সুমেরের উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, বর্বর গথ ও ভাণ্ডালগণ রোমান সাম্রাজ্যকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল, হূণ ও তাতারগণ ভারতবর্ষ পারস্য এবং মেসোপটেমিয়ার উপর অভিযান করেছিল। ত্রয়োদশ শতকের মোগল অভিযান সুসভ্য মানুষের উপর বর্বর ম'নুষের শেষ অভিযান। দ্বাদশ শতকের শেষ ভাগে মোগলগণ অন্ধকারের অন্তর থেকে ইতিহাসের পটভূমির উপর হঠাৎ আবির্ভূত হল। চীনের উত্তরে হূণ ও তুর্কীদের উৎপত্তি স্থান এদেরও সূতিকাগার। এরা হূণ ও তুর্কীদের সমগোত্র। একজন শক্তিশালী ব্যক্তিকে কেন্দ্র কবে এরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। তার পুত্র চেঙ্গিস্ খাঁর নেতৃত্বে এরা অতি অল্প সময়ের মধ্যে একটি ক্ষমতাশালী জাতিতে গঠিত হয়।

ইস্লামের সংহতি ইতিপূর্বেই শিথিল হয়ে গিয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে পশ্চিম এশিয়ায় কতকগুলি মুসলিম রাজ্য ছিল। তারা পরস্পর বিবাদে মত্ত ছিল। মিশর প্যালেষ্টাইন এবং সিরিয়ার অধিকাংশ স্থানে সালাদিনের বংশধরগণ কর্তৃত্ব করছিল। এশিয়া মাইনরে সেলজুকগণ প্রবল ছিল। এর পূর্বদিকে বিশাল খোরিশ্মিয়ান সাম্রাজ্য অবস্থিত ছিল। চীনের আভ্যন্তরীণ শোচনীয় অবস্থা দুর্মদ মোগল আক্রমণকারীদের লোভের ইন্ধন জুগিয়েছিল।

১২০৬ খ্রীষ্টাব্দে কুতুবুদ্দীন নামে একজন দাস দিল্লীতে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেছিল। এই সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থানের সহিত বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজাদের শক্তি ও প্রাধান্য তখনও অবিসংবাদী হয়ে ওঠেনি।

কুরুল-তাই অথবা মোগল পরিষদ চেঙ্গিস্কে কেগান অর্থাৎ সম্রাট নির্বাচন করার পর তিনি ১২১৪ সালে কিন্ সাম্রাজ্য আক্রমণ করে পিকিন জয় করেন।

তাঁর দূতকে হত্যা করার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তিনি খোরিশমিয়ান সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। খাসগড় ও কোকন্দ ও বোখারা অধিকৃত হল। রাজধানী সমরকন্দ তাঁর বাহুবলের কাছে মস্তক অবনত করল। কাস্পিয়নের উত্তরে কিভের রুশসৈন্য পরাজিত হল। কনষ্টান্টিনোপল ভীত হল। একদল মোগল সৈন্য হিসিয়া সাম্রাজ্য দখল করে নিল। চেঙ্গিসের মৃত্যুর সময় তাঁর সাম্রাজ্য প্রশান্ত মহাসাগর থেকে নিপার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। চেঙ্গিস্ নিরক্ষর ছিলেন। তিনি মুসলমান ছিলেন না। তিনি অনন্ত নীল আকাশের পূজা করতেন এবং চীনের তাও ধর্মের জ্ঞানীদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতেন রাষ্ট্রিক সত্তাবোধ ও রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ভিত্তির উপর তাঁর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি। এর উদ্দেশ্য ছিল শাসন, এর শক্তি ছিল সামরিক। সম্রাটের ব্যক্তিত্ব ছিল এর শক্তিকেন্দ্র এবং প্রজার সহিত এর সম্পর্ক ছিল সৈন্যের ব্যয়ভার বহনের জন্য রাজস্ব আদায়। চেঙ্গিসের রাজসভায় ইনিউ চুটসেই নামে একজন প্রতিভাশালী রাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। কিন্ সাম্রাজ্যের শাসন বিভাগে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। চেঙ্গিসের মৃত্যুর পরও তিনি মোগলদের শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন। তাঁরই প্রভাবে মোগলদের ধ্বংসপ্রবণ নিষ্করুণ কঠোরতা দূর হয়েছিল। চেঙ্গিসের সাম্রাজ্যে ধর্মবিষয়ে স্বাধীনতা ছিল। মঙ্গোলীয়ায় কারাকোরম তাঁর রাজধানী ছিল।

চেঙ্গিসের পুত্র ওগ্দাই খাঁ সম্রাট মনোনীত হলেন। ১২৩৪ সালে কিন্ সাম্রাজ্য সম্পূর্ণ বশীভূত হল। ১২৪০ সালে কিভ্ ধ্বংস হল। প্রায় সমগ্র রাশিয়া মোগলদের কর দিতে বাধ্য হল। পর বৎসর লিগ্নীজের যুদ্ধে সম্মিলিত জার্মান ও পোল বাহিনী ধ্বংস হয়ে গেল। মোগলরা পশ্চিম দিকে আর অগ্রসর হয়নি। সম্ভবতঃ পশ্চিমাঞ্চলের নিবিড় জঙ্গল ও পার্বত্য দেশ তাদের অগ্রগতির বাধা সৃষ্টি করেছিল। তারা হাঙ্গেরিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল। ম্যাগিয়ারগণ সিথিয়ান আভর ও হুণদের উচ্ছেদ করে সেখানে বসতি স্থাপন করেছিল। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে মোগলরা এক্ষণে তাদের তেমনিভাবে হত্যা ও ধ্বংস করেছিল।

সিংহাসন নিয়ে কারাকোরমে কয়েক বৎসর গোলযোগ চলার পর ১২৫১ সালে মান্-গু খাঁ মোগল সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। তার ভাই কুবলাই খাঁ চীনের প্রধান শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন। সুং সাম্রাজ্য মোগলদের অধিকারে এল। মানগু তিব্বত অধিকার করলেন, পারস্য ও সিরিয়া আক্রান্ত হল। মান্-গুর আর

একজন ভাই হুলাগু বোগ্‌দাদ অধিকার করে সেখানকার অধিবাসীদের পাইকারী হত্যার ব্যবস্থা করলেন। বোগ্‌দাদ তখনও ইসলামের প্রধান কেন্দ্র ছিল। মোগলরা মুসলিমদের প্রধান শত্রু ছিল।

মান-গুর মৃত্যুর পর মোগল সামন্তগণ কুব্‌লাই খাঁকে সম্রাট নির্বাচন করল। তিনি পিকিনে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। পারস্য সিরিয়া এবং এশিয়া মাইনর হুলাগুর অধীনে প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন হয়ে গেল। রাশিয়ার নিকটবর্তী স্থানের এবং তুর্কীস্তানের মোগলগণ পৃথক হয়ে গেল। ১২৯৪ সালে কুব্‌লাই-এর মৃত্যুর পর খাঁগণের আধিপত্য শেষ হয় এবং মোগল সাম্রাজ্য পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে যায়—প্রথম, মঙ্গোলিয়া মাঞ্চুরিয়া এবং তিব্বত নিয়ে চীনের প্রধান মোগল সাম্রাজ্য, রাজধানী পিকিং। দ্বিতীয়, রাশিয়া পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরি নিয়ে কিপ্‌চাকদের মোগল সাম্রাজ্য। তৃতীয়, পারস্য মেসোপোটেমিয়া ও মধ্য এশিয়া নিয়ে হুলাগু প্রতিষ্ঠিত ইল্‌খান সাম্রাজ্য। চতুর্থ, সাইবেরিয়া রাজ্য, এবং পঞ্চম, তুর্কীস্তানে 'গ্রেট তুর্কী' নামে আর একটি রাজ্য। ভারতবর্ষে তারা পাঞ্জাব পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং মিশরের সুলতান হুলাগুর সেনাপতি কেটবোগাকে প্যালেষ্টাইনে পরাজিত করে মোগলদের মিশর প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে দেয়।

১২৬০ সালে মোগলদের শক্তি ও গৌরব তুঙ্গস্থানে ওঠে। এর পর তাদের ইতিহাস কলহের কাহিনীতে ভরপুর। কুব্‌লাই খাঁ চীনে যে মোগল বংশ প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম ইউনান বংশ। এই বংশ ১৩৬৮ সাল পর্যন্ত বর্তমান থাকে। পরবর্তী যুগে পশ্চিম এশিয়ায় মোগল শক্তি সুগঠিত ও সংহত হয়ে ভারতবর্ষে অধিকতর স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপন করে। কিন্তু ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতকে আফগানগণ উত্তর ভারত অধিকার করে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত আফগান সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল।

মোগল অভিযান ও বিজয়ের ফল। মোগল অভিযান ও বিজয় ইতিহাসে একটি চমকপ্রদ ঘটনা। এর গতি বিস্তৃতি ও প্রভাবের সহিত তুলনায় আলেকজান্দারের অভিযান ও বিজয় ম্লান হয়ে যায়। মোগল অভিযানের অন্তরালে অজস্র সম্ভাবনার আভাস পাওয়া যায়। ইহা এশিয়া ও পশ্চিম ইয়োরোপের কল্পনা, ভাব ও চিন্তার মূলে আঘাত করেছিল এবং দুই মহাদেশের মধ্যে যাতায়াতের সুবিধা ও ভাববিনিময়ের পথ প্রস্তুত করেছিল। কারাকোরমের রাজ সভায় নানাজাতির প্রতিনিধি সমবেত হত। খ্রীষ্টান ধর্ম এশিয়া এবং

ইয়োরোপের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব প্রতিযোগিতা ও ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল তার তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল।

গ্রেট খাঁ তাঁবুতে বাস করতেন। ইহা দেশ-বিদেশের লুণ্ঠিত দ্রব্যসম্ভারে পরিপূর্ণ ছিল। মুসলমান বণিকগণ বিবিধ পণ্য নিয়ে আসত। মোগলরা সেই সকল পণ্য প্রচুর পরিমাণে ক্রয় করত। বহু শিল্পী বৈজ্ঞানিক জ্যোতির্বিদ ও অঙ্কশাস্ত্রের পণ্ডিত কারাকোরমের শিবিরপূর্ণ নগরে বাস করতেন। ইতিহাস মোগলদের অভিযান যুদ্ধ ও হত্যার কাহিনীতে মুখর কিন্তু তাদের কৌতূহলী মন ও জ্ঞানার্জনের উৎসাহ সম্বন্ধে নীরব। তারা কোন কিছু মৌলিকতত্ত্বের গবেষণা ও আবিষ্কার করেনি সত্য কিন্তু জ্ঞানের বার্তাবহরূপে বিশ্বসভ্যতার ভাণ্ডারে তাদের দান অনস্বীকার্য। মধ্যযুগের বিশ্বেতিহাসের অস্পষ্ট পটভূমির উপর চেঙ্গিস্ ও কুব্লাই-এর আকস্মিক আবির্ভাব আলেকজান্দার বা শার্লেমেনের অত্যুজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের অতিস্ফীত গৌরবে সার্থক না হলেও, তাদের অভিযান ও দেশজয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যে যোগসূত্র স্থাপনের সহায়তা করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

তাদের বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ছিল। দুই মহাদেশের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, নানা দেশ ও জাতির মধ্যে সহযোগিতা আদান-প্রদানের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। গতিধর্মী ও স্বভাববাদী মোগলদের খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে পোপ এক দল দূত প্রেরণ করেছিলেন, নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টান মুসলিম ও বৌদ্ধ প্রচারকরাও কারাকোরমের রাজসভায় সমবেত হয়েছিল। তারা সকলেই ভেবেছিল এই বিশ্বজিৎ জাতি যে ধর্ম গ্রহণ করবে তা বিশ্বজিৎ ধর্মে পরিণত হবে। কিন্তু মোগলগণ স্বভাবতঃ ধর্মপ্রবণ ছিল না। নির্বিচারে কোন ধর্ম গ্রহণ করতে তারা আগ্রহ প্রকাশ করেনি। খ্রীষ্টান ধর্ম মোগল সম্রাটের মন আকৃষ্ট করলেও এই ধর্মের একাগ্র সন্ন্যাস পরলোকমুখীনতা, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে পোপের হস্তক্ষেপ তাঁব মনঃপূত হয়নি। অবশেষে মোগলগণ যে দেশে বাস করেছিল তারা সেই দেশের ধর্ম গ্রহণ করল। চীন ও মঙ্গোলিয়ার অধিকাংশ মোগল বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করল, মধ্য এশিয়ার মোগল মুসলমান হয়ে গেল এবং রাশিয়া ও হাঙ্গেরির মোগল খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষিত হল।

মোগলদের জ্ঞানের-স্পৃহা প্রবল ছিল। এজন্য তারা বিদেশী পর্যটক ও দর্শকদের সমাদর করত। চেঙ্গিস যখন শুনলেন যে মনের ভাব লিখে রাখার জন্য অন্য দেশে বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় তখন তিনি এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন

হলেন এবং বর্ণমালা শিক্ষা করার জন্য কর্মচারীদের আদেশ দিলেন। মোগলদের মন উন্মুক্ত, হৃদয় বন্ধনহীন এবং প্রাণ প্রচুর আবেগে পূর্ণ ছিল।

কুবলাই খাঁ পিকিনে বাস করে চীনের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্পর্কে আসেন এবং পুরামাত্রায় সুসভ্য চীনা সম্রাট হয়ে যান। নিকোলো পোলো ও মাফিও পোলো নামক দুইজন বণিক ভেনিস থেকে তাঁর সভায় আসেন। তাদের মুখে ইয়োরোপের খ্রীষ্টান ধর্ম ও পোপের কথা শুনে কুবলাই খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত এক শত ব্যক্তিকে তাঁর কাছে প্রেরণ করতে অনুরোধ করে তিনি পোলোদের হাতে একখানি চিঠি পোপের নিকট পাঠান। পোলো ভ্রাতৃদ্বয় স্বদেশে ফিরে আসেন এবং দুই বৎসর পরে মাত্র দুই জন খ্রীষ্টান সন্ন্যাসী নিয়ে স্থলপথে যাত্রা করেন। এইবার নিকোলোর পুত্র মার্কো তাদের সঙ্গে ছিল।

মার্কো সম্রাটের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। বুদ্ধিমান যুবক তাতার ভাষা সুন্দরভাবে শিক্ষা করলেন। তিনি সতের বৎসর কুবলাই-এর দরবারে অবস্থান করেন এবং একটি প্রদেশের শাসনকর্তা হন। রাজকার্যের জন্য তিনি চীনের বিভিন্ন স্থানে গমন করতেন। কুব্‌লাই-এর ভ্রাতুষ্পুত্র ইলখান সম্রাটের বিবাহের জন্য একটি যুবতী রাজকন্যাকে সঙ্গে নিয়ে পোলোগণ চীন থেকে জলপথে যাত্রা করেন এবং সুমাত্রায় বৌদ্ধ শ্রীবিজয় সাম্রাজ্যে আসেন। তারপর দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য রাজ্যের কায়াল বন্দর দিয়ে তাঁরা দুই বৎসর পরে পারস্যে উপস্থিত হন। ইতিপূর্বেই পারস্য সম্রাটের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর পুত্রের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হয়।

চব্বিশ বৎসর পরে পোলোগণ ভেনিসে প্রত্যাবর্তন করেন। ভেনিসের সহিত জেনোয়ার যুদ্ধে ভেনিসের বহু সহস্র লোক বন্দী হয়। বন্দীদের অন্যতম মার্কো কারাগারে তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী বিবৃত করেন। অন্য এক ব্যক্তি এই কাহিনী লিপিবদ্ধ করে। এইভাবে 'মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনী' লোক-লোচনের সমক্ষে আবির্ভূত হয়।

এই পুস্তকে বিশেষতঃ চীন এবং চীনদেশের নানা স্থানে মার্কোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত স্থান পেয়েছে। শ্যাম যবদ্বীপ সুমাত্রা সিংহল এবং দক্ষিণ ভারতের কথাও বাদ পড়েনি; ধন ধান্য ঐশ্বর্যপরিপূর্ণ অন্তহীন দেশ, পরিশ্রান্ত পর্যটকদের বিশ্রামের জন্য স্থানে স্থানে সুন্দর পান্থনিবাস, ফলভরে অবনত দ্রাক্ষাকুঞ্জ, শস্য পরিপূর্ণ অনন্ত ক্ষেত্র, ফলফুল শোভিত মনোরম উদ্যান, বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের অসংখ্য

মঠ, সোনার জরিতে কাজ-করা রেশমী বস্ত্রের কারখানা, ধনজন পরিপূর্ণ আনন্দ বিলাস হিল্লোলিত নগরের পর নগর, জনপদের পর জনপদ, প্রাচ্যের নানা স্থান থেকে সমাগত পণ্যবাহী জাহাজ পরিপূর্ণ চীনের পোতাশ্রয় ও বন্দর প্রভৃতির বর্ণনা মার্কো পোলোর ভ্রমণ-কাহিনীতে সন্নিবেশিত হয়েছে। তিনি বলেছেন, সম্রাট অশ্বারোহী বার্তাবহ নিযুক্ত করে চব্বিশ ঘণ্টায় চারি শত মাইল দূরে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করেছিলেন, চীনারা মাটির নীচ থেকে কালো পাথর অর্থাৎ কয়লা তুলে জ্বালানি স্বরূপ ব্যবহার করত, কুব্‌লাই কাগজের নোট প্রচলন করেছিলেন এবং সোনা দিবার প্রতিশ্রুতি তার উপর লেখা থাকত। প্রেস্‌টার জন নামে এক শাসন কর্তার অধীনে চীনে খ্রীষ্টানদের একটি উপনিবেশ ছিল।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইয়োরোপের লোকদের এক অভিনব জগতের সন্ধান দিল, তাদের মনে নূতন প্রেরণা, নূতন আবেগ সঞ্চার করল। ক্ষুদ্র ভৌগোলিক সীমার গণ্ডীতে আবদ্ধ পরস্পর বিবদমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টির সামনে বৃহত্তর জগতের গৌরবোজ্জ্বল আলেখ্য উন্মোচিত হল। মার্কোর ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠ করে ইয়োরোপীয় জাতিদের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অহঙ্কার দূর হয়। প্রাচ্যের ঐশ্বর্যসম্ভার হস্তগত করার সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনায় তাদের মন আলোড়িত হল। ইয়োরোপ ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্য নৌশক্তি বৃদ্ধির দিকে মনযোগ দিল।

ইতিপূর্বেই মধ্য যুগের শৃঙ্খল থেকে মুক্তির তীব্র বাসনায় ইয়োরোপ ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল। ইয়োরোপ সচেতন হচ্ছিল, তার সভ্যতা নূতন পথে যাত্রা করছিল। চার্চের বিধি নিষেধ অনুশাসন নিয়ম শৃঙ্খলার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে ইয়োরোপের বিদ্রোহী মানস মুক্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল। তার নবজাগ্রত সমাজচৈতন্য পূর্ণতর বিকাশের পথ খুঁজে নিল। পৃথিবীর ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করার উদগ্র কামনায় ইয়োরোপ সমুদ্রের নীল বারিরাশির উন্মুক্ত পথে যাত্রা করল। সে আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তাল তরঙ্গ ভেদ করে উপস্থিত হল প্রাকৃতিক সম্পদপূর্ণ অনুন্নত আমেরিকায়, উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে উপস্থিত হল শতধাবিচ্ছিন্ন ভারতে, প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে, চীনে ও জাপানে। সমুদ্রের নীল বারিপথ রাজপথে পরিণত হল। পণ্যবাহী উষ্ট্রের স্থলপথ পরিত্যক্ত হল।

কুব্‌লাই-এর মৃত্যুর ছয় বৎসরের ভিতব চীন থেকে মোগলগণ বিতাড়িত

হল, হউয়ান বংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হল। মোগলদের চীনের প্রাচীরের বাহিরে বিতাড়িত করা হল। মিং-তাই বংশের প্রতিষ্ঠা হল। এই বংশ প্রায় তিন শত বৎসর রাজত্ব করেছিল। উত্তর চীনের মাঞ্চুগণ চীন জয় করে (১৬৪৪) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল।

পামীরের উচ্চ মালভূমিতে, পূর্ব ও পশ্চিম তুর্কীস্তানে এবং উত্তরাঞ্চলে মোগলগণ অর্ধবর্বর অবস্থায় পর্যবসিত হল। বহু ক্ষুদ্র স্বাধীন খাঁ ভেকছত্রের মতো উদ্ভূত হল। চীনারা কালমুকদের হাত থেকে পূর্ব-তুর্কীস্তান পুনরুদ্ধার করে। তিব্বতের সহিত চীনের সম্পর্ক দৃঢ়তর হয়। তিব্বত বৌদ্ধ সন্ন্যাস ধর্মের প্রধান আশ্রয় স্থল হয়ে ওঠে। কিপ্‌চাক সাম্রাজ্যের মোগলগণ মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হলেও প্রাচীন যুগের সামানিজমের সংস্কারমুক্ত হয়নি। তাদের সম্রাট গোল্ডেন হোর্ডের খাঁ নামে অভিহিত হত। বর্তমান ইউক্রেনিয়ার শ্লাভরাও যাযাবর জীবন-প্রণালী গ্রহণ করেছিল।

রাশিয়ার অভ্যুদয়। যখন তুর্কীস্তানের ন্যায় কিপ্‌চাক সাম্রাজ্যে যাযাবরগণ বিচরণ করছিল তখন তাদের ভিতর শান্তিপ্রিয় ব্যক্তিগণ এক একটি স্থানে বাস করে সহর ও নগর পত্তন করে এবং যাযাবরদের সম্রাটকে কর দিতে থাকে। মস্কৌ প্রভৃতি নগরে প্রাক্-মোগল যুগের খ্রীষ্টান নাগরিক জীবন-ধারা ডিউকদের আশ্রয়ে অব্যাহত থাকে। ডিউকগণ 'গোল্ডেন হোর্ডের' খাঁকে কর দিত। মস্কো-এর ভারপ্রাপ্ত ডিউক খাঁর বিশ্বাস ভাজন হন এবং অন্যান্য শাসন কর্তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করেন।

গ্রাণ্ড ডিউক ৩য় ইভান-এর আমলে (১৪৬২-১৫০৫) মস্কৌ মোগল আনুগত্য ত্যাগ করে কর দিতে অস্বীকার করে। কনষ্টানটিনোপলে সম্রাট কনষ্টানটাইনের বংশের রাজত্ব লোপ পেয়েছিল। প্রাচীন রাজবংশের দুহিতা জো পেলিওলোগসের পাণিগ্রহণকে (১৪৭২) উপলক্ষ্য করে বাইজানটিয়মের উত্তরাধিকার সর্তের দাবী উপস্থাপিত করেন। তিনি বাইজানন্টিয়মের পতাকায় দ্বিমস্তকযুক্ত ঈগল পাখির ছবি নিজের ক্ষমতার প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেন। উত্তরের নভ্‌গোরড্‌ মস্কৌ-এর আনুগত্য স্বীকার করল। এইভাবে আধুনিক রুষ সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন হয়।

তৃতীয় ইভানের পৌত্র চতুর্থ ইভান (১৫৩৩-১৫৮৪) কনষ্টানটিনোপলের সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি জার (সিজার) নামে পরিচিত হন। জারের আচার ব্যবহার ও মনোবৃত্তির পশ্চাতে তাতার ঐতিহ্যের স্বীকৃতি

পরিস্ফুট। তার উপর ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ছাপ অস্পষ্ট। রাশিয়ার জারতন্ত্র দায়িত্ব-হীন প্রভুত্বের ধারক বাহক ও চালক। তার ধর্ম গোঁড়ামির অন্ধতায় আবিল।

কিপ্‌চাক সাম্রাজ্যের পশ্চিমে মোগলশক্তিচক্রের বাইরে দশম ও একাদশ শতকে পোল্যাণ্ডে স্লাভ্‌জাতির দ্বিতীয় কেন্দ্র রচিত হয়। মোগল অভিযান-স্রোত পোল্যাণ্ডের উপর প্রবাহিত হলেও তার জলোচ্ছ্বাসে পোল্যাণ্ড নিমজ্জিত হয়নি। পোল্যাণ্ড রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করেছিল, লাটিন বর্ণমালা ব্যবহার করত এবং রাজা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করেনি। প্রকৃতপক্ষে পোল্যাণ্ড খ্রীষ্টান ভূমিখণ্ডের প্রত্যন্ত দেশ ও পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের অংশ কিন্তু রাশিয়ার প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের ছিল।

পারস্য মেসোপোটেমিয়া ও সিরিয়া ইলখান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। যাযাবর মোগল শক্তি এই সকল স্থানের প্রাচীন সভ্যতার মূল শিথিল করে দিয়েছিল। যখন চেঙ্গিস্‌খাঁ প্রথম চীন আক্রমণ করেন তখন সে দেশের নগর ও জনপদ ধ্বংস করা হবে কিনা, এই বিষয় নিয়ে মোগল দলপতিগণ আলোচনা করেছিল। মোগলদের সহজ বীর্যবন্ত মন কৃত্রিম নাগরিক জীবনের পরিপন্থী ছিল। যে সকল মানুষ তৃণ-শষ্পপূর্ণ শ্যামায়মান দিগন্তপ্রসারী উন্মুক্ত মেষচারণভূমির সংকীর্ণতা সম্পাদন করে শ্বাসরোধকর কৃত্রিম নগর পত্তন করেছিল তারা মোগলদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে আহত করেছিল। তাদের কাছে নগরপত্তনকারী মানুষের মনোবৃত্তি দুর্বোধ্য বিকৃত ও অস্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়েছিল। এজন্য এইসকল তথা-কথিত সুসভ্য মানুষ তাদের বিদ্বেষ ও ঘৃণা উদ্রেক করেছিল। সভ্য মানুষের প্রতি তাদের হৃদয়হীন আচরণের মনস্তত্ত্ব এই।

এইরূপ ধ্বংসশীল মনোবৃত্তি মেসোপোটেমিয়ায় হুলাগুর সক্রিয় নীতিতে সুস্পষ্ট হয়েছিল। মোগলগণ সেখানকার নগর ও গৃহ অগ্নিদগ্ধ করেছিল। বহু নরনারীকে হত্যা করেছিল। সেখানকার বহু প্রাচীন কালের জলসেচন প্রণালী নষ্ট করে দিল। সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা সোনার দেশের অন্তিম শয্যা রচনা করল। প্রাচীন সভ্যতার জন্মস্থান, ইরিধু নিপ্পুর বাবিলোন নিনেভা টিসিফোন এবং বোগ্‌দাদের পটভূমি মেসোপোটেমিয়া নগর সভ্যতার পরম শত্রু মোগলদের সশস্ত্র অভিযানে ঊষর ভূমিতে পরিণত হল। তার অট্টালিকা ও প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত হল। হুলাগুর সেনাপতি কেটবোগার প্যালেষ্টাইনে পরাজয় মিশরকে এই দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা করেছিল।

হুলাগুর নেতৃত্বে মোগলদের প্রথম উত্তেজনা নিঃশেষ হয়ে শান্তভাব ধারণ করে। কিন্তু পঞ্চদশ শতকে পশ্চিম তুর্কীস্তানে তাইমুর বা তামারলেনের নেতৃত্বে যাযাবর মোগলদের অভিযান ঘটে। তিনি সমরকন্দে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন এবং তুর্কীস্তান থেকে দক্ষিণ রাশিয়া পর্যন্ত কিপ্‌চাক সাম্রাজ্যে সাইবিরিয়ায় এবং দক্ষিণ দিকে সিন্ধুনদের তীরভূমি পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে ১৩৬৯ খ্রীষ্টাব্দে 'গ্রেট খাঁ' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি উত্তর ভারত এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে হত্যা ও ধ্বংসের খাণ্ডবদাহ চালিয়েছিলেন। ইস্পাহান জয় করে তিনি সত্তর হাজার নরমুণ্ডের স্তূপ সজ্জিত করেছিলেন। তিনি ছিলেন রক্তপিপাসু যাযাবর মানুষের শেষ প্রতিনিধি।

চেঙ্গিস খাঁর লুপ্ত সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধার তাঁর অভিপ্রেত ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। শোণিত প্লাবন ও ধ্বংসস্তূপ তাঁর যাত্রাপথের অনুগামী হয়েছিল। তিনি পাঞ্জাবকে শ্মশানে পরিণত করেন। দিল্লী তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। দিল্লী অধিকার করে তিনি নগরবাসীদের উপর বীভৎস হত্যা চালিয়েছিলেন। তাঁর কালান্তক নামের ভয়াবহ স্মৃতি আমাদের মনে জাগিয়ে তোলে মৃত্যুর নিস্তব্ধতাপূর্ণ রাজ্য, রক্তের বিভীষিকা, আসুরিক শক্তির নগ্ন ও সর্বধ্বংসী মূর্তি। তিনি ছিলেন মানব শক্তির কদর্য অপব্যবহারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত।

ঊনত্রিংশ

নব জাগরণ

কোন একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ইতিহাসের যুগবিশেষের আরম্ভ হয়। ১৪৫৩ সালে কনস্টানটিনোপলের পতনের পর ইয়োরোপে নবযুগের জন্ম। সহস্র বৎসর ব্যাপী তমসাচ্ছন্ন যুগের অবসান হল। ইয়োরোপের শুষ্ক ধমনীতে নূতন শোণিত প্রবাহের স্পন্দন অনুভূত হল। নূতন আবেগ, নূতন উৎসাহ, নূতন উদ্দীপনায় তার মানস জীবন আলোড়িত হয়ে উঠল। তার সাহিত্য ললিতকলা ধর্ম রাজনীতি নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি চিৎপ্রকর্ষের নানা বিভাগে নূতনের যাত্রা শুরু হল। ইয়োরোপের জাগৃতি দেখা দিল। মানুষ যেন গভীর নিদ্রা থেকে জাগ্রত হল।

পঞ্চদশ শতকে যখন ইংল্যাণ্ডের জাতীয় চৈতন্য সুপ্ত বা অর্ধজাগ্রত তখন

১৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—এই দুই শত বৎসরের মধ্যে ইটালিতে যে সাহিত্য শিল্প জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্ম হয়, প্রাচীনকালে এথেন্সের সৃষ্টি প্রতিভার গৌরবময় যুগের পর তেমনটি আর কখনও দেখা যায়নি। মধ্য-যুগে চার্চের প্রভুত্ব সন্ন্যাস বিধি-নিষেধের প্রাবল্যে মানুষের মন অবদমিত, হৃদয় শুষ্ক ও জীবন আড়ষ্ট হয়ে যায়। সন্দেহ ও জিজ্ঞাসা পুরাতনের বিরুদ্ধে জনমনে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থার জগদ্দল পাথরের চাপে পীড়িত মানুষের হৃদয় প্রাক্‌ খ্রীষ্টীয় যুগের স্বভাববাদী গ্রীসের দর্শনে ও সাহিত্যে সহজ আনন্দ-রসের সন্ধান পেয়ে আবেগে ও উৎসাহে চঞ্চল হয়ে উঠল।

তুর্কীদের হস্তে কনস্টানটিনোপলের পতনের সহিত বহু জ্ঞানী গুণী কোবিদ পণ্ডিত ও দার্শনিক ইটালিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গ্রীক দর্শন ও সাহিত্য সাধনা কেন্দ্রচ্যুত হয়ে সুজলা সুফলা শৈলকিরীটী সাগর-মেখলা ইটালির বক্ষে স্থান লাভ করে।

মানস জাগরণের মলয়-হিল্লোলে ইটালির জনমন আলোড়িত ও পুলকিত হল। ক্রমে এর সুরভি ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড এবং অন্যান্য দেশে বিস্তৃত হয়ে পড়ল। এই জাগরণ প্রাচীন গ্রীক চিন্তা বা সাহিত্যের কেবলমাত্র পুনরাবৃত্তি নয়। এর শক্তি ও প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। বহুযুগ ধরে ইয়োরোপের অন্তরে যে সংস্কৃতি প্রতিক্রিয়া, যে চিন্তা-বিপ্লব অলক্ষ্যে জীবনের নানা ক্ষেত্রে শক্তি অর্জন করছিল, এই জাগরণ তারই নৃত্যলীলার বিকাশ।

প্রাচীন যুগের গ্রীসের সৌন্দর্যানুভূতি এর আবেদন জুগিয়েছিল। কিন্তু গ্রীসের নিছক দৈহিক সৌন্দর্যসাধনা এক্ষণে উচ্চতরভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। গ্রীসের সৌন্দর্যসাধনা সুসভ্য নাগরিকের মহান কীর্তি। এই নগরাশ্রয়ী সাধনা ইটালির নগরগুলিতে, বিশেষতঃ ফ্লোরেন্সে আত্মপ্রকাশ করেছিল। লোরেনজো দি মেদিচির শাসনকালে ফ্লোরেন্সে বহু প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি সমবেত হয়েছিলেন। ফ্লোরেন্স ইয়োরোপের সাহিত্য ও কলা-শিল্পের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। লোরেন্‌জো স্বয়ং কবি, রাজনীতিবিদ ও রসজ্ঞ ছিলেন। মাইকেল এঞ্জেলো, লিওনার্ডো দা ভিন্‌চি এবং আলবার্টির মতো বহু প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। লিওনার্ডো (১৪৫২-১৫১৯) একটি প্রথম শ্রেণীর অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তিনি মোনা লিসা এবং শেষ নৈশ-ভোজনের ছবি এঁকেছিলেন। তিনি একাধারে শিল্পী বৈজ্ঞানিক ও শরীরতত্ত্ববিদ্‌ ছিলেন। তাঁর প্রতিভা সর্বতোমুখী

ছিল। চন্দ্র ও সূর্যের গতিপথ, আপিনাইন পর্বতের উপর সামুদ্রিক জন্তুর কঙ্কাল, গতিতত্ত্ব প্রভৃতি বিচিত্র ও জটিল বিষয়ের আলোচনায় তাঁর মন নিবিষ্ট ছিল। আলবার্টি যেমন ব্যায়াম কৌশল ও অশ্বচালনায় সুদক্ষ ছিলেন, তেমনি স্বরলিপি চিত্রন, গির্জা নির্মাণ, প্রহসন রচনা, স্থাপত্য, দৃষ্টিবিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তিনি অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

জ্যোতিষ্ক সকলের আকাশ পথে গতিবেগ এবং সূর্যের চতুর্দিকে পৃথিবীর আবর্তন, এই দুইটি তথ্য পোল্যাণ্ডবাসী সন্ন্যাসী কোপরনিকস্ প্রথম প্রমাণ করে দিলেন। ডেনমার্কের টাইকো ব্রাহীর জ্যোতিষ্ক সম্বন্ধে আলোচনা জার্মান বৈজ্ঞানিক কেপ্‌লারের মনীষায় চরিতার্থতা লাভ করেছিল। গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪১) গতিবিজ্ঞান শাস্ত্রের জনক ছিলেন। নিউটন মাধ্যাকর্ষণ নিয়ম আবিষ্কার করে জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করেন। কলচেষ্টারের ডাঃ গিলবার্ট রোজার বেকনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিলেন। চুম্বক সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা ফ্রান্সিস্ বেকনের বিজ্ঞান-বোধ উদ্রেক করেছিল। বেকন পরীক্ষামূলক দর্শন শাস্ত্রের জনক। তাঁর নিউ আটলান্টিস্ পুস্তকে বিজ্ঞান মন্দিরের পরিকল্পনা ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে রয়েল সোসাইটি প্রতিষ্ঠার কারণ। বিজ্ঞান-পরিষৎ স্থাপনের পর বৈজ্ঞানিকগণ চিন্তার আদান-প্রদানে বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধতর করে তোলার সুযোগ পেলেন। লিউওয়েলহোক্ অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কার করে জীবন-নাটকের অপরিজ্ঞাত অংশ থেকে অজ্ঞানতার যবনিকা তুলে দিলেন। জার্মেনি ও হল্যাণ্ডের মানস-জাগরণ ধর্মান্দোলনের সন্তান। এতে রাজনীতির উত্তাপ ও ধর্মনীতির উত্তেজনা ছিল। সুতরাং পরিকল্পনার ও সাহিত্যের সার্বভৌমিকতায় ইহা নিঃস্ব ছিল। জার্মেনিতে লুথারের মতো, হল্যাণ্ডে ইরাস্‌মাস্ নব জাগরণের মানস-সন্তান ছিলেন।

রেনাসাঁসের প্রধান কথা অতীতপ্রীতি নয়, এর গূঢ়তত্ত্ব মুক্তি, চিত্তের অবন্ধন। উত্তরাঞ্চলের গথিক শিল্পাদর্শ অথবা দক্ষিণাঞ্চলের মুসলিম প্রভাব ইটালির শিল্পজীবন স্পর্শ করেনি। সে যুগের চিত্রশিল্প বস্তুতান্ত্রিক চিত্রণের বৈজ্ঞানিক সূত্র অন্বেষণে ব্যস্ত ছিল। বিজ্ঞান বুদ্ধির বেদীমূলে সৌন্দর্যবোধ উৎসর্গীত হয়েছিল। সারাসেন শিল্প মনুষ্যদেহ অঙ্কনরীতি বন্ধ করে দিয়েছিল। ইটালিতে গৃহের দেওয়াল ও প্রস্তরের উপর চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি প্রসার লাভ করেছিল। ফ্লোরেন্সে ফিলিপো লিপ্পি বটেসেলি ঘিরল্যাণ্ডিজো, অম্ব্রিয়ায় সিগ্‌নোরেনি পেরুগিনো মণ্টেগ্‌না প্রভৃতি প্রতিভাশালী চিত্রশিল্পীর আবির্ভাব

হয়েছিল। টাইটিয়ানের শিল্প প্রতিভায় ভেনিসের চিত্রাঙ্কন বিদ্যা উন্নতির উচ্চতম শিখরে উঠেছিল। তাঁর 'ম্যাডোনা' এবং মাইকেল এঞ্জেলোর 'পবিত্র ও অপবিত্র প্রেম' নামক চিত্র চিত্রাঙ্কন শিল্পের পরাকাষ্ঠা।

জার্মেনির কোলন নগরে একটি শিল্পী মণ্ডলী গড়ে উঠেছিল। হল্যাণ্ডে হিউবার্ট এবং ভান ভ্যান্ ইক নামক শিল্পীদের চিত্রে সৌন্দর্য ও প্রাণময়তার সমন্বয় হয়েছিল। হানস্ হোলবেন (১৪৯৭-১৫৪৩) নামে একজন জার্মান ইংল্যাণ্ডে চিত্রশিল্প আমদানী করেন। ইংল্যাণ্ডে এই যুগের চিত্র বা স্থাপত্য শিল্প ইটালি ও ফ্রান্সের তুলনায় নিকৃষ্ট ধরণের ছিল। জার্মেনিতে রুবেনস্ এবং র‍্যামব্রাণ্ট ফ্লেমিশভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্পেনের শিল্পীগণ ইটালিতে গিয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেছিল। ষোড়শ শতকের প্রথমাংশে স্পেনের চিত্র-শিল্প ভিলাজ কোয়েজের অসাধারণ ব্যক্তিত্বে বিকশিত হয়েছিল। হল্যাণ্ডের র‍্যামব্রাণ্ট এবং স্পেনের ভিলাজ কোয়েজের মনীষা ঊনবিংশ শতকের শিল্পাদর্শে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

স্পেনসারের 'ফেয়ারি কুইন' সৌন্দর্য সৌষ্ঠবে মনোজ্ঞ কিন্তু এই দ্ব্যর্থসূচক নীতিমূলক অতিকায় কাব্য সুখপাঠ্য নয়। এলিজাবেথের যুগের বৈশিষ্ট্য নাটক। মার্লো বেন জনসন চ্যাপম্যান ডেকার ম্যাসিংগার বোমণ্ট ও ফ্লেয়ার প্রভৃতি নাট্যরস স্রষ্টার পরিমণ্ডলে সেকস্‌পীয়র তুঙ্গ স্থান অধিকার করেছিলেন। ছান্দসিক প্রতিভায়, মানবচরিত্র অঙ্কনে ও বিশ্লেষণে কল্পনার বিদ্যুৎ খেলায়, সৌন্দর্যানুরাগে, চিত্তের বিরাটত্বে সেকস্‌পীয়রের মনীষা বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়। সেকস্‌পীয়রের প্রতিভা গভীরতায় সৌন্দর্যসৃষ্টিতে লালিত্যে বৈচিত্র্যে এবং সর্বোপরি মানবতায় মিল্টনের বিপরীতধর্মী।

জন গুটেনবার্গ কর্তৃক মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কার এবং আটটি পরিষদ প্রতিষ্ঠা জার্মেনিতে যুগান্তর সৃষ্টি করেছিল। ইটালিতে প্যারিসে লণ্ডনে ষ্টকহলমে মাদ্রিদে ধাতুনির্মিত অক্ষরে পুস্তক ছাপা হয়েছিল। পূর্বসূরীদের যে জ্ঞান ও কাব্য সম্পদ পাণ্ডুলিপির ভিতর আত্মগোপন করে মুষ্টিমেয় শিক্ষার্থী ও পণ্ডিতের মনের খোরাক যোগাত—তা ছাপার অক্ষরে রূপ ধারণ করে অসংখ্য নরনারীর কৌতূহল চরিতার্থ করেছিল। জার্মাণ মুদ্রাকর ও পুস্তকবিক্রেতাগণ ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা আরম্ভ করল। প্রায় ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে তারা ইটালিতে এক শত এবং স্পেনে তিরিশটি মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করেছিল।

তিরিশ

ধর্মান্দোলন

ষোল শতকে ধর্মান্দোলন সমগ্র ইয়োরোপে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। মধ্যযুগের অর্থনীতিও ধর্মের বিধি-নিষেধের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছিল। পুরোহিতদের রাষ্ট্রশাসন এবং বিশেষ অধিকারের বিরুদ্ধে জনমনের তীব্র প্রতিবাদ এবং খ্রীষ্টান ধর্মের সনাতনী খাঁটি শিক্ষার পুনরুদ্ধার প্রোটেস্টাণ্ট-ধর্মান্দোলনের রূপ ধারণ করে দেখা দিল। সন্দেহ জিজ্ঞাসা ও প্রতিবাদের অসংখ্য ক্ষীণধারা বিভিন্ন স্থানে পৃথকভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল। তারা এক্ষণে মিলিত হয়ে বিপুল কলেবর বিপ্লব-স্রোতের আকার ধারণ করে সমগ্র ইয়োরোপের উপর প্লাবন এনে দিল।

সার্বভৌম চার্চের শাসন থেকে মানুষকে মুক্ত করতে যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন মার্টিন লুথার ছিলেন তাঁদের অন্যতম। অক্সফোর্ডের সংস্কারকগণ তাঁর পূর্বগামী ছিলেন। ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে কোলেট গ্রীক ভাষায় লিখিত নিউ টেষ্টামেণ্টের লাটিন অনুবাদ প্রকাশ করেন। পণ্ডিতদের শাস্ত্রব্যাখ্যা ও ভাষ্য সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্বোধ্য হয়েছিল। যীশুখ্রীষ্ট যে ধর্মের কথা বলেছিলেন তা শিক্ষা দেওয়াই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ইরাসমাসের 'খ্রীষ্টান প্রিন্স' এবং টমাস মোরের 'ইউটোপিয়া' রাষ্ট্র ও ধর্ম সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করেছে, তাতে নূতন যুগের আভাষ পাওয়া যায়। তাঁরা বলেছিলেন—রাষ্ট্রের একমাত্র উদ্দেশ্য জাতি-সাধারণের সুখসম্পদ বৃদ্ধি করা; ধর্মের একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষ ও ঈশ্বরকে ভালোবাসা। প্রকৃত ধর্ম মানুষকে ভ্রাতৃত্বের সূত্রে বেঁধে রাখে, সম্প্রদায় সৃষ্টি করে না।

১৪৮৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্মেনিতে মার্টিন লুথারের জন্ম হয়। তাঁর পিতা খনিতে কাজ করতেন। দরিদ্র হলেও তিনি পুত্রকে ব্যবহারজীবী করার জন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। লুথার একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. উপাধি লাভ করেন। পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে আইনপাঠ ত্যাগ করে ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে এর্ফাটের আগষ্টাইন মঠে প্রবেশ করেন। সেখানে বাইবেল এবং অগষ্টাইনের বই পড়ে তিনি প্রাচীন কালের খ্রীষ্টান ধর্মের সহিত প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্মের প্রভেদ বুঝতে পারলেন। গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার সহিত তিনি খ্রীষ্টানদের তীর্থস্থান রোমে গেলেন। সেখানে তিনি দেখলেন, দুষ্ট প্রকৃতির পুরোহিতরা গির্জায় উপাসনা

করছে। অজ্ঞ লোক পুরোহিতদের ঘুষ দিয়ে পাপমুক্ত হচ্ছে এবং প্রায়শ্চিত্ত করছে। রোম থেকে ফিরে এসে এইভাবে অর্থের বিনিময়ে পাপমুক্তির প্রথার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলন আরম্ভ করলেন। উইটেনবার্গের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক মেলাঙ্কথন তাঁর সহকর্মী হলেন। পোপ দশম লিও লুথারের উপর সমাজচ্যুতির ফতোয়া জারি করলেন। তাঁর সকল বই পুড়িয়ে দেওয়া হল। সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ লুথার ধর্মচ্যুত বলে ঘোষণা করলেন। জার্মেনির রাজারা লুথারের পক্ষ সমর্থন করলেন। জার্মেনি দুই দলে বিভক্ত হয়ে গেল।

এই সময় কৃষকরা বিদ্রোহ করল। সম্রাট স্বয়ং জার্মেনিতে উপস্থিত হলেন। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম প্রচার বন্ধ করে দিবার জন্য তিনি আদেশ দিলেন। ধর্ম-বিশ্বাসের জন্য কাহারও উপর কোন অত্যাচার করা হবে না এবং প্রোটেষ্টাণ্টদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে নেওয়া হবে, এই সর্তে সন্ধি হল।

সুইজারল্যাণ্ডে জুইংগ্লি পুরোহিতদের প্রভুত্ব অস্বীকার করলেন। জেনেভায় জন ক্যালভিন চার্চের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। লুথারের ধর্মমত জার্মেনি এবং ইংল্যাণ্ডের রাজার শক্তি বৃদ্ধি করেছিল কিন্তু ক্যালভিনের মত স্কটল্যাণ্ড ও নেদারল্যাণ্ডে রাজার শক্তি উচ্ছেদ করেছিল।

চার্চের বাইরের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হল কিন্তু প্রোটেষ্টাণ্ট শত্রুদের হাত থেকে একে রক্ষা করার জন্য এর আভ্যন্তরীন সংস্কারের চেষ্টা চলতে লাগল। ষোল শতকে প্রোটেষ্টাণ্ট আন্দোলনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে কয়েকটি সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল জেসুইট্ সম্প্রদায় তাদের অন্যতম।

জেসুইট্ সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইগ্নেশিয়াস্ লয়েলা। প্রথম জীবনে তিনি একজন সৈনিক ছিলেন। কামানের গোলায় তাঁর একখানি পা ভেঙে যায়। হাসপাতালে রোগ-শয্যায় তিনি সাধুদের জীবনী পাঠ করতেন। তাঁর কল্পনা-প্রবণ চিত্তের উপর সাধুজীবনের অলৌকিক কাহিনীর ছাপ পড়েছিল। তিনি মহাপুরুষদের আদর্শ নিজের জীবনে কার্যে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধে রক্তপাত করে বীরত্বের গৌরব অর্জন করার চেয়ে খ্রীষ্টজননী মেরির উপাসনায় জীবন উৎসর্গ করা শ্রেয়, এই ধারণা তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়েছিল। তীর্থপর্যটন সমাপ্ত করে প্রৌঢ় বয়সে তিনি শিক্ষালাভের জন্য আত্মনিয়োগ করেন। ফ্রান্সিস্ জেভিয়র ছিলেন তাঁর সাহায্যকারীদের অন্যতম। পরবর্তী কালে এঁরা তাঁর সহকর্মী হন। পবিত্রতা দারিদ্র্য এবং আদেশপালন, এই তিনটি পণ ছিল নূতন সম্প্রদায়ের সভ্যদের প্রধান

ব্রত। অবিচলিত চিত্তে পোপের আদেশ পালন করাও তাঁদের কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল।

গৃহ পরিবার বিষয় অর্থ প্রভৃতি যে সকল বন্ধন মানুষকে সংসারের সঙ্গে জড়িত করে তা তাঁরা ছিন্ন করে কায়মনোবাক্যে সম্প্রদায় সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ার সময় মত প্রকাশের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে অন্ধভাবে আদেশ পালনের জন্ম শপথ গ্রহণ করতে হত। রাজনীতি তাদের কার্যসূচীর প্রধান অঙ্গ ছিল। উদ্দেশ্যসিদ্ধি তাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। শিক্ষাদান তাদের প্রধান কর্তব্য ছিল। ইয়োরোপের জেসুইট বিদ্যালয়-গুলি আদর্শস্থানীয় হয়ে উঠল। তাদের শিক্ষাপদ্ধতি একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। ক্যাথলিক দেশগুলির তরুণদের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তারা ভবিষ্যতের কর্মক্ষেত্র প্রস্তুত করত। প্রচার কার্যে তাদের উদ্যম ও উৎসাহ প্রশংসনীয় ছিল। তারা চীন ভারতবর্ষ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ক্যাথলিক ধর্মের পতাকা বহন করে এনেছিল। কর্মকুশলতায় স্বার্থত্যাগে ও আদর্শনিষ্ঠায় তারা অতুলনীয় ছিল।

ধর্মান্দোলনের ফলে যে যুদ্ধ হয় তার ফেনিল রক্তস্রোতে সমগ্র ইয়োরোপ ভেসে গেল। সমুদ্র মন্থনে যেমন সুধা ও বিষ যুগপৎ উত্থিত হয় তেমনি ইয়োরোপের শোণিত-প্লাবনে মনুষ্য হৃদয়ের উচ্চতম ও নিম্নতম গুণ প্রকাশ পেয়েছিল। একদিকে যেমন ক্র্যানমারের 'স্তবমালা', মিল্টনের 'প্যারাডাইজ্ লষ্ট', লয়লার 'আধ্যাত্মিক সাধনা' এবং প্যাসকেলের 'পেনসিস্' নামক অমূল্য গ্রন্থরাজী জন্মলাভ করেছিল, একদিকে যেমন প্যালেষ্ট্রিসার 'ক্যাথলিক সঙ্গীত' এবং ব্যাকের 'প্রোটেস্টান্ট সঙ্গীত' প্রতিভাশালী মনীষীদের ভাবরাশির গভীরতার সন্ধান দিয়েছিল, অপরদিকে তেমনি বোহিমিয়ার ওয়ালেষ্টিন এবং ইংল্যাণ্ডের মার্লবরো সৈন্যবল ও অর্থ সাহায্যে দেশের কায়েমি স্বার্থ সুদৃঢ় করে নিয়েছিলেন। প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্মান্দোলন শিল্পে ও সঙ্গীতে, বিজ্ঞানে ও সাহিত্যে যে অমূল্য রত্ন প্রসব করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নাই।

একত্রিশ

নূতন জগৎ আবিষ্কার

ফিউডাল ব্যবস্থায় জমিদার এবং পুরোহিতদের শোষণে সাধারণ মানুষ অসন্তুষ্ট হয়েছিল। তখন জমিই ছিল একমাত্র সম্পদ। ক্রমে শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারে নগর পত্তন হল। বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হল। জমিদার ও পুরোহিতদের হাত থেকে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য বুর্জোয়ারা চেষ্টা করতে লাগল। এমন সময় মার্কো পোলো এবং অন্যান্য পর্যটকদের ভ্রমণকাহিনীতে চীন ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের ঐশ্বর্যের কথা পশ্চিম ইয়োরোপে প্রচারিত হল। তুর্কীরা এতকাল প্রাচ্যের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তাদের শক্তিহ্রাসের সহিত সে অন্তরায় দূর হয়ে গেল। পশ্চিম ইয়োরোপের জাতিগণ প্রাচ্যের সোনার দেশগুলির সহিত স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার জন্য সমুদ্রের রাস্তা অনুসন্ধান করতে লাগল।

সমুদ্রযাত্রায় স্পেন ও পর্তুগাল ইয়োরোপের অন্যান্য জাতির পথপ্রদর্শক। ইংরেজ ফরাসি ডচ্ এবং হ্যান্সা সহরগুলি এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে স্পেন ও পর্তুগাল আমেরিকা ও প্রাচ্য অঞ্চলের সহিত বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। জার্মেনি একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিল। তখন স্পেনের রাজা জার্মেনির সম্রাট ছিলেন। পোপের নিষ্ঠাবান সমর্থক স্পেনে ডমিনিকান ও জেসুইট সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। স্পেনে ক্যাথলিক ধর্ম অক্ষুণ্ন ছিল। স্পেনের নেতৃত্বে ও সাহায্যে কলম্বস আমেরিকা আবিষ্কার করেন (১৪৯২)। পোপ স্বীয় অনুরক্ত ভক্ত স্পেনকে আমেরিকার একচেটে অধিকার দিলেন।

কলম্বসের আবিষ্কার পশ্চিম ইয়োরোপে অপূর্ব উত্তেজনা সৃষ্টি করে। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত কলম্বসের বিশ্বাস ছিল যে তিনি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে এশিয়ায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ১৪৯৭ সালে ভাস্কো ডি গামা উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে কালিকটে আসেন। ১৫১৫ সালে পুর্তুগীজ জাহাজ যবদ্বীপ ও মলাক্কায় উপস্থিত হয় এবং ১৫১৯ সালে ম্যাগিলান নামে আর একজন পর্তুগীজ অশেষ কষ্ট স্বীকার করে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন।

সদাশয় পোপের আদেশে নবাবিষ্কৃত আমেরিকা স্পেন ও পর্তুগালের মধ্যে বিভক্ত হল দেখে ইয়োরোপ ক্ষুব্ধ হল। স্পেনের লোকেরা আমেরিকার

অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মেক্সিকোর আজটেক এবং পেরুর সভ্যতার সম্পর্কে আসে। এই দুইটি সভ্যতা গঙ্গা-যমুনা স্রোতের ন্যায় একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়েছিল।

আজটেকগণ বীরের জাতি ছিল। ধর্মের নামে তারা নরবলি দিত। কোর্টেজের অভিযান আজটেক সভ্যতা ধ্বংস করেছিল। ১৫১৯ সালে কোর্টেজ মেক্সিকোর উপত্যকায় উপস্থিত হন। তাঁর মেক্সিকো প্রবেশ, মন্টিজিউমার হত্যা, দেশ জয়, প্রত্যাবর্তন প্রভৃতি কাহিনী চমকপ্রদ। মেক্সিকোতে এখন স্প্যানিশ ভাষার প্রচলন হয়েছে। ক্যাথলিক ধর্ম ও স্প্যানিশ সভ্যতার মিশ্রণে তাদের বর্তমান সভ্যতা গঠিত হয়েছে।

১৫৩০ সালে পাইজারো নামক আর একজন ভাগ্যান্বেষী বিশ্বাসঘাতকতা করে পেরুর সম্রাট ইন্‌কাকে বন্দী করে এবং তাঁর নামে রাজ্যশাসন করতে থাকে। পাইজারো সমগ্র দেশ জয় করেছিল। ক্রমে ব্রেজিল ছাড়া আমেরিকার সর্বত্র স্পেনের ভাগ্যান্বেষীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। তাদের হত্যা লুণ্ঠন ও ধ্বংসের কাহিনীতে এই যুগের ইতিহাস কলঙ্কিত।

পর্যাপ্ত পরিমাণে সোনারূপা স্পেনে প্রেরিত হল। অপরিমিত ধনাগমে স্পেনের সম্রাট ও স্পেনের অধিবাসীগণ ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠল। উপনিবেশ স্থাপন চলতে লাগল। আফ্রিকার উপকূল থেকে বহু নিগ্রো আমদানী হল। দাস ব্যবসা প্রচলিত হল। স্পেনের ঐশ্বর্য ও শক্তি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স স্পেন ও পর্তুগালের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। হল্যাণ্ড তাদের অনুবর্তী হল।

মেকিয়াভেলি। ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতকের রাজনীতি, রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা এবং সে যুগের রাজাদের মনোভাব নিকোলো মেকিয়াভেলির (১৪৬৯—১৫২৭) 'প্রিন্স' নামক পুস্তকে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি নিছক জড়বাদী ছিলেন। ভ্যালেন্টিনোর ডিউক সিজার বোর্জিয়া মেকিয়াভেলির আদর্শ রাজা ছিলেন। মেকিয়াভেলি সন্দেহবাদী ছিলেন। প্লেটো বা বেকনের ন্যায় তিনি ভাবী জগতের রাজনৈতিক বা সামাজিক আদর্শের স্বপ্নে বিভোর হননি। কি উপায়ে ক্ষমতা হস্তগত করতে পারা যায়, ছলে-বলে-কৌশলে জগতের উপর আধিপত্য স্থাপন করতে পারা যায়, ইহাই ছিল তাঁর মতে পরম পুরুষার্থ।

সেই সময়ের বুদ্ধিমান ও কৌশলী রাজারা মেকিয়াভেলির উপাসক ছিলেন। চতুরতা কূটনীতি দুর্বল প্রতিবেশীর উপর অত্যাচার পররাজ্য গ্রাস ও ধ্বংস প্রভৃতি দুর্নীতিমূলক প্রচেষ্টা তাদের চিন্তাধারায় ও কর্মপন্থায় পরিস্ফুট।

সুইজারল্যাণ্ড। একদিকে স্পেন ও ইটালি অন্যদিকে ফ্রান্স—এই তিনটি দেশের মধ্যস্থলে শৈলমালাপরিবৃত সুইজারল্যাণ্ড। এর চতুর্দিকে স্তরে স্তরে পর্বতসোপান উপরে নীল নীলিমার সহিত মিশে গিয়েছে। নীচে লতাবিতানে ঢাকা ছায়া-সুশীতল কুঞ্জশ্রেণী। স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ অসংখ্য হ্রদ। এদের কাকচক্ষু জলে প্রতিফলিত বন্য প্রকৃতির শ্যামশোভা। এই সুরম্য পার্বত্য দেশ স্বাধীনতার লীলানিকেতন। এখানে কয়েকটি জেলা সম্মিলিত হয়ে সুইস্ যুক্তরাজ্য গড়ে উঠেছিল। কয়েক শতাব্দী রোমান সাম্রাজ্যের নামমাত্র অধীন থেকে ১৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে সুইস যুক্তরাজ্য খাঁটি প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল।

প্রায় আট শত বৎসর সুইজারল্যাণ্ড স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছে। এখানে তিনটি ভাষা এবং তেরটি জেলা আছে। গৃহ বিবাদ ও অন্তর্যুদ্ধ থেকে এই দেশ মুক্ত। স্বদেশ থেকে নির্বাসিত কত শিল্পী কত বাগ্মী সংস্কারক এই দেশের বুকে আশ্রয় পেয়েছেন। এই স্থলেই ক্যালভিন্ প্রোটেস্টাণ্ট ধর্মকে রূপ দিয়েছিলেন এবং গ্রোশিয়াস্ আন্তর্জাতিক আইনের মূলসূত্রের প্রেরণা পেয়েছিলেন। এখানে রুসোর সাম্যমৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী স্ফুরিত হয়েছিল এবং ম্যাটসিনি নব্য ইটালির মাতৃমূর্তির পরিকল্পনা করেছিলেন। এখানে রুশ বিপ্লবের বীজ প্রথমে উপ্ত হয়েছিল এবং যুগস্রষ্টা লেনিন নূতন মতবাদ প্রপঞ্চিত করেছিলেন। এই দেশের প্রকৃতি সজীব প্রাণবন্ত চিরনবীন। এখানে আছে প্রাণ-প্রাচুর্য স্বচ্ছন্দ আনন্দ কিন্তু বুদ্ধিদীপ্তির অপ্রাচুয।

বত্রিশ

ষোল থেকে আঠার শতাব্দীর ইয়োরোপ

ব্যক্তিকেন্দ্রী সাম্রাজ্য। বিশ্ব সভ্যতার ইতিহাস বিভিন্ন জাতির মনীষার অবদানে 'সূত্রে মণিগণা ইব' রচিত। মাঝে মাঝে পৃথিবীতে এমন দুই এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন যাঁরা অবস্থাচক্রে অথবা ঘটনার আবর্তে এমন কাজ করে বসেন যার ফল সুদূরপ্রসারী, যার ছাপ সমসাময়িক ইতিহাসের উপর পড়ে।

শার্লেমেন, আলেকজান্দার অথবা দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের ন্যায় অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও শক্তির প্রাচুর্য না থাকলেও সম্রাট পঞ্চম চার্লস্ কয়েক বৎসরের জন্য ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁর পিতামহ সম্রাট প্রথম ম্যাক্সিমিলনের রাজনৈতিক বিবাহনীতি তাঁর এই সাময়িক ঔজ্জ্বল্যের কারণ।

কেহ বাহুবলে, কেহ বুদ্ধিবলে ক্ষমতা অর্জন করে। হ্যাপস্‌বার্গ বংশ বিবাহসূত্রে উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। ম্যাক্সিমিলন হ্যাপস্‌বার্গদের নিকট অষ্ট্রিয়া টিরিয়া আলসেসির অংশ এবং অন্যান্য স্থান উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়ে জীবন আরম্ভ করেন। বিবাহ দ্বারা নেদারল্যাণ্ড এবং বার্গেণ্ডি তাঁর হস্তগত হয়। প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর বিবাহ দ্বারা তিনি ব্রিটানি লাভ করতে চেষ্টা করেন। তৃতীয় ফ্রেডেরিকের মৃত্যুর পর তিনি সম্রাট হন এবং বিবাহ-সূত্রে মিলান লাভ করেন। ফার্ডিনাণ্ড ও ইজাবেলার কন্যার সহিত নিজপুত্রের বিবাহ দিয়ে সমগ্র স্পেন সার্দিনিয়া সিসিলিদ্বয় কাষ্টাইল এবং ব্রেজিলের পশ্চিম দিকে সমগ্র স্থান নিজ বংশভুক্ত করে নিলেন। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্রান্সিসের আপত্তি সত্ত্বেও পোপ দশম লিও এবং ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেনরীর পৃষ্ঠপোষকতায় ও জার্মেনির ফিউগার বংশের প্রভাব ও অর্থ সাহায্যে চার্লস্‌ নির্বিবাদে সম্রাট পদে প্রতিষ্ঠিত হলেন (১৫২৩)।

সম্রাট পঞ্চম চার্লসের যুগ পৃথিবীর ইতিহাসে ব্যক্তিকেন্দ্রী সাম্রাজ্যের যুগ। তখন ইংল্যাণ্ডে অষ্টম হেন্‌রী, ফ্রান্সে প্রথম ফ্রান্সিস্‌, জার্মেনি ও স্পেনে পঞ্চম চার্লস, ইটালিতে দশম লিও, ভারতবর্ষে বাবর এবং তুরস্কে সুলেমান রাজত্ব করছিলেন।

চার্লসের রাজত্বের প্রথম ভাগে জার্মেনিতে ধর্মান্দোলন চলেছিল। তিনি লুথারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হলেন কিন্তু জার্মেনির সাহায্য পেলেন না। চার্লসের ক্ষমতা বৃদ্ধি হচ্ছে দেখে হেনরী ও পোপ ফ্রান্সিসের পক্ষ অবলম্বন করলেন। উত্তর ইটালিতে কয়েক বৎসর যুদ্ধের পর ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ চার্লসকে জার্মেনির সম্রাট পদে অভিষিক্ত করলেন। এর পর পোপ ইয়োরোপের আর কোন রাজাকে সম্রাটপদে অভিষিক্ত করেননি।

ইয়োরোপের রাজনীতিক্ষেত্রে মেকিয়াভেলির প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্তমান ছিল। ব্যক্তিগত প্রাধান্য ও শক্তি অর্জনের জন্য রাজারা যে কোন পক্ষ অবলম্বন করত এবং যে কোন নীতি অনুসরণ করতে দ্বিধাবোধ করত না। জার্মেনির কর্তৃত্ব তাঁর ভ্রাতা ফার্ডিনাণ্ডের এবং স্পেন ও নেদারল্যাণ্ডের শাসনক্ষমতা তাঁর পুত্র ফিলিপের হস্তে সমর্পণ করে চার্লস সম্রাট পদ ত্যাগ করলেন।

ষোল শতকের শেষভাগে ইয়োরোপে রাষ্ট্রশক্তি ব্যক্তিকেন্দ্রী শাসনতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল। পররাষ্ট্রসচিবগণ মেকিয়াভেলির নীতি অনুসরণ করে ইয়োরোপকে

একটি বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য প্রজাদের উপর কর চাপান হল। নূতন ধরণের সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি হল। রাজার সহিত প্রজার সংঘর্ষের নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল।

গণতান্ত্রিক আন্দোলন। ফ্রান্সের সহিত যে যুদ্ধ হচ্ছিল তার ব্যয় নির্বাহের জন্য ফিলিপ নেদারল্যাণ্ডের নাগরিক ও অভিজাতদের নিকট অর্থ সাহায্য চান। তারা ফিলিপের অন্যায় দাবীর প্রতিরোধ করে। শাসনকর্তা অ্যাল্‌ভার নিষ্ঠুর অত্যাচারে প্রজাগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠল। হল্যাণ্ড অরেঞ্জ বংশের নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী গ্রহণ করল। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েষ্ট-ফেলিয়ার শান্তিবৈঠকে এর পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়েছিল।

স্যাকসনদের ইংল্যাণ্ডে আগমনের সহিত সেখানে যে পঞ্চায়েতি স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত হয় তার নাম 'উইটেনাগেমট'। কালক্রমে ইহা পার্লামেণ্টের আকার ধারণ করেছে। যে সকল সভ্য গ্রাম থেকে নির্বাচিত হত তাদের নাম নাইটস্ অব্ দি শিয়ার বা জেলার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং যারা নগর থেকে নির্বাচিত হত তারা বার্জার্স বা নাগরিক নামে অভিহিত হত। এই সমিতির মধ্যে সত্যকারের সাধারণতন্ত্রের গোড়া পত্তন হয়েছিল। ফ্রান্স ও স্পেনের মণ্ডলীতে নির্বাচিত নাগরিক প্রতিনিধি ছিল কিন্তু জনসাধারণেব নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিল না।

স্বেচ্ছাচারী রাজা জনের অত্যাচারে ব্যারনগণ বিদ্রোহী হয়ে রাজার স্বাক্ষর-যুক্ত যে অধিকারপত্র আদায় করে তার নাম ম্যাগ্‌নাচার্টা। রাজা কখনও জনসাধারণের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না, ইহাই ছিল এই দলিলের প্রধান কথা।

ষ্টুয়ার্ট বংশের শেষ রাজা জেমস্ যখন রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হস্তগত করতে চাইলেন তখন ইংল্যাণ্ডের সকল স্তরের সকল শ্রেণীর নাগরিকগণ সমবেত হয়ে তাঁর স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিবাদ করেছিল। এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিবাদ ইয়োরোপের ইতিহাসে অভিনব। ধর্মান্দোলনের ফলে ইয়োরোপের জাতিগণ প্রোটেস্টাণ্ট এবং ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে কুরুক্ষেত্র সৃষ্টি করেছিল। ইংল্যাণ্ডে তা হয়নি। এখানে রাজার সহিত প্রজার সংর্ষের মূল কারণ রাজনৈতিক, ধর্মীয় নয়। ধর্মান্দোলনের বিপুল তরঙ্গে ইংল্যাণ্ড বিক্ষুব্ধ হয়েছিল এবং তার প্রভাবে রাজা ও প্রজা উভয়েই প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছিল কিন্তু ধর্ম-বিশ্বাসের ব্যক্তিগত মানসিক ব্যাপার রাজনৈতিক অধিকারের জাতিগত দাবীর প্রতিকূল হয়নি।

প্রথম চার্লস্ ইংল্যাণ্ডকে ফ্রান্স ও স্পেনের সহিত যুদ্ধে জড়িয়ে দিয়ে যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্য পার্লামেন্টের নিকট অর্থ সাহায্য দাবি করলেন। তখন আন্তর্জাতিক ব্যাপারে পার্লামেন্টের হাত ছিল না। পার্লামেন্ট রাজার দাবী অগ্রাহ্য করলেন। উপায়ান্তর না দেখে রাজা দেশের অর্থশালী ব্যক্তিগণের নিকট ঋণ গ্রহণ এবং অন্যায়ভাবে প্রজাদের নিকট টাকা আদায় করতে লাগলেন।

১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্ট প্রজাস্বত্ব বিষয়ক যে দলিল প্রস্তুত করেন তাতে ম্যাগনাচার্টা-নিবদ্ধ ধারাগুলির পুনরুল্লেখ করে আরও কয়েকটি নূতন ধারা সন্নিবেশিত হল। এতে বলা হল যে পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া রাজা প্রজার উপর কোন নূতন কর স্থাপন করতে পারবেন না, প্রজার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না, কোন প্রজাকে শাস্তি দিতে অথবা কোন স্থানে সৈন্য রেখে প্রজার নিকট অতিরিক্ত কর আদায় করতে পারবেন না। চার্লস্ পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন। এগার বৎসর পার্লামেন্টের কোন অধিবেশন হয়নি। রাজার সহিত পার্লামেন্টের সংঘর্ষ অন্তর্যুদ্ধের আকার ধারণ করল। ওলিভার ক্রমওয়েল পার্লামেন্টের পক্ষে সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। তাঁর 'আইরনসাইড' নামে দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল রাজাকে পরাস্ত করল। চার্লস্‌কে বন্দী করা হল। দেশদ্রোহিতা, অত্যাচার এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য তাঁর ফাঁসী হল। (১৬৪৯)।

পার্লামেন্টের এই ভয়াবহ কার্য ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। ইংরেজ জাতি স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, সাহসী ও বীর। তারা প্রাচীনের উপাসক। পরিবর্তন তাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ। তারা আইন ও শৃঙ্খলার পক্ষপাতী। তারা অভিজ্ঞতার আলোকে পথ দেখে ধীরপদে অগ্রসর হয়, ভবিষ্যতের অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে না। তাদের রাজভক্তি গভীর। তারা রাজাকে ভক্তি ও সম্মান করে এবং তাঁর ন্যায্য প্রাপ্য দিতে পরাঙ্মুখ নয়। স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত থেকে রাজা ন্যায়সঙ্গত অধিকার ভোগ করবেন, তাতে তাদের আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি প্রজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবেন, তার জন্মগত অধিকার ক্ষুণ্ণ করবেন, জনমত অগ্রাহ্য করবেন, স্বেচ্ছাচার স্বৈরাচার অবলম্বন করবেন—তাঁর এই অন্যায় দাবী সহ্য করতে ইংল্যাণ্ডের লোক রাজী হয়নি।

ইংল্যাণ্ডে রাজাকে বন্দী করে দেশদ্রোহিতা এবং বিশ্বাসঘাতকতার জন্য প্রকাশ্যভাবে তাঁর ফাঁসী হল দেখে ইয়োরোপের রাজাদের মনে ভীতি ও

আতঙ্ক সৃষ্টি হল। রাশিয়ার জার ইংরেজ রাজদূতকে তাঁর সভা থেকে বিতাড়িত করলেন। ফ্রান্স ও হল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধাচরণ করল কিন্তু ওলিভার ক্রমওয়েলের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সামরিক শক্তি, তাঁর বাহুবল ইংল্যাণ্ডের নবপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্রের রাষ্ট্রিক মর্যাদা রক্ষা করতে সমর্থ হল। ক্রমে তিনি সমস্ত রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হস্তগত করে ডিক্টেটর নাম গ্রহণ করেন।

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর ইংল্যাণ্ডের ক্ষণিক ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়ে গেল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হল। দ্বিতীয় চার্লস্ পিতৃসিংহাসন গ্রহণ করার জন্য আহুত হলেন। রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে প্রজাগণ উন্মত্ত হয়ে উঠল। চার্লস্ পররাষ্ট্র বিভাগের কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। তিনি ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই-এর সহিত গোপনে সন্ধি করলেন। ইংল্যাণ্ডের পররাষ্ট্র বিভাগ ফ্রান্সের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হল।

চার্লসের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় জেমস্ রাজা হন (১৬৮৫)। তিনি আচারনিষ্ঠ ক্যাথলিক ছিলেন। ইংল্যাণ্ডের পার্লামেন্টরি ডিমোক্রেসীর অন্তর্নিহিত মূলতত্ত্ব বোঝার মতো বুদ্ধি তাঁর ছিল না। রাজা ও পার্লামেন্টের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠল। জেমস্ ইংল্যাণ্ডকে রোমের সহিত সংযুক্ত করতে চেষ্টা করেন। অন্তর্বিরোধ প্রচণ্ডভাবে প্রকাশ পেল। ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে জেমস্ ফ্রান্সে পলায়ন করলেন।

গৃহবিরোধ দেশে যে বিষম পরিস্থিতি সৃষ্টি করে পার্লামেন্ট তার তিক্ত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। সুতরাং ক্রমওয়েলের মতো কোন শক্তিশালী ব্যক্তির বা কোন সেনাপতির হাতে দ্বিতীয়বার আত্মসমর্পণ করতে ইংল্যাণ্ডের লোক রাজী হয়নি। পার্লামেন্ট এবার শান্তির পথ গ্রহণ করলেন। একবিন্দু রক্তপাত হল না। পার্লামেন্ট প্রিন্স্ অব অরেঞ্জ উইলিয়মকে আহ্বান করে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে স্থাপন করলেন। তৃতীয় উইলিয়ম এবং মেরির রাজত্বের পর অ্যান্ ইংল্যাণ্ডের রাণী হন। তারপর ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে হ্যানোভার বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়।

সতের এবং আঠারো শতকে ইংল্যাণ্ডে আধুনিক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। রাজা, জমিদার ও প্রজা—এই শক্তিত্রয়ের সমবায়ে এবং একত্রীকরণে যে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তাহাই এখন পার্লামেন্টরি ডিমোক্রেসী নামে অভিহিত। যদিও এই শাসনতন্ত্র শ্রেণীগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য, শাসক ও শাসিতের প্রভেদ, বর্ণভেদের তীব্রতা প্রভৃতি সমস্যার সমাধান করতে সমর্থ হয়নি, তথাপি ইহা

ইংল্যাণ্ডে দুই শত বৎসরের উপর সমভাবে বিগুমান আছে, ইংরেজ জাতি একে তাদের ঐতিহ্য সংস্কৃতি ও কল্যাণের অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা বলে মেনে নিয়েছে। ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্রে রাজার স্থান আপাতদৃষ্টিতে নিষ্প্রয়োজন মনে হলেও তিনি শাসনদণ্ডের জীবন্ত প্রতীক। হ্যানোভার বংশের রাজারা রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগে, পররাষ্ট্র ও নৌ বিভাগে যে প্রভাব অলক্ষ্যে বিস্তার করেছেন তা অনস্বীকার্য। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রে ধনিকের শক্তি অপ্রতিহত এবং তার শাসনতন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদ রাজনৈতিক কৈবল্যলাভের বীজমন্ত্র হয়েছিল।

সপ্তদশ শতকে জার্মেনির আভ্যন্তরীণ অবস্থা। মধ্যযুগে জার্মেনি বহু খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। সে সকল রাজ্যে জমিদার ডিউক ইলেক্টর ধর্মযাজক প্রভৃতির ক্ষমতা প্রবল ছিল। বিপুল সম্পত্তি ও ক্ষমতার জন্য সম্রাট এদের ভয় করতেন। খণ্ড রাজ্যগুলি জার্মেনিতে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের অন্তরায় হয়েছিল। ১৬১৮ সাল থেকে ১৬৪৮ সাল পর্যন্ত জার্মেনিতে অন্তর্যুদ্ধ চলেছিল। একদিকে ক্যাথলিক রাজা, অপর দিকে প্রোটেষ্টাণ্ট অভিজাতবর্গ। এই দুই শক্তির দ্বন্দ্ব চলেছিল। জাতীয় ঐক্য-স্থাপনের পরিবর্তে দুইটি বিরোধী শক্তি জাতিকে বিভক্ত করে দিল।

বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ক্যাথলিক ও প্রোটেস্টাণ্টগণ পরস্পর যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিল। বর্বরতায় নৃশংসতায় ও নির্দয়তায় জার্মেনির আভ্যন্তরীণ সংগ্রাম আদিম অসভ্য মানুষের শোণিতপিপাসু মনের পরিচয় দিয়েছিল। দেশের দুর্দশার সীমা ছিল না। চাষ বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হল। ক্ষুধার্ত স্ত্রীলোক ও বালকের দল লুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ পাওয়ার আশায় সৈন্যদলের পিছনে ঘুরে বেড়াত। হ্যাপস্‌বার্গ পক্ষে টিলি এবং ওয়ালেনষ্টিন নামে দুইজন লুণ্ঠনকারী সৈন্যসর্দার ছিল। সুযোগ বুঝে সুইডেনের রাজা গষ্টাভস্ অ্যাডল্‌ফস্ বল্টিক সাগরে সুইডেনের পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনে চেষ্টিত হলেন। বীরত্বের জন্য তিনি উত্তর ইয়োরোপের সিংহ নামে অভিহিত হন। লুটজেনের যুদ্ধে ওয়ালেনষ্টিনকে পরাস্ত করার পর তিনি নিহত হন। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে অভিজাত ও কূটনীতিজ্ঞগণ ওয়েষ্টফেলিয়ার শান্তি-বৈঠকে সমবেত হন। সম্রাটের ক্ষমতা হ্রাস হল। আলসাসি ফ্রান্সের অধিকারে এল। ব্রাণ্ডেনবার্গের ইলেক্টর প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হলেন। ইহাই ক্রমে প্রুশিয়া রাজ্যে পরিণত হয়। হল্যাণ্ড ও সুইজারল্যাণ্ড সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে দুইটি স্বাধীন রাজ্য বলে স্বীকৃত হল।

পোপের প্রাধান্য অবসান হওয়ার পর মেকিয়াভেলির আদর্শ অনুযায়ী

ইয়োরোপে ব্যক্তিকেন্দ্রী রাষ্ট্র সংগঠিত হয়। নেদারল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ডের প্রজাগণ তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারা স্বেচ্ছাচারী রাজাকে বিতাড়িত করে নূতন ধরণের শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু ফ্রান্স রাশিয়া জার্মেনি ইটালি প্রভৃতি দেশে পুরাতন আদর্শ রাজার অবাধ কর্তৃত্ব স্থাপনে সাহায্য করেছিল। এই সকল দেশে বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তশ্রেণী দুর্বল ছিল। এই সুযোগে রাষ্ট্রনায়কগণ শাসনব্যবস্থায় সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন এবং আড়ম্বরের সহিত ক্ষমতা পরিচালন করতে লাগলেন।

ফ্রান্স। ফ্রান্সে ইংল্যাণ্ডের ম্যাগ্‌না চার্টার ন্যায় প্রজাস্বত্ববিষয়ক কোন দলিল ছিল না অথবা শাসন ব্যবস্থায় নির্বাচিত প্রতিনিধির কোন স্থান ছিল না। সেখানে রাষ্ট্রশক্তির সহিত অভিজাত ও বণিক সম্প্রদায়ের স্বার্থের সংঘর্ষ চলেছিল। তারা রাজার বিরুদ্ধে যে সঙ্ঘ স্থাপন করেছিল তার নাম "ফ্রণ্ড"। সম্রাট চতুর্দশ লুই ও তাঁর মন্ত্রী ম্যাজারিনের সহিত এই সঙ্ঘের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। কয়েক বৎসর বিরোধের পর ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে তারা পরাজিত হয়। সম্রাটের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। ম্যাজারিনের পূর্বগামী কার্ডিনাল রিচলু এর পথ প্রস্তুত করেছিলেন। পরে অভিজাতগণ সম্রাটের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে তাঁর আজ্ঞাবহ ভৃত্য অথবা রাজানুসেবী পারিষদের স্থান অধিকার করেছিল। রাজার অনুগ্রহ ভোগ করে তাদের মেরুদণ্ড দুর্বল হয়ে গেল। অর্থলোভে তারা বশ্যতা স্বীকার করল।

সাধারণ প্রজা করভারে জর্জরিত হল। যাজকশ্রেণী অভিজাত সম্প্রদায় এবং খেতাবধারীদের কোন কোন কর মকুব করে দেওয়া হল। নীচ স্তরের প্রজারা উপরের ব্যক্তিদের চাপে পিষ্ট হয়েছিল। সম্রাট বিপুল ক্ষমতার অধিকারী হলেন। চতুর্দশ লুই মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করলেন। ঔজ্জ্বল্যে জাঁকজমকশীলতায় আড়ম্বরে ও ক্ষমতা-প্রাচুর্যে তিনি ইয়োরোপের আদর্শ সম্রাট হলেন। তাঁর আদর্শে অন্যান্য রাজারা নিজেদের রাষ্ট্র গঠন করতে লাগল। তাঁর পররাষ্ট্রনীতি ও জাঁকজমকশীলতা ফ্রান্সকে দেউলে করে দিয়েছিল।

ভের্সাই নগরে সম্রাটের প্রাসাদ সৌন্দর্যে ও ঔজ্জ্বল্যে পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বস্তু। অপর দেশের ছোট বড় রাজারা ভের্সাই প্রাসাদের আদর্শে সাধ্যাতিরিক্ত ব্যয়ে প্রাসাদ নির্মাণ করতে লেগে গেল। বিলাসিতার প্রবল স্রোতে ইয়োরোপের রাজা, ধনী ও জমিদারগণ ভেসে গেল। চতুর্দিকে

শীর্ণকায় বুভুক্ষু জনমণ্ডলীর করুণ আর্তনাদ, দুঃখ-ক্লিষ্ট অসহায় প্রজাদের বুকফাটা ক্রন্দন, দারিদ্র্য, অনির্বাণ হুতবহ জ্বালা-দহন—তারই মধ্যে চন্দনচর্চিতা স্মিতবদনা ললনাদের চটুল গতিছন্দ আর অভিজাতবর্গের প্রেমপূর্ণ নয়নের লোলুপদৃষ্টি। সম্রাট ও অভিজাতগণ অজ্ঞাতসারে অদূর ভবিষ্যতের জন্য স্বহস্তে সমাধি রচনা করছিলেন।

ইংরেজ ও ডাচদের সহিত সমকক্ষতা রক্ষা করার জন্য তিনি নৌবহর নির্মাণ করলেন। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট হওয়ার আশায় তিনি পোপকে সন্তুষ্ট করতে চেষ্টিত হলেন। তিনি প্রোটেস্টাণ্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। তাঁর উৎপীড়নে বহু লোক স্বদেশ ত্যাগ করে চলে গেল। তাদের ভিতর বহু শিল্পী ও গুণী ব্যক্তি ছিল। তারা ইংল্যাণ্ডে গিয়ে রেশমের ব্যবসা আরম্ভ করল। প্রোটেস্টাণ্টদের গৃহে সৈন্য পাহারা মোতায়েন করা হল। ক্যাথলিক ধর্মানুমোদিত পন্থায় বালকদের শিক্ষার ব্যবস্থা হল। তিনি বিজ্ঞান পরিষৎ প্রতিষ্ঠা করলেন।

১৭১৫ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চদশ লুই ফ্রান্সের সম্রাট হলেন। পিতামহের আড়ম্বর-প্রিয়তার ক্ষীণ অনুকরণ প্রবৃত্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতা তাঁর প্রকৃতির বিশেষত্ব ছিল। সুন্দরী রমণী ও অবৈধ প্রেম তাঁর জীবনের একমাত্র কাম্য ছিল। শ্যাটুরুক্সের ডচেস্, ম্যাডাম ডি পম্পাডুর এবং ম্যাডাম ডু বারি তাঁর প্রণয়িনী ছিলেন। এই সকল রমণীর প্রেমকটাক্ষ কামাতুর সম্রাটের জীবন ও রাষ্ট্রনীতি নিয়ন্ত্রণ করত। তাদের সৌন্দর্যের অহমিকা ও গর্বের হোমানলে উচ্ছৃঙ্খল সম্রাটের রুচি প্রজাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য রাষ্ট্রের কল্যাণ আহুতি দেওয়া হল। যুদ্ধ অভিযান সন্ধি প্রভৃতি রাষ্ট্রের গুরুতর সমস্যায় তারা হস্তক্ষেপ করত। দেশের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র ষোড়শ লুই সম্রাট হন।

জার্মেনি। বহু ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে হোহেনজোলার্ণ বংশ ধীরে ধীরে প্রুশিয়ার ভাগ্যনিয়ন্তার স্থান অধিকার করে। অষ্টাদশ শতকে প্রুশিয়া সম্রাটের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে। ফ্রেডেরিক দি গ্রেট পটস্ডামের বিরাট প্রাসাদ এবং নিউ প্যালেস নির্মাণ করেন। তাঁর মার্বেল প্রাসাদ একটি মনোরম সৌধ ছিল। তিনি বিদ্যাচর্চা করতেন এবং ফরাসি লেখক ভল্টেয়ারের সহিত পত্রালাপ করতেন। ফ্রেডেরিকের পর মেরিয়া টেরেসা এবং তারপর ২য় জোসেফ্ সম্রাট হন।

রাশিয়া। পিটার দি গ্রেটের (১৬৮২—১৭২৫) পূর্বে রাশিয়া ইয়োরোপের রাজনীতি ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়নি। পশ্চিম ইয়োরোপের অধিবাসীদের নিকট এই বিস্তৃত ভূমিখণ্ড অরণ্যানীসঙ্কুল জলাভূমি এবং বর্বরদের বাসস্থান বলে বিবেচিত হত। ইয়োরোপের সহিত এর কোন সম্পর্ক ছিল না। পিটারের রাজত্ব কালে এই অজানা অদ্ভুত দেশ ফরাসি সংস্কৃতির পরিচয় লাভ করে। পিটার অভিজাতদের দীর্ঘ শ্মশ্রু ত্যাগ করতে এবং ইয়োরোপীয়দের পোষাক পরতে বাধ্য করলেন। মস্কৌএর প্রাচ্যভাবপূর্ণ আবেষ্টনী থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি পেট্রোগ্রাড্ নগরে নূতন রাজধানী স্থাপন করলেন এবং ফ্রান্স থেকে স্থপতি এনে একটি বৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করলেন। এখানেও উদ্যান চিত্র ঝরনা প্রভৃতি আড়ম্বরের অসদ্ভাব ছিল না।

ফ্রান্সের আদর্শে ফ্লোরেন্স সেভয় স্যাক্সনি ডেনমার্ক ও সুইডেনের রাষ্ট্র-পতিগণ স্ব স্ব রাজধানীকে নানাবিধ সাজসজ্জায় সুসজ্জিত করেছিলেন, বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করে আড়ম্বরপ্রিয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। উদ্যান বীথিকা প্রভৃতি রচনা করে তাঁরা প্রজাদের শ্রমলব্ধ অর্থের অসদ্ব্যবহার করেছিলেন। প্রোটেস্টাণ্ট মুসলিম এবং ইয়ুদীদের উপর অত্যাচারের ফলে স্পেন দুর্বল হয়ে গেল এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পর্যবসিত হল।

ইয়োরোপের রাজা ও অভিজাতদের রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া শীঘ্রই আরম্ভ হয়েছিল। গভীর দুঃখের বেদনা সঞ্জাত আবেগে ইয়োরোপের জনমন উদ্বেলিত হয়ে উঠল। এই গোপন অন্তর্বেদনা ফরাসি বিপ্লবের প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাধারণ মানুষের যুগ যুগ সঞ্চিত নৈরাশ্য ও দুর্নিবার বেদনা, শ্রেণীবৈষম্যের গ্লানিকর বিক্ষোভ, নিপিষ্ট মানুষের হতাশ মর্মধ্বনি ফরাসি বিপ্লবের মূলমন্ত্র সাম্যমৈত্রী ও স্বাধীনতার সুরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল।

পোল্যাণ্ড। সপ্তদশ শতাব্দী ইয়োরোপে চতুর্দশ লুইএর যুগ। অষ্টাদশ শতকে একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রুশিয়ার অভ্যুদয় হয়। ফ্রেডেরিক দি গ্রেট ছিলেন এই বিরাট নাটকের প্রধান অভিনেতা। পোল্যাণ্ডের সাধারণতন্ত্রে রাজা মনোনয়নের ব্যবস্থা ছিল। তিনি যাবজ্জীবন সভাপতি হিসাবে রাষ্ট্রনায়ক থাকতেন। পোল্যাণ্ডে কোন বড় ব্যবসা ছিল না, কোন বৃহৎ নগর ছিল না। ফ্রেডেরিকের প্ররোচনায় রাশিয়ার সম্রাজ্ঞী ২য় ক্যাথরিন এবং অষ্ট্রিয়ার সম্রাজ্ঞী মেরিয়া টেরেসা পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। এর পর পোল্যাণ্ডের নূতন

জাগরণ হয়। শিক্ষায় সাহিত্যে এবং শিল্পে নবজাগরণের স্পন্দন অনুভূত হল। ব্রিটিশ আদর্শে পার্লামেন্ট স্থাপন করা হল। কসিয়াস্কোর নেতৃত্বে জাতীয় দল স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করল কিন্তু পরাক্রান্ত শত্রুদের চক্রান্তে পোল্যাণ্ড ইয়োরোপের মানচিত্র থেকে মুছে গেল। ১৯১৮ সালে পোল্যাণ্ডের ভৌগোলিক সীমা এই ইয়োরোপের মানচিত্রে নির্দিষ্ট হয়েছিল।

তেত্রিশ

সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন ও সাহিত্য

ষোড়শ শতকে ইয়োরোপে নাট্যকলার উন্নতি ও গীতিনাট্যের অভিনয়ে সঙ্গীত চর্চার প্রসার বৃদ্ধি হয়েছিল। সামাজিক পরিস্থিতি সঙ্গীতের ক্ষেত্র প্রসারিত করেছিল। সুর ও ধ্বনির তারতম্য পারম্পর্য সামঞ্জস্য ও প্রকাশভঙ্গীর বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা এবং সুনির্দিষ্ট রীতি আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হল। ইটালি এই বিষয়ে অগ্রণী হয়েছিল। লালি ও মান্টিভার্ডির কৃতিত্ব উল্লেখ-যোগ্য। সঙ্গীতের উপর আধ্যাত্মিকতার প্রভাব বেশী ছিল বলে এর পরিধি সঙ্কীর্ণ ছিল। গির্জায় উপাসনার প্রারম্ভে ভগবৎ মহিমা ও গুণ কীর্তনের জন্য লোকে- দলবদ্ধ হয়ে গান করত কিন্তু বন্ধুবান্ধবদের সম্মিলনে হাল্কাভাবের সঙ্গীত হত। অর্গানের উন্নতি হল। ইংল্যাণ্ডে বুল ও ফিলিপস্, নেদারল্যাণ্ডে সুইল্ডিঙ্ক, রোমে ফ্রিস্কোবলি, ভিয়েনায় ফ্রোবেরজার প্রভৃতি সঙ্গীতশিল্পীর অভ্যুদয় হল। ক্রমে বেহালার আমদানী হল। সুরের সূক্ষ্মতাকে রূপায়িত করার ক্ষমতায়, মনুষ্যকণ্ঠের সহিত সুরের সামঞ্জস্য বিধান করার শক্তিতে এর অদ্বিতীয় প্রভাব অনুভূত ও স্বীকৃত হল। আলিসাণ্ডো স্কারলেটি মোজার্টের অগ্রদূত।

ইংল্যাণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগের সঙ্গীতচর্চা ক্রমওয়েলের শাসনকালে শ্বাসরুদ্ধ ও অবলুপ্ত হয়ে গেল কিন্তু পার্সেলের সঙ্গীত সাধনায় ইহা উচ্চস্থান অধিকার করল। জার্মেনির বিভিন্ন রাজদরবারে সঙ্গীতচর্চা হত। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাক্ ও হ্যানডেলের আবির্ভাবে জার্মেনির সঙ্গীতশিল্প গৌরবের উচ্চসীমায় উঠেছিল। তাঁদের পরে হেডেন মোজার্ট এবং বিঠোভেন সঙ্গীতশাস্ত্রের অত্যুজ্জ্বল মণি। তবে ঐ যুগে সঙ্গীতের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ ছিল। উহা পরিশীলিত সমাজে সীমাবদ্ধ

ছিল। রাজসভায়, প্রাদেশিক নগরের অপেরা ও কনসার্ট গৃহে এর চর্চা চলত। জনসাধারণের ভিতর এর আদর ছিল না। তখনও ইহা প্রাকৃত জনের হৃদয় অধিকার করতে সমর্থ হয়নি। মাত্র কয়েকটা গান ও গুটিকয়েক স্তোত্র জনসাধারণের সঙ্গীতচর্চার উপাদান ছিল। এক্ষণে সঙ্গীতকলা ভদ্রসমাজের শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত।

এই যুগের চিত্রাঙ্কনে ও স্থাপত্যে সমাজের অবস্থা প্রতিফলিত হয়েছিল। বিষয়বস্তু তখনও চিত্রশিল্পীর মনে প্রধান স্থান অধিকার করেনি। ক্রমে আর্টে শিল্পীর সজ্ঞান প্রচেষ্টার ভাব দেখা দিল। তুলি ও রঙে, মাটি বা পাথরে, সঙ্গীত বা নৃত্যের ছন্দে, যে কোন বস্তুর সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাই আর্ট। আর্টে মনই প্রধান বস্তু। এজন্য শিল্পীর মনকে সচেতন হতে হয়। আর্টের চরম উদ্দেশ্য আনন্দ। লোকের রুচি বিভিন্ন বলে আনন্দ বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে বিভিন্ন নামে প্রকাশ পায়। আর্ট ত্রিগুণাত্মক। একে নির্দেশযুক্ত আত্মপ্রকাশক্ষম ও ফলপ্রাপ্ত হতে হবে। বীরত্বের কাল্পনিক গল্প ও মহাকাব্য এক সময়ে সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল। এক্ষণে কথাশিল্প ও গীতিকাব্য তার স্থান অধিকার করেছে। চিত্রে বা সঙ্গীতে এক সময় ধর্ম ও নীতি শিক্ষার আয়োজন হত। এক্ষণে সত্যকার চিত্র আঁকার প্রথা আমদানী হল। সপ্তদশ শতকে ভেলাকুয়েজ (১৫৯৯-১৬৬০) এবং র‍্যামব্রাণ্ট (১৬০৬-১৬৬৯) শ্রেষ্ঠতম চিত্রশিল্পী ছিলেন। পূর্বে আর্টের বিষয়বস্তুর সীমা সঙ্কীর্ণ ছিল। ইয়োরোপে বাইবেল থেকে মেরি বা সাধুদের মূর্তি বা গল্প, ভারতবর্ষে রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প থেকে দেবদেবীর মূর্তি বা ছবি, বুদ্ধসম্বন্ধে উপকথা বা কাহিনী গানে ছবিতে বা পাথরে রূপায়িত হত। তখন সঙ্গীত ছিল একই সুরের, চিত্র আঁকা হত একই ভাবে গতানুগতিকের সুনিশ্চিত ও সুসন্নিবদ্ধ সীমার ভিতর। এক্ষণে এর পরিবর্তন হল। ভেলাকুয়েজ ও র‍্যামব্রাণ্টের আর্টের প্রতিপাদ্য বস্তু ছিল জীবন। মনুষ্য জীবনের বিশ্বজোড়া পটভূমিকার উপর প্রতিফলিত হয়েছিল তাঁদের অনবদ্য শিল্পানুভূতি। জীবন যতই ক্ষুদ্র বা অনাদৃত হোক তাঁরা তার রূপ দিয়েছেন, তার সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁরা ছিলেন সুন্দরের উপাসক। আকাশে আলোকে বস্তুতে, যেখানেই সৌন্দর্য আছে, তাঁরা তার সন্ধান নিয়েছেন এবং সেই সৌন্দর্যকে তুলির সাহায্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। তার বিচার দর্জির ফিতার মাপে নয়, টেক্‌নিকের বা আঙ্গিকের নির্ভুলতায় নয়—তার বিচার সৌন্দর্যপ্রকাশের সমগ্রতায়। প্রাকৃতিক

দৃশ্যের ছবি আঁকার রীতি প্রবর্তিত হল। শিল্পীগণ প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে লাগলেন। সমুদ্র পাহাড় বনজঙ্গল সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সোনালি রঙ নির্ঝর নদনদী আকাশের নীল নীলিমা, প্রকৃতির সুন্দর সুমহান সুমনোহর গম্ভীর দৃশ্য, আবার ঝাঁকজমকশীল পোষাক পরিহিত পোপ বা সম্রাটের স্থূল চিত্র, অন্ধ খঞ্জ ও বামনের কুশ্রীতার আলেখ্য, এই যুগের শিল্পীদের পরিপ্রেক্ষিতে সমানভাবে স্থান পেয়েছিল। তাঁরা প্রকৃতির বৈচিত্র্যে ও জীবনের ব্যাপকতার ভিতর সৌন্দর্য অন্বেষণ করেছিলেন।

এই যুগের পরিশীলিত সমাজে এমন একদল লোকের উদ্ভব হল যাদের শিক্ষিত উদার মন সৌন্দর্য উপলব্ধির ক্ষমতা অর্জন করেছিল। তারা জীবনের রহস্যকে বুঝে জীবনের প্রাচুর্য ও অসম্পূর্ণতার মধ্যে অবিচলিত থেকে নির্লিপ্তভাবে নিরঙ্কুশ সৌন্দর্যানুভূতির আস্বাদ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

এলিজাবেথের যুগে জাতির যে মনোভাব সাহিত্যে ও সঙ্গীতে বিকাশ লাভ করে, চিত্রে বা ভাস্কর্যে তা রূপায়িত হয়নি। বিদেশ থেকে চিত্রশিল্পী ও ভাস্কর আমদানী করতে হয়েছিল। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা চারুকলার উৎকর্ষসাধনের অনুকূল হয়েছিল। রিনল্ডস্ গেইনবরো ও রোমনির চিত্রশিল্প অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ভীষণ অগ্নিকাণ্ডে লণ্ডনের অধিকাংশ গৃহ ভস্মীভূত হয়ে যায়। স্যার ক্রিস্টোফার রেনের প্রতিভা সেণ্ট পলস্ ক্যাথিড্র্যাল ও লণ্ডনের বহু গির্জা নির্মাণে প্রযুক্ত হয়েছিল। এই যুগের আর একজন স্থপতি ইনিগো জোন্স যে ভোজনাগার নির্মাণ করেন তা পরে হোয়াইট্ হল প্রাসাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর শিল্পপ্রতিভার চিরনিদর্শন রূপে এখনও দণ্ডায়মান আছে। ইংরেজ ফরাসি ও জার্মেন স্থপতিগণ রেনেসান্স আর্ট আদর্শে 'অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন কিন্তু পরে গ্রীক ও রোমান শিল্পাদর্শের অনুকরণ প্রকৃতির আবেগে তার সজীবতা ও জীবন্ত ভাব আড়ষ্ট হয়ে যায়।

রাজার শক্তি, অভিজাত ও মধ্যশ্রেণীর অভ্যুদয়ে স্থাপত্য শিল্পের উৎকর্ষ হয়। বিভিন্ন দেশের রাজারা নূতন পদ্ধতি অনুসারে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, উচ্চশ্রেণীর ব্যক্তিগণ ও অভিজাতগণ পুরাতন গৃহ ভেঙে আধুনিক প্রণালীতে প্রাসাদ প্রমোদভবন প্রভৃতি রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন।

সপ্তদশ শতকের ইংরেজি সাহিত্যে সমসাময়িক সমাজের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছিল। ইহা প্রাণবাণ ও শক্তিশালী ছিল কিন্তু ফরাসি সাহিত্যের মতো

সুগঠিত ও চটকদার ছিল না। সম্রাট ও রাজধানীর অভিজাতবর্গ ফ্রান্সের জাতীয়-জীবন গ্রাস করেছিল কিন্তু ইংল্যাণ্ডের জাতীয় জীবন অব্যাহত ছিল। ফ্রান্সে ডেকার্টে ও তাঁর শিষ্যদের স্থায় ইংল্যাণ্ডে বেকন হবস্ এবং লক্ দার্শনিক চিন্তাশীলতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বানিয়ন ডিফো ফিল্ডিং স্থামুয়েল রিচার্ডসন্ স্মোলেট প্রভৃতি লেখকদের সাহিত্য-সাধনায় ইংরেজ জাতির স্বাভাবিক মনোভাব সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

ফ্রান্সে গ্রাণ্ড মনার্কির যুগেও সাহিত্য আলোচনা চলেছিল। কিন্তু সে সাহিত্যে সেক্সপীয়রের অন্তর্দৃষ্টি, মিল্টনের বিরাট ব্যক্তিত্ব, জন বানিয়নের অনাবিল ধর্ম ভাব দুর্লভ। এ যুগের ফরাসি সাহিত্য কৃত্রিম। এর বৈশিষ্ট্য ছিল নির্বাচনী শক্তি, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি, শুষ্ক পাণ্ডিত্য, প্রাণহীন নিয়মানুবর্তিতা। স্বষ্টিকর্তা যেমন আপনার বিচিত্র লীলার মধ্যে আপনাকে ফুটিয়ে তোলেন, নিজের স্বষ্টির ভিতর নিজেই ডুবে যান, "আপনার রস-বৈচিত্র্যের পরিচয়" পান, তেমনি মানুষ সাহিত্যে ও আর্টে আপনাকে স্বষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে নানা ভাবে নানা রূপে আপনাকে পায়। কিন্তু ফ্রান্সের সাহিত্য এইরূপ বন্ধনহীন আত্মোপলব্ধির ক্ষেত্র ছিল না। কর্নেলি ও রেসিনের নাটকে, মেলিয়রের প্রহসনে ঐ যুগের ফ্রান্সের সামাজিক চিত্র অঙ্কিত হলেও তাদের ভিতর যে অসংযম ও প্রমত্ত আনন্দের বিকাশ তা জাতীয় মানসের অসুস্থতা প্রমাণিত করে। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংল্যাণ্ডেও এইরূপ জাতীয় মানসের অসুস্থতা একবার দেখা দিয়েছিল। যখন ইংল্যাণ্ডে রাজভক্তির উচ্ছ্বাসে ক্রমওয়েল যুগের বকধার্মিকতা ও মর্কট বৈরাগ্যের বন্ধন শিথিল হয়ে গেল, তখন ইংরেজি সাহিত্যে স্বৈরাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার তাণ্ডব চলেছিল। পেটরোগা রোগীর স্থায় সমাজও মাঝে মাঝে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুরুচির ঝাঁঝসংযুক্ত সাহিত্য ও আর্ট মনের দুষ্ট ক্ষুধা মেটাতে চেষ্টা করে কিন্তু সমাজের এই অস্বাস্থ্যকর অবস্থা কেটে গেলে মন যখন সুস্থ হয়, তখন মানুষের প্রাণের সহজ বিকাশ সম্ভব হয়, তখন "আবার আসে সহজ সম্ভোগের দিন, তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ করে চিরকালের সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়"। (রবীন্দ্রনাথ)।

এই যুগের প্রবাসী বিপ্লবীদের রচনা উল্লেখযোগ্য। দার্শনিক প্রবর ডেকার্টে (১৫৯৬—১৬৫০) জীবনের অধিকাংশ কাল হল্যাণ্ডে অতিবাহিত করেছিলেন। সে সময়ের যে সকল বিচারপরায়ণ তীক্ষ্ণধী দার্শনিক ক্যাথলিক মতবাদের ভিত্তি

শিথিল করে দেন, ডেকার্টে ছিলেন তাঁদের অন্যতম। নির্বাসিত বিপ্লববাদী ভল্টেয়ার এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। রুসো আধুনিক সভ্যতা ও সমাজের বিরুদ্ধবাদী ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন। তিনি ছিলেন কৃত্রিমতার চিরশত্রু এবং স্বাধীনতার একনিষ্ঠ উপাসক।

অষ্টাদশ শতকে অ্যাডিসনের স্বচ্ছ সরল অনাড়ম্বর গদ্য রচনা, স্যামুয়েল জনসনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচনা, পোপের অলঙ্কার শাস্ত্রনির্দিষ্ট ছান্দসিক জ্ঞান, সুইফ্‌টের রোমাঞ্চকর মনোজ্ঞ কাহিনীতে রাষ্ট্র ও সমাজের প্রচ্ছন্ন শ্লেষ, গোল্ডস্মিথের পেলব সুন্দর হাস্যরসাশ্রিত লিপিচাতুর্য, ষ্টার্ণের সুখপাঠ্য রূপচিত্রন সাধারণ মানুষের জীবনে আনন্দ পরিবেশন করেছিল। এঁদের রচনাবলী পাঠ করে মানুষ বুঝেছিল যে জীবন শুষ্ক বস্তু নয়, তাতে যেমন অগ্নিস্রাবী মরুভূমি ও উত্তাল তরঙ্গ-বিক্ষোভিত পারাবার আছে তেমনই শস্যসম্পদপূর্ণ ক্ষেত্র আছে, শ্যামবিটপীঘন তটভূমি আছে—তাতে যেমন প্রেম-মাধুর্যপূর্ণ শান্তির নীড় আছে, বুকভরা মধু আছে, তেমনি চিন্তা বিপদ ও দুঃখ আছে। মানুষ বুঝল জীবন শুধু যুদ্ধক্ষেত্র নয়, একটানা কর্মক্ষেত্র নয়—জীবনে মলয় বায়ুর হিল্লোল আছে, বসন্ত কোকিলের মধুস্রাবী সঙ্গীত আছে, ফুল্লকুসুমদাম শোভিত মনোহর উদ্যানও আছে। মানুষ বুঝল পৃথিবীতে সে আসেনি শুধু কষ্টভোগ করতে, বুঝল সে এসেছে জীবনকে ভোগ করতেও। কর্মক্লান্ত জীবনের সামান্য অবসর কালেও সাহিত্যের আনন্দরস সম্ভোগ করতে সে শিক্ষা করেছিল এই যুগের ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য থেকে।

চৌত্রিশ

বিদ্রোহী আমেরিকা

যখন ইয়োরোপ বর্বর জাতিদের সম্ভাবিত আক্রমণের আশঙ্কা থেকে মুক্ত হয়ে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল এবং নিজের ভৌগোলিক সংস্থানের ভিতর শান্তি সুখ ভোগ করার আয়োজন করছিল ঠিক সেই সময় পৃথিবীর দুই প্রান্তে দুইটি অগ্নিশিখা প্রচণ্ডভাবে জ্বলে উঠেছিল। ষোল ও সতের শতকে ইয়োরোপের রাজারা পরস্পর প্রতিযোগিতা করে আত্মঘাতী সমরে ব্যাপৃত ছিল। তারপর বুদ্ধিবল বাহুবলের স্থান অধিকার করল। রাষ্ট্রনায়করা কূটনীতি ও চালবাজীর আশ্রয় নিয়ে নিজেদের দেশের ক্ষমতা ও সুবিধা বৃদ্ধি করল।

সম্রাট ছিলেন রাষ্ট্রের প্রতীক। তিনি এক্ষণে শাসনযন্ত্রের প্রতিনিধি হয়ে উঠলেন। প্রুশিয়া রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়া দুর্বল পোল্যাণ্ডকে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিল। আমেরিকায় ও ভারতবর্ষে ফ্রান্সের শক্তির মূল উৎপাটন করে ব্রিটেন সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। কানাডায় তার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল।

পূর্বে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ লোক পররাষ্ট্রিক ব্যাপারে উদাসীন ছিল। আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণও পররাষ্ট্র নীতি নিয়ে চিন্তা করত না, অথবা আন্তর্জাতিক ব্যাপারে জড়িত হয়নি। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের কূটনীতি স্বাধিকার সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তুলল। ইয়োরোপের রাজনৈতিক ব্যাপারে আমেরিকা নিরপেক্ষ নীতি প্রায় এক শত বৎসর ধরে অনুসরণ করে এসেছিল। সুইজারল্যাণ্ডও ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত এই নীতির অনুবর্তন করে আসছে। বিশ্বের রাষ্ট্রনীতি থেকে যুক্তরাষ্ট্র দূরে অবস্থান করছিল কিন্তু ১৯১৭ সালে নিরপেক্ষতার শৈলশিখর থেকে নেমে এসে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করার অজুহাতে সে আন্তর্জাতিক শান্তি নষ্ট করছে।

ষোল শতক থেকে ইংল্যাণ্ডে সাম্রাজ্যবাদ অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারার মতো ভিতরে ভিতরে বয়ে চলেছিল। মাঝে মাঝে তা প্রতিবেশ প্রাতিক্রিয়ায় পরিস্ফুট হচ্ছিল। তার পররাজ্য গ্রাস করার স্পৃহার মুখোস খুলে গেল।

সতের শতকের প্রথমার্ধে (১৬২০) কয়েকজন ঔপনিবেশিক ধর্মমতের স্বাধীনতা রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে বসতি স্থাপন করে। তাদের জাহাজের নাম ছিল 'মে ফ্লাউয়ার'। ১৫৮৪ সালে স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে উপনিবেশ স্থাপন উদ্দেশ্যে ভার্জিনিয়ায় উপস্থিত হন। চিরকুমারী এলিজাবেথের নামানুসারে এই প্রদেশের নামকরণ হয়েছিল। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সহিত আমেরিকার উপনিবেশ স্থাপন পূর্ণমাত্রায় চলেছিল। দ্বিতীয় চার্লস ও তাঁর বন্ধুগণ স্বদেশে বে-আইনী-ভাবে কর স্থাপন করে প্রজাদের অপ্রিয়ভাজন হতে সাহসী হননি। চার্লস্ ঔপনিবেশিকদের শোষণ করে নিজের অর্থ-পিপাসা চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

জন লকের বৈপ্লবিক চিন্তায় আমেরিকার প্যাট্রিক হেনরি এবং জেমস্ ওটিস অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন ঈশ্বর সকল মানুষকে সমান করে সৃষ্টি করেছেন, শ্রেষ্ঠত্ব শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত, জন্মগত নয়। জনসাধারণের

কল্যাণের জন্য রাজার সৃষ্টি, রাজার স্বার্থের জন্য জনসাধারণের সৃষ্টি হয়নি। প্রজাকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার অধিকার রাষ্ট্রতন্ত্রের নাই।

মানুষের মন স্বভাবতঃ স্থিতিশীল। আদর্শ মতবাদ সাধারণ মানুষের জীবনের উপর সহজে আধিপত্য স্থাপন করতে পারে না। বাস্তব জীবনের সমস্যা সমাধানের পথে যখন কোন অন্তরায় আসে তখনই তার স্থবির মন ক্রিয়াশীল হতে আরম্ভ করে। তখনই আসে পুরাতনের সঙ্গে নূতনের সংঘাত। সংঘাত থেকে নূতন পরিস্থিতি জন্মে। নূতন পরিস্থিতি মানুষকে কোন মতবাদের সাহায্য নিতে বাধ্য করে। বাস্তবের কষ্টিপাথরে সে মতবাদের পরীক্ষা আরম্ভ হয়। পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা অগ্রগতির পাথেয়।

১৭৬০ সালে তৃতীয় জর্জ ইংল্যাণ্ডের রাজা হন। ইংল্যাণ্ডের আয় বৃদ্ধির জন্য 'ষ্ট্যাম্প আইন' জারি করা হল। আমেরিকায় অসন্তুষ্টি ও প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি হওয়ায় এই আইন বাতিল করা হল কিন্তু লোকের অসন্তুষ্টি দূর হল না। অবাধ বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা হল। আমেরিকার চা আমদানী করার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে বিশেষ সুবিধা দেওয়া হল। ঔপনিবেশিকগণ চা বর্জন করল। বন্দরে ইংল্যাণ্ডের জাহাজ থেকে চা সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হল। বোষ্টন নগরের অধিবাসীদের শাস্তির ব্যবস্থা হল। ইংল্যাণ্ড থেকে কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ প্রেরিত হল।

১৭৭৪ সালে ফিলাডেলফিয়ায় বিভিন্ন উপনিবেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয়। এ দিকে ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজ থেকে বোষ্টনের উপর গোলা বর্ষণ চলতে লাগল। ১৭৭৫ সালের এপ্রিল মাসে দুই দেশের মধ্যে রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হল। কংগ্রেস জর্জ ওয়াসিংটনকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। স্বাধীনতা অর্জনের দুর্জয় প্রেরণায় কৃষকগণ লাঙ্গল ছেড়ে দলে দলে যুদ্ধে যোগ দিল। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ঔপনিবেশিকগণ 'যুক্তরাষ্ট্র' নাম গ্রহণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করল।

ফ্রান্স পোল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বহু লোক ওয়াশিংটনের সৈন্যদলে যোগ দিল। ফরাসি বীর লা-ফায়েৎ নিষেধ ও বাধাসত্ত্বেও গোপনে আমেরিকায় উপস্থিত হন এবং স্বাধীনতার যুদ্ধে ঔপনিবেশিকদের পক্ষে যোগ দেন। শীত অনাহার দুঃখ-কষ্ট রসদের অভাব দুর্গম পথের যাত্রীদের আদর্শচ্যুত করতে পারেনি। তারা জয় পরাজয়ের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। ১৭৭৮ সালে ফ্রান্সের সম্রাট আমেরিকার পক্ষ অবলম্বন করে সাহায্যের জন্য কয়েকখানি যুদ্ধ জাহাজ ও সৈন্য

প্রেরণ করলেন। ১৭৮১ সালে বিখ্যাত ইংরেজ সেনাপতি লর্ড কর্ণওয়ালিস আমেরিকা ও ফ্রান্সের সম্মিলিত শক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। পর বৎসর উভয় পক্ষ সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জন একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। পৃথিবীতে এক নূতন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। নিছক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এইরূপ রাষ্ট্রগঠন পৃথিবীর ইতিহাসে অভিনব। ব্যক্তিগতভাবে ঔপনিবেশিকগণ খ্রীষ্টান কিন্তু তাদের রাষ্ট্রিক সত্তা ধর্মনিরপেক্ষ ছিল। তাদের রাষ্ট্রিক আদর্শ মানবধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঘটনা-স্রোতের টানে এবং পরিস্থিতির প্রভাবে মানুষ এতকাল চিরাচরিত প্রথার দাস হয়ে তার শাসনব্যবস্থা ধীরে ধীরে ও অজ্ঞাতসারে গঠন করেছে। এক্ষণে সে রাজনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে অতীতের অন্ধ আনুরক্তি ও প্রথার দাসত্বমুক্ত হয়ে বর্তমানের কর্তব্য-বোধ অনুসারে তার রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলল। সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সকল মানুষ সমান, এই নীতি যে রাষ্ট্রধর্মে প্রযুক্ত হতে পারে, তার প্রথম পদপ্রদর্শক আমেরিকা এবং বিংশ শতকের রাশিয়া।

প্রকৃতির বিধানে সকল মানুষ স্বাধীন ও মুক্ত, মানুষ হিসাবে মানুষের অধিকার আছে, রাষ্ট্রচালকগণ জনসাধারণের রক্ষক ও ভৃত্য, বিবেক-অনুমোদিত ধর্মপথে চলার অধিকার সকলের আছে, এই নীতি ভার্জিনিয়ার প্রান্তরে প্রথম বিঘোষিত হয়েছিল। স্বাধীনতা ঘোষণার ইস্তাহারে দৃঢ়ভাবে স্বীকৃত হল, মুদ্রিত হল – সাম্য সকলের জন্মগত অধিকার।

বিভিন্ন ষ্টেট এই নীতি অনুসারে তাদের শাসনতন্ত্রের ভূমিকা রচনা করেছিল। প্রায় সকল প্রদেশেই ব্রিটিশ আদর্শে দুইটি ব্যবস্থাপক সভা ছিল। নূতন আইন ধীর ও মন্থরভাবে হওয়াই বাঞ্ছনীয়,—ইহাই দ্বৈতশাসনের মূলনীতি।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনতন্ত্র প্রথমে তেরটি পৃথক শাসনতন্ত্রের প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এর নাম কংগ্রেস বা রাষ্ট্রীয় মহাসভা। স্বতন্ত্র প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচিত কয়েকজন প্রতিনিধির মিলন স্থান ছাড়া ইহা আর কিছুই নয়। বিদেশের বাণিজ্য, মুদ্রা প্রচলন, কর নির্ধারণ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রদেশগুলি স্বাধীন ছিল। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ফিলাডেলফিয়ায় আহুত সভায় সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান শাসনতন্ত্রের খসড়া প্রস্তুত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল। প্রদেশের পর প্রদেশ নূতন সাধারণতন্ত্র গ্রহণ করল। পর বৎসর নূতন প্রণালীতে গঠিত কংগ্রেসের অধিবেশন ওয়াশিংটনের পৌরহিত্যে নিউইয়র্ক নগরে

অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে নূতন শাসনতন্ত্র প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয়ে বর্তমান আকার ধারণ করেছে। পটোম্যাক পর্বতের উপর যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন নগর স্থাপিত হল।

রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। কোন রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানও একদিনে গড়ে ওঠেনি। অভিজ্ঞতাবলে রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত সংস্কৃত ও পরিশোধিত হয়। কিন্তু আমেরিকার শাসনতন্ত্র বৈপ্লবিক যুগের উত্তেজনার মধ্যে পরিকল্পিত হয়েছিল বলে এর দোষ ত্রুটি তখন ধরা পড়েনি তাদের উল্লেখযোগ্য অতীতও ছিল না। তারা নূতন রাষ্ট্র পত্তন করেছিল, নূতন শাসনতন্ত্র রচনা করেছিল। তাদের ভিতর প্যাট্রিক হেন্‌রি টমাস জেফারসন আলেকজান্দার হ্যামিল্টন টমাস পেইন বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ও জর্জ ওয়াশিংটনের মতো লোকও ছিলেন। কিন্তু তাঁরাও সময়ের উর্ধে উঠতে পারেননি। তাঁরা একদিকে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, 'সকল মানুষ সমান ও স্বাধীন', অপরদিকে নিগ্রো দাসগণ তাঁদের মধ্যেই পশুর ন্যায় দুর্বহ জীবন অতিবাহিত করেছিল। অনুন্নত ও কৃষ্ণকায় নিগ্রোদের সহিত মিশ্রণে শ্বেতকায় জাতির অধঃপতন ঘটবে, এই আশঙ্কায় নিগ্রোদের এখনও পৃথক রাখা হয়েছে কিন্তু রক্তের মিশ্রণ না করেও মানুষের সঙ্গে মানুষের মতো ব্যবহার করা সম্ভব।

পঁয়ত্রিশ

বিপ্লবী ফ্রান্স

মেকিয়াভেলির রাষ্ট্রনীতির আদর্শে গঠিত ইয়োরোপীয় রাজতন্ত্রের পীড়নে এবং পররাষ্ট্রীয় দপ্তরখানার কূটবুদ্ধির বন্ধনে মানবতার নাভিশ্বাস আরম্ভ হয়েছিল। বিষয়-প্রয়োজনের ভিতর যে তাগিদ আছে মানুষ চিরকাল তাকে বড় করে দেখতে পারে না। আত্মার প্রাচুর্যের অনুভূতি, অখণ্ডতার উপলব্ধি, পূর্ণতার স্পর্শ তার মন-প্রাণ মাতিয়ে তোলে। তখন সে নূতন পথ খুঁজে নেয়, কারণ নবসৃষ্টির উন্মাদনা কোন বাঁধন মানে না। স্থিতিবাদীর দল তাকে নিরস্ত করতে চেষ্টা করে, শৃঙ্খলার নামে শৃঙ্খল রচনা করে তার উচ্ছ্বাসকে রুদ্ধ করে দিতে প্রয়াসী হয় কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা সার্থক হয় না। ভাঙার আনন্দের ভিতর নব-সৃষ্টির প্রাণ-পরিচয় পাওয়া যায়।

আমেরিকার বাঁধন-ভাঙার প্রেরণা প্রকৃষ্ট রূপ পেয়েছিল। ইয়োরোপে

গ্র্যাণ্ড মনার্কির লীলাস্থল ফ্রান্সে বিক্ষুব্ধ মানবতা ব্যক্তি-স্বার্থের মমত্ব-মোহকে প্রচণ্ড আঘাতে ভেঙে দিয়েছিল। আমেরিকার ঔপনিবেশিকগণ রাজশক্তি অধিকার করেছিল, ফ্রান্সের লোকেরা ইংরেজদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে তাদের রাজাকে যূপকাষ্ঠে বলি দিয়েছিল। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকার বিপ্লবের মতো ফরাসি বিপ্লবও রাজশক্তির অন্যায় দাবী, তার নির্বিবেক সঙ্কীর্ণ স্বার্থ-লিপ্সার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ ইয়োরোপের পটভূমির উপর দেখা দিয়েছিল।

গ্র্যাণ্ড মনার্কের উচ্চাভিলাষ আড়ম্বরপ্রিয়তা ও পরস্বাপহরণ প্রবৃত্তি, ইয়োরোপব্যাপী যুদ্ধ প্রস্তুতির অত্যধিক ব্যয় ফ্রান্সের সাধারণ মানুষকে করভারে পীড়িত করেছিল। সম্রাটের বিলাসিতা ও জাঁকজমকশীলতা রক্ষা করার জন্য যে কর আদায় হত তা প্রজাদের উৎপাদনী শক্তির তুলনায় দুর্বহ হয়েছিল। ইংল্যাণ্ড আমেরিকা ও ফ্রান্সের প্রজারা রাজার পররাষ্ট্রনীতির প্রতিবাদ করেনি। এই নীতি যে তাদের দুর্দশার মূল কারণ তা বোঝার মতো বুদ্ধি তাদের ছিল না। ইংল্যাণ্ডের প্রজাদের মতো ফ্রান্সের প্রজাদের অত্যধিক কর বহন করার শক্তি ছিল না। অভিজাত ও পুরোহিতগণ নানা বিষয়ের কর থেকে অব্যাহতি পেয়েছিল। এজন্য ফ্রান্সের অভিজাতগণ রাজার পক্ষ অবলম্বন করেছিল। ইংল্যাণ্ডের অভিজাত ও সাধারণ প্রজার স্বার্থ সমান ছিল। এজন্য তারা উভয়েই রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ধীরে ধীরে ফ্রান্সের রাজনৈতিক আকাশ ঘোর মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসেছিল। ইহা কেহ লক্ষ্য করেনি। এমন কি আমেরিকার স্বাধীনতা-যুদ্ধের সময় ফরাসি বিপ্লবের কোন আভাষ পাওয়া যায়নি। উদার মতবাদের অভাব ছিল না কিন্তু সবহারাদের কাতর ক্রন্দনের দুর্বার ফল্গুধারা যে অতর্কিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে বিধি-নিষেধ শৃঙ্খলাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তাদের উষ্ণনিশ্বাস যে ফরাসি দেশকে একটি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

ফরাসি বৈপ্লবিক সাহিত্য। কোন যুগের সাহিত্য সে যুগের জাতীয় মানসের মুকুরস্বরূপ। জাতিসাধারণের চিন্তা ভাব আশা ও আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যিকের স্বচ্ছ হৃদয়-দর্পণে প্রতিফলিত হয়। কবি ও সাহিত্যিক জাতীয় ভাবধারার ঘনীভূত আধার। কোন জাতির ইতিহাস দর্শন ও বিজ্ঞান না থাকতে পারে কিন্তু যদি তার সাহিত্য থাকে তাহলে তার সকলই আছে।

এই যুগের ফরাসি সাহিত্যে জাতির মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। মণ্টেস্কুর (১৬৮৯—১৭৫৫) সত্যসন্ধানী দৃষ্টি ফ্রান্সের তদানীন্তন সামাজিক রাজনৈতিক

ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির নীতি বিশ্লেষণ করেছিল, তাদের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা ও শৈথিল্যের উপর আলোকপাত করেছিল। সমাজকে পুনর্গঠন করার সজ্ঞান প্রচেষ্টা দার্শনিকপ্রবর লকের প্রধান কীর্তি। মণ্টেস্কু ছিলেন তাঁর আলাময় মূর্তি। সে যুগের চিন্তাধারা ও বিচারবৃত্তি 'এন্‌সাইক্লোপিডিষ্ট'—বিশ্বকোষ সম্পাদক নামক একদল প্রতিভাশালী লেখক ও সমালোচকের রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। মনস্বী ডিড্‌রোট্ এঁদের অগ্রণী ছিলেন। অন্যায়ের প্রতি ঘৃণা, দাসব্যবসায়ের নিন্দা, করস্থাপন নীতির অসামঞ্জস্য, বিচারকার্যে উৎকোচ-গ্রহণ, যুদ্ধের ব্যয়-বাহুল্য, নূতন সমাজ সংগঠনের পরিকল্পনা, শিল্পোন্নতির উপায় ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা মত প্রকাশ করেছিলেন। ধর্ম ও অতীন্দ্রিয় সত্তায় অবিশ্বাস তাঁদের পররাষ্ট্র পরিকল্পনায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে মানুষের ন্যায়বুদ্ধি সহজ ও অকৃত্রিম, তার রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা স্বাভাবিক। তাঁদের তার্কিক মন ধারণা করতে পারেনি যে একমাত্র অধ্যাত্ম সাধনা ও উপযুক্ত শিক্ষা-ব্যবস্থা মানুষকে ঐশ্বর্যশালী করে তোলে, মানুষের সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তা সমাজ-সেবায় নিঃস্বার্থ আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করে।

ধনোৎপাদন ও বণ্টন সম্বন্ধে এই যুগের অর্থনীতিজ্ঞদের মত অবজ্ঞার বস্তু নয়। কোড্‌ ডি লা নেচারের লেখক ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিন্দা করেছিলেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে সোস্যালিজমের প্রবর্তক।

এই যুগের চিন্তাশীল লেখকদের অন্যতম ছিলেন রুসো (১৭১২—১৭৭৮)। তাঁর চিন্তাধারা বুদ্ধি ও হৃদয়, বিচার ও ভাবুকতার গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমস্থল। তাঁর মতে সুপ্রাচীন কালে মানুষ স্বভাবতঃ ধার্মিক ও সুখী ছিল। ক্রমে রাজা পুরোহিত প্রভৃতির আবির্ভাব হয়। এরাই সহজ মানুষের নিত্যকালের ধর্মভাব নষ্ট করে তার অধঃপতনের পথ খুলে দিয়েছিল। ভল্টেয়ার ছিলেন ফরাসি বিপ্লববাদের দার্শনিক, রুসো ছিলেন এই বিপ্লবযজ্ঞের পুরোহিত।

রুসো কেবলমাত্র বর্তমান সমাজ উচ্ছেদ করে ক্ষান্ত হননি। তাঁর মত সমাজমাত্রেরই বিরোধী। আদিম মানুষ স্বাধীন ছিল। কেহ দাস ছিল না, কেহ প্রভু ছিল না। কালক্রমে তারা একমত হয়ে তাদের ভিতর শ্রেষ্ঠ ও গুণবান ব্যক্তির সহিত চুক্তি করে, স্বইচ্ছায় নিজেদের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে তার কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং তাকে রক্ষক নিযুক্ত করে। রাজা রাষ্ট্রিক শক্তির আধার নন, পরিচালক মাত্র। রাষ্ট্রিক শক্তির আধার জনসাধারণ। শাসক জনসাধারণের প্রভু নয়, ভৃত্য মাত্র। যখন কেহ প্রভুত্ব হস্তগত করে

তখন তার উচ্ছেদ করা চাই। এই মতবাদ গণতন্ত্রের ভিত্তি। ফরাসি বিপ্লবের ঐতিহাসিক ঘটনা বর্তমান যুগের গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থার সূচনা করেছিল। রাজার প্রভুত্বের উপর আক্রমণ শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল না, অর্থনীতিক্ষেত্রেও তাহা প্রযুক্ত হয়েছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি-শিল্পের উপর ইয়োরোপের রাজারা হস্তক্ষেপ করতে ছাড়ত না। দারুণ দুর্ভিক্ষের প্রকোপে ফ্রান্সের জনসাধারণ যখন নিঃস্ব, তখনও লুই রাজাদের বিলাস-ব্যসনের ব্যয় নির্বাহের জন্য কর আদায় চলেছিল। এইরূপ অত্যাচার রুসোর অগ্নিময়ী লেখনীর উপাদান জুগিয়েছিল।

রুসোর মতবাদ মনোজ্ঞ, কবি মানসের অনুভূতিরসে অভিষিক্ত কিন্তু তা বস্তুতন্ত্রহীন এবং তত্ত্বাংশে বিচারসহ নয়। তাঁর মতবাদ সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং অতিরঞ্জিত। প্রথমতঃ, সার্বজনীন ইচ্ছার উপর বুদ্ধিমান নেতার নির্বাচন ও তাঁহার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধতা নির্ভ করে। রক্ষকের আবশ্যকতা স্বাভাবিক কিন্তু ইচ্ছার ভিন্নতা অনিবার্য। দ্বিতীয়তঃ, সাম্য চিরন্তন ও অবিসংবাদী নয়। বৈষম্যই সৃষ্টি। মানবিক বৈশিষ্ট্য প্রকৃতিগত, বিভেদ ও তারতম্যের উপর সাম্য স্থাপনের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

সাম্যবাদ প্রজাতন্ত্রবাদ স্বভাববাদ প্রভৃতি মতবাদের আলোচনা ও বিশ্লেষণ-সত্ত্বেও সমাজ ও রাষ্ট্রের মূলনীতি অব্যাহত ছিল। ফ্রান্সের সম্রাট পূর্বের মতো বিলাসের উপকরণ এবং নারীর রূপের মধ্যে বিভোর হয়ে থাকলেন। তাঁর পারিষদবর্গ ও অভিজাতগণ আরাম-কেদারায় বসে সুখ ও ইন্দ্রিয়-সেবায় সময় কাটাতে লাগলেন। অর্থসচিবরা ঋণ করে রিক্ত রাজকোষ পূর্ণ করার কৌশল উদ্ভাবন করতে লাগলেন। এদিকে দেশের লোক করভারে ও অত্যাচারে পীড়িত হতে লাগল। রুশোর ভাবধারার অগ্নিসুরা পান করে যে নূতন ফরাসিজাতি সৃষ্টি হয়েছিল তার মুক্ত প্রাণের স্বচ্ছন্দগতি কালবৈশাখীর ঝড়ের মতো ফরাসি বিপ্লবের প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে দেখা দিল।

তখন ১৬শ লুই ফ্রান্সের সম্রাট। তিনি নির্বোধ ও অল্পশিক্ষিত ছিলেন। অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের ভগ্নী মেরি অ্যাণ্টইনেটকে তিনি বিবাহ করেন। তখন রাজকোষ শূন্য। দেশে অসন্তোষ-বহ্নি ধূমায়িত। রাণী মন্ত্রীদের ব্যয়সংকোচের ব্যবস্থাকে ব্যর্থ করে দিলেন। অর্থসচিব ক্যালোন ঋণের পর ঋণ করতে লাগলেন। তিনি সম্পত্তির উপর কর স্থাপন করতে মনস্থ করলেন। ষ্টেট্স্ জেনেরেল মহাসভা আপত্তি জানালেন। সম্রাট সভাগৃহ বন্ধ করে দিলেন।

একটা ময়দানে সভার কাজ চলতে লাগল। সৈন্যদল সম্রাটের আদেশ অগ্রাহ্য করল। বিদেশ থেকে সৈন্য আমদানী হল। প্যারিস বিদ্রোহ করল। প্যারিসে এবং অন্যান্য নগরে অস্থায়ী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। সম্রাটের সৈন্যকে বাধা দিবার জন্য ন্যাশন্যাল গার্ড নামে নূতন সৈন্যবাহিনী গঠিত হল।

১৭৮৯ সালের জুলাই মাসের বিদ্রোহ ফরাসি বিপ্লবের ভূমিকা। প্যারিসের উত্তেজিত জনমণ্ডলী ব্যাষ্টিল নামক কারাগৃহ ধ্বংস করল। বিপ্লবের আগুন সমগ্র ফ্রান্সে বিস্তৃত হল। পূর্ব ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকগণ অভিজাতদের প্রাসাদ ধ্বংস করল। বহু লোক নিহত হল। অভিজাত এবং সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকগণ বিদেশে পলায়ন করল। জাতীয় পরিষদ শাসন-প্রতিষ্ঠান হস্তগত করে নিল। ফ্রান্সকে আক্রমণ করার জন্য আত্রাই-এর কাউণ্ট প্রভৃতি নির্বাসিত ব্যক্তিগণ অষ্ট্রিয়া এবং প্রুশিয়াকে উৎসাহিত করেছিল। জাতীয় পরিষদের আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতির শৃঙ্খলা ছিল না। সকল বিষয়ে ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল।

জাতীয় পরিষদে বিভিন্ন মতের ঘাত-প্রতিঘাতে কয়েকটি দল সৃষ্টি হল। দক্ষিণপন্থীরা প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতিবিরোধী ছিল। নরম দলের নেতারা নেকারের আজ্ঞাধীন ছিল। ইংল্যাণ্ডের শাসনতন্ত্র এদের আদর্শ ছিল। জাতীয় পরিষদ আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রের অনুরূপ পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে 'মানুষের দাবী' নামে ঘোষণাপত্র প্রচার করল।

১৭৮৯ সাল থেকে ১৭৯১ সাল পর্যন্ত রাজা নির্বিবাদে টুইলারিস্ প্রাসাদে বাস করতে লাগলেন। এই দুই বৎসর প্রথম বিপ্লবের যুগ। ফ্রান্সে পার্লামেণ্টারী শাসনতন্ত্রমূলক রিপাব্লিক প্রতিষ্ঠা হল। জাতীয় পরিষদ সমগ্র দেশ শাসন করতে লাগল। কিছু কালের জন্য শান্তি প্রতিষ্ঠিত হল। অভিজ্ঞতার অভাব, অবস্থা বিপর্যয় এবং সমস্যার জটিলতা সত্ত্বেও অল্প সময়ের ভিতর তারা যে উন্নতি করেছিল তা অবজ্ঞার বস্তু ছিল না।

শারীরিক শাস্তি, বিনা বিচারে আটক, ধর্মমতের জন্য পীড়ন প্রভৃতি বিষয়ে ফৌজদারী আইনের ধারাগুলি বাতিল করা হল। সামরিক বিভাগে প্রবেশের পথ সকলের জন্য উন্মুক্ত হল। নূতন ভাবে নূতন আদালত সৃষ্টি হল। জনসাধারণের ভোটে বিচারকদের নির্বাচন হত। গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হল। সরকারী তহবিল থেকে পুরোহিতদের বেতন দিবার এবং নির্বাচন দ্বারা তাদের নিযুক্ত করার ব্যবস্থা হল। শাসন বিভাগ এবং ব্যবস্থাপক বিভাগ পৃথক

করে দেওয়া হল। ব্রিটিশ শাসন পদ্ধতির দোষত্রুটি পরিবর্জন বা সংশোধন করে এবং ব্যাপকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত করে ফ্রান্সের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করা মিরাবোর উদ্দেশ্য ছিল। তাঁর মৃত্যুর সহিত রাজার সঙ্গে জাতীয় পরিষদের সহযোগিতার শেষ আশা ও সুযোগ অন্তর্হিত হল।

রাজার অনুগত পার্শ্বচরগণ মিরাবোর পরিকল্পনায় সন্তুষ্ট হয়নি। দেশের মঙ্গল তাদের লক্ষ্যের বিষয় ছিল না। জাতীয় পরিষদকে অচল করে তুলতে তারা চেষ্টা করেছিল। ১৭৯১ সালের ২০শে জুন তারিখের অন্ধকার রাত্রে রাজা সপরিবারে পলায়ন করলেন এবং অপেক্ষমান সৈন্যদলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার পূর্বে তিনি ধরা পড়লেন। তাঁকে প্যারিসে কড়া পাহারায় রাখা হল। রাজার পলায়ন লোকের মনে অবিশ্বাস সৃষ্টি করল। জেকোবিন ও অর্লিয়েনিষ্ট-দল খাঁটী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্য ঘোষণা করল। রোবস্পীয়র, ডাণ্টন, ম্যারাট প্রভৃতি বামপন্থীগণ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠলেন।

জেকোবিন দল। জেকোবিন দল এই সময়ের ফ্রান্সে স্বাধীন চিন্তার অগ্রদূত ছিল। ফ্রান্সের জনমনে বিপ্লবের যে ধারণা স্থান পেয়েছিল তা এই স্বার্থহীন স্বদেশ-প্রেমিক তরুণদলের অন্তরে পরিমূর্ত হয়ে উঠে। লাফেইট ও মিরাবো প্রচলিত শাসনবিধির সমর্থক ছিলেন। রোবস্পীয়র রুশোর আদর্শকে জাতীয় জীবনবেদের উদ্গীথ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। বৈপ্লবিক যুগে ফ্রান্সের রাজনৈতিক আকাশে ম্যারাট ছিলেন একটী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। বিপ্লবের প্রেরণায় তাঁর লেখনী শক্তিশালী হয়েছিল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ সম্পদে তাঁর মন ঐশ্বর্যশালী হয়েছিল।

জেকোবিন দলের নেতাগণ উগ্র আদর্শবাদী ছিলেন। তাঁদের মতে বিপ্লব অভিব্যক্তির আধুনিকতম স্তর। স্বাধীনতা ও সাম্যের একনিষ্ঠ সাধনা তাঁদের জীবনের মূলমন্ত্র ছিল।

রুশোর দার্শনিক মতবাদের প্রেরণার আতিশয্যে তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে মানুষের স্বভাবের মধ্যে বর্বরতা প্রচ্ছন্ন আছে, পৃথিবীতে পাশবিক প্রভুত্ব মানবতার আদর্শকে নিত্য অপমান করছে। তাঁরা বিস্মৃত হয়েছিলেন যে পৈশাচিক নিষ্ঠুরতার কবল থেকে মানুষকে উদ্ধার করতে হলে আইনের উদ্ধত মহিমাকে খর্ব করতে হয়, মানুষের মনে আত্মমর্যাদার জ্ঞান জাগ্রত করে তুলতে হয়, ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করে সামাজিক পরিস্থিতির উন্নয়ন করতে হয়,

উদারতা মৈত্রী ও ভালোবাসার মন্ত্রে মানুষকে দীক্ষিত করতে হয়। ইহাই পৃথিবীতে মানুষের সুখ ও স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্ট পন্থা।

১৭৯১ সালে প্রুশিয়ার রাজা ও অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ঘোষণা করলেন যে ফ্রান্সের শৃঙ্খলা ও রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার উপর সমগ্র ইয়োরোপের রাজতন্ত্রের নিরাপত্তা নির্ভর করছে। ফ্রান্সের দেশত্যাগী অভিজাত এবং রাজকর্মচারিগণ মিলিত হয়ে সৈন্যবাহিনী গঠন করল এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি সংগ্রহ করে সীমান্তের উপকণ্ঠে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল। যুদ্ধ আরম্ভ হল। ফ্রান্সের সৈন্যদল পরাজিত হল। রাজার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করার প্রচেষ্টা আরও চলতে থাকলে পরিষদ এবং প্যারিসকে রীতিমত শাস্তি দেওয়া হবে, ডিউক অব্ ব্রুনস্ উইকের এই দাম্ভিক উক্তি, এমন কি রাজতন্ত্রের উপাসকগণকেও উগ্র বামপন্থী করে তুলল।

ফরাসি বিপ্লবের দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু হল। জেকোবিনগণ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করল। রাজা পদচ্যুত ও বন্দী হলেন। দেশদ্রোহীদের শাস্তি দিবার জন্য ধরপাকড় চলতে লাগল। বন্দীদের নির্দয়ভাবে হত্যা করা হল। প্যারিসে নরমেদ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল। রাজার পৃষ্ঠপোষক ও গণতন্ত্রের শত্রুদের নির্মূল করতে হবে, এই উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের তরুণগণ জাতীয় সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি করল। মাতৃভূমির কান্তমধুর রূপকল্পনার সহিত তাঁর ভীম-ভৈরবী মূর্তি একজন যুবকের মনে স্থান লাভ করে 'মার্শেলস্' সঙ্গীতে মন্দ্রিত হয়ে উঠল। এই সঙ্গীত ফ্রান্সের জাতীয় সঙ্গীতরূপে এতাবৎ গীত হয়ে আসছে। এর মূর্চ্ছনায় স্বদেশ প্রেমের মদিরা ক্ষরিত হয়, জাতির মনে অপরূপ অনুভূতি ও উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।

রাজার ফাঁসি হওয়ার পর ফরাসি গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধিকে ইংল্যাণ্ড থেকে বিদায় করে দেওয়া হল। ফরাসি গবর্ণমেন্ট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ফলে ফরাসি বিপ্লবের প্রতি ইংল্যাণ্ডের উদার মনোভাব নষ্ট হয়ে গেল। কয়েক বৎসরের মধ্যে ফ্রান্স ইয়োরোপের সমবেত শক্তিপুঞ্জের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগল।

বিভীষিকার রাজত্ব। রোবস্পীয়র জেকোবিন দলের নেতা হলেন। শত শত লোক গিলোটিন যন্ত্রে প্রাণ আহুতি দিল। রোবস্পীয়র নৃশংস হত্যা অবাধে চালাতে লাগলেন। প্যারিসের মাটি নরশোণিতে সিক্ত হয়ে গেল। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, রক্তনিষিক্ত পথেই ফ্রান্সের মুক্তি ও পৃথিবীতে মানবতার স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। বারো জন সদস্য নিয়ে একটি ক্ষুদ্র

শাসন পরিষদ গঠিত হল। দেশের সমস্ত জমি সমানভাবে সকলের মধ্যে ভাগ করে দিবার ব্যবস্থা হল। ধনীদের উপর বেশী কর চাপান হল। তাদের সম্পত্তি দরিদ্রদের মধ্যে বণ্টন করা হল। জেকোবিন গভর্ণমেণ্ট সামাজিক সংস্কারে মন দিয়েছিল। বিবাহ ও বিবাহ-ভঙ্গের ব্যবস্থা করা হল। মাসের নূতন নাম দেওয়া হল। জটিল ধরণের ওজন ও মাপের পরিবর্তে দশমিকের ব্যবহার প্রচলিত করা হল।

ফ্রান্সের লুই রাজারা এবং তাঁহাদের পার্শ্বচর অভিজাতদের কার্যাবলী ফরাসি বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। প্রিন্স, ডিউক, কাউণ্ট প্রভৃতি উপাধিধারীগণ রাজার চতুর্দিকে গ্রহ-উপগ্রহের মত বিচরণ করতেন। ভল্টেয়ার-প্রমুখ লেখকদের প্রচারের ফলে সাধারণ প্রজার মনে বৈপ্লবিক চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হয়েছিল। ইয়োরোপে, ভারতবর্ষ ও আমেরিকার যুদ্ধে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্সকে পরাজিত করেছিল। যুদ্ধ ও আড়ম্বরের ব্যয় বাহুল্যে রাজকোষ শূন্য হয়েছিল। সাধারণ লোকের দুর্দশার সীমা ছিল না। দেশব্যাপী বিপ্লবের আগুনে পুরাতন প্রতিষ্ঠান সকল পুড়ে ছাই হয়ে গেল। প্রথমে ইংল্যাণ্ডের শাসন-ব্যবস্থা লোকের মন আকৃষ্ট করেছিল, কিন্তু উগ্র-বামপন্থীগণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল। সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে ফরাসি জাতি উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। হত্যা ও উচ্ছৃঙ্খলতা সত্ত্বেও তারা যে আদর্শ অনুসরণ করেছিল তাহা বিশ্বমানবের পরম সম্পদরূপে গৃহীত হল।

১৭৯৮ সালের পর ফ্রান্সের প্রজাতন্ত্রের ইতিহাস

ডাইরেক্টরী। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল শাসন কার্যে প্রভুত্ব লাভের জন্য পরস্পর বিবাদ ও চেষ্টা করতে থাকলেও, শাসন বিষয়ে সুনির্দিষ্ট পন্থা নির্ধারণ করার চেষ্টা হয়েছিল। পর পর কয়েকটি বিদ্রোহ হয়েছিল। প্যারিসের গুণ্ডাদল বিদ্রোহের সুবিধা নিয়ে পক্ষাপক্ষ বিচার না করে লুটপাট আরম্ভ করে দিত। শাসন কার্যে সুবিধার জন্য পাঁচজন সদস্য নিয়ে ডাইরেক্টরী স্থাপিত হল। তরুণ সেনাপতি নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ১৭৯৫ সালের বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। ডাইরেক্টরীর আমলে বিদেশে বিজয়ী ফ্রান্স স্বদেশে গঠনমূলক কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করেনি। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ নিজেদের স্বার্থক্ষুধা মেটাতে ব্যস্ত ছিল। অর্থনৈতিক সুব্যবস্থা করতে হলে যে সাধুতা ও চরিত্রবল প্রয়োজন তা তাদের ছিল না। তাদের ভিতর কারনট্

সাধুপ্রকৃতির লোক ছিলেন কিন্তু শয়তানি বুদ্ধিতে বারাস অন্য সকলকে অতিক্রম করেছিলেন।

সকল স্থানেই রাজতন্ত্রের সমাধির উপর প্রজাতন্ত্রের মন্দির গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আদর্শ প্রচারের সাধু উদ্দেশ্য এবং পুরাতন সমাজ ব্যবস্থাকে ভেঙ্গে নূতন করে গড়ে তোলার উচ্চ মনোবৃত্তি ফ্রান্সের শোচনীয় অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন করার হীন প্রচেষ্টায় পর্যবসিত হল। স্বাধীনতা ও আদর্শবাদের উপাসক-গণ দস্যুর ন্যায় বিজিত দেশের ধনরত্ন লুণ্ঠন করে স্বদেশের শূন্য কোষাগার পূর্ণ করতে লাগল। জগতে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা স্থাপনের জন্য ধর্মযুদ্ধ পরস্বাপহরণ ও পরধনলোলুপতার নীচ নীতি চরিতার্থতার সর্বগ্রাসী কার্যে পরিণত হল।

ফরাসি বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ

যখন সামাজিক ও রাষ্ট্রিক বিপ্লবের ফলে দুঃখী "সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট" করে দেখতে পায় তখনই সেই বিপ্লব সার্থক হয়। ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। যেখানে ভেদ নাই সেখানে "দৈন্যের কুশ্রীতা নাই, আছে অকিঞ্চনতা"। ব্যষ্টি-সম্পত্তির এই রূপ ও তার ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই ধারণা, একদিনেই মানুষের চোখে ধরা পড়েনি। আঠারো শতকে ফ্রান্সের লুই রাজারা দেশে দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও নিজেদের ভোগ-বিলাসের জন্য দরিদ্র প্রজাদের অর্থ শোষণ করছিলেন এবং অবসরভোগী অভিজাতদের অত্যাচারী প্রকৃতি নগ্ন মূর্তিতে দেখা দিয়েছিল। ব্যষ্টি-সম্পত্তি রক্ষা করার প্রবৃত্তিতেই ফরাসি বিপ্লবের প্রেরণা। যখন জাতিসাধারণের সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশের আপনার বলতে সূচাগ্র-মেদিনী ছিল না, যখন তাদের জঠরজ্বালা নিবারণের কিছুমাত্র উপায় ছিল না, তখন সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শবাদ শূন্যগর্ভ বাক্‌চাতুরী মাত্র।

স্বাধীনতা ও সাম্য আদর্শের পূজারী জেকোবিন বিপ্লবীগণ সাম্য স্থাপনের জন্য দেশের সমস্ত সম্পত্তিকে সমানভাবে ভাগ করে দিতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল, এই সহজ উপায়ে ধনী ও দরিদ্রের প্রভেদ ঘুচে যাবে। দেশের ধন এত বেশী ছিল না, যে তাকে সমানভাবে বণ্টন করে দিলে তাতে দেশের সকল লোকের অন্নের সংস্থান হতে পারে।

সম্পত্তির জটিলতা সম্বন্ধে তাদের মন সচেতন ছিল না। দেশের সমস্ত সম্পত্তির রাষ্ট্রীকরণ সম্ভব কি-না, কোন্ বস্তু সাধারণের অধিকারভুক্ত, কোন্ বস্তু সমষ্টির সম্পত্তি, ব্যষ্টি ও সমষ্টির সম্পত্তির মধ্যে কোন বিভাগ থাকবে কি-না এই সকল বিষয়ে, অষ্টাদশ শতকে তো দূরের কথা, এখনও মতের ঐক্য স্থাপিত হয়নি। জমি, মূলধন, যন্ত্রপাতি, খনিজ পদার্থ, শক্তির উৎস, যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রভৃতি ধনসৃষ্টির সকল উপাদান ও উপায় সাধারণের সম্পত্তি হতে পারে। কিন্তু দেহ শিল্পীর যন্ত্র গৃহ সাজসজ্জা পোষাক ইত্যাদি নিজস্ব ব্যক্তিগত বস্তুতে ব্যক্তি বিশেষের অধিকার অস্বীকার করা সম্ভব বা উচিত কিনা, তা বিচার সাপেক্ষ। শ্রেণী বৈষম্য ও উত্তরাধিকার প্রথার উচ্ছেদ না হলে ধনসাম্য স্থাপন হতে পারে না। দারিদ্র্যের মূল উৎপাটন করতে হলে সমাজের ধনিক ও শ্রমিক বিভাগ লোপ করে দিতে হবে। ব্যক্তি বিশেষের সম্পত্তিগত অধিকার এবং লাভের জন্য ইচ্ছামত ধন উৎপাদনের ব্যবস্থা রহিত হওয়া চাই। আজিকার রাষ্ট্রজীবনে অশান্তির প্রধান কারণ শ্রেণীর সহিত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব। জাতির সংগে জাতির সংঘর্ষ এই দ্বন্দ্বেরই বাহ্য প্রতিক্রিয়া।

ফরাসি বিপ্লবের পর যে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তাতে সম্পত্তির স্বরূপ নির্ণয় করে নূতনভাবে সমাজ-সংগঠন করার মতো বুদ্ধি ক্ষমতা ও অন্তর্দৃষ্টি সে সময়ের লোকের ছিল না। সুতরাং এই অবস্থায় সমাজ গঠনের আদর্শ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব ও মতের অনৈক্য স্বাভাবিক।

মুদ্রা বিষয়েও তাদের ধারণা স্পষ্ট ছিল না। সমাজ জীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সহিত দ্রব্য বিনিময়ের অসুবিধা দূর করার জন্য মুদ্রা প্রচলন সম্ভব ও আবশ্যক হয়েছিল। সমাজের দৈনন্দিন জীবনে মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। মুদ্রা প্রচলনের সহিত দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। মুদ্রাই লাভ ও লোভ নিবৃত্তির উপায় হয়ে উঠল। মুদ্রা দ্রব্যমূল্যের বাহ্যরূপ। যে বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম পরিবর্তিত হয় না, যাকে সহজে ও ইচ্ছানুসারে ভাগ করা চলে এবং যার বিভক্ত অংশগুলি একত্র করলে তার স্বাভাবিক গুণের কোন ব্যতিক্রম হয় না, এইরূপ বস্তুই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হতে পারে। সোনা ও রূপার এই সকল স্বাভাবিক গুণ বা ধর্ম আছে। এজন্য সোনা বা রূপ মুদ্রার আকারে ব্যবহার যোগ্য। টাকার ক্রয়-শক্তিতে লোকের বিশ্বাস জন্মিলে রাজা খাঁটি সোনা-রূপার সঙ্গে খাদ মিশিয়ে মুদ্রা চালান। কাগজের টাকা

চালাতে গেলে উপযুক্ত পরিমাণ সোনা বা রূপা মজুত রাখাই সাধারণ নিয়ম।

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ফরাসি গণতন্ত্র প্রথম থেকেই অর্থাভাবের নাগপাশে আবদ্ধ হয়েছিল। উভয়েই টাকা ধার করতে লাগল এবং হুবহু নোট চালাতে লাগল। কাগজের টাকার পরিমাণ গচ্ছিত সোনা ও রূপার চেয়ে বেশী হওয়ায় গবর্ণমেণ্টের ঋণ পরিশোধ করার ক্ষমতায় লোক আস্থাহীন হল। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা সোনা সঞ্চয় করতে লাগল কিম্বা তা আমদানী দ্রব্যের মূল্য-স্বরূপ বিদেশে রপ্তানি হয়ে গেল। লোকের হাতে নগদ টাকার পরিবর্তে নানা রকমের নোট কাগজ প্রভৃতি ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

মুদ্রা প্রচলন নীতির মত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক স্থাপনের উপায় সম্বন্ধে বিপ্লবীদের ধারণা সুস্পষ্ট ছিল না। অর্থনৈতিক অবস্থা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির অনিশ্চয়তায় তারা বিভ্রান্ত হয়েছিল। রাষ্ট্র পরিচালনা সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞতা ছিল না। অতীতের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে নূতনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা কঠিন। পুরাতন ভিত্তির উপর নির্মাণ করা অপেক্ষাকৃত সহজ। যারা অতীতের যোগসূত্র ছিন্ন করে নূতন পরিস্থিতি সৃজন করে তাদের পক্ষে স্থায়ী কল্যাণকর ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ নয়। যে সকল সমস্যা তাদের বিভ্রান্ত করেছিল তাদের ভিতর সম্পত্তি, অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রধান ছিল। অনাদিকাল থেকে মানুষ এই সমস্যাত্রয়ের সমাধান করতে চেষ্টা করে এসেছে কিন্তু এদের জটিলতা তার চেষ্টাকে নিয়ত প্রতিহত করেছে। কী ভাবে এরা তার জীবনকে সহজ-সুন্দর ও উপভোগ্য করে তুলতে পারে, চিন্তাজগতে ইহাই নবযুগের সাধনার বিষয়।

ডাইরেক্টরীর আমলে বিজয়ী ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় হয়েছিল। খাদ্য ক্ষুধাতুর ব্যক্তির লোভ উদ্রেক করে। তখন সে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়। তেমনি বিজিত দেশগুলির অর্থ লুণ্ঠন করে ফ্রান্স নিজের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি করার সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা বোধ করেনি।

মানুষের চিত্তনদীর দুইটি শাখা—একটি শাখা কল্যাণের দিকে, অপরটি পাপের দিকে ছুটে চলে। ফ্রান্সের জাতীয় চরিত্রে এই বিপরীতধর্মী দ্বিত্বভাব পরিস্ফুট হয়েছিল। ফ্রান্সই প্রথমে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের আদর্শকে অস্পষ্টতার

কুজ্ঝাটিকা থেকে মুক্ত করে সর্বসাধারণের কল্যাণের দিকে পরিচালিত ও প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিল। আদর্শের নবোদিত সূর্য উজ্জ্বল কিরণসম্পাতে তার জাতীয় মানসের দিগন্ত আলোকিত করেছিল। তার মনের মন্দিরে ভাবী মনুষ্য সমাজের জ্যোতির্ময় মূর্তি প্রথমে দেখা দিয়েছিল। তাই বিজিত দেশে সে আবির্ভূত হয়েছিল মুক্তির আলোক-দূত হয়ে গণতন্ত্রের পুরোহিতরূপে সাম্যের বার্তা বহন করে। তার আনন্দ প্রাচুর্য জীবন বেগ ইয়োরোপের মানুষের মনে মনুষ্যত্বের মর্যাদাবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। হল্যাণ্ড, জেনোয়া, উত্তর ইটালি, সুইজাবল্যাণ্ড, রোম, নেপলস্ প্রভৃতি স্থানে গণতান্ত্রিক আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হল। এই অগণিত গণতান্ত্রিক জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যবর্তী ফ্রান্স পূর্ণযৌবনা মুক্তির অনবদ্য-রূপের আলোকচ্ছটায় শোভা পেয়েছিল। ইহাই ছিল ছবির এক দিক। ছবির অন্যদিকে ফরাসি রাষ্ট্র ও ফ্রান্সের দরিদ্র জনসাধারণের অর্থপিপাসু, পৈশাচিক মূর্তির লেলিহান জিহ্বার উৎকট রূপ দেখা দিয়েছিল। একদিকে মহান আদর্শের অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ, অপরদিকে মুক্ত জাতি সকলের অবারিত শোষণের অন্ধকার কূপ, এই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তিদ্বয়ের সংঘাত তার জাতীয় জীবনে আলো-আঁধারের দ্বন্দ্বের বিচিত্ররূপ সৃষ্টি করেছিল।

জাতীয় মহাসভা আহ্বানের দশ বৎসরের মধ্যেই বিপ্লবের অগ্নিতে পরিশুদ্ধ নবগঠিত ফ্রান্সের জাতীয় জীবনস্রোত তার সেই পুরাতন পঙ্কিল খাতে প্রবাহিত হল। পুরাতন যুগের ধনীর স্থানে নতুন ধনী, পুরাতন কৃষক সম্প্রদায়ের স্থানে অধিকতর করবাহী কৃষক সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হল। পুরাতনের জীর্ণ পরিচ্ছদে আবৃত নূতন পররাষ্ট্র নীতি, পুরাতন যুগের ধন বৈষম্য, আভিজাত্য গৌরব, কঠোর দারিদ্র্য নূতন-সাজে নূতনরূপে আত্মপ্রকাশ করল। সাম্য-স্বাধীনতার স্বর্গরাজ্য দিবাস্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হল। যে নূতন রাষ্ট্র সর্বহারাদের আশ্রয়, স্বাধীনতার দুর্গ, সাম্যের লীলা নিকেতন হওয়ার স্পর্ধা করেছিল, তাও নিয়তির বিধানে উপকথায় পর্যবসিত হল।

বিশ্বসভ্যতায় ফরাসি বিপ্লবের দান

অনেকে মনে করেন, ফরাসি-বিপ্লব ইতিহাসে একটি শোচনীয় ও মারাত্মক ব্যাপার। কোন ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন। এজন্য ঘটনা পরম্পরার জটিলতা ভেদ করে ঐতিহাসিক একটা সাধারণ নিয়ম বা সূত্র

আবিষ্কার করেন। এক একটি যুগের একটি ধারা আছে। এর নাম যুগধর্ম। যুগধর্ম বিশ্বসভ্যতার গতি নির্ণয় করে। ইতিহাস দ্বন্দ্বের কাহিনী। বিবিধ ঘটনার স্রোতের ভিতর দিয়ে যুগধর্ম আত্মবিকাশ করে। প্রত্যেক মানুষের চিত্তে যুগধর্ম অল্প-বিস্তর প্রকাশ পায়। যে কোন যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষীগণ কেবলমাত্র যুগধর্মী নন, যুগধর্মকে অতিক্রম করেই তাঁদের মহত্ত্ব।

বিশৃঙ্খলতা এবং আকস্মিকতা পৃথিবীকে শাসন করে না। আপাত প্রতীয়মান বিশৃঙ্খলতার মধ্যে শৃঙ্খলা বর্তমান থাকে। ঐতিহাসিকের চোখে একটি ঘটনা অপর একটি ঘটনার সঙ্গে বাঁধা। অতীত, বর্তমানের ভিতর জীবিত, বর্তমান ভবিষ্যতের আলো। ফরাসি বিপ্লব একটি আকস্মিক ঘটনা নয়। এতে কার্য-কারণের সম্বন্ধ আছে। আঠারো শতকে উদার মতবাদ প্রচারের প্রভাবে ইয়োরোপের বহু যুগ-সঞ্চিত রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বাধা সম্বন্ধে সচেতনতা আসে। এরই ফলে মানুষের মনে মুক্তি ও স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা বলবতী হয়। আমেরিকার উপনিবেশগুলি, গ্রীস, বেলজিয়ম, ইটালী, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রাজ্যগুলি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ফেলে এবং ইয়োরোপের প্রায় সর্বত্র গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ফরাসি বিপ্লবের সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শ বাস্তবের ভিতর রূপ গ্রহণ করতে পারেনি সত্য, কিন্তু—ইহা বিশ্বের অসংখ্য মানুষের মনে স্থায়ী আসন গ্রহণ করেছিল।

ইংল্যাণ্ডের চিন্তারাজ্যে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব

যে উদার মতবাদ কিছুকাল ইয়োরোপের জন-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা ১৭৮৯ সালে ঘনীভূত হয়ে ফরাসী বিপ্লবের আকার ধারণ করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ দান রক্তরঞ্জিত তরবারি নয়, তার শ্রেষ্ঠ দান নূতন ভাব-সম্পদ। এর অগ্নিকেন্দ্র থেকে অশান্তি ও অনিশ্চয়তার তীক্ষ্ণ অস্ত্র উৎসারিত হলেও, এর চোখ ঝলসান বিদ্যুদালোকে সমাজ ও মনুষ্য ধর্মের মসীলিপ্ত আলেখ্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম আকস্মিক হলেও এর পশ্চাতে বহুযুগ-সঞ্চিত শক্তির অন্তর্লীলা বর্তমান থাকে।

ফরাসি বিপ্লবের অন্ততঃ দুই শত বৎসর পূর্ব থেকে বৈপ্লবিক চিন্তা পাশ্চাত্য সমাজের নিম্নস্তরের ভিতর শক্তি সঞ্চয় করছিল। ফিউডালিজমের ভস্মস্তূপে এর বীজ নিহিত ছিল। ফ্রান্সের অনুকূল আবহাওয়ায় এই বীজ বিশাল মহীরুহে পরিণত হওয়ার সুযোগ ও সুবিধা পেয়েছিল। একমাত্র ফ্রান্সের

ফিউডালিজমের বাঁধন শিথিল ও দুর্বল ছিল। সেখানকার জনসাধারণ অপেক্ষাকৃত স্বাধীন ছিল। সেখানে ভাবসমষ্টি মতবাদে সুবিন্যস্ত হয়ে প্রেরণার উৎসে পরিণত হয়েছিল। ফরাসি লেখকগণ কবিতায় ও গানে, প্রবন্ধে ও গল্পে, গদ্যে ও পদ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারাকে নানা ভাবে নানা ছন্দে লেখনী মুখে আকার দান করে গ্রামে, সহরে, নগরে ও জনপদে অধিবাসীদের চিত্ত-ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিয়ে ভাবীসমাজের মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছিলেন। এইরূপ চিন্তা ইংল্যাণ্ড ও জার্মেনিতে বর্তমান ছিল কিন্তু জার্মেনিতে ইহা অবদমিত হয়েছিল এবং ইংল্যাণ্ডে ইহা জনমনে আত্মগোপন করেছিল।

বসন্ত আসার আগেই বৃক্ষলতায় মৃদুমন্দ মলয়ের শিহরণ লাগে, বিশ্বে নবজীবনের স্পন্দন জাগে। ১৭৮৯ সালে বিপ্লবের প্রবল বন্যায় ফরাসি দেশ প্লাবিত হয়, শোণিত-প্রবাহে ফ্রান্সের সহর, গ্রাম, প্রান্তর ভেসে যায় কিন্তু ইংল্যাণ্ডে বৈপ্লবিক ভাব বাস্তবরূপ গ্রহণ করেনি, এর প্রকাশ হয়েছিল চিন্তা-রাজ্যে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, কোলরিজ এবং সাউদির কাব্যে এর উল্লেখ, ওয়াল্টার স্কটে এর প্রতিক্রিয়া, শেলি ও বাইরনে এর পুনঃ প্রকাশ এবং কীটস্-এর সৌন্দর্য-সাধনায় এর আত্মবিলোপ ঘটেছিল।

সমগ্র মানব-পরিবারের মনুষ্য এক। মানুষের ভিতর বিভাগ শ্রেণী জন্ম পদ ঐশ্বর্য শক্তি জাতীয়তা প্রভৃতি বাইরের একালের প্রভেদ কাল্পনিক। বাহ্য বিভেদকে বড় করে দেখলে সহজ মানবধর্ম বিনষ্ট হয়। বিশ্বমানবের অন্তর্গত ব্যষ্টি মানুষগুলি ভ্রাতৃত্বের সুবর্ণসূত্রে বাঁধা। জাতি বর্ণ আবহাওয়া দেশপ্রীতির সঙ্কীর্ণতার অতিক্রমণই মানবধর্মের মর্মকথা। যেমন একটি মাত্র দেশ আছে এবং সেই দেশ বিশ্বমানবের দেশ; যেমন একটিমাত্র জাতি আছে এবং সেই জাতি বিশ্বমানব; কেবল একটিমাত্র ধর্ম আছে এবং সেই ধর্ম মানবধর্ম। সেই মতবাদ প্রচারে বস্তুজগতে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় তা এখনও চলেছে। এর জ্ঞান প্রকৃতি ও সমাজকে পরিবর্তন করেই মানুষের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করবে এবং এর পরিণতির মানদণ্ডে মানবতার সর্বাঙ্গীন প্রসারের বিচার নির্ভর করবে।

বিশ্বপ্রেম স্বাধীনতা এবং প্রকৃতিপূজার ত্রিবেণী সঙ্গমে ফরাসি বিপ্লব। দেশপ্রীতিকে বিশ্বপ্রেমে পরিণত করতে হবে। বিশ্বপ্রেম স্বদেশপ্রেম থেকে উচ্চতর ও মহত্তর। স্বদেশের কল্যাণের স্থান বিশ্বজনীন কল্যাণের নীচে। স্বদেশপ্রেমে অন্যজাতির প্রতি হিংসা আছে। নিজ জাতির সংস্কৃতি ও

উৎকর্ষের প্রতি অতিশয় অনুরক্তি মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থকে অবদমিত করে। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে এই আদর্শ প্রচারিত হয়। কিন্তু এর পূর্বে ইংরেজ কবি কুপারের বীণার তারে ইহা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। তাঁর মানবপ্রীতি আন্তর্জাতিক।

ফ্রান্সের নবজাত রেপাব্লিকের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বলে' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করলে তাঁরাও নেপোলিয়নকে আক্রমণ করেছিলেন। নেপোলিয়ন মানবধর্মের উচ্চ আদর্শকে পদদলিত করেছেন দেখে তাঁদের কবি হৃদয় নৈরাশ্যে ভরে উঠেছিল। বাইরন বিদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। শেষে ইংল্যাণ্ডের চেয়ে ইটালিকে বেশী ভালোবাসতেন এবং ইটালির চেয়ে মানবজাতিকে আরও বেশী ভালোবাসেন। মাটির রস গোপনে রূপায়িত ও গন্ধায়িত হয়ে আনন্দবিধান করে। মানবতার আদর্শে উদ্রিক্ত কাব্য বিশ্বজনের আদরের বস্তু হয়ে উঠে।

কবিগণ চিরকালই স্বাধীনতার উপাসক ও পশুবলের বিরোধী। ফরাসি বিপ্লবের চারি বৎসর পূর্বে কুপার তাঁর অমর লেখনীর স্পর্শে অনবদ্য ভাষায় বাষ্টি ধ্বংসের যে কাল্পনিক ছবি এঁকেছিলেন তাহা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং কোলরিজের চিত্তে রেখাপাত করেছিল।

বিপ্লবের তৃতীয় অবদান নিসর্গপ্রীতি—প্রকৃতির নিভৃত নিকেতনে প্রত্যাবর্তন। যখনই সমাজ কৃত্রিমতা ও ভোগবিলাসের আতিশয্যে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে, যখনই অর্থ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে পুঞ্জীভূত হয়ে বুদ্ধিহীনতা ও অবিচারের আধিপত্য স্থাপন করেছে, স্বার্থ সংঘাতে সরল ও সাবলীল জীবনধারা জটিল হয়ে উঠেছে, জ্ঞানচর্চা নিভে গিয়েছে, 'আড়ম্বরের চাপে সমাজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেছে, তখনই মানবাত্মা প্রকৃতির সৌন্দর্যে আত্মবিলীন করে পর সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তখন সে চেয়েছে সভ্যতার আবরণকে দূরে নিক্ষেপ করে নিসর্গের সঙ্গলাভ। তথা কথিত সভ্য মানুষকে প্রত্যাখ্যান করে সে খুঁজেছে কৃষক মেষপালক ও কাঠুরিয়ার সহিত মিলনের আনন্দ আস্বাদন। তখন নদনদী বন উপবন পাহাড়ের বিজন চূড়া, বনের নিভৃত অন্তরাল, গ্রাম্যপথের পুষ্পিত অঞ্চল তার সহায় হয়। তখন সে স্বভাব বিলাসী হয়ে উঠে। তখন সে চায় প্রাকৃত মানুষকে, মানুষকে মানুষের সহজ পরিমণ্ডলে রেখে তাকে সহজভাবে দেখতে।

ফরাসি বিপ্লবের সহিত নিসর্গপ্রীতি ইংরেজি কবিতায় উপজীব্যরূপে গৃহীত হয়েছিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নাগরিক জীবন ত্যাগ করে প্রকৃতির সাহচর্যে হ্রদবহুল কামবারল্যাণ্ডের উপত্যকায় নীড় রচনা করেছিলেন। তাঁর মতো কোলরিজ এবং সাউদি প্রকৃতির বস্তুর মধ্যে আনন্দ লাভ করতেন। স্বভাবের মানুষ ও তার স্বাভাবিক পরিবেশ তাঁদের কাব্যের প্রতিপাদ্য বস্তু। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন, উপত্যকা নিবাসী মেষপালক প্রকৃতির সহচর। প্রকৃতিই তার শিক্ষয়িত্রী। সরল সহজ মানুষের অকৃত্রিম অনাড়ম্বর ভাষাই কবির ভাষা, কবিত্ব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা। এই নূতন কাব্যের নায়ক অসাধ্যসাধনরত অর্ণবচারী মহাবীর ইউলিসিস্‌ নয় অথবা ভাববিলাসী আদর্শবাদী রাজতনয় হ্যামলেট নয়, কিম্বা অলকাপুরীর নির্বাসিত বিরহবিধুর যক্ষ নয়, অথবা স্বর্গচ্যুত কুচক্রী সয়তান নয়—এর নায়ক প্রতিধ্বনিমুখর শিশিরসিক্ত তেপান্তরের মাঠে মেষপালক কৃষকবালক; এর নায়িকা শস্যকর্তনরতা মধুরভাষিণী মধুরহাসিনী "অনবগুণ্ঠিতা অকুণ্ঠিতা কুন্দদন্ত কৃষকতনয়া"। স্বভাববিলাসী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও তাঁর অনুবর্তিগণ প্রকৃত মানুষের গুণবর্ণনায় অতিমুখর। স্বভাবকে ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি। অতি সাধারণ মানুষকে অতিমানবের অধিকার দিতেও তাঁরা কার্পণ্য করেন নি। তাঁরা মানুষকে সত্যই ভালবাসতেন, মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা অপরিমেয় ছিল।

স্বভাবের মানুষকে শ্রেষ্ঠ আসন দিবার সহিত স্বভাবের অকৃত্রিম সৌন্দর্যকে ভালোবাসার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। সভ্যতা ও সংস্কৃতি-বিরহিত প্রাকৃত মানুষই প্রকৃত মানুষ। তেমনি অযত্নসম্ভূত বনউপবন ধূসর পর্বত নির্ঝরিণীর মর্মরতান পাপিয়ার মনমাতন কাকলী সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী সমুদ্রের ভীম কল্লোল জ্যোৎস্না-প্লাবিত মাধবী-বিতানে ছায়াঢাকা পাখিডাকা কুঞ্জ তরঙ্গায়িতহ্রদউপকূলে বায়ুভরে হিল্লোলিত অসংখ্য কুসুম প্রভৃতি প্রকৃতির দৃশ্যাবলী প্রকৃত সুন্দর। মনুষ্যহস্ত রোপিত সুসজ্জিত কৃত্রিম উদ্যান প্রকৃত সৌন্দর্যানুভূতির পরিপন্থী এবং মানুষের অনাত্মীয়।

ফ্রান্সের প্রাক্‌-বিপ্লব যুগে রুসো বন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তার মহিমা প্রচার করেছিলেন। বন্যপ্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার সহিত তিনি সভ্যতা ও সমাজ-সম্পর্ক-রহিত স্বাভাবিক মানুষের শ্রেষ্ঠতার জয়গান করেছিলেন। সমাজ গঠিত হওয়ার পূর্বে, আইন বিধি-ব্যবস্থা

উৎকর্ষের প্রতি অতিশয় অনুরক্তি মানবজাতির বৃহত্তর স্বার্থকে অবদমিত করে। ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে এই আদর্শ প্রচারিত হয়। কিন্তু এর পূর্বে ইংরেজ কবি কুপারের বীণার তারে ইহা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল। তাঁর মানবপ্রীতি আন্তর্জাতিক।

ফ্রান্সের নবজাত রেপাব্লিকের বিরুদ্ধে ইংল্যাণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল বলে' ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরিজ ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করলে তাঁরাও নেপোলিয়নকে আক্রমণ করেছিলেন। নেপোলিয়ন মানবধর্মের উচ্চ আদর্শকে পদদলিত করেছেন দেখে তাঁদের কবি হৃদয় নৈরাশ্যে ভরে উঠেছিল। বাইরন বিদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছিলেন। শেষে ইংল্যাণ্ডের চেয়ে ইটালিকে বেশী ভালোবাসতেন এবং ইটালির চেয়ে মানবজাতিকে আরও বেশী ভালোবাসেন। মাটির রস গোপনে রূপায়িত ও গন্ধায়িত হয়ে আনন্দবিধান করে। মানবতার আদর্শে উদ্রিক্ত কাব্য বিশ্বজনের আদরের বস্তু হয়ে উঠে।

কবিগণ চিরকালই স্বাধীনতার উপাসক ও পশুবলের বিরোধী। ফরাসি বিপ্লবের চারি বৎসর পূর্বে কুপার তাঁর অমর লেখনীর স্পর্শে অনবদ্য ভাষায় বাষ্টি ধ্বংসের যে কাল্পনিক ছবি এঁকেছিলেন তাহা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ এবং কোলরিজের চিত্তে রেখাপাত করেছিল।

বিপ্লবের তৃতীয় অবদান নিসর্গপ্রীতি—প্রকৃতির নিভৃত নিকেতনে প্রত্যাবর্তন। যখনই সমাজ কৃত্রিমতা ও ভোগবিলাসের আতিশয্যে পঙ্কিল হয়ে উঠেছে, যখনই অর্থ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হস্তে পুঞ্জীভূত হয়ে বুদ্ধিহীনতা ও অবিচারের আধিপত্য স্থাপন করেছে, স্বার্থ সংঘাতে সবল ও সাবলীল জীবনধারা জটিল হয়ে উঠেছে, জ্ঞানচর্চা নিভে গিয়েছে, 'আড়ম্বরের চাপে সমাজ শ্বাসরুদ্ধ হয়ে গেছে, তখনই মানবাত্মা প্রকৃতির সৌন্দর্যে আত্মবিলীন করে পর সত্তায় সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। তখন সে চেয়েছে সভ্যতার আবরণকে দূরে নিক্ষেপ করে নিসর্গের সঙ্গলাভ। তথা কথিত সভ্য মানুষকে প্রত্যাখ্যান করে সে খুঁজেছে কৃষক মেষপালক ও কাঠুরিয়ার সহিত মিলনের আনন্দ আস্বাদন। তখন নদনদী বন উপবন পাহাড়ের বিজন চূড়া, বনের নিভৃত অন্তরাল, গ্রাম্যপথের পুষ্পিত অঞ্চল তার সহায় হয়। তখন সে স্বভাব বিলাসী হয়ে উঠে। তখন সে চায় প্রাকৃত মানুষকে, মানুষকে মানুষের সহজ পরিমণ্ডলে রেখে তাকে সহজভাবে দেখতে।

ফরাসি বিপ্লবের সহিত নিসর্গপ্রীতি ইংরেজি কবিতায় উপজীব্যরূপে গৃহীত হয়েছিল। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নাগরিক জীবন ত্যাগ করে প্রকৃতির সাহচর্যে হ্রদবহুল কামবারল্যাণ্ডের উপত্যকায় নীড় রচনা করেছিলেন। তাঁর মতো কোলরিজ এবং সাউদি প্রকৃতির বস্তুর মধ্যে আনন্দ লাভ করতেন। স্বভাবের মানুষ ও তার স্বাভাবিক পরিবেশ তাঁদের কাব্যের প্রতিপাদ্য বস্তু। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছিলেন, উপত্যকা নিবাসী মেষপালক প্রকৃতির সহচর। প্রকৃতিই তার শিক্ষয়িত্রী। সরল সহজ মানুষের অকৃত্রিম অনাড়ম্বর ভাষাই কবির ভাষা, কবিত্ব প্রকাশের উপযুক্ত ভাষা। এই নূতন কাব্যের নায়ক অসাধ্যসাধনরত অর্ণবচারী মহাবীর ইউলিসিস্ নয় অথবা ভাববিলাসী আদর্শবাদী রাজতনয় হ্যামলেট নয়, কিম্বা অলকাপুরীর নির্বাসিত বিরহবিধুর যক্ষ নয়, অথবা স্বর্গচ্যুত কুচক্রী সয়তান নয়—এর নায়ক প্রতিধ্বনিমুখর শিশিরসিক্ত তেপান্তরের মাঠে মেষপালক কৃষকবালক; এর নায়িকা শস্যকর্তনরতা মধুরভাষিণী মধুরহাসিনী "অনবগুণ্ঠিতা অকুণ্ঠিতা কুন্দদন্ত কৃষকতনয়া"। স্বভাববিলাসী ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও তাঁর অনুবর্তিগণ প্রকৃত মানুষের গুণবর্ণনায় অতিমুখর। স্বভাবকে ভগবানের আসনে প্রতিষ্ঠা করতেও তাঁরা কুণ্ঠিত হন নি। অতি সাধারণ মানুষকে অতিমানবের অধিকার দিতেও তাঁরা কার্পণ্য করেন নি। তাঁরা মানুষকে সত্যই ভালবাসতেন, মনুষ্যত্বের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা অপরিমেয় ছিল।

স্বভাবের মানুষকে শ্রেষ্ঠ আসন দিবার সহিত স্বভাবের অকৃত্রিম সৌন্দর্যকে ভালোবাসার সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য। সভ্যতা ও সংস্কৃতি-বিবর্জিত প্রাকৃত মানুষই প্রকৃত মানুষ। তেমনি অযত্নসম্ভূত বনউপবন ধূসর পর্বত নির্ঝরিণীর মর্মরতান পাপিয়ার মনমাতন কাকলী সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী সমুদ্রের ভীম কল্লোল জ্যোৎস্না-প্লাবিত মাধবী-বিতানে ছায়াঢাকা পাখিডাকা কুঞ্জ তরঙ্গায়িতহ্রদউপকূলে বায়ুভরে হিল্লোলিত অসংখ্য কুসুম প্রভৃতি প্রকৃতির দৃশ্যাবলী প্রকৃত সুন্দর। মনুষ্যহস্ত রোপিত সুসজ্জিত কৃত্রিম উদ্যান প্রকৃত সৌন্দর্যানুভূতির পরিপন্থী এবং মানুষের অনাত্মীয়।

ফ্রান্সের প্রাক্-বিপ্লব যুগে রুসো বন্য প্রকৃতির সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটন করেছিলেন এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষায় তার মহিমা প্রচার করেছিলেন। বন্যপ্রকৃতির প্রতি ভালোবাসার সহিত তিনি সভ্যতা ও সমাজ-সম্পর্ক-রহিত স্বাভাবিক মানুষের শ্রেষ্ঠতার জয়গান করেছিলেন। সমাজ গঠিত হওয়ার পূর্বে, আইন বিধি-ব্যবস্থা

রচনার পূর্বে মানুষ পবিত্র ছিল। সভ্যতা বিস্তারের সহিত তার শুভ্রমনের উপর একটা কালো ছাপ পড়ে গেছে, কৃত্রিমতা তার জীবনকে কলুষিত বিকৃত ও অস্বাভাবিক করে তুলেছে। মানুষ নিসর্গের নন্দনকাননের অধিবাসী ছিল। তার জীবন সরল স্বচ্ছ আড়ম্বরবর্জিত ছিল। তার হৃদয় কুসুমের মতো কোমল ও দুগ্ধের মতো শুভ্র ছিল। এই অবস্থায় রাজা-প্রজা ছিল না, উচ্চ-নীচ ছিল না, ধনী-নির্ধনী ছিল না, আইন-কানুনের শৃঙ্খল স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করেনি। সে ছিল স্বভাবের জীব। প্রকৃতির প্রিয়পুত্র। তখন সে ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার শিক্ষা করেনি। প্রকৃতির নির্মল প্রাঙ্গণ থেকে সে যত দূরে চলে এসেছে, তার দুঃখ ক্লেশ ও অভাব ততই বেড়েছে, ততই সে তার হৃদয়ের স্বচ্ছতা হারিয়ে ফেলেছে, নিজেকে পঙ্গু ও দুর্বল করে ফেলেছে। সুতরাং অনাবিল আনন্দ ও চিত্তের স্বাধীনতা পেতে হলে মানুষকে নৈরাজ্যের অবস্থায় ফিরে যেতে হবে, তাকে স্বভাবের সাযুজ্য সালোক্য ও সারূপ্য লাভ করতে হবে। এই একমাত্র পথ।

রুসোর এই মনোজ্ঞ মতবাদ অলঙ্কারবর্জিত সহজবোধ্য ভাষায় প্রচারিত হয়েছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের ন্যায় ফ্রান্সের কাব্যে পুষ্পিত হয়ে উঠেনি। বিপ্লবের অগ্নিস্রুনা ফ্রান্সের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয়েছিল। তার মাদকতার বিহ্বলতায় জাতীয় মানস আচ্ছন্ন ও উন্নত হয়েছিল। সুতরাং এই আদর্শবাদ তার কাব্যে রূপ পরিগ্রহ করতে অবসর পায়নি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে ফরাসী বিপ্লবের তিরিশ বৎসর পরে প্রকৃতির একনিষ্ঠ সাধক রুসোর জন্মস্থান ফ্রান্সে এবং ফরাসি কাব্যে প্রকৃতির সৌন্দর্য ক্ষীণভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল কিন্তু বিপ্লবের দশ বৎসর পূর্বে বন্য প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা ইংরেজ কবিদের চিত্তক্ষেত্রে পত্রপুষ্পসমন্বিত বৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। বিপ্লবের বহু পরেও সেই বৃক্ষের নীচে ইংরেজ কবিকুলের সুরলহরী এখনও দুঃখীজনের প্রাণে আনন্দ বিতরণ করছে।

ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ নিরালা স্থানের অশরীরী আত্মায় স্বীয় সত্তা নিমজ্জিত করে আত্মভোলা হয়েছিলেন এবং সরল ভাষায় তাঁর কবি-অভিজ্ঞতাকে অনন্য সাধারণভাবে প্রকাশ করেছিলেন। যদিও তিনি কবিতাকে অনাবিল রসসৃষ্টির কর্তব্য থেকে অব্যাহতি দিয়ে স্বমত প্রকাশের বাহনরূপে নিযুক্ত করেছেন তথাপি তাঁর অভিজ্ঞতা বিশ্বজনীন অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত হয়ে অমর হয়ে আছে।

বিপ্লবের সহিত সম্পর্কিত আর একটি ধারণা ইংরেজী সাহিত্যে আত্ম-প্রকাশ করেছে। ইহা সত্যযুগের স্বপ্ন। এই স্বপ্নের সুষীম আলেখ্য শেলি তাঁর 'প্রেমিথিউস্ আনবাউণ্ড' নামক অমর গীতি-নাটকে পরিস্ফুট করেছেন। তাঁর কবি মানসের ধ্যানলব্ধ অনুভূতি যুগযুগান্ত লোকচিত্ত মোহিত করবে। যে সরল বৃহৎ সত্য ভাষায় প্রকাশাতীত, যার সুবর্ণমন্দিরের দ্বার থেকে কাঙাল মন নাগাল না পেয়ে বার বার ফিরে আসে, ধ্যানী কবি শেলি তার দর্শন লাভ করেছিলেন এবং তাকে ভাষার ইন্দ্রজালে রূপায়িত করে সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন। শেলির প্রেমিথিউস্ আদর্শ মানুষ, বিশ্বের ত্রাণকর্তা। আদর্শ মানুষ অকল্যাণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে নিরন্তর যুদ্ধে রত কিন্তু অন্যায়ের কাছে তিনি কখনও মাথা নীচু করেন না। মঙ্গলে তাঁর অবিচলিত নিষ্ঠা। অমঙ্গলের 'পরাজয়ে তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা। দৃঢ় নিষ্ঠা ও আশায় বুক বেঁধে, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করে' তিনি অত্যাচারের সম্মুখীন হন। অবশেষে বিজয়ীর রত্নমুকুট তাঁর মস্তকের শোভা বর্ধন করে। তখন মানুষ ও প্রকৃতির মিলন হয়, এশিয়ার সঙ্গে প্রেমিথিউসের শুভপরিণয় হয়—জগতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়—প্রেম ও কোমলতা, জ্ঞান ও পুণ্য পৃথিবীকে স্বর্গরাজ্যে পরিণত করে, সত্যযুগের আবির্ভাব ঘটে।

১৭৯৯ সাল হইতে ১৮১৪ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের অবস্থা

১৭৯৫ সালে রাজতন্ত্রী দলের শেষ বিদ্রোহের সময় নেপোলিয়নের বুদ্ধি ও বাহুবলে ডাইরেক্টরী রিপাব্লিক রক্ষা পেয়েছিল। বিপ্লবের সময় তিনি গণতন্ত্রের উপাসক ছিলেন। রোবস্‌পীয়রের পতনের সময় পর্যন্ত তিনি জেকোবিন ছিলেন। তাঁর প্রতিভা কারনটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তাঁর স্ত্রী সুন্দরী জোসেফিনের প্রভাবে বারাসও তাঁর উপর সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি ইটালীতে সেনাপতি নিযুক্ত হন।

১৭৬৯ সালে কর্সিকা দ্বীপে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জন্ম হয়। প্রথমে ব্রিনির এবং তারপর প্যারিসের সামরিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষা হয়। ব্রিটিশ ও স্পেনীয়দের বিতাড়িত করে নেপোলিয়ন টুলো বন্দর ও নগর উদ্ধার করেন এবং একজন সুদক্ষ সামরিক কর্মচারী বলে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

ইটালির অভিযান ফ্রান্স ও নেপোলিয়নের দ্বৈতরূপ প্রকাশ করেছে। একদিকে তিনি ইটালির উদ্ধার কর্তা সেজে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন যে

ফরাসিগণ ইটালির মুক্তির জন্য সে দেশে এসেছে। অপর দিকে তিনি ডাইরেক্টরীর নিকট গোপনে চিঠি লিখলেন—আমরা এই বিজিত দেশ থেকে দুই কোটি ফ্রাঙ্ক আদায় করব। ইটালি পৃথিবীর ঐশ্বর্যশালী দেশের অন্যতম।

প্রাচীনকালের রোমান সম্রাটদের মতো তিনি প্রাচ্য দেশ জয় করতে মনস্থ করলেন। তিনি ভিনিসকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে বণ্টন করে দিলেন। সেখানকার গণতন্ত্রের সমাধি হয়ে গেল। আইওনিক দ্বীপপুঞ্জ ও ভিনিসের নৌবহর ফ্রান্সের অধিকারে এল। ইটালি সিজারের দেশ। গল দেশ পদানত করে বিজয়ী সিজার রোমে প্রত্যাবর্তন করেন। সিরাজের স্বয়ংসিদ্ধ প্রতিনিধি ভারতবর্ষ ও মিশর জয় করে বিজয়োল্লাসে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন। গুণমুগ্ধ ডাইরেক্টরী তাঁর বিজয় অভিযান অনুমোদন করলেন।

টুলোঁ বন্দর থেকে নৌবহর যাত্রা করল এবং পথে মাল্টা জয় করে আলেকজান্দ্রিয়ায় উপস্থিত হল। নেপোলিয়ন দ্রুত সৈন্য চালনা করে মিশর অধিকার করে নিলেন। ইতিমধ্যে নেলসন নাইলের যুদ্ধে ফরাসি নৌবহর বিধ্বস্ত করে দিলেন। নেপোলিয়ন জাফার যুদ্ধে জয়ী হন। তিনি এবার আক্রমণ করলেন এবং আবুকিরের যুদ্ধে তুর্কীদের পরাস্ত করেন। তিনি ইংরেজের কাছে পরাজিত হয়ে ফ্রান্সে আসতে বাধ্য হন। ইতিপূর্বেই তালেরাঁ মাডাম ডি ষ্টিলের কৃপায় প্রধান ডিরেক্টর বারাস্‌কে মুরব্বী ধরে মন্ত্রিত্ব লাভ করেছিলেন।

এই সময় ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয়। বহুস্থানে ফ্রান্সের বাহুবল প্রতিহত। ইটালির অধিকাংশ স্থান তার হস্তচ্যুত। তখন মাডাম পাপাস্থর ও দ্যুবারির কক্ষ থেকে শাসনকার্য পরিচালিত হত। প্রথম জীবনে তালেরাঁ ধর্মযাজক ছিলেন কিন্তু কোনদিন ধর্মপরায়ণ ছিলেন না। একজনের পর একজন সুন্দরীকে সারথি করে তিনি জীবন-রথ চালিত করছিলেন। অর্থই তাঁর পরমার্থ ছিল। বিবেকের দংশন তাঁর মনের স্থূল আবরণ ভেদ করতে পারত না। তিনি কোন দলেই ছিলেন না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য তিনি যে কোন দলে যোগ দিতেন। সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাস না থাকলেও তিনি তার দূত হয়ে সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে ইংল্যাণ্ডে যান। বিভীষিকার তাণ্ডবের সময় তিনি ইংল্যাণ্ডে আত্মগোপন করে ছিলেন। রাষ্ট্রদ্রোহী বলে ঘোষিত হলে তিনি আমেরিকায় গিয়ে প্রজাতন্ত্রের উৎকট উপাসক হয়ে পড়েন। তাঁর

লোক চেনার শক্তি অসাধারণ ছিল। ডাইরেক্টরীর অমাত্য হয়েই তিনি নেপোলিয়নকে গোপনে পত্র লেখেন। সাক্ষাতের পূর্বেই দুই মহাপুরুষের মিলন হয়েছিল। তালেরাঁ প্যারিসে বসে ভিতরে ভিতরে ডাইরেক্টরীর অমঙ্গল করছিলেন এবং তাঁর বন্ধু নেপোলিয়ন বিদেশে শত্রু জয় করে ফ্রান্সের হৃদয় জয় করছিলেন।

শুভক্ষণে ভাগ্যলক্ষ্মীর বরপুত্র নেপোলিয়ন প্যারিসে উপস্থিত হলেন। ক্যান্সার রোগী যখন যন্ত্রণায় অস্থির হয় তখন সে যে-কোন চিকিৎসকের হস্তে আত্মসমর্পণ করে। স্বার্থপর রাষ্ট্র-পরিচালকদের শোষণে অস্থির হয়ে ফরাসি দেশের জনসাধারণ নেপোলিয়নকে জাতির উদ্ধার কর্তারূপে সাদরে অভ্যর্থনা করল। কৌশলের সহিত ডাইরেক্টরীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হল। নেপোলিয়ন প্রধান কনসল উপাধি গ্রহণ করে দেশের ভাগ্যবিধাতা হয়ে বসলেন। তাঁর আত্মগরিমা প্রায় অসীমে উঠেছিল। সিজারের উচ্চাভিলাষ, আলেকজান্দারের আত্মম্ভরিতা, শার্লেমেনের আড়ম্বর, ক্রমওয়েলের কর্মপ্রবণতা —এই কয়টি উপাদানে তাঁর চরিত্র গঠিত হয়েছিল। তিনি ডাইরেক্টরীর সৈন্যবিভাগ নিজহস্তে গ্রহণ করলেন। তিনি ইটালীতে মেরিনগোর যুদ্ধে জয়ী হলেন (১৮০০), হোহেনলিণ্ডেনের প্রান্তরে অষ্ট্রিয়ার সৈন্য-বাহিনী পরাজিত করে ইংল্যাণ্ড ও অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে সন্ধি করলেন।

প্রাচীন রোমের সিজার তাঁর আদর্শ ছিল। তিনি বড় বড় রাস্তা নির্মাণ করলেন, জলসেচনের এবং আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করলেন। প্যারিসে বহু স্তম্ভ ও তোরণ নির্মাণ এবং ব্যাঙ্ক স্থাপন করা হল। নূতন ব্যবস্থা মেনে নেওয়ার সর্তে সাবেক অভিজাতগণকে দেশে ফিরে আসার জন্য অনুরোধ করা হল।

পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রধান কনসল সম্রাট নাম গ্রহণ করে সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন। প্যারিসের নটার ডেম গির্জায় তাঁর অভিষেক হল (১৮০৫)। ইয়োরোপের রাজচক্রবর্তী হওয়ার বাসনা তাঁর দিবসের চিন্তা ও নিশীথের স্বপ্ন হল। সচিব তালেরাঁ তাঁর দক্ষিণ হস্ত হলেন।

গণতন্ত্রের আমলের রিপাব্লিকগুলি ফ্রান্সের অধীন রাজ্যে পরিণত হল। তাঁর দুই ভ্রাতা লুই এবং জোসেফ যথাক্রমে হল্যাণ্ড এবং নেপলসের সর্বময় কর্তা হলেন। পিডমণ্ট এবং এলবা দ্বীপ ফ্রান্সের অধিকারে এল। জার্মেনিতে ফরাসি প্রভুত্ব কায়েম করার ব্যবস্থা হল। নেপোলিয়নের বৈদেশিক নীতি

ইংল্যাণ্ডে অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করল। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নেপোলিয়নের অযথা হস্তক্ষেপ ইয়োরোপের শান্তি ভঙ্গ করছে দেখে ইংল্যাণ্ড প্রতিবাদ করল। নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করার জন্য সৈন্য সমাবেশ করলেন, এমন কি ভাবী সাফল্যের চিহ্নস্বরূপ একটি স্তম্ভ নির্মাণ করে ফেললেন। অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়া ইংল্যাণ্ডের পক্ষ অবলম্বন করল। ১৮০৫ সালে বিস্কে উপসাগরে কলডারের হাতে ফরাসি নৌবহর পরাজিত হল এবং ঐ বৎসরই ট্রাফল-গারের জলযুদ্ধে নেলসন ফ্রান্স ও স্পেনের মিলিত নৌবহরকে বিধ্বস্ত করে দিলেন। নেপোলিয়নের ইংল্যাণ্ড জয়ের আশা চূর্ণ হল।

১৮১১ সালে রাশিয়ার সম্রাট নেপোলিয়নের বাণিজ্য-নীতি থেকে সরে দাঁড়ালেন। নেপোলিয়ন আলেকজান্দারকে শিক্ষা দিবার জন্য ছয় লক্ষ সৈন্যের সহিত রাশিয়ায় অভিযান করলেন। রাশিয়ানরা 'পোড়া মাটি'র নীতি অবলম্বন করল। খাদ্যের অভাবে এবং শীতের প্রকোপে তাঁর বহু সৈন্য ধ্বংস হয়ে গেল। নেপোলিয়ন অবশিষ্ট সৈন্যের সহিত প্রত্যাবর্তন করলেন। জনমানবহীন প্রান্তরের কর্দমাক্ত জলের ভিতর দিয়ে কুজ্ঝটিকা ও তুষারপাত মস্তকে ধারণ করে সৈন্যগণ অগ্রসর হতে লাগল। পেটের জ্বালায় তারা লুটপাট আরম্ভ করল। কৃষকগণ তাদের হত্যা করতে লাগল। সিথিয়ান সৈন্যগণ তাদের সংখ্যা হ্রাস করে দিল। নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে নির্বুদ্ধিতার একটি করুণ কাহিনী।

১৮১৪ সালে পূর্ব ও দক্ষিণ দিক দিয়ে জার্মেনি-অষ্ট্রিয়া এবং রাশিয়ার সৈন্য এবং ব্রিটিশ ও স্পেনীয় সৈন্য ফ্রান্স আক্রমণ করল। নেপোলিয়ন সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন। ভিয়েনা কংগ্রেসে যাঁরা সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা ছিলেন রাজা রাজপ্রতিনিধি জমিদার ও অভিজাত বংশের লোক। এখানে জন-সাধারণের কোন প্রতিনিধি ছিল না। এখানে জনসাধারণের বৃহত্তর সমস্যাগুলির আলোচনা ও সমাধান হয়নি। বুর্বন রাজা অষ্টাদশ লুইকে তাঁরা ফ্রান্সের সিংহাসনে স্থাপন করলেন। একজন উদ্ধত প্রগতিবিরোধী ব্যক্তির পরিবর্তে আর একজন প্রতিক্রিয়াশীল ও পুরাতনের অন্ধ উপাসককে কর্তৃত্ব ভার দেওয়া হল।

নেপোলিয়ন ক্ষুদ্র এল্‌বা দ্বীপের তথা-কথিত সম্রাট হলেন। তাঁকে সম্রাট পদের বাহ্যাড়ম্বর রক্ষা করার অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু ইহা তীব্র পরি-হাসের মতো তাঁর অন্তরাত্মাকে ব্যথিত করতে লাগল। এগারো মাস এল্‌বা

দ্বীপে অবস্থান করার পর তিনি অনুমান করে নিলেন যে ফ্রান্সের অন্তরাত্মা বুর্বন শাসনচক্রের নিচে আর্তনাদ করছে। তিনি হঠাৎ পুনরায় ফ্রান্সে আবির্ভূত হলেন। বিস্ময়মুগ্ধ উচ্ছ্বাসের সহিত সকলে তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা করল। নেপোলিয়ন ফ্রান্সের জনসাধারণের নির্বাক স্বীকৃতির সুযোগ নিয়ে সিংহাসন অধিকার করলেন কিন্তু তাঁর জীবন-নাটকের শেষ অঙ্কের অভিনয় মাত্র এক শত দিন স্থায়ী হয়েছিল।

মিত্র শক্তির সহিত শান্তি স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হল। ওয়েলিংটন এবং ব্লুকারের অধীনে যথাক্রমে ইংরেজ ও প্রুশিয়ান সৈন্য বেলজিয়মে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হল। লিগনিতে প্রুসিয়ান সৈন্য পরাজিত হল কিন্তু ওয়েলিংটনের অধীনে ইংল্যাণ্ড বেলজিয়ম ও হ্যানোভারের সম্মিলিত সৈন্য কোয়াটারব্রাসের যুদ্ধে ফরাসি সেনাপতি নে-র বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান ছিল। ইতিমধ্যে ব্লুকারের সৈন্য ওয়েলিংটনকে সাহায্য করার জন্য অগ্রসর হল। ১৮ই জুন ওয়াটারলুর যুদ্ধে ওয়েলিংটন নেপোলিয়নের সৈন্যকে পরাজিত করলেন। নেপোলিয়ন পলায়ন করে প্যারিসে উপস্থিত হয়ে সম্রাটপদ ত্যাগ করলেন। আমেরিকায় পলায়ন করার পথে তাঁকে বন্দী করে সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে প্রেরণ করা হল। এই সমুদ্র-পরিবেষ্টিত নির্জন দ্বীপের নিভৃত কক্ষে তিনি জীবনের অবশিষ্ট ছয় বৎসর অতিবাহিত করেছিলেন।

নেপোলিয়নের চরিত্র। শিল্পীজনোচিত কল্পনার অধিকারী হলে এবং আত্মসর্বস্ব মনোভাব পরিহার করতে পারলে নেপোলিয়ন ফরাসি জাতির উদ্ধার কর্তারূপে ইতিহাসে উচ্চস্থান অধিকার করতেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হওয়া কঠিন হলেও একজন লেলিন বা গান্ধীর আবির্ভাব অসম্ভব নয়। অতিমর্ত্যের' আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে তিনি জীবন-পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন কিন্তু তার অপব্যবহারের জন্য তাঁকে দুর্বহ বন্দীজীবন ভোগ করতে হয়েছিল। ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর মত মধ্যযুগীয় ছিল। তিনি জানতেন, দরিদ্রকে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট রাখার একমাত্র উপায় ধর্ম। বৈষম্য মূলক সমাজ ব্যবস্থাকে নির্বিচারে মেনে নিতে সাহায্য করে ধর্ম। মনুষ্য-চরিত্রে নেপোলিয়মের অন্তর্দৃষ্টি ছিল। শাসনকার্যে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করতে হলে দাস-মনোবৃত্তি সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এজন্য ছয় হাজার সদস্য নিয়ে লিজন অব্ অনার্স নামে একটি সংঘ গঠিত হয়েছিল। লাল ফিতা দিয়ে সঙ্ঘের সদস্যগণকে সম্মান করা হত। প্রথম কনসল এই সম্প্রদায়ের

প্রধান কর্তা ছিলেন। দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি ও যোদ্ধাগণ এর সভ্য হয়ে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেছিল।

নেপোলিয়ন খৃষ্টান ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছিলেন। দেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার ব্যাপারকে তিনি উপেক্ষা করেছিলেন। জনশিক্ষা রাষ্ট্রনিরপেক্ষ ব্যক্তিগত কর্তব্য অথবা স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীর অন্তর্গত। স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে তিনি বলতেন, বিদ্যালয়ের শিক্ষা স্ত্রীলোকদের উপযোগী নয়। তাদের উপযুক্ত স্থান অন্দর। গার্হস্থ্য ধর্ম ও মধুর ব্যবস্থার তাদের একমাত্র লক্ষ্য ও কাম্য বস্তু। সুস্থ সবল সন্তান প্রসবই তাদের প্রধান কর্তব্য। দণ্ডনীতি ও অপরাধ তত্ত্বের মৌলিক ভাবধারার পরিবর্তন হচ্ছিল কিন্তু এই বিষয়ে তাঁর অজ্ঞতা পর্বতপ্রমাণ ছিল। নূতন যুগের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থেকেও তিনি প্রাচীন নীতিকে ধ্রুবসত্যজ্ঞানে অবলম্বন করেছিলেন।

পবিত্রচুক্তি। ওয়াটালুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের পরাজয় এবং ইয়োরোপের রাজনৈতিক আসর থেকে এই উল্কাধর্মী ব্যক্তির পতনের পর রাশিয়া অষ্ট্রিয়া এবং প্রুসিয়ার সম্রাটগণ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যে চুক্তি করেন তার নাম 'পবিত্র চুক্তি'। এতে স্বাক্ষর করার জন্য ইয়োরোপের অন্যান্য রাজাদের আহ্বান করা হল। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা ভেবেছিলেন যে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শবাদ— বিশ্বে সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা স্থাপনের আদর্শ, সমাধি লাভ করেছে। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন, কোন বৃহৎ আইডিয়া একেবারে লোপ পায় না। বৃহৎ আইডিয়া শাশ্বত, মৃত্যুঞ্জয়ী।

চুক্তিপত্রের বিধি অনুসারে স্বাক্ষরকারী রাজগণ প্রজা ও সৈন্যদের পুত্রের মতো দেখবেন, পরস্পরকে স্বদেশবাসী বলে ভাববেন, পরস্পরকে সাহায্য করবেন, প্রকৃত ধর্মের রক্ষক হবেন এবং খৃষ্টান ধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন করতে সকলকে আদেশ দিবেন। তাঁদের মতে খৃষ্টান প্রজাদের প্রকৃত রাজা যিশুখ্রীষ্ট। পৃথিবীর রাজারা তাঁর প্রতিনিধি মাত্র। অতীতের উপাসক মধ্যযুগীয় মনোবৃত্তিসম্পন্ন রাজন্যবর্গ নবযুগের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতিধারার গতি রুদ্ধ করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ইংল্যাণ্ডের রাজা, পোপ এবং সুলতান ছাড়া আর সকল রাজা এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেছিলেন। শীঘ্রই দেখা গেল, আলেকজাণ্ডার ধর্ম ভাবপ্রসূত সদিচ্ছার বশবর্তী হয়ে পোল্যাণ্ডের অধিকাংশ স্থান স্বরাজ্যভুক্ত করে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ভিয়েনার সন্ধি ইউরোপে এক অস্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। জনসমাজের বৃহত্তর স্বার্থ অথবা কোন উচ্চতর আদর্শ এর লক্ষ্য ছিল না। ইউরোপ থেকে বৈপ্লবিক ধারণা অথবা অশান্তি দূর করে শান্তিময় রামরাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে পবিত্র চুক্তির পরিকল্পনা। যখন উচ্চতর আদর্শের সংঘাতে মানুষের মন চঞ্চল, অতীতের সহিত বর্তমানের সংঘর্ষে ইয়োরোপের চিরাচরিত জীবনধারা বিক্ষুব্ধ তখন এরা অতীতের স্বপ্নে বিভোর ছিল। তাদের পবিত্র সঙ্ঘ ক্রমে মানুষের পীড়ন যন্ত্রে পর্যবসিত হল, —উদার ভাব ও স্বাধীন চিন্তা দমন করার, মনুষ্যত্বের মর্যাদাবুদ্ধিকে ক্ষুণ্ণ করার অস্ত্রে পরিণত হল। শান্তিরক্ষার নামে এরা অশান্তির ইন্ধন প্রয়োগ করতে লাগল। ইয়োরোপে' আপাতশান্তির তলায় উৎপীড়ন ও অত্যাচার চলতে লাগল। এর সঙ্গে তুলনা করলে নেপোলিয়নের অত্যাচার মৃদু মনে হয়। এজন্য তাঁর মৃত্যুর পরে বিপ্লব ও ফ্রান্সের জীবন্ত-মূর্তি হিসাবে লোক তাঁর স্মৃতিপূজা করেছিল।

অষ্টাদশ শতকের উত্তরার্ধে ইংল্যাণ্ড

অষ্টাদশ শতকের উত্তরার্ধ বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় যুগ। এই সময়ে পৃথিবীর দুইটি মহাদেশে—আমেরিকায় এবং ইয়োরোপে—যে দুইটি বিরাট অগ্নিক্রীড়া অনুষ্ঠিত হয় তাতে পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার পূতিগন্ধময় শ্বাসরুদ্ধকর জঞ্জাল পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তির উপর মানবসমাজ পুনর্গঠনের আদর্শপ্রচার এই বিপ্লবের মর্মকথা। আমেরিকা ও ফ্রান্স এই আদর্শ প্রচার করে পৃথিবীতে যে বিপুল বিক্ষুব্ধ আন্দোলন সৃষ্টি করে তার পাশে স্থান পেয়েছিল শিল্প-বিপ্লব এবং মানব-কল্যাণবাদ। শিল্প-বিপ্লবের জন্মস্থান ইংল্যাণ্ড। মানবকল্যাণবাদের জন্ম ইংল্যাণ্ডে না হলেও নানা ভাবস্রোতের ভিতর দিয়ে এর স্বীকৃতি ও বিকাশ ইংল্যাণ্ডেই সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং আমেরিকা ও ফ্রান্সের বৈপ্লবিক মতবাদ, শিল্পবিপ্লব এবং মানবকল্যাণবাদ যে আন্দোলন সৃষ্টি করে তা প্রজাতন্ত্রে সার্থকতা লাভ করেছে।

মানুষ বুদ্ধিবলে প্রকৃতির সঞ্চিত ধনসম্পদ ব্যবহার করে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করার উপায় উদ্ভাবন করেছিল। ফলে জীবনধারণ প্রণালীর পরিবর্তন ঘটে, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অনুন্নত জাতির ও জনবিরল দেশের

শ্রীবৃদ্ধি হয়। বিভিন্ন জাতির ভিতর সহযোগিতা আবশ্যক হয়ে উঠে। এইরূপ অবস্থায় রাজনৈতিক সংগঠন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কৃষি ও শিল্পের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন আত্মপ্রকাশ করে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বল্পব্যয়ে এতাবৎ উপেক্ষিত কৃষির উৎপাদন বর্ধিত হল। নূতন যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, বাষ্পশক্তি ব্যবহার, যানবাহনের দ্রুত উন্নতি শিল্পসম্প্রসারণের পথ উন্মুক্ত করে দিল।

ইংল্যাণ্ডে বৈদেশিক আক্রমণ হয়নি বললেও চলে। এখানে কয়লা প্রচুর ছিল। ইংরেজ মানসের সৃষ্টি-প্রেরণায় কৃষির উন্নতি ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন থেকে এখানে শিল্পের দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। বস্ত্রশিল্প, লৌহ ও ইস্পাতের নানা বস্তু নির্মাণ ইংল্যাণ্ডের ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করেছিল। পুরাতন অভিজাত ও জমিদার শ্রেণীর স্থানে নূতন শ্রেণীর অভ্যুদয় হল। কারখানার বিত্তশালী পুঁজিওয়ালা মালিকগণ তখনও সমাজের কাঠামোয় স্থান পায়নি। তারা শ্রমিকদের প্রতি উদাসীন ছিল। তারা যথাসম্ভব অল্প পারিশ্রমিক দিয়ে বেশী কাজ আদায় করত। অল্প সংখ্যক পুঁজিওয়ালা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক সমাজদেহে নগণ্য স্থান অধিকার করলেও তারা দেশের ঐশ্বর্য সৃষ্টি করে ভবিষ্যতের পথ প্রশস্ত করছিল। সুতরাং দেশের রাজনৈতিক সংস্থানে তাদের প্রতিষ্ঠা অনস্বীকার্য হয়ে উঠল।

সুখের বিষয় এই যে এই জড়বাদ-প্রধান আর্থিক উন্নতির যুগে বিশ্বমানবতার আদর্শ প্রচারিত হয়ে নূতন জীবনদর্শন ও মনুষ্যত্বের মর্যাদা সৃষ্টি করেছিল। সপ্তদশ শতকে ধর্মানুভূতির আবেগ অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধে শুষ্ক বিচার-বুদ্ধির বালুচরে অন্তর্হিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ওয়েস্‌লি ও তাঁর সতীর্থদের ধর্মপ্রচার জনমনের উদাসীনতা ও আলস্যের কঠিন আবরণ ভেঙ্গে দিয়েছিল। ভগবৎ প্রেম মানুষের প্রতি ভালোবাসার নামান্তর, সমাজের দুঃখী আতুর পীড়িত ব্যক্তিদের প্রতি সহানুভূতি সে যুগের সাহিত্যেও স্থান পেয়েছিল। দরিদ্রের জন্য বহু হাসপাতাল অনাথ আশ্রম ও অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হল। দাস-ব্যবসা পরিত্যক্ত হল।

ফরাসি বিপ্লবের পর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

বিপ্লবোত্তর যুগে ইয়োরোপের বাহিরে রাজ্য ও প্রভাব বিস্তারের জন্য পাশ্চাত্য শক্তিগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতার অবসান হল। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে

ফ্রান্স কানাডা উপনিবেশ ব্রিটেনের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ভারতবর্ষে ফরাসি সাম্রাজ্য স্থাপনের আশাও নির্মূল হয়ে গিয়েছিল। কেবলমাত্র লুইসিয়ানা, কয়েকটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ, পশ্চিম আফ্রিকার কয়েকটি স্থান এবং ভারতবর্ষে দুইটি ঘাঁটি তার হাতে ছিল। নেপোলিয়ন লুইসিয়ানা এবং মিসিসিপি নদীর অপর পারের বিস্তৃত স্থান যুক্তরাষ্ট্রকে বিক্রয় করে দেন। সুতরাং ফরাসিদের সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন ভেঙে গেল।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন আমেরিকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা স্বীকার করে। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের সময় ডাচ্‌গণ দক্ষিণ আফ্রিকা সিংহল এবং যবদ্বীপ ব্রিটেনের হস্তে সমর্পণ করে। নেপোলিয়ন স্পেন জয় করলে দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার উপনিবেশগুলি বিদ্রোহী হয় এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করে রিপাব্লিক স্থাপন করে। নেপোলিয়নের পতনের পর ইয়োরোপের শক্তিবর্গ স্পেনের আনুগত্য স্বীকার করার জন্য তাদের বাধ্য করতে চায় কিন্তু মনরো নীতি ও ব্রিটিশ নৌবহর বাধা সৃষ্টি করে। ঔপনিবেশিকগণের স্বাধীনতা অব্যাহত থেকে গেল। সুতরাং স্পেনের সাম্রাজ্যও নষ্ট হয়ে গেল।

ইয়োরোপের জাতিরা দেখল সমুদ্র পারে উপনিবেশ স্থাপন এবং তাকে রক্ষা করতে হলে যে অর্থ ব্যয় ও শক্তি নষ্ট করতে হয় তার তুলনায় লাভ অতি অল্প। টারগো বলেছেন—উপনিবেশ গাছের ফল। কাঁচা ফল গাছে ঝুলতে থাকে। পাকিলেই তার বোঁটা খসে। নেপোলিয়নিক যুদ্ধের পর ষাট বৎসর ইয়োরোপেব রাষ্ট্রগুলি অন্তর্বিপ্লবে ও যুদ্ধে এতদূর বিপর্যস্ত হয়েছিল যে অন্য কোন দিকে তারা মনোযোগ দিতে পারেনি।

ইয়োরোপের এইরূপ সামাজিক ও বাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে ব্রিটেন সর্বেসর্বা হয়ে ওঠে। সমুদ্রের বাণী ব্রিটেনের দশ হাজার জাহাজ ব্যবসার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করত। তার শিল্প উন্নত ছিল। তার পণ্য বিভিন্ন দেশের লোক ক্রয় করত। তার ধর্মপ্রচারকরা অখ্রীষ্টান দেশে তার সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করত। তার লোক-সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং নূতন সাম্রাজ্য গঠনের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় সে তার সদ্ব্যবহার করেছিল।

কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষ তার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ভারতবর্ষ ছাড়া এই সকল দেশে ব্রিটিশ আদর্শে স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। আমেরিকার যুক্তরাজ্য হস্তচ্যুত হয়ে

প্রথম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস হয়ে যায় কিন্তু দ্বিতীয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার ক্ষতিপূরণ করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দী—পূর্বার্ধ

নেপোলিয়ানের বিরাট সৈন্যদল মস্কো পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে অশেষ দুঃখ ভোগের পর প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হয় এবং পথে শত্রুর আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গেল। জার আলেকজান্দার ইয়োরোপের ত্রাণকর্তারূপে বরমাল্য লাভ করলেন। ঊনবিংশ শতকের পূর্বার্ধ ইংল্যাণ্ডের শিল্পোন্নতির যুগ। সে সময়ের চিন্তাধারা এবং প্রচলিত অর্থশাস্ত্র যুগোচিত প্রভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। নূতন চিন্তা প্রাচীন ভাব ও কর্মপন্থার কঙ্করময় পথ ভেদ করে প্রবাহিত হচ্ছিল।

নেপোলিয়নিক যুগের অব্যবহিত পরেই ইংল্যাণ্ডের সমাজে কয়েকটি স্তর ছিল। ধনিক ও শ্রমিক সমস্যা তখনও সমস্যার আকারে দেখা দেয়নি। গ্রাম্য সমাজে জমিদার কৃষক ও মজুর ছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে টোরি এবং হুইগ্ নামে দুইটি দল ছিল। টোরিগণ প্রাচীনপন্থী ছিল। আমেরিকার বিদ্রোহ ও ফরাসি বিপ্লবকে তারা সুনজরে দেখত না। হুইগগণ একটু উদার ভাবাপন্ন ছিল।

১৮১৫ সালের পর অন্যান্য জাতি ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্যের উপর শুল্ক চাপিয়ে দিল। শিল্পপ্রধান অঞ্চলে লোকের দুর্দশার সীমা ছিল না। গ্রামের মজুরদের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠল। সুতার কলের মজুরদের অবস্থাও সচ্ছল ছিল না। ঊনবিংশ শতকের প্রারম্ভে ইংল্যাণ্ডের সমাজদেহ ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। তখনকার চিন্তাশীল ব্যক্তিদের চিত্তক্ষেত্রে নূতন পরিস্থিতির প্রভাবে আলোড়িত হয়ে যে ভাব ও ধারণার জন্ম দিয়েছিল তা অর্থনীতি বিজ্ঞান নাম ধারণ করল। বেন্থামের দর্শন এবং হার্টলির নিকট প্রাপ্ত জেমস্ মিলের মনোবিজ্ঞান নূতন অর্থনীতি বিজ্ঞানের সহিত সংমিশ্রিত হয়ে যে মতবাদ সৃষ্টি করেছিল তার নাম দার্শনিক চরম সংস্কারবাদ। এই মতবাদ অর্ধশতাব্দী ধরে ব্রিটিশ রাজনীতিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এই মতবাদের উপাসকগণ অনুভূতির স্থানে বুদ্ধির আধিপত্য স্বীকার করেছিলেন। তাঁরা বুদ্ধির শক্তিতে অত্যধিক বিশ্বাসী ছিলেন। জন স্টুয়ার্ট মিল্ এদের অন্যতম। যুক্তিবাদীগণ কেবলমাত্র বুদ্ধির সাহায্যে জীবনকে

উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ভুলে গিয়েছিলেন যে জীবনকে বুঝতে হলে বুদ্ধিকে অতিক্রম করতে হয়। বিজ্ঞান বা বুদ্ধি আমাদের পৌঁছে দিতে পারে রহস্যের বহির্দ্বারে। সাহিত্য চিত্র সঙ্গীতকলার মধ্যে অনুভূতির স্থান অবিসংবাদী। এমন কি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মূলে প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, অনুভূতি বর্তমান আছে। জীবনের চরম সত্যকে অনুভূতি দ্বারা উপলব্ধি করতে হয়। জীবনে যুক্তির স্থান অস্বীকার করা যায় না। বুদ্ধি কেবলমাত্র যোগায় প্রমাণ, প্রামাণ্য অনুভূতিগম্য।

আডাম স্মিথ ছিলেন ইংল্যাণ্ডে অর্থনীতিশাস্ত্র আলোচনার অগ্রদূত। তিনিই প্রথমে অবাধ বাণিজ্য নীতির সপক্ষে যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, ব্যক্তি ও সমাজের স্বার্থ অভিন্ন। উদার স্বার্থসেবা-পরিচালিত ব্যবহার হিতসাধন-প্রবৃত্তি-পরিচালিত ব্যবহারের অনুরূপ। এই নীতি অনুসারে উৎপাদনকারীর স্বার্থে সমাজের সত্যকার স্বার্থ সাধিত হয়। সুতরাং যে শ্রমিক ধনিক মনিবের বিরুদ্ধতা করে সে নির্বোধ।

ম্যালথাসের জনসংখ্যাবিষয়ক মতবাদ এই যুগের এবং পরবর্তী কালের সমাজ বিজ্ঞান নিয়ন্ত্রিত করেছিল। তাঁর মতে অতি-প্রজনন থেকে পৃথিবীতে শীঘ্রই খাদ্যাভাব উপস্থিত হবে। প্রজা বৃদ্ধির অন্তরায় না থাকলে জনসংখ্যা ন্যূনাধিক পঁচিশ বৎসরে দুই গুণ বেড়ে যায়। কিন্তু সাধারণতঃ তিনটি কারণে ইহা হয় না, যেমন—ইন্দ্রিয় দমন, অধর্মাচরণ এবং দুরবস্থা। এর মধ্যে দুরবস্থাই জনসংখ্যা হ্রাসের মূল কারণ। শ্রমিকদের ভিতর শিক্ষা বিস্তার করে তাদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতিসাধন করাই দারিদ্র্য দূর করার একমাত্র উপায়। দার্শনিক উদারমতবাদীগণ বিচার-বিবেচনাকে প্রধান স্থান দিয়েছেন। তাঁদের মতবাদে আবেগ অনুভূতি ও প্রেমের স্থান নাই।

বেস্থাম ও তাঁর প্রধান শিষ্য জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে, সুখই জীবের কাম্য। মনোবিজ্ঞান ও নীতিবিজ্ঞান বেন্থাম দর্শনের দুইটি স্তম্ভ। আঠারো শতকের মধ্যভাগে সমাজবিজ্ঞানের দুইটি মূল সূত্রের অস্তিত্ব অনুভূত হয়েছিল। এর একটির নাম অনুষঙ্গ এবং অপরটির নাম উপযোগ।

মানুষমাত্রেই সুখ চায়, দুঃখ চায় না। যে ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠান যতখানি প্রয়োজন সিদ্ধ করে তার ততখানি সার্থকতা। কিন্তু মানুষ একক নয়, তার সমষ্টি আছে। সুতরাং বৃহত্তম সংখ্যার বৃহত্তম মঙ্গল উপযোগের (utility) আদর্শ। এই আদর্শ নির্ধারণ সম্ভব করতে হলে দুইটি বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন—

প্রথমত, মানুষের সুখ পরিমাণ সাপেক্ষ। দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন ব্যক্তির মূল্য সমান। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির সুখের ধারণা অবশ্য এক নয়। এর কারণ কেবলমাত্র অনুষঙ্গের (association) মূলনীতি।

হিতবাদের প্রধান আচার্য বেন্থাম সুখের জাতিভেদ স্বীকার করতেন না। তাঁর দৃষ্টিতে সকল প্রকারের সুখ সমান। তাঁর প্রধান শিষ্য মিল সুখের শ্রেণীবিভাগ করতে বাধ্য হন। তিনি বলেন, সুখ একজাতীয় নয়, সুখের মধ্যে উচ্চনীচ ভেদ সুস্পষ্ট। আত্মতৃপ্ত নির্বোধের চেয়ে অসন্তুষ্ট সক্রেটিস হওয়া বাঞ্ছনীয়, আত্মতৃপ্ত শূকরের চেয়ে অসন্তুষ্ট মানুষ শ্রেষ্ঠতর।

দার্শনিক চরম সংস্কারবাদের আর্থিক রাষ্ট্রিক ও নৈতিক সিদ্ধান্তগুলি ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে নানাভাবে ও নানারূপে প্রভাব বিস্তার করেছিল। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রিকার্ডো ও ম্যালথাস্ এই মতবাদকে রূপায়িত করেছিলেন। বেন্থামপন্থীগণ আডাম স্মিথের উত্তরাধিকারী ছিলেন। রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে তাঁরা স্টেটের কার্যপরিধি সংকীর্ণ করার পক্ষপাতী হয়ে পড়েন। আবার তাঁরা গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন এবং নারীর রাষ্ট্রিক অধিকার স্বীকার করতেন। সাম্রাজ্য বিস্তার ও উপনিবেশ স্থাপনে তাঁদের আগ্রহ ছিল না। নীতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে প্রত্যেক ব্যক্তিই সুখ অন্বেষণ করে এবং মানুষ নিজ স্বার্থের শ্রেষ্ঠ বিচারক।

ইংল্যাণ্ডের শাসনপদ্ধতি সংস্কার, জনশিক্ষা বিস্তার, আইন-কানুন পরিবর্তন, গণতন্ত্রের বিকাশ ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে দার্শনিক সংস্কারকদের হস্তচিহ্ন বর্তমান। উনিশ শতকের মাঝামাঝি এই মতবাদ মাঞ্চেষ্টারের সংস্কারবাদরূপে পরিণত হয়েছিল। তার মধ্যে আর্থিক চিন্তা প্রধান স্থান গ্রহণ করেছিল। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য ষ্টেটের ক্ষমতা বৃদ্ধির পক্ষে অন্তরায় সৃষ্টি।

বিজ্ঞান সাধনা। ইউরোপের রাজনৈতিক আকাশে নেপোলিয়ানের অভ্যুদয় সর্বগ্রাসী উল্কার মতো ইয়োরোপীয় সভ্যতা প্রগতি ও সঙ্ঘজীবনে সাময়িক বিশৃঙ্খলা ও বিকলন সৃষ্টি করেছিল। অন্য রাজ্যকে অকারণ আক্রমণ করার আত্মঘাতী প্রবৃত্তি এক গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করেছিল। ভয় নৈরাশ্য ও সংশয় মানুষের চিত্ত আচ্ছন্ন করেছিল বটে কিন্তু যুগযুগান্তের অক্লান্ত সাধনায় মানুষ যে সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে তুলেছিল তা বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ইয়োরোপব্যাপী দাবানলের ভিতর যে সঙ্ঘশক্তি জন্মলাভ করেছিল

তা মেকিয়াভেলি প্রবর্তিত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের সমাধি রচনা করে অন্ততঃ ইয়োরোপীয় মানুষের সমগ্রতার ভাব প্রকাশ করেছিল।

রেনাসাঁস প্রতীচ্য মানুষের মনকে মুক্ত করার পর সামাজিক ও রাজনৈতিক বিষয়ে সংগঠন চলে। উনিশ শতকে বিজ্ঞান সাধনার ফলে জীবনযাত্রা-প্রণালীর আমূল পরিবর্তন ঘটে। রোজার বেকনের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হল। প্রকৃতির উপর মানুষের প্রভুত্ব স্থাপিত হল। প্রকৃতিকে প্রাকৃতজনের কার্যে নিযুক্ত করা হল। এর প্রথম সুফল বাষ্পীয় যন্ত্র। অষ্টাদশ শতকে বাষ্পীয় যন্ত্র কয়লার খনিতে জল সেচনের জন্য ব্যবহৃত হত। জেমস্ ওয়াট্ নামে গ্লাসগোর একজন কারিগর তার উন্নতি করে যন্ত্রপাতি চালনায় নিযুক্ত করেছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে নটিংহামে প্রথম বাষ্পীয় যন্ত্র সাহায্যে সুতার কল চালান হয়েছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ট্রেভিথিক্ ওয়াট ইঞ্জিনকে আশ্রয় করে মালপত্র বহন বা স্থানান্তরে প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। ১৮২৫ সালে যাত্রী বহনের জন্য প্রথম রেলগাড়ি চালিত হয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি ইয়োরোপের সকল দেশে রেল লাইন বিস্তৃত হয়েছিল।

১৮০২ খৃষ্টাব্দে সারলটি ডানডাস্ নামে বাষ্পীয় পোত ক্লাইড খালে চলাচল করত। ১৮০৭ সালে ফুল্টন নামে একজন আমেরিকান ক্লেয়ারমণ্ট নামক একখানি যাত্রীবাহী জাহাজ হডসন নদীতে চালিয়েছিল। ১৮১৯ সালে সাভান্না নামক বাষ্পীয় পোত প্রথম আটলান্টিক মহাসাগরে পাড়ি দিয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি বাষ্পীয় পোত বাণিজ্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল। বাণিজ্য দ্রুত প্রসার লাভ করল। বিভিন্ন দেশে যাতায়াতের পথ নির্বিঘ্ন ও সুগম হল। এদিকে ভেল্টা গ্যালভানি ও ফ্যারাডে বিদ্যুৎ সম্বন্ধে গবেষণা করতে লাগলেন। ১৮৩৫ সালে বৈদ্যুতিক বার্তাবহ ব্যবহৃত হল। ১৮৫১ সালে ইংল্যাণ্ড এবং ফ্রান্সের মধ্যে সমুদ্রের নীচে প্রথম তার বসান হল। কয়েক বৎসরের ভিতর বৈদ্যুতিক বার্তাবহ অত্যাবশ্যক জনপ্রিয় বস্তু হয়ে উঠল। কয়লার আগুনে খাদ-মিশ্রিত ধাতু থেকে খাঁটি লোহা প্রস্তুত হল। লোহার চাদর শিক প্রভৃতি নির্মিত হল। প্রথমে বেল্‌সিমার প্রক্রিয়ায় এবং পরে হাপরে ইস্পাত ও লোহা গলান হল। ইস্পাত ও লোহাকে ইচ্ছামত আকার দিয়ে বিরাট অর্ণব পোত, বৃহৎ সেতু এবং অট্টালিকার কাঠামো প্রস্তুত হচ্ছে। ক্রমে তামা, টিন, নিকেল, অ্যালুমিনিয়ম প্রভৃতি ধাতু, কাঁচ, পাথর, রঙ্ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

প্রথমে ইংরেজ ও ফরাসিগণ বৈজ্ঞানিক জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। পরে জার্মানরা বিজ্ঞান আলোচনায় প্রতিষ্ঠা অর্জন করল। এক্ষণে আমেরিকা ও রাশিয়া ব্যবহারিক ও ফলিত বিজ্ঞানে অগ্রসর হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয় বিত্তশালী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। গ্রীক লাটিন লেখক ও কবিদের গ্রন্থাবলী তাদের জ্ঞানচর্চার খোরাক যোগাত। তখন বাগ্‌দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে বিজ্ঞান অস্পৃশ্যা রমণীর মতো অনাদৃত অবস্থায় অবস্থান করছিল। শিক্ষক ও যাজক সম্প্রদায়ের বিরোধিতা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ডে বিজ্ঞান উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। জার্মেনিতে বিজ্ঞান আলোচনার পথ খোলা ছিল।

বৈশ্যবৃত্তিসম্পন্ন কৌশলী ব্যক্তিবা বিজ্ঞানীদেব আবিষ্কারকে বিত্ত উপার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছে। তারা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি দ্বারা বিপুল পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন এবং মোটা লাভে উদর পূরণ করছে।

যন্ত্রশিল্প ও শিল্পবিপ্লব

যন্ত্রবিপ্লবের যুগ পৃথিবীর বৃহৎ কারখানার যুগ। মানুষ যন্ত্রনির্মাণকারী জীব। অতি প্রাচীনকাল থেকে মানুষ যন্ত্রনির্মাণ ও ব্যবহার করে এসেছে। যন্ত্রই মানুষকে অন্য জীবের উপর আধিপত্য স্থাপনে সাহায্য করেছে। হাতিয়ার মানুষের তৃতীয় হস্ত। যন্ত্র সাহায্যে মানুষ সমাজকে প্রকৃতির বন্ধন থেকে মুক্তি দিয়েছে। ব্যবহারিক প্রয়োজন মেটানর আকাজ্ক্ষা শিল্পের জনক। হস্তসম্পাদ্য কার্যের সাহায্যে এবং সহজ যন্ত্রের উদ্ভাবনে মানুষ শিল্পবুদ্ধি চরিতার্থ করছিল। কুটীর-শিল্প ধনোৎপাদনের উপায় ছিল। ক্রমে তা বৃহৎ কারখানায় পরিণত হল, বিপুল পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন হতে লাগল, তার বিক্রয়ের ব্যবস্থা করতে হল। বিদেশের অর্থে কারখানার মালিকগণ ধনী হয়ে উঠল এবং দরিদ্রগণ আরও দরিদ্র হয়ে গেল। একদিকে মানুষ সহযোগিতা সংগঠন ও সময়ানুবর্তিতা শিক্ষা করল, অন্যদিকে জীবন প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত হল। সুখ আনন্দ ও শিল্পবুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেল।

প্রাচীন জগতে একমাত্র মানুষই ছিল সকল শক্তির আধার। শারীরিক শক্তির উপর সকল বস্তু নির্ভর করত। কায়িক পরিশ্রম কৃষিকার্যে ভারবস্তু উত্তোলনে ও নৌকা চালনায় প্রযুক্ত হত। প্রাচীন কালের স্থাপত্যে, বিরাট অথবা ক্ষুদ্র বস্তুর ভিতর এর মর্মন্তুদ অলিখিত কাহিনীই প্রতিষ্ঠা

লাভ করেছে। পূর্বে মানুষ যন্ত্রের মতো পরিচালিত ও ব্যবহৃত হত। ঊনবিংশ শতকের নূতন পরিস্থিতির ভিতর মানুষ আর যন্ত্রের মতো ব্যবহৃত হল না। সে এখন বুদ্ধির কাজে নিযুক্ত হল। যন্ত্রপাতি ব্যবহারের সহিত মানুষ হয়ে দাঁড়ানর সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থনৈতিক সমস্যা তীব্রতর হয়ে উঠল। ইংল্যাণ্ডে উদার মতবাদের বিকাশ হয়েছিল কিন্তু তা মুষ্টিমেয় ভাববিলাসীদের ভিতর সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁরা ফরাসি বিপ্লবের মূলধন নিয়ে কারবার করছিলেন। তাঁদের স্বাধীনতার ধারণা কতকটা অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট ছিল। তার ভিতর সাম্যবাদও বর্তমান ছিল।

প্রাচীনকালে জমিই ছিল ধনোৎপত্তির প্রধান ও একমাত্র উপায়। সুতরাং জমিদারগণ সমাজে ও রাষ্ট্রে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থায় একদিকে জমিদারের প্রাধান্য ও সচ্ছলতা, অন্যদিকে অর্ধদাস কৃষকদের হীন অবস্থা ও দুঃখ ছিল। সম্পত্তির সহিত রাষ্ট্রিক অধিকারও উত্তরাধিকারসূত্রে পুত্রের হাতে আসত। জনকয়েক লোকের ভোটে পার্লামেণ্টে সভ্য নির্বাচন হত। 'পকেট বরো' থেকে সহজেই পার্লামেণ্টে প্রবেশ করা চলত। দরিদ্রগণ টাকার বিনিময়ে ভোট ক্রয় করতে পারত না। সুতরাং তারা বা তাদের প্রতিনিধি কস্মিনকালে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করতে পারত না। ফ্রান্সের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়েছিল। ফ্রান্সই ফিউডাল সমাজ ব্যবস্থার জন্মস্থান। সেখানে অত্যুগ্র উদার মত প্রচারের ফলে বিপ্লব হল। ফরাসি বিপ্লব ছিল প্রধানতঃ সামাজিক বিপ্লব কিন্তু ইংলণ্ডের বিপ্লব অর্থনৈতিক এবং আমেরিকার বিপ্লব রাজনৈতিক ছিল।

১৮৩০ সালের পূর্বে ও পরে ইয়োরোপে উদার মতবাদের প্রবল ঝড় বয়েছিল। ইংল্যাণ্ডে ফ্রান্সের মতো বৈপ্লবিক চিন্তার জন্ম হয় নি। সেখানে পরিবর্তন ধীরে ধীরে চলেছিল। ১৮৩২ সালে ইংল্যাণ্ডে রিফর্মবিলের সাহায্যে ভোটাধিকার বৃদ্ধি করা হল। পার্লামেণ্টে জনসাধারণের প্রতিনিধি প্রবেশ করল। আন্দোলন ও উত্তেজনার কিছু উপশম হল।

প্রত্যেক যুগের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ধনোৎপাদন পদ্ধতিতে বিপ্লব আঠারো শতকের শেষভাগে আরম্ভ হয়। উনিশ শতকে তাহা পূর্ণ প্রকাশ লাভ করে। ইয়োরোপীয় কর্তৃত্ব ও সভ্যতা পৃথিবীর প্রায় সকল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাই এই যুগের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্রের আদর্শ পুরাতন হলেও এর সর্বত্র গ্রহণ এবং তদনুসারে শাসনপদ্ধতির সংস্কার

উনবিংশ শতকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। গণতন্ত্রের প্রচুর সমালোচনা হয়েছে কিন্তু আদর্শ হিসাবে তার স্থানে গ্রহণযোগ্য অন্য কোন মত আজ পর্যন্ত স্বীকৃত হয় নি।

বিখ্যাত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সমাজসংস্কারক বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন যে, নেপোলিয়নের পতনের সময় থেকে প্রথম মহাযুদ্ধের আরম্ভ পর্যন্ত (১৮১৫-১৯১৪) একশত বৎসরের ইতিহাসে দুইটি মূলসূত্র দেখা যায়। এর প্রথমটিকে যুক্তির প্রয়াস বলা যেতে পারে। স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা এবং স্বায়ত্তশাসনের সঙ্কল্প এরই অন্তর্গত।

আঠারো শতকের শেষদিকে যে উদার মতবাদ প্রচারিত হয়েছিল পরবর্তী শতকে তারই সাফল্য সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই উদার মতবাদের আক্রমণে বহুযুগ সঞ্চিত রাষ্ট্রিক আর্থিক ও সামাজিক অন্তরায় ক্রমে ক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত ও অপসারিত হওয়ার ফলে যুক্তি ও স্বাধীনতার স্থান প্রশস্ততর হয়েছিল। স্পেনের এবং দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার উপনিবেশ সকল গ্রীস, বেলজিয়ম, ইটালী, বলকান অঞ্চলের খণ্ড রাজ্যগুলি নরওয়ে এবং আংশিকভাবে ব্রিটিশ সামাজ্যের অন্তর্গত ডোমিনিয়নগুলি পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভ করেছিল। বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক আদর্শ অনুসৃত হল। আর্থিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজ্য জয়যুক্ত হয়েছিল। মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের ভিতর রাষ্ট্রিক বা অন্য কোন ব্যবধান অন্তর্হিত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। শ্রমিক ও সাধারণ মানুষও প্রাচীন প্রথা ও আইনের বন্ধন থেকে মুক্ত হল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এবং পরে আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ও অন্যান্য দেশে দাস ব্যবসার উচ্ছেদ হল। ধর্মবিশ্বাস, স্বমতপ্রকাশ ও প্রচারের স্বাধীনতা এই শতাব্দীর গৌরবের বিষয়। সুতরাং মুক্তি ও স্বাধীনতা প্রচার উনবিংশ শতকের একটি প্রধান বস্তু।

রাসেলের মতে, এই শতাব্দীর দ্বিতীয় মূলসূত্র সংগঠন ও সংহতি। সংগঠন মুক্তির পরিপন্থী। আর্থিক জগতে সংগঠন পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেল। উৎপাদনের ক্ষেত্রে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা মুষ্টিমেয় লোকের করায়ত্ত হল। বাণিজ্যে জাতীয়তা ও সংরক্ষণ নীতি আত্মপ্রকাশ করল। সামাজিক ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পেল। দুর্বলকে রক্ষা করার, জনসাধারণকে শিক্ষা দিবার, দেশের সর্ববিধ প্রচেষ্টাকে সংগঠিত ও সুশৃঙ্খল করার ভার

রাষ্ট্রের উপর ন্যস্ত হল। জাতীয়তা মানুষের মিলনের পথে বাধা সৃষ্টি করল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ পরস্পর বিরোধী অংশে বিভক্ত হল। অপর দেশের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য রাষ্ট্রের ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত ব্যক্তি স্বাধীনতা হ্রাস হয়ে গেল। বিশ্বব্যাপী মহাসমর আর্থিক সমস্যার জটিলতা ও জাতি-বিদ্বেষ বৃদ্ধির অবশ্যম্ভাবী বিষময় ফল। উনবিংশ শতকে প্রত্যেক দেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক জীবনে একদিকে যেমন সংগঠনের আধিক্য, অন্য দিকে তেমনি আন্তর্জাতিক ব্যাপারে রাষ্ট্র সার্বভৌমিক স্বাধীনতা লাভ করল।

সুতরাং উদার নীতি উনবিংশ শতকের যুগধর্ম। এর লক্ষ্য ছিল জাতিগত স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত অধিকার ও স্বাতন্ত্র্য স্বীকার, আইনের চক্ষে সকলের সমানভাব, নিয়মতন্ত্রমূলক শাসনপদ্ধতি, রাষ্ট্রিক ব্যাপারে জনসাধারণের অবাধ কর্তৃত্ব। সাম্যবাদের মূলনীতি ব্যক্তিগত সম্পত্তির উচ্ছেদসাধন ও জড়বাদ।

গণতন্ত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্য থেকে মস্তকে জয়টিকা ধারণ করে এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শে আত্মবিশ্বাস অর্জন করে ইংল্যাণ্ডে আবির্ভূত হয়েছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা চার্টিষ্টগণ আমেরিকান আদর্শের তত্ত্বাংশে অনুপ্রাণিত হলেও প্রথমে কৃতকার্য হতে পারেন নি। কবডেনের বন্ধু জন ব্রাইট এবং তাঁর পরে গ্লাডষ্টোন (১৮৪১-৪৬) পার্লামেণ্টে জনসাধারণের প্রতিনিধি নির্বাচন প্রণালীর ব্যাপক প্রয়োগের যে দাবী করেছিলেন তার ভিতরই ইহা সার্থকতা লাভ করেছিল।

জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদ—১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীতে তিনটি মতবাদ প্রচলিত ছিল—প্রথম, আমেরিকার গণতন্ত্রবাদ, দ্বিতীয়, দার্শনিক চরম সংস্কারবাদ এবং তৃতীয়, উদার মতবাদ।

দার্শনিক চরম সংস্কারবাদীদের মতে, জন্ম থেকে সকল মানুষ সমান। তাদের ভিতর পার্থক্যের কারণ শিক্ষা ও বেষ্টনী। ধর্মবিষয়ে তারা ছিল সন্দেহবাদী, নীতিতে দুঃখবাদী। তারা বলেছিল, স্বার্থ ই কর্মের প্রেরণা দেয়। বিচারবুদ্ধি স্বার্থ নিয়ন্ত্রণ করে, শাসনব্যবস্থা নানা স্বার্থের সমন্বয় সাধনের কৌশলমাত্র। তাদের আদর্শ বিশ্বপ্রেম, তাদের বৈশিষ্ট্য বিচারপরায়ণতা, তাদের উদ্দেশ্য গণতন্ত্র স্থাপন। উদারমতবাদীদের বিচারশীলতার চেয়ে ভাবপ্রবণতা বেশী ছিল। দুর্বল ও অত্যাচারিত ব্যক্তির দুঃখমোচনে তারা আগ্রহশীল ছিল। তারা 'পবিত্র চুক্তি'কে ঘৃণা করত, মেটারলিঙ্ককে সয়তানি

বুদ্ধির অবতার ভাবত, স্বাধীন মতবাদ ও বিপ্লবের জন্য ফ্রান্সকে ভালোবাসত, গ্রীসের উপর অত্যাচারের জন্য তুর্কীদের ঘৃণা করত এবং ইংরেজ কবি বাইরনের ভক্ত ছিল।

ভিয়েনা বৈঠকে যে সকল তথা-কথিত রাজনীতিজ্ঞ সমবেত হয়েছিলেন তাঁরা বিভিন্ন জাতিকে নিজেদের খেয়াল অনুসারে বিভক্ত করেছিলেন। ভৌগোলিক সংস্থান ঐতিহ্য সংস্কৃতি ধর্ম ও ভাষার দিকে লক্ষ্য না করে কেবলমাত্র বৈপ্লবিক মতবাদ দমনের উদ্দেশ্যে তাঁরা এই সহজ উপায় অবলম্বন করেছিলেন। ফলে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের মধ্যে মমত্ববোধ নষ্ট হয়েছিল, শাসন ব্যবস্থার সহিত দেশবাসীর রক্তের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছিল। এইরূপ অবস্থায় প্রাকৃত মানুষের স্বভাবসিদ্ধ দলপ্রীতি বা গোষ্ঠীভাব জাগ্রত হল, স্বাদেশিকতার জন্ম হল। স্বদেশপ্রেম মনুষ্য চরিত্রের একটি মহৎ গুণ। যিনি নিজের দেশকে ভালোবাসেন তিনি নমস্য কিন্তু যিনি বিদেশের ঠাকুর ফেলে' স্বদেশের কুকুরকে মাথায় রাখেন, তিনি মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা ও বিদ্বেষ, শত্রুতা ও প্রতিহিংসার ইন্ধন দেন। মানুষ চিন্তা করতে শিক্ষা করল যে স্বাদেশিকতা তার ইহকালের সর্বস্ব ধন, তার অস্তিত্বের প্রাণবায়ু, তার জাতীয় জীবনের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। জার্মেনি, ইটালি ইংলাণ্ড প্রভৃতি দেশের জাতীয়তা জার্মেনিয়া ইটালিয়া ব্রিটিশ সিংহ প্রভৃতির প্রতীক হয়ে উঠল। এইরূপ উগ্র স্বাদেশিকতা এশিয়ায় আমদানী হল। এমন কি বাঙালি মনস্বী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনায় ভারতমাতার মূর্তি সুস্পষ্ট আকার ধারণ করেছিল।

অপর জাতির স্বার্থের দিকে দৃষ্টি না রেখে যে কোন জাতি নিজ স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে যে কোন কাজ করতে পারে, এইরূপ ধারণা উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদের মূলমন্ত্র। কিন্তু যখন আমরা ভেবে দেখি যে আধুনিক যুগের কোন জাতির স্বার্থ তার ভৌগোলিক সীমার ভিতর আবদ্ধ নয়, সকল জাতির স্বার্থের সংগে জড়িত, তখন জাতীয়তাবাদের অযৌক্তিকতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

জাতীয়তাবাদ প্রচারের সহিত সবল জাতিদের ভিতর সাম্রাজ্যবাদের জন্ম হল। উন্নত ও শক্তিশালী জাতি দুর্বল ও অনুন্নত জাতিকে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত করার দাবী করল। শ্বেতজাতিগণ একে তাদের বিধিনির্দিষ্ট কর্তব্য মনে করল। তাদের মতে সাম্রাজ্য উন্নত জাতির লক্ষণ। এলিজাবেথের

সময় ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্য ছিল না। ক্রমে ইংল্যাণ্ড বিশ্বজোড়া সাম্রাজ্য গড়ে তুলল। যুক্ত-রাজ্য হস্তচ্যুত হওয়ায় ইংল্যাণ্ডের প্রথম সাম্রাজ্য নষ্ট হয়ে যায়। এবার কানাডা অষ্ট্রেলিয়া নিউজিল্যাণ্ড দক্ষিণ আমেরিকা এবং ভারতবর্ষ নিয়ে তার দ্বিতীয় সাম্রাজ্য স্থাপিত হল। পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে কয়েকটি দেশ মালয় উপদ্বীপ ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি দ্বীপ জামাইকা ব্রিটিশ গায়েনা এবং হণ্ডুরাস তার তৃতীয় সাম্রাজ্য গঠন করল।

জাতীয়তা ও সাম্রাজ্যবাদের প্ররোচনায় জার্মেনি সমগ্র ইয়োরোপকে কবলিত করতে চেয়েছিল, ইটালি অসভ্য আবিসিনিয়াকে সুসভ্য করার জন্য তাকে দখল করেছিল এবং ইয়োরোপের মন্ত্রশিষ্য জাপান সমগ্র এশিয়ায় একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিল।

উৎকট জাতীয়তা বা সাম্রাজ্যবাদ আন্তর্জাতিক যুদ্ধের জনক। যুদ্ধ বিবাদের প্রকৃত মীমাংসা করতে পারে না, অশান্তি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় না। প্রাচীনকালে যুদ্ধ সভ্যতা বিস্তারে সাহায্য করেছে। আধুনিক যুদ্ধ সর্বধ্বংসী ও সর্বগ্রাসী। সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে যুদ্ধকে নির্বাসন দিতে হবে, শাশ্বত মহামানবিকতা জাগ্রত করতে হবে। এক জাতির বিপদ অন্য সকল জাতির বিপদ, এইরূপ মনোবৃত্তি সৃষ্টি না হলে যুদ্ধের অবসান সম্ভব নয়।

সমাজতন্ত্রবাদ—রুশোর সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী ফরাসি বিপ্লবের ভিতর পরিমূর্ত হয়ে উঠলেও, পরবর্তী দুইটি বিপ্লবে তা ব্যর্থ হয়ে গেল। সেই সময় কার্ল মার্কস্ নূতন বিপ্লবের বাণী ঘোষণা করলেন। তিনি বললেন, সমাজদেহেই বিপ্লবের বীজ নিহিত। বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থায় সমাজের যে বৃহত্তর শ্রেণী, যাদের নিজের বলতে কিছুই নাই, এই সর্বহারা দলের পরিপুষ্টিই বর্তমান অযৌক্তিক ও অন্যায় সমাজ-ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। ভবিষ্যতের বিপ্লব হবে সর্বব্যাপী। তার রূপ হবে এক ও অভিন্ন। সবহারা দলই রাষ্ট্রশক্তি অধিকার করবে এবং এজন্য তাদের সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে।

ইয়োরোপের সামাজিক অবস্থার যুগসন্ধিক্ষণে কার্ল মার্কসের (১৮১৮—১৮৮৩) আবির্ভাব ঘটে। তিনি বর্তমান সমাজতন্ত্রবাদের জনক। সর্বপ্রথমে তিনিই একে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপন করেন। মার্কস্ ছিলেন একাধারে পণ্ডিত ও বিপ্লবী নেতা। ঐতিহাসিক প্রগতির লক্ষ্য ও দিক নির্ণয়

করতে গিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিক বিদ্রোহ প্রবলতর হয়ে শ্রেণীভেদ উচ্ছেদ করবে। এজন্য শ্রমিক আন্দোলনকে সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তিনি চেয়েছিলেন একদিকে শ্রেণীবর্জিত ভবিষ্যৎ সমাজ গঠন, অন্যদিকে ধনতন্ত্রের ধ্বংস।

মার্কসের জীবদ্দশায় শ্রমিক সম্প্রদায় সোস্থাল ডিমোক্রাট দলে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। তাদের মতে, বিনা বিপ্লবে সমাজে শ্রেণীভেদ আপনা-আপনিই ধীরে ধীরে লোপ পাবে। কমিউনিষ্ট বা সাম্যবাদীদের মত বিপ্লবাত্মক। তাদের মতে, সশস্ত্র বিপ্লব পরিবর্তন সাধনের প্রকৃষ্ট ও সহজতম উপায়। উভয় দলের লক্ষ্য শ্রেণীবর্জিত সমাজ গঠন। প্রথম দলের গতি ধীর, কর্মপদ্ধতি শান্তিপূর্ণ। তাদের পন্থা বক্তৃতা ও প্রচার কার্য। দ্বিতীয় দলের পন্থা সশস্ত্র বিপ্লব।

সাম্যবাদের প্রধান সিদ্ধান্ত সমূহ

প্রথম, অতীত ও বর্তমানের সকল সমাজই শ্রেণী বিভাগের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনুষ্য সমাজ বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। অনেক সময় তাদের ভিতর সীমারেখা সুস্পষ্ট না হলেও তার অস্তিত্ব অস্বীকার করা চলে না। বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থের ঐক্য অসম্ভব। সুতরাং শ্রেণী স্বার্থের মধ্যে সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘাতই ইতিহাসের পটভূমি।

দ্বিতীয়, ধনতন্ত্রের যুগে ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর পার্থক্য সুস্পষ্ট। শ্রমিক যে পারিশ্রমিক পায় তার চেয়ে সে যে দ্রব্য উৎপাদন করে তার মূল্য অনেক বেশী। এই অতিরিক্ত দ্রব্যের নাম 'অতিরিক্ত সম্পদ' বা সারপ্লাস ভ্যালু। এই সম্পদ ধনিকের হাতে আসে। মার্কস একে 'শোষণ' বলেন।

তৃতীয়, রাষ্ট্র শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষার উপায়মাত্র। শ্রেণীবদ্ধ সমাজ থাকলে জাতির বা দেশের স্বার্থ কাল্পনিক।

চতুর্থ, শ্রেণীসংঘর্ষ দূর করার একমাত্র উপায় শ্রেণীবর্জিত সমাজগঠন। তার প্রথম সোপান শ্রমিকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ। বিপ্লবকে সম্ভব ও সার্থক করে তোলাই সাম্যবাদীর সাধনা।

পঞ্চম, বিপ্লবের অব্যবহিত পরেই নূতন সমাজ স্থাপিত হবে না। এর জন্য দীর্ঘকাল পরিশ্রম চাই। এই যুগসন্ধির সময় শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য প্রয়োজন।

ষষ্ঠ শ্রমিক শ্রেণীর একাধিপত্য চিরস্থায়ী নয়। শ্রেণীভেদ উঠে গেলে

ষ্টেটের নিষ্পেষণ যন্ত্রের কোন কাজ থাকবে না, রাষ্ট্রের অবসান ঘটবে এবং পূর্ণ সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে।

বিতর্কানুগত জড়বাদ (Dialectical materialism) এবং ঐতিহাসিক জড়বাদ (Historical materialism) মার্কসবাদের ভিত্তিভূমি।

প্রাচীনকাল থেকে দার্শনিকদের দুইভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। তাঁদের নাম আদর্শবাদী ও জড়বাদী। আদর্শবাদীরা মনে করেন যে জগতের মূল কারণ আত্মা বা বিদেহী জ্ঞান। দৃশ্যজগতের সকল বস্তুই তার রূপান্তর মাত্র। জড়বাদীদের মতে, জড়বস্তুই অস্তিত্বের আদি কথা। জড়ই বাস্তব ধ্রুব সত্য। দেহ-বিশেষের আধারের বাহিরে জ্ঞানের কোন অস্তিত্ব নাই।

ডায়ালেকটিক বা বাদানুবাদ পদ্ধতি মার্কস দর্শনের প্রথম কথা। হেগেল বলেন, জগতের কোন কিছুই স্থিতিসার নয়। বিশ্বপ্রপঞ্চ অবিরত রূপান্তরিত হচ্ছে। দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে সারসত্য পরমাত্মার আইডিয়া-রূপে বিরাজ করছে। প্রথমে একটি আইডিয়া আবির্ভূত হয়ে রূপগ্রহণ করে। তারপর তার বিরোধী আইডিয়া ভিন্নমূর্তিতে প্রকাশিত হয়। প্রথমটির নাম থিসিস, দ্বিতীয়টির নাম অ্যান্টিথিসিস্। এদের সঙ্ঘাতের ফলে সিন্থিসিস্ সৃষ্টি হয়। পরবর্তী যুগে আবার এই সিন্থিসিস্ বা সমন্বয় থিসিসের স্থান গ্রহণ করে। এ থেকে আবার নূতন সংঘাত ও নূতন সমন্বয়েব উদয় হয়। এইভাবে জগতের ইতিহাসের প্রতি পর্যায়ে পরমাত্মা ক্রমে ক্রমে স্বপ্রকাশ হয়ে নিজের পূর্ণতা উপলব্ধি কবেন। বিশ্বের বিবর্তনের মধ্যে আদর্শের এই লীলা হেগেলীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য।

মার্কস ও এঞ্জেল্‌স্-এর আদি গুরু হেগেল। হেগেলের আদর্শবাদ ত্যাগ করে তাঁরা জড়বাদ গ্রহণ করলেন। পুরাতন জড়বাদের ভিতর ঐতিহাসিক পরিবর্তনের সঙ্গত ব্যাখ্যা না পেয়ে হেগেলীয় ডায়েলেকটিকের সাহায্য নিয়ে তাঁরা জড়বাদের এক নূতন রূপ দিলেন। তাঁদের দর্শনে বিশ্বসংসার নিয়ত পরিবর্তনশীল ও চলন্ত গণ্য হয়ে থিসিস অ্যান্টিথিসিস এবং সিনথিসিস পর্যায়ভুক্ত হল। হেগেল যেখানে পরমাত্মার আইডিয়ার ক্রমবিকাশ ও ঘাত প্রতিঘাত দেখিয়েছিলেন মার্কস সেখানে প্রকৃত বস্তর অস্তিত্ব ও প্রভাব স্বীকার করলেন। মার্কস আদর্শবাদের বিদেহীজ্ঞান ও অস্তিত্ব অস্বীকার করলেন। তবে মার্কসের বস্তু নিছক জড়পদার্থ নয়, তার ভিতর মানুষের মনের ক্রিয়ারও যথাযোগ্য স্থান আছে।

ডায়লেকটিকের মূলতত্ত্ব বুঝতে হলে এর কতগুলি জ্ঞাতব্য তত্ত্ব মনে রাখতে হবে। জগতের সকল বস্তুই পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই বিবর্তন মানুষের আর্থিক বিধিব্যবস্থা সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান, এমন কি তার মনের ধারণা বা আইডিয়া রাজ্যেও লক্ষিত হয়। পরিবর্তনের বীজ বস্তুর মধ্যে নিহিত। গতির বেগ বস্তুর মধ্যস্থিত পরস্পর বিরোধী শক্তির সংঘর্ষের ফলমাত্র। কিন্তু বিবর্তন আকস্মিক বা লক্ষ্যহীন নয়। জড়পদার্থ জীবন বা মানুষের সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক গঠনই এমন যে ইনভোলিউশনের একটা বিশেষ লক্ষ্য থাকতে বাধ্য। বিবর্তন প্রণালীর সকল ক্ষেত্রেই একটা বিশিষ্টরূপ আছে—প্রথমে বস্তুবিশেষের উদ্ভব, পরে তার বিরোধী শক্তির সহিত সংঘাত, অবশেষে সমন্বয়। এই সমন্বয় থেকে আবার নূতন পরিবর্তন ধারার সূত্রপাত। বিরোধই ক্রমবিকাশের পথ দিয়ে সামঞ্জস্যে নিয়ে যাওয়ার উপায়। শ্রেণী-সংঘর্ষ থেকেই শ্রেণীভেদের অবসান হতে বাধ্য। সিনথিসিস ঠিক দুই বিরোধী বস্তুর মিলন নয়, তার ভিতর সর্বদা অতিরিক্ত কোন গুণের আবির্ভাব থাকে।

ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা মার্কস দর্শনের দ্বিতীয় কথা। ইতিহাসের একটা ধারা ও ঐক্য আছে। আদর্শবাদীরা সেই ঐক্য ভগবানের ইচ্ছায় বা মানুষের কোন বিশেষ মনোভাব বা প্রচেষ্টার ভিতর দেখতে পান। প্রথমটি সত্য হলে মানুষের বোঝার ও মাথা ঘামানর সার্থকতা নাই। আবার ঐতিহাসিক পরিবর্তন মানুষের ইচ্ছার অনুগামী হলে, প্রতিযুগে মানুষের অসংখ্য ইচ্ছা ও বিভিন্ন চেষ্টার ভিতর কোন কোনটি জয়যুক্ত ও অপরগুলি নিষ্ফল হয় কেন, এর কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না।

দেখা যায় বিশেষ কোন ধারণা সব যুগেই আবির্ভূত হয় না কিংবা হলেও প্রচলিত হয় না। আর্থিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য জাতীয় স্বভাব ভৌগোলিক সংস্থান আবহাওয়া খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকারভেদ যন্ত্রের উন্নতি প্রভৃতি অপরিবর্তিত থাকা সত্ত্বেও সামাজিক পরিবর্তন ঘটে। এজন্য জড়বাদীগণ ইতিহাসে আরও ব্যাপক কোন নির্দেশকের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। মার্কসপন্থীগণ বলেন, পণ্য উৎপাদনের ও বণ্টনের বিভিন্ন রীতিই ইতিহাসের বিভিন্ন যুগের নিয়ামক। মার্কসের মতে বর্তমান ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সামাজিক বিবর্তনের একটি অবশ্যম্ভাবী স্তর। চাষী ও মজুর তার অর্জিত ও ন্যায্য প্রাপ্য সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে সত্য কিন্তু এই বঞ্চনার মূলে

ব্যক্তি বিশেষের কোন আক্রোশ বা শত্রুতা নাই। এই বঞ্চনার মূলে আছে বর্তমান সমাজব্যবস্থা। সমগ্র বিশ্বের ন্যায় সমাজব্যবস্থাও ক্রমবিবর্তনের অধীন। বর্তমান সমাজব্যবস্থা সনাতন নয়। এর পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। এরই নাম ইতিহাসের জড়বাদমূলক বা অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা।

সাম্যবাদের দুর্বলতা। জগৎ সংসারে পরিবর্তন ডায়লেকটিকের নিয়ম অনুসারে হচ্ছে, হেগেলের এই মতের প্রমাণ নাই। ডায়লেকটিকের দুইটি নিয়ম কাল্পনিক ও অনুমান সাপেক্ষ। ডায়লেকটিকের নির্দিষ্ট রূপ থেকে সর্বত্র বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতাও কাল্পনিক। ফিউডাল সমাজ থেকে ধনতন্ত্রে আসার সময় সর্বত্র বিপ্লবের প্রয়োজন হয়নি। বিভিন্ন জাতি ও সভ্যতার উত্থান-পতনের সঙ্গে শ্রেণীসম্বন্ধের পরিবর্তনের যোগ সব সময় দেখা যায় না।

সাম্যবাদী বলেন, দারিদ্র্যই দুঃখের কারণ। দারিদ্র্যকে দূর করতে পারলে সাম্য, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে, পৃথিবী স্বর্গে পরিণত হবে। কিন্তু পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ এক রকমের নয়। নানা প্রকারের দুঃখ আছে। দুঃখ তিন প্রকারের—আধিভৌতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক। রোগ বেদনা জমির অনুর্বরতা প্রভৃতি আধিভৌতিক দুঃখ। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা এই শ্রেণীর দুঃখ দূর করতে পারি। মানুষের উপর মানুষের অত্যাচার অর্থনৈতিক দুঃখ। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার আমূল পরিবর্তনে এই দুঃখ দূর হতে পারে। ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা ও প্রবৃত্তির অত্যাচার আধ্যাত্মিক দুঃখ। এইরূপ দুঃখের হস্ত থেকে পরিত্রাণের উপায় আত্মিক উন্নতি। সুতরাং ব্যক্তি বা সমাজ জীবন থেকে দারিদ্র্যকে দূর করতে পারিলেই পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে না। সাম্যবাদীগণ দারিদ্র্যের অভিশাপকে অত্যন্ত বড় করে দেখে। উপযুক্ত শিক্ষা দ্বারা চরিত্রের দুর্বলতা দূর করতে না পারলে কেবলমাত্র খাওয়া-পরার সুখই প্রকৃত সুখ নয়। একমাত্র অর্থ ই যদি সুখের কারণ হত, তাহলে বিত্তশালী ব্যক্তিরা জগতে সুখী হতে পারত। মানুষের দুঃখদুর্দশার প্রকৃত কারণ আত্মার বা মনের অধোগতি। বার্ট্রাণ্ড রাসেল মার্কস মতবাদের যে সুদক্ষ সমালোচনা করেছেন তার মর্ম এই—

অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন ঐতিহাসিক বিবর্তনের চরম ও মূল কথা নয়। মার্টিন লুথারের বিদ্রোহ ফরাসি বিপ্লব প্রথম মহাসমর বল্কানের

আত্মঘাতী জাতীয়তা ইত্যাদি বহু যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনার উৎস একমাত্র অর্থনীতি নয়। মার্কসের মতে, সাম্যবাদীকে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে এবং একনায়কত্ব স্থাপন করতে হবে। কিন্তু বিপ্লবের নামান্তর যুদ্ধ এবং যুদ্ধ ভীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যদি শাসনযন্ত্র বিপ্লবীদের হাতে না থাকে তাহলে তাদের পক্ষে আধুনিক সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ান অসম্ভব। সশস্ত্র বিপ্লব রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হস্তগত করার একমাত্র উপায় বলে গৃহীত হলে রাষ্ট্রে কোন কালে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকে না। যুদ্ধের সময় মানুষের সুপ্ত বর্বরোচিত মনোভাব জাগ্রত হয়। দলগত শক্তি অর্জনের জন্য নিরন্তর যুদ্ধ ও রক্তপাত সভ্যজীবনের অন্তরায় ও পরিপন্থী।

মার্কসের ইতিহাসের বাস্তবব্যাখ্যা ভ্রমাত্মক। বর্বর জাতির আক্রমণে রোমান সাম্রাজ্যের পতন শিল্প ও সভ্যতার উন্নয়ন করেনি, বরং অন্ধকার যুগের জন্ম দিয়েছিল। তিরিশ বৎসর ব্যাপী যুদ্ধের ফলে জার্মেনির শিল্প ও সাহিত্য সৃষ্টি ব্যাহত হয়েছিল। প্রথম মহাসমরের প্রলয়ঙ্কর অগ্নিপ্লাবনে উচ্চতর আদর্শের বীজ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। ঘৃণা, হিংসা ও যুদ্ধের দাবানল-প্রদাহে সভ্যতাকুসুম শুষ্ক ও মুমূর্ষু হয়ে যায়। একমাত্র শান্তিবারি সেচনে তার সুষমা ও সৌন্দর্য বিকশিত হতে পারে, অন্য উপায়ে নয়।

মার্কসের বিপ্লববাদ বর্বরতার অগ্রদূত। অন্যায় অন্যায়ের উচ্ছেদ করতে পারে না। শুদ্ধানন্দ সৃষ্টি ও সম্ভোগের অর্থনৈতিক মূল্য নাই। ভ্রাতৃত্ব ও ন্যায়বোধ প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা মার্কসবাদের ভিত্তি। মার্কসের মতে ডায়লেকটিক স্থিতিসার নয়। শ্রেণী-বিরোধ থেকে ক্রমোন্নতির ধারায় শ্রেণীশূন্য সমাজের জন্ম হলে, সেই শ্রেণীশূন্য সমাজ অপরিবর্তনীয় অবস্থায় অনন্তকাল বর্তমান থাকবে। সুতরাং তাঁর মত স্ববিরোধী।

অর্থনৈতিক কারণে বিরুদ্ধ শক্তির আবির্ভাব ঘটে, মার্কসের এই মত সমীচীন নয়। কারণ বিরুদ্ধ শক্তির জয়-পরাজয় সাফল্য ও আকস্মিক ঘটনার উপর নির্ভর করে। ভামির যুদ্ধে প্রুসিয়ানদের একজন সুদক্ষ সেনাপতি থাকলে ফরাসি বিপ্লবের অস্তিত্ব থাকত না, ইংল্যাণ্ডের অষ্টম হেনরি অ্যানি বোলিনের প্রেমে না পড়লে আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম সম্ভব হত না।

মার্কস ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, অর্থনৈতিক বিরোধ শ্রেণীবিরোধের নামান্তর কিন্তু ইতিহাসে দেখা যায় যে এই বিরোধ

জাতি বিরোধ, শ্রেণী বিরোধ নয়। জাতি বিরোধ অর্থনৈতিক বিরোধ থেকে জন্মায় সত্য কিন্তু মানুষ যে বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত বা পরিণত হয়েছে তা প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণবশতঃ নয়।

মার্কসের মতে অর্থনৈতিক পরিবর্তনের একটি প্রধান কারণ উৎপাদন-রীতির পরিবর্তন কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে উৎপাদন প্রণালীর পরিবর্তনের কারণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার। মার্কস বলেন, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জনক। ইহা ঐতিহাসিক দৃষ্টি নয়।

মার্কসপ্রতিপাদিত ব্যবস্থার যে অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা ও নীতির আলোচনা হয়েছে তাতে ভ্রম ও ভ্রান্তি আছে, কল্পনার খেলা আছে কিন্তু তিনি যে চারিটি তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করেছেন তারজন্য তিনি বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন—

১ম, ব্যবসায়ের মূলধন প্রথমে অবাধ প্রতিযোগিতার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে একচেটে ব্যবসায়ে পর্যবসিত হয়।

২য়, অর্থনৈতিক প্রভাব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করে, অর্থাৎ যারা পুঁজির মালিক তারাই অর্থবলে দেশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে। ৩য়, দরিদ্র ব্যক্তিগণ কর্তৃক রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকারের আবশ্যকতা আছে। ৪র্থ, রাষ্ট্র ধনোৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা স্বত্ব গ্রহণ করলে সমগ্র জাতির ভিতর সাম্যের প্রতিষ্ঠা হয়।

মার্কস-দর্শনের বৈশিষ্ট্য ও মহাপ্রাণতা—গৌতম বুদ্ধ ও কার্ল মার্কস।

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ভিতর মার্কস দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনের জন্ম। বিপুল দুঃখের যে জগদ্দল পাথর মানুষের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে তাকে অপসারিত করে আনন্দের নূতন জগৎ সৃষ্টি করার সাধনা বুদ্ধ ও মার্কসের জীবনের মহাব্রত ছিল। এজন্য বুদ্ধের মতো মার্কসও আত্মা ঈশ্বর পরলোক প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় বস্তু নিয়ে মাথা ঘামানর চেষ্টা করেন নি। বুদ্ধের মতে বাসনার উচ্ছেদই দুঃখনাশ। মার্কসের মতে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবসানে দুঃখনাশ। দুই মতেই জড়বাদের, যুক্তির প্রাধান্য আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের

চেয়ে সাম্যবাদে মহাপ্রাণতার অধিকতর বিকাশ। বুদ্ধের আদর্শ নির্বাণ। মার্কসের আদর্শ বিশ্বে সাম্যের জয়ধ্বজা স্থাপন।

প্রাচীন জগতের শিক্ষা—কর্তব্য কর, পরজগতে সুখভোগ করবে। দুঃখের ভিতর সীমাহীন ধৈর্য, ভাগ্যের আঘাতকে হাসিমুখে সহ্য করার শক্তিই মানবাত্মার পরিপূর্ণ গরিমা। মার্কসের নূতন যুগের আদর্শ—বিজ্ঞানের সাহায্যে পৃথিবী থেকে দারিদ্র্য ও রোগের অভিশাপকে দূর করে তাকে সুখময় করে তোলা। পৃথিবীতে দুঃখ আছে কিন্তু তাকে দূর করার শক্তিও মানুষের আছে। মানুষকে হতে হবে জ্ঞানে গরীয়ান, শক্তিতে মহীয়ান, স্বাস্থ্যে দীপ্তিমান। এজন্য পুরাতন দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্যক। অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকলে চলবে না। দুঃখ কষ্ট রোগ দারিদ্র্যকে অদৃষ্টের দান বলে, বিধাতার অদৃশ্য শক্তির লীলা বলে গ্রহণ করলে দুর্বলতার পরিচয় দেওয়া হয়। মার্কসের আদর্শের সংগে প্রাচীন আদর্শের সংঘাত এই স্থানে, এবং পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীর সংগে সাম্যবাদের সংঘর্ষের কারণও এই।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে মার্কসের স্থান।

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে মার্কসের দান সুমহান—তাঁর স্থান উচ্চে। তিনি আমাদের চিন্তার মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন, আমাদের দৃষ্টিকোণ প্রসারিত করেছেন। বৈশ্যসভ্যতার শূন্যগর্ভ স্ফীতি এবং নৈতিক শৈথিল্যের প্রতি তিনিই প্রথমে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, যে সমাজ অর্থকে পরমার্থ বলে গ্রহণ করে সে সমাজে প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় না, সেখানে উচ্চতম বৃত্তির অনুশীলন সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক নির্ণয়ে তাঁর দান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গ্রোশিয়াসের ন্যায় মহান্। তিনি একদিকে অর্থনীতি বিজ্ঞানের জনক, অন্যদিকে একটি আদর্শের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর বাণী সকল দেশের সমাজ সেবকদের প্রাণে নূতন বল, নূতন আশা ও উদ্যম সঞ্চার করে।

ওয়েলস্ বলেছেন মার্কস্ চিকিৎসকের ন্যায় রোগের নিদান নির্ণয় করেছেন কিন্তু রোগনির্মুক্তির জন্য ঔষধের পরিবর্তে যাদুমন্ত্রের ব্যবস্থা দিয়েছেন। কিন্তু ব্যাধিনির্ণয় আরোগ্যলাভের অপরিহার্য অঙ্গ, তা অস্বীকার করা যায় না। তিনি শিল্প বিপ্লবের বিষময় ফলের যে আলেখ্য অঙ্কন করেছেন তা মহাকাব্যের ন্যায় মর্মস্পর্শী ও প্রসন্নগম্ভীর। এর সর্বব্যাপী পরিকল্পনার বিরাটত্ব, বহুবর্ণ

বর্ণনার লিপিকুশলতা, প্রাণতপ্ত ভাবুকতার অপূর্ব সমাবেশ, অগ্নিগর্ভ বেদনার জ্বালাময়ী বাণী মনীষী কার্লাইল বা রাস্কিনের লিপিচাতুর্য ও হৃদয়াবেগকেও অতিক্রম করেছে। বর্তমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূলে যে ভীষণ ত্রুটি ও অসামঞ্জস্য বিদ্যমান তা তিনি আমাদের নিকট উন্মুক্ত করেছেন। তাঁর কৃপায় আজ মানুষের দৃষ্টি ও চিন্তা ধর্ম ও দর্শনের ভাববিলাসের অবাস্তব উর্ধলোক থেকে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছে এবং মানুষের সামাজিক জীবনধারা নিয়ন্ত্রণে ও তার গুরুতর সমস্যা সমাধানে নিয়োজিত হয়েছে। তিনিই দেখিয়েছেন যে, যে-সমাজ বৈশ্যপ্রধান এবং যে-সমাজ বৈশ্যবৃত্তির সুবিধার জন্য গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত তা দুর্নীতিমূলক ও অসহ্য। যে সমাজের সামগ্রিক শক্তি সাধারণ সমাজ জীবনের উন্নতিবিধানে নিয়োজিত না হয় তা পর্যাপ্ত নয়। মানুষের নায্য অধিকার ও ন্যায় বিচার দাবীর তীব্র ইচ্ছার খরস্রোতে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত ও উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণকামী মুক্তিদূতদের ভিতর তাঁর স্থান উর্ধতম দেশে, ইতিহাস এই কথা স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রাখবে সন্দেহ নাই।

শিল্পবিপ্লবের ফলে ইয়োরোপে দুইটি পূর্ণাঙ্গীন মতবাদ জন্মলাভ করেছিল—প্রথম, দার্শনিক চরম সংস্কারবাদ ও দ্বিতীয়, যুক্তিসিদ্ধ সমাজতন্ত্রবাদ। প্রাক্-শিল্পবিপ্লব যুগের উদারমতের সহিত আমেরিকা ও ফ্রান্সের বিপ্লবের সংস্রব ছিল। যুক্তিসিদ্ধ সমাজতন্ত্রবাদ লেলিন ও ষ্ট্যালিনের ব্যক্তিত্বে ও কর্মধারায় সোভিয়েট রাশিয়ায় রূপায়িত হয়েছে এবং নানা দেশের সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে যে সকল সমাজ-সংস্কারক সমাজতন্ত্রী নামে অভিহিত হয়েছিলেন তাঁদের মতবাদের ভিত্তি ছিল জনহিতৈষণা। স্যার টমাস মোরের ইউটোপিয়ার নাম অনুসারে এরা ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রবাদী নামে পরিচিত। টমাস মোর থেকে আরম্ভ করে আওএন সেণ্ট সাইমন ফোরিয়ার প্রোধন প্রভৃতি সকলেই ছিলেন সাধারণভাবে ইউটোপীয় অথবা আদর্শবাদী বা রাষ্ট্রসম্পর্কহীন সমাজতন্ত্রী। এই সকল আদর্শবাদীর মধ্যে অনেকে ধর্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁরা একদিকে যেমন ধনীকে দয়ালু ও উদার হতে উপদেশ দিয়ে স্বর্গসুখ ভোগের প্রলোভন দেখাতেন, অন্যদিকে তেমনি দরিদ্রকে ভগবান, পরজগতে সুখ ও শান্তির কথা শুনিয়ে তাকে ইহ জগতের অভাব দুঃখ দৈন্য ধৈর্যের সহিত সহ্য করতে উপদেশ দিতেন।

রাষ্ট্র সমাজ পরিবার ও ব্যক্তিজীবনে যে মতবাদ প্রচলিত ছিল তার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন রুসো। তিনিই এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে অতীন্দ্রিয় শক্তির হাত থেকে মুক্ত করে যুক্তিসিদ্ধ ন্যায়নীতির ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন। যোসেফ্ ব্যাবুক রুসোর মতবাদকে বস্তুরূপ দিতে প্রথম চেষ্টা করেন। কার্ল মার্কসই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রবাদকে যুক্তি ও বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করেছিলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দী—উত্তরার্ধ

বিজ্ঞানদৃষ্টি। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত যন্ত্রবিপ্লব হল এবং সভ্য রাষ্ট্র সকলের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থার ভিতর বিপ্লব সূচিত হল। প্রাচীনের সহিত নবীনের রূঢ় সংঘাতের ফলে এক নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হল, নবতর মনুষ্য সমাজের ও নবতর মানবধর্মের ধারণা স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

হাটন প্লেফেয়ার সার চার্লস লায়েল লার্মাক ও কুভের প্রভৃতি পণ্ডিতগণ পাষাণের তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করছিলেন। ভূ-বিজ্ঞান আলোচনা হচ্ছিল। বিভিন্ন প্রাণী স্তরের ভিতর দিয়ে নৈসর্গিক জীবনীশক্তি ক্রমবিকশিত হয়ে অবশেষে মনুষ্য স্তরে উন্নীত হয়েছে, এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব খ্রীষ্টান ধর্ম জগতে এক বিপ্লব সৃষ্টি করল। যদি প্রাণীগণ বিশেষ নিয়মানুসারে নিম্নতম স্তর থেকে উর্ধ্ব দিকে ক্রমবিকশিত হয় তাহলে বাইবেলে যে আদি জনকজননী আদম ও ইভ, জ্ঞানবৃক্ষের ফল খেয়ে পবিত্র অবস্থা থেকে পতনের কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা মিথ্যা হয়ে পড়ে, পাপ ও তার প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যকতা থাকে না, প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্মের ভিত্তি শিথিল হয়ে ওঠে, সত্যযুগের কল্পনা নৈতিক আদর্শ আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি কথার কথা হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং যখন ১৮৫৯ সালে যথাক্রমে ডারউইনের (১৮০৯—১৮৮২) "প্রাণীদের জন্মের কাহিনী" ও "মানুষের আবির্ভাব" নামক দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হল, তখন প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ও সাধু ব্যক্তিদের ভিতর বিপুল চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত করেছিল, গোঁড়া খ্রীষ্টানদের

কাল্পনিক সৃষ্টিতত্ত্ব ধূলিসাৎ হল। একদিকে যেমন সতেজ বিজ্ঞানবুদ্ধি ক্রমে সাহিত্য শিল্পকলা সমাজনীতি রাজনীতি প্রভৃতিকে প্রভাবিত করেছিল তেমনি পুরাতনের একদেশদর্শিতা ও বিধিনিষেধকে আঁকড়ে রাখার অন্ধপ্রয়াস চলতে লাগল। যে ভ্রান্ত ঐতিহাসিক ধারণার ভিত্তির উপর নৈতিক জীবন নির্মিত হয়েছিল তা এত পুরাতন ও দৃঢ়মূল যে তাকে ভেঙে-চুরে নূতন করে গড়ে তোলা অসম্ভব হয়েছিল। নূতন সত্যকে গ্রহণ করার মতো বলিষ্ঠ সাহস ও উদার মন অতি অল্পলোকেরই থাকে। নূতন সত্যের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন চলতে লাগল। যদিও ডারউইনের মতের সহিত খ্রীষ্টান ধর্মের মূলনীতির যুক্তিসিদ্ধ বিরোধ ছিল না তথাপি গোঁড়া ধর্মযাজকগণ তাঁর উপর রুষ্ট হল, ডারউইন সাহিত্য ও মত প্রচারের বিরুদ্ধে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল।

ডারউইনের মতবাদ তরুণদের মন আকৃষ্ট করেছিল। তারা বিশ্বাস করে নিল যে জীবধারার অংশ হিসাবে ব্যক্তির জীবন একটা শাশ্বত সংগ্রাম। প্রকৃতি বলবতী, মানুষ দুর্বল। অতিক্রম করার নীতিই জীবনের মৌল নীতি। জীবন সংগ্রামে যে কোন প্রকারে জয়ী হতে হবে। নির্বোধ ও দুর্বল ব্যক্তিকে ধ্বংস করে শ্রেষ্ঠতা অর্জন করাই নিয়ম। এজন্য মানুষকে সবল নির্দয় ও স্বার্থপর হতে হবে। ভগবান বলে কোন কিছু বস্তু নাই। জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয় মানুষের নিজের হাতে। নিজেও বাঁচব, অপরকেও বাঁচতে দেব, এইরূপ যে মনোভাব রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তার প্রতি ঘৃণা, তার পরিবর্তে দাম্ভিকতা ও নিষ্ঠুরতা, প্রাধান্য লাভের জন্য সংগ্রাম, দুর্বল ও অনুন্নত ব্যক্তি বা জাতিকে ধ্বংস করার মনোবৃত্তি তীব্র সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়ে পৃথিবীতে বহু অনর্থ সৃষ্টি করার সূচনা হল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থা

আমেরিকা। যাতায়াতের নূতন ব্যবস্থা, বাষ্পীয় পোত ও রেলপথ নির্মাণ বৈদ্যুতিক বার্তাবহ যথাসময়ে আবির্ভূত না হলে যুক্তরাষ্ট্রের সীমা পশ্চিম পর্বতমালা অতিক্রম করে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারত না। দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত বিভিন্ন জাতির মধ্যে মেলামেশার অন্তরায়। বাষ্পীয় পোত ও বৈদ্যুতিক বার্তাবহ বিভিন্ন প্রদেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও মিত্রতার পথ উন্মুক্ত করে একটি অখণ্ড মহাজাতি গঠনে সাহায্য করেছিল। তীক্ষ্ণ সমাজ

বোধের প্রেরণায় বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীগণ অনুপ্রাণিত হয়ে একটি বিরাট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল। ভাষায় চিন্তায় ভাবে আচার-ব্যবহারে এবং আদর্শে তাদের ঐক্য ছিল। তারা যে নূতন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল তা প্রাচীনকালের সভ্যতার ন্যায় পরজীবী অলস ও আরামবিলাসী ছিল না, অথবা আধুনিক ইয়োরোপীয় সভ্যতার ন্যায় দুর্বল অনুন্নত জাতির ধ্বংসের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়নি। তাদের সভ্যতা পরধনলোলুপতা ও কূটবুদ্ধিপ্রসূত ছিল না। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইয়োরোপের জাতিদের ভিতর অন্তর্বিরোধ ও ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। এর অবাধ বিবেকহীন প্রয়োগ প্রতিহিংসার আগুন জেলে দিয়েছে। বর্তমান ইংল্যাণ্ডের কূটবুদ্ধি ও প্রচারকার্যে প্রতারিত হয়ে আমেরিকা মনরো নীতির প্রাচীর ভেঙ্গে দিয়ে বিশ্বদাবানলে ইন্ধন জুগিয়ে ডলার সাম্রাজ্য স্থাপনে মনোনিবেশ করেছে।

ইয়োরোপের সমাজে প্রাচীন কাল থেকে জমিদার ও কৃষক ছিল। কোথাও কৃষকরা ক্ষেত্রদাসে পরিণত হয়েছিল, আবার কোথাও বা তারা নির্দিষ্ট জমি চাষ করত। নূতন অনাবাদী জমি অধিকার করার আশায় আমেরিকানগণ দলে দলে অ্যালিঘানি পর্বতমালা অতিক্রম করে মিসিসিপি উপত্যকায় এল এবং নূতন নূতন ষ্টেট স্থাপন করল। কেবলমাত্র অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য তাদের পরিচালিত করেনি। স্বাধীনতাপ্রিয়তা, অসমসাহসিক কর্মের আনন্দ, নূতন জগতের জনবিরল স্থানে আলোক বিস্তারের আগ্রহে তারা দুঃখকষ্ট বরণ করে নিল। ১৮৯০ সাল পর্যন্ত এইভাবে জমি অধিকার চলতে থাকে। রেলপথ নির্মাণের পর তাদের কষ্টের লাঘব হয়েছিল। তখন তাদের কোন বাণিজ্য ছিল না। খাদ্যের জন্য শস্য হরিণের চামড়া ও কাঠ সংগ্রহ করতে পারলেই তারা সন্তুষ্ট হত। রেলগাড়ী চলার পর তাদের অর্থনৈতিক জীবনে পরিবর্তন এসেছিল।

এইভাবে বলপূর্বক দেশ অধিকার আদিম অধিবাসীদের সংগে সংঘর্ষ সৃষ্টি করল। তাদের সংগে ঔপনিবেশিকদের বহু খণ্ড যুদ্ধ হত। ক্রমে তারা ধীরে ধীরে ইণ্ডিয়ানদের উপর আধিপত্য স্থাপন করল এবং ন্যায্য অধিকার থেকে তাদের বঞ্চিত করল। এই সংঘর্ষ আমেরিকান চরিত্রের উগ্রতা ও একতা সৃষ্টি করলেও মানুষ হিসাবে তারা এক স্তর নীচে নেমে গেল।

দাসত্ব ও গণতন্ত্র বিরুদ্ধ-স্বভাবের বস্তু। যারা নিজেরা স্বাধীন বলে গর্ব করে কিন্তু দুর্বল ও অসহায় জাতিকে দাসত্বের শৃংখলে বেঁধে রাখে তারা

বাহিরে স্বাধীন হলেও, মনে পরাধীন, তারা ভণ্ড ও কপট। উত্তরাঞ্চলের লোকের চোখে দাসপ্রথা ও গণতন্ত্র বিসদৃশ ছিল কিন্তু দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা দাসদের সাহায্যে ব্যক্তিগত ধন অর্জন করছিল। দাসপ্রথা দুই অঞ্চলের লোকের মধ্যে যে মনোমালিন্য ও শত্রুতা সৃষ্টি করেছিল তা লিংকলনের সময় অন্তর্হিত হয়। আমেরিকা জোর গলায় বলেছিল, সকল মানুষ সমান। কিন্তু এই উচ্চ নীতির সহিত দাসপ্রথার সামঞ্জস্য হয় না। দাসপ্রথা বেআইনি বলে গৃহীত হল। জাতি হিসাবে যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পেল।

যখন আদর্শবাদীরা শাসন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃতি রীতি ও নীতি নিয়ে তর্কবিতর্ক করছিল, এমন কি রক্তপাত করছিল, তখন বিষয়ীলোকেরা অর্থ উপার্জনের পন্থা উদ্ভাবন করে প্রভূত ঐশ্বর্যের অধিকারী হচ্ছিল। রেলপথ নির্মাণ, তৈল ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে প্রতিযোগিতা ক্রমে একচেটে ব্যবসায়ে পরিণত হল। কমোডোর ভাণ্ডারবিল্ট রেলপথ নির্মাণ করে ধনকুবের হয়েছিলেন। তেলের ব্যবসায়ে রক্‌ফেলার এবং লোহা ও ইস্পাতের ব্যবসায়ে কার্নিগী একাধিপত্য করে বিপুল ঐশ্বর্যের অধিপতি হন।

ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে সর্বনাশা প্রতিযোগিতার হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন পিয়ারপন্ত মর্গান। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশীদারদের অর্থের সমন্বয়ে একচেটে ব্যবসায়ীদের সর্বময় কর্তৃত্ব লোপ করেছিলেন। কোন একটি ব্যবসা বা কারখানা একজন ধনিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি না হয়ে সাধারণের সম্পত্তি হয়ে দাঁড়াল।

পৃথিবীতে ডলার রাজ প্রতিষ্ঠা এক্ষণে আমেরিকার আদর্শ হয়ে উঠেছে। গণতন্ত্রের উচ্চ আদর্শ এক্ষণে ডলার সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হয়েছে।

ফ্রান্স। শাসন ব্যবস্থায় বহু পরীক্ষার পর ১৮৭৫ সালে ফ্রান্সে স্থায়ী গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাজয়ের গ্লানির ভিতর এর জন্ম হয়েছিল। এজন্য ১৭৯০ অথবা ১৮৪৮ সালের উদ্দীপনা ফরাসি মানসে স্থান পায়নি। এর গঠনে দল বিশেষের মতের প্রাধান্য ছিল না। এই প্রতিষ্ঠান যেন ছিল একটা জোড়া-তালি দেওয়া কাজ-চালানো গোছের বস্তু। ১৮৪৮ সালে ফ্রান্স আমেরিকার আদর্শ গ্রহণ করেছিল। প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাপক সভার নিকট জবাবদিহি ছিলেন না। বোনাপার্ট নামে এক ব্যক্তি গণতান্ত্রিক শাসননীতি অনুসরণ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রেসিডেন্ট হন এবং দুই বৎসরের মধ্যে ফ্রান্সের সম্রাট হয়ে পড়েন। ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ আদর্শে শাসনব্যবস্থা

পুনর্গঠিত হল। জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সভা এবং স্থানীয় কর্মচারিদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে সিনেট সভা গঠিত হল। দুইটি সভার সদস্যগণ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিই প্রেসিডেন্ট হলেন।

রাশিয়া। রাশিয়ার সম্রাট ১ম নিকোলাস্ তুরস্ককে আক্রমণ করার জন্য অগ্রসর হন। সুলতানকে তিনিই প্রথমে "ইয়োরোপের রুগ্ন ব্যক্তি" নামে অভিহিত করেন। তুর্কী সাম্রাজ্যে খৃষ্টানদের উপর দুর্ব্যবহার হচ্ছে, এই অছিলায় তিনি ১৮৫৩ সালে ডানিউব নদীর তটভূমিস্থিত দেশ অধিকার করেন। একটি নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হল। রাশিয়ার প্রাধান্য স্থাপিত হলে সিরিয়ায় ফ্রান্সের এবং ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডের গমনাগমনের অসুবিধা হবে ভেবে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ড সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হল। নেপোলিয়ন ব্রিটেনের সহিত বন্ধুতা দৃঢ় করে নেওয়ার সুযোগ পেলেন। ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৩-৫৬) আরম্ভ হল। রাশিয়া পরাজিত হল।

ইটালি। এই সময়ে ইটালি বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এর উত্তরাংশ অষ্ট্রিয়ার অধীন ছিল। সার্দিনিয়ার রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল এবং তাঁর প্রধান মন্ত্রী কাভুর ইটালির স্বদেশপ্রেমিক গ্যারিবল্ডী পরিচালিত সিসিলির বিদ্রোহ দমন করেন। রোম ও ভিনিসিয়া ছাড়া সমগ্র ইটালি ইম্যানুয়েলের অধিকারভুক্ত হল। ১৮৬১ সালে তিনি ইটালির রাজা বলে গৃহীত হলেন।

কাভুর ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি শাসন পদ্ধতির ভক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ আদর্শে প্রতিনিধিমূলক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তিত হল। ইটালিতে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ছিল না। ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধে উঠে রাষ্ট্রসত্তার একত্বের ধারণা ইটালির লোকের মনে স্থান পায়নি। পার্লামেণ্টে তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্মচারি মনোনয়নে কর্তৃত্ব করে ভোটারদের মনস্তুষ্টি করত এবং নিজেদের প্রভাব ও প্রাধান্য বজায় রাখত। কোন সুনির্দিষ্ট নীতি বা আদর্শ অনুসারে কোন রাজনৈতিক দল ছিল না। সুসংবদ্ধ রাজনৈতিক দল ছাড়া পার্লামেণ্টারি শাসনপদ্ধতি অকেজো ও অচল। জাতিসাধারণের সামগ্রিক কল্যাণের উদ্দেশ্যে দায়িত্বজ্ঞান না থাকলে পার্লামেণ্টারি শাসন বিরাট প্রহসনে পর্যবসিত হয়। এজন্য যাট বৎসর পরে মুসোলিনী সহজে এর মূলোৎপাটন করে ডিক্টেটর হয়ে বসেন।

জার্মেনি। ১৮৪৮ সালে অষ্ট্রিয়ার সহিত সমগ্র জার্মেনি কিছু কালের জন্য মিলিত হয়। সেলস্‌উইগ-হোলষ্টেনকে জার্মান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করার

জন্য পার্লামেণ্ট প্রুসিয়ার সৈন্যকে আদেশ দিলেন। প্রুসিয়ার রাজা সেই আদেশ অমান্য করায় পর্লামেণ্টের অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে গেল। এদিকে ডেনমার্কের রাজা নবম ক্রিস্টিয়ান এই দুই রাজ্য আক্রমণ করলেন।

এই সময় প্রুশিয়ার রাষ্ট্রিক ব্যাপারে বিসমার্কের ক্ষমতা অপ্রতিহত ছিল। তিনি এই গোলমালের ভিতর নিজ স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ পেলেন। বিসমার্কের ব্যক্তিত্বে জার্মান জাতীয়তার পূর্ণ বিকাশ হয়। প্রুসিয়া এবং অষ্ট্রিয়া মিলিত হয়ে ডেনমার্ককে পরাজিত করল। ডেনমার্ক রাজ্য দুইটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হল।

ঐ দুইটি রাজ্য লাভের আশায় বিসমার্ক অষ্ট্রিয়ার সহিত ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন। হোহেনজোলার্ন বংশের ও প্রুসিয়ার গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি জার্মানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিলেন এবং প্রুসিয়ার হোহেনজোলার্নদের অধীনে সমগ্র জার্মেনির একতা স্থাপন করলেন।

প্রুসিয়া ও ইটালি একযোগে অষ্ট্রিয়াকে বার বার পরাস্ত করল (১৮৬৬)। অষ্ট্রিয়া আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। জার্মেনির রাজ্য নিয়ে প্রুসিয়ার নেতৃত্বে 'উত্তর জার্মান সংঘ' গঠিত হল। অষ্ট্রিয়া কোণঠেসা হয়ে গেল। প্রুসিয়া শক্তিশালী হয়ে উঠছে দেখে ফ্রান্সের অন্তর্হৃদয়ে প্রতিহিংসার আগুন জ্বলে উঠল। নেপোলিয়ন লুসেনবার্গ নিয়ে প্রুসিয়ার সহিত ঝগড়া বাধিয়ে দিলেন। স্পেনের শূন্য সিংহাসন নিয়ে ১৮৭০ সালে যুদ্ধ আরম্ভ হল। উত্তর জার্মান সংঘের বাহিরের কোন রাজ্য ফ্রান্সের পক্ষে যোগ দিল না দেখে নেপোলিয়ন হতাশ হলেন। ১৮৪৮ সালের পর জার্মানগণ অন্ততঃ বৈদেশিক ব্যাপারে জাতীয় ঐক্যের নীতি গ্রহণ করেছিল। সুতরাং সমগ্র জার্মান জাতি প্রুসিয়ার পক্ষ অবলম্বন করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হল।

১৮৭৩ সালের প্রথমে সম্মিলিত জার্মান সৈন্যবাহিনী ফ্রান্স আক্রমণ করল। সংখ্যায় সাজসরঞ্জামে ও যুদ্ধকৌশলে তারা ফরাসী সৈন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর ছিল। নেপোলিয়ন সিডান নামক স্থানে সন্ধি করতে বাধ্য হন। তিনি বন্দী হন। প্যারিস আক্রমণ আসন্ন হয়ে পড়ল। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করা হল। ফরাসী সৈন্য পরাজয় স্বীকার করল। প্যারিস অবরুদ্ধ হল এবং ১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসে আত্মসমর্পণ করল। ফ্রান্স সন্ধি প্রার্থনা করতে বাধ্য হল। ভোর্সাই-এর বৈঠকে প্রুসিয়ার রাজা জার্মান সম্রাট বলে ঘোষিত হলেন। ফ্রাঙ্কফোর্টের শান্তি বৈঠকে হোহেনজোলার্ন বংশের প্রাধান্য স্বীকৃত হল।

জার্মান জাতীয়তার দোহাই দিয়ে বিস্‌মার্ক জার্মেনির রাজ্য সকলের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। এক সাধারণ ভাষা ও সাহিত্য সমগ্র জার্মান জাতিকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করেছিল এবং স্বাভাবিক ভৌগোলিক সংস্থান এই সূত্রকে দৃঢ় করেছিল। লোহার খনির লোভে জার্মেনি—ফরাসি ভাষাভাষী লোরেনকে কুক্ষিগত করে নিল। ফরাসি ভাবাপন্ন আলসেসি জার্মেনির অন্তর্ভুক্ত হল। ফলে এই সকল প্রদেশের জার্মান শাসনকর্তার সহিত ফরাসি প্রজাদের সংঘর্ষ চলতে লাগল। জার্মেনির উপর ফ্রান্সের বিদ্বেষ স্থায়িত্ব লাভ করল। নেপোলিয়ন ইংল্যাণ্ডে পলায়ন করলেন। বোনাপার্ট রাজতন্ত্রের উপর দ্বিতীয়বার যবনিকা পড়ে গেল।

তুরস্ক। ১৮৭৫ সালে বলকানের খ্রীষ্টানজাতিগণ, বিশেষতঃ বুলগারগণ, বিদ্রোহ করে। তুর্কীরা কঠোর দমননীতি অবলম্বন করল। বুলগারদের উপর অবাধ হত্যার তাণ্ডব চলতে লাগল। রাশিয়া এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে তুর্কীকে সন্ধি করতে বাধ্য করে। রাশিয়ার যে কোন কাজে প্রতিবাদ করাই যেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র বিভাগেব চিরাচরিত নীতি। লর্ড বিকনস্‌ফিল্ড তুর্কীকে আক্রমণ করে তার অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ করতে বললেন। ব্রিটেন সাইপ্রাস দ্বীপ অন্যায়ভাবে অধিকার করে নিল। বিকনস্‌ফিল্ড ব্রিটেনের জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিলেন যে তাদের জাতীয় সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে।

ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে যে সাম্রাজ্য গঠিত হয়েছে তার প্রথম অবস্থায় ব্রিটিশ জাতির বা ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের কোন হাত ছিল না। স্যর জন সিলি বলেছেন, অন্যমনস্কতার ভিতর এই সাম্রাজ্য লাভ হয়েছে। একদল ভাগ্যান্বেষী বণিক প্রাচ্যদেশে একচেটে ব্যবসা করার জন্য ইংল্যাণ্ডের রাজার কাছে সনন্দ নিয়ে ভারতবর্ষে উপস্থিত হল। ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ভারতবর্ষে যে গোলযোগ ও অশান্তি সৃষ্টি হয় তার সুযোগ নিয়ে বিদেশী চতুর বণিক দল সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করে। ক্লাইভ এই সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, ওয়ারেন হেষ্টিংস্‌ এর গঠনকর্তা। ক্রমে ফরাসিদের ক্ষমতা ধ্বংস হল। ১৭৯৮ সালে মার্কুইস অফ ওয়েলেস্‌লি গবর্ণর জেনারেল হয়ে কোম্পানীর শাসননীতির সহিত ক্ষীয়মান মোগল সাম্রাজ্যের সংগতি রক্ষা করে একটি নূতন সাম্রাজ্য গড়ে তুললেন। নেপোলিয়নের মিশর অভিযান ব্রিটিশ কোম্পানীর ভারতীয় সাম্রাজ্যকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত

হয়েছিল। যখন ইউরোপ নেপোলিয়নিক যুদ্ধে ব্যস্ত ঠিক সেই সময়ে কোম্পানী-নিযুক্ত গভর্ণর জেনারেলগণ ভারতবর্ষকে একটি অর্ধ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেছিলেন।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর দাক্ষিণাত্যে মারাঠাগণ, রাজপুতানায় রাজপুতগণ, অযোধ্যা ও বাঙলা দেশে মুসলমানগণ এবং পাঞ্জাবে শিখগণ কয়েকটি রাজ্য স্থাপন করে। কোম্পানীর শাসকগণ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য তাদের ভিতর দলাদলি, শত্রুতা ও মিত্রতা সৃষ্টি করে নিজেদের প্রাধান্য স্থাপন করল এবং অবশেষে একটির পর একটি রাজ্যকে কবলিত করে সর্বেসর্বা হয়ে উঠল। বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে একত্রিত হয়ে তাকে বাধা দিবার মতো মনোবৃত্তি তাদের ছিল না। ভারতবর্ষের সামন্ত রাজগণের নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতা ইংরেজ প্রাধান্যের রাস্তা প্রস্তুত করেছিল।

চীন। ১৮৯৮ সালে জার্মানগণ চীনের কৈচু এবং ইংরেজগণ ওয়া-হি-ওয়া অধিকার করে। এই বৎসরই পোর্ট আর্থার রাশিয়ার হস্তগত হয়। এই সময় থেকে চীনের আভ্যন্তরীণ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। ইয়োরোপীয়দের স্বার্থপরতা ও পররাজ্য গ্রাসের প্রবৃত্তির জন্য চীনারা তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। তাদের চীন থেকে বিতাড়িত করার জন্য একটি রাজনৈতিক দল গঠিত হয়। এই দলের নাম বক্সার। বক্সারগণ আড়াইশত ইয়োরোপীয় এবং তিরিশ হাজার খ্রীষ্টানকে হত্যা করে। চীনের সম্রাজ্ঞী বক্সারদের এই জঘন্য কার্য সমর্থন করলেন এবং আততায়ীদের আশ্রয় দিলেন। ১৯০০ সালে অবস্থা সঙ্গীন হয়ে ওঠে। সম্রাজ্ঞীর দেহরক্ষীদলের একজন সৈনিক জার্মান দূতকে হত্যা করে। বৈদেশিক রাজপ্রতিনিধিগণ বিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করে পিকিনের দিকে অগ্রসর হয়। সম্রাজ্ঞী সিয়ান-কু নামক স্থানে পলায়ন করেন। ইয়োরোপীয় দলের সৈন্যগণ চীনের নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর অত্যাচার করতে থাকে। মাঞ্চুরিয়া রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হল।

জাপান। ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশ ডাচ ও আমেরিকান রণতরীসমূহ যখন একযোগে জাপানকে তার রুদ্ধদ্বার খুলে দিতে বাধ্য করে তখন জাপান দুই শত বৎসরের নিদ্রা থেকে উত্থিত হয়। তখন সে তার ক্ষুদ্রতা, হৃদয়ের দৈন্য, তার অভিশপ্ত জাতীয় জীবনের নৈরাশ্য উপলব্ধি করে, তখন সে বিশ্বের ভাব-প্রবাহের সহিত সমান তালে পা ফেলে চলতে বদ্ধপরিকর হল, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করতে লাগল এবং দ্রুত উন্নতির পথে অগ্রসর

হল। কয়েক বৎসরের ভিতর সে যে কোন প্রগতিশীল জাতির সহিত সমকক্ষতা করতে সমর্থ হল। ১৮৯৪-৯৫ সালের চীন-জাপান যুদ্ধে তার শক্তির আভাষ পাওয়া গেল। ব্রিটেন রাশিয়া এবং জার্মেনি চীন আক্রমণ করল এবং দুই জন খ্রীষ্টান প্রচারকের হত্যার অজুহাতে স্যাং-টু প্রদেশের কিয়দংশ অধিকার করল, রাশিয়া লেও-টুং উপদ্বীপ অধিকার করল, চীনের নিকট পোর্ট আর্থার পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণের সম্মতি আদায় করে নিল ও ১৯০০ সালে মাঞ্চুরিয়া দখল করল।

ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক নীতি রুশ-জাপান যুদ্ধে পরিণতি লাভ করে এশিয়ার ইতিহাসে এক নূতন যুগ সৃষ্টি করল। ইয়োরোপের দর্প চূর্ণ হল। প্রাচ্য জগতের দূরতম অংশে এই সামরিক আয়োজন, তার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা সম্বন্ধে রাশিয়ার জনসাধারণকে জানান হয়নি। জলে ও স্থলে রাশিয়ার সৈন্য ভীষণভাবে পরাজিত হল। রাশিয়ার অতিকায় বল্টিক নৌবহর আফ্রিকা মহাদেশ আবর্তন করে এল এবং টুশিমা প্রণালীর জলযুদ্ধে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। বিদেশে অকারণ শক্তিক্ষয়ের জন্য জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হল। সম্রাট বাধ্য হয়ে যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন (১৯০০)। তিনি সেখালিয়েনের অর্ধাংশ প্রত্যর্পণ করলেন। রাশিয়ানগণ মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে দিল এবং কোরিয়া জাপানের হস্তে অর্পিত হল। পূর্ব এসিয়ায় ইয়োরোপীয় প্রাধান্য লাঘব হয়ে গেল। কৈ-চু জার্মেনির অধিকারে থেকে গেল।

ভারতবর্ষ-বহির্ভূত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য

অষ্ট্রেলিয়া। উনিশ শতকের প্রথমাংশে ভারতবর্ষের বাহিরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি অল্পই হয়েছিল। ঐ যুগের কোন কোন চিন্তাশীল ইংরেজ মনীষীর মতে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি জাতির দুর্বলতার লক্ষণ। বিখ্যাত ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্‌টেন কুক্‌ অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ আবিষ্কার করেন। প্রথমে এখানে দণ্ডিত ব্যক্তিদের নির্বাসন দেওয়া হত। ক্রমে ব্রিটেন থেকে বহু ঔপনিবেশিক আবির্ভূত হল। তারা অষ্ট্রেলিয়ার দিগন্তব্যাপী তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরে মেষপালন করত এবং ইংল্যাণ্ডে মেষের লোম চালান দিত। ১৮৫১ সালে সোনার খনি আবিষ্কৃত হয়। সোনার লোভে বণিক ও ব্যবসায়ীগণ আসতে লাগল। শীঘ্র প্রায় ছয়টি উপনিবেশ স্থাপিত হল। ১৮৫৫ সালে ঔপনিবেশিকদের

স্বায়ত্তশাসনের খসড়া পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে। এ পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া একটি আত্মকর্তৃত্ব সম্পন্ন উপনিবেশ হিসাবে ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্পর্ক রেখেছে।

কানাডা। ১৮৪৯ সালের পূর্বপর্যন্ত কানাডা উন্নত ছিল না। এখানকার ফরাসি ও ব্রিটিশ অধিবাসীদের মধ্যে কলহ ও বিরোধ বর্তমান ছিল। ১৮৬৭ সালে কানাডা ফেডারেল রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং অন্তর্বিপ্লবের অবসান ঘটে। রেলপথ নির্মাণের সহিত এর পশ্চিমাঞ্চলে যাতায়াতের সুবিধা হ'ল, উৎপন্ন দ্রব্যাদি ইয়োরোপে প্রেরণের ব্যবস্থা হল, এর অধিবাসীরা ভাষায় ভাবে ও স্বার্থে একটি অখণ্ড জাতি হয়ে উঠল। পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা থাকলেও কানাডা ইংল্যাণ্ডের সহিত যোগসূত্র এখনও ছিন্ন করেনি।

নিউজিল্যাণ্ড। এই দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের নাম মেওরি। ইংল্যাণ্ড থেকে কয়েকজন পাদ্রী এসে মেওরিদের মধ্যে বাস করে। পরে বহু দুর্দান্ত নাবিক বণিক ও পলাতক কয়েদী দলে দলে আসতে থাকে। এদের দমন করার জন্য ১৮৪০ সালে ইংল্যাণ্ড এই সুন্দর ও সুখময় দ্বীপটিকে সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেয়। তারপর বহু ঔপনিবেশিক আসতে থাকে। মেওরিদের সংগে যুদ্ধ চলতে থাকে। পরে ব্রিটিশ আদর্শে এখানে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। তদবধি নিউজিল্যাণ্ড ইংল্যাণ্ডের একটি ডমিনিয়ন হিসাবে বর্তমান আছে।

আফ্রিকা। এ পর্যন্ত অনুন্নত দুর্বল অথবা ঐশ্বর্যশালী দেশ থেকে সোনা প্রভৃতি ধাতু মশ্‌লা হাতির দাঁত আমদানী করার জন্য ইয়োরোপের বিভিন্ন গভর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ী ও ভাগ্যান্বেষীর দল বিদেশে গমনাগমন করত এবং সুযোগ বুঝে দেশ অধিকার করে নিত। উনিশ শতকের শেষ ভাগে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির সহিত ইয়োরোপের জাতিগণ বিদেশ থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করতে বাধ্য হল এবং রবার চর্বি প্রভৃতি নানাপ্রকারের কাঁচা মাল দেশে নিয়ে যাওয়ার আবশ্যকতা অনুভব করল। গ্রেট ব্রিটেন হল্যাণ্ড এবং পর্তুগাল বহু গ্রীষ্ম-প্রধান উর্বর ও সম্পদশালী দেশের মালিক ছিল। এজন্য তারা বাণিজ্যে ঐশ্বর্যে ও সভ্যতায় উন্নত হয়েছিল। ১৮৭১ সালের পর জার্মেনি ফ্রান্স এবং সকলের শেষে ইটালি কাঁচা মাল হস্তগত করার জন্য প্রাচ্য দেশগুলির উপর লোলুপদৃষ্টিপাত করছিল। তারা দেখল সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ না থাকলে উন্নত হওয়া যায় না, অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জন করা যায় না। এজন্য তাদের পরস্পরের ভিতর প্রতিযোগিতা চলতে লাগল, সকলেই নূতন রাজ্য অধিকার ও দেশ জয় করতে সচেষ্ট হল।

সুতরাং ইয়োরোপের সন্নিকটে যে বিস্তৃত মহাদেশ এতকাল তাদের ঔৎসুক্য ও কৌতূহল উদ্রেক করে এসেছিল, যার অত্যাশ্চর্য কাহিনী উপকথা ও ইতিহাসের ভিতর দিয়ে তাদের কর্ণগোচর হয়েছিল—সেই আণ্টনি ও অনিন্দ্যসুন্দরী ক্লিওপেট্রার বিহার স্থল, যে দেশের বুকের উপর সিজার আলেকজান্দার ও নেপোলিয়নের বিজয়-বাহিনীর পদচিহ্ন বর্তমান—যে দেশের আকাশচুম্বী পিরামিড, মহাকালের প্রস্তর প্রতীক ধ্যানস্তিমিত লোচন ফিনিক্স, যার অনন্ত বালুকা-সমুদ্রে বিলীয়মান নীল নদের সুধাধারা মিশর দেশকে সম্পদশালী করেছে—সেই প্রাচীনতম সভ্যতার লীলাভূমি আফ্রিকা সম্বন্ধে ইয়োরোপীয়দের অজ্ঞতা পর্বতপ্রমাণ ছিল। পর্যটকদের অক্লান্ত পরিশ্রম অজ্ঞানতার তিমিরজাল ভেদ করতে সমর্থ হল। তাঁরা এই রহস্যময় দুর্গম স্থানে প্রবেশ করে নানা তথ্য সংগ্রহ ও প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে দলে দলে রাজনৈতিক প্রতিনিধি ও দূত, বণিক ঔপনিবেশিক ও বৈজ্ঞানিক সেখানে উপস্থিত হলেন। নানা বর্ণের আশ্চর্য ফুলফল লতাগুল্ম, অসূর্যম্পশ্য বনানী, অদ্ভুত ধরণের হ্রস্বাকার মনুষ্য, জলরাশিপূর্ণ গভীর হ্রদ, বিরাট নদনদী, গিরিকান্তারের নয়নজুড়ান প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, অনন্যসাধারণ জীবজন্তু, এমন কি অধুনালুপ্ত প্রচীনতম সভ্যতার অলিখিত কাহিনী ও ধ্বংসাবশেষ লোকলোচনের সমক্ষে উন্মোচিত হল। ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে দলে দলে লোক উপস্থিত হল এবং এর বিভিন্ন স্থান ভাগ করে নেওয়ার জন্য কাড়াকাড়ি করতে লাগল। স্বার্থসিদ্ধির অতিমাত্র ঝোঁকে তারা সেই দেশবাসীর সুবিধা-অসুবিধার দিকে লক্ষ্য করল না। ফলে সেখানে যে হৃদয়হীন অত্যাচার ও বিবেকহীন নিষ্ঠুরতার অভিনয় চলতে লাগল তা ইয়োরোপের তথাকথিত সুসভ্য শক্তিবর্গের বর্বরতার নগ্নচিত্র উন্মোচন করে।

মিশর তুর্কী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল কিন্তু ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেন কূটবুদ্ধিবলে তাকে হস্তগত করতে চেষ্টা করে। ১৮৯৮ সালে ফ্রান্সের সংগে গ্রেট ব্রিটেনের যুদ্ধ হয়। মার্চেণ্ড নামে একজন ইংরেজ সেনাপতি নীলনদের উপত্যকার উত্তরাংশ অধিকার করতে চেষ্টিত হয়। ১৮৭৭ সালে ব্রিটেন বুয়োর বা ডাচদের ট্রান্সভাল অধিকার করলে তারা স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ করে এবং ১৮৮১ সালে ব্রিটিশদের পরাজিত করে ট্রান্সভাল পুনরুদ্ধার করে। বুয়োর যুদ্ধের (১৮৯৯—১৯০২) ফলে ইংল্যাণ্ড শেষপর্যন্ত অরেঞ্জ রিভার এবং

ট্রান্সভাল ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। পরে ১৯০৭ সালে এই দুইটি রিপাব্লিকের সহিত কেপ্ কলোনি এবং নেটাল মিলিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

অর্ধশতাব্দীর ভিতর আফ্রিকা মহাদেশ খণ্ডিত হয়ে ইয়োরোপীয় শক্তি-বর্গের কবলিত হল। মাত্র তিনটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেশ—নিগ্রো দেশ লিবিয়া, মুসলিম রাজ্য মরোক্কো এবং অর্ধ-সভ্য খ্রীষ্টান দেশ আবিসিনিয়া ইয়োরোপের দস্যুদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিল। ১৮৯৬ সালে আডোয়ার যুদ্ধে আবিসিনিয়া ইটালিকে পরাস্ত করে স্বাধীনতা রক্ষা করেছিল।

পাশবিক বল ইয়োরোপীয় সভ্যতার মাপকাঠি

ইয়োরোপের জাতিগণ গায়ের জোরে পৃথিবীর দুর্বল ও অনুন্নত জাতিদের স্বাধীনতা হরণ করেছে। মারণ-যন্ত্রের আবিষ্কার গোলাগুলির অসংযত ও যথেচ্ছ ব্যবহার বিবেকহীন অত্যাচার ও রক্তপাত তাদের সভ্যতার মানদণ্ড। তারা নিজেদের স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষার জন্য অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছে, প্রাণ দিয়েছে কিন্তু অন্য দেশের স্বাধীনতা নষ্ট করেছে, তার দাসত্ব-শৃংখল রচনা করেছে। ইয়োরোপের চক্ষে জাপান চিরকালই অসভ্য ছিল কিন্তু ইয়োরোপের অন্যতম শক্তি রাশিয়াকে পরাস্ত করার পর জাপান সভ্য বলে আদৃত হয়েছে। জার্মেনি ইংল্যাণ্ড ও ইটালির তরুণদের মনে প্রভু-মনোভাব বহু অনর্থ সৃষ্টি করেছে। এটনের খেলার মাঠে ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয় হয়েছে এবং বহু সাম্রাজ্যবাদী সৃষ্টি হয়েছে।

ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে ইয়োরোপীয় জাতিগণ সাম্রাজ্য বিস্তৃতির শেষ সীমায় উপস্থিত হয়েছিল। প্রতিক্রিয়াও আরম্ভ হয়েছিল। আবিসিনিয়ায় ইটালির বিস্তৃতি আডোয়ার যুদ্ধে (১৮৯৬) বাধা পেয়েছিল। মিশর ভারতবর্ষ প্রভৃতির সমস্যা ইংল্যাণ্ডকে বিব্রত করেছিল। টনকিন আন্নাম টিউনিস আলজিয়ার্স প্রভৃতির আভ্যন্তরীণ ব্যাপার ফ্রান্সকে চিন্তিত করে তুলেছিল। স্পেন মরোক্কো নিয়ে ব্যস্ত হয়েছিল। ট্রিপলি ইটালিকে উদ্বিগ্ন করেছিল। জার্মেনি "সূর্যমণ্ডলে স্থান" অন্বেষণ করতে গিয়ে জীবন-মরণের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল।

যে সকল জাতি ও দেশ ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনে এসেছিল তারা অনুন্নত হলেও বর্বর ছিল না। যুগ-মহিমা ও সময়ের প্রভাবে তাঁদের

ভিতর স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হয়েছিল। বিজ্ঞানের উন্নতি, শক্তিশালী জাতির সান্নিধ্য তাদের ভিতর নূতন ভাব, নূতন প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল, নূতন আদর্শের উদ্দীপনায় তাদের অন্তর্হৃদয় উদ্বেলিত হয়েছিল। তারা নিজেদের হীন অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিল না। দেশী ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ, পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার, ও সাহিত্য আলোচনা তাদের মনে স্বরাজ অর্জনের ন্যায়সংগত দাবী জাগিয়ে তুলেছিল।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সভ্যতার ইতিহাসের কথা

১৮১৫ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত একশত বৎসরের সভ্যতার ধারা একমুখী। বিশ্বের ইতিহাসে এই শতাব্দী যেমন চিন্তায় ও ভাবে সমৃদ্ধ, তেমনি তাহা ইয়োরোপীয় জাতিদের বিশ্বে প্রাধান্য স্থাপনের কাহিনীতে কলঙ্কিত। এই যুগেব এক প্রান্তে নেপোলিয়নের উচ্চাকাঙ্ক্ষা-প্রসূত ইয়োরোপ-ব্যাপী চাঞ্চল্য ও অশান্তি, অন্য প্রান্তে ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনেব উদগ্র কামনা-প্রসূত বিশ্বব্যাপী মহাসমর। ভিয়েনা কংগ্রেসে ইয়োরোপের দেশগুলির অস্বাভাবিক ভৌগোলিক পরিস্থিতি সৃষ্টির সহিত এর আরম্ভ এবং ভের্সাই সন্ধির অনুরূপ অন্যায় ব্যবস্থার সহিত এর অবসান। ভিয়েনা কংগ্রেসের অদূরদর্শিতার জন্য ইয়োরোপের জাতিগুলির ভিতর যে প্রতিহিংসা প্রতিযোগিতা ও বিদ্বেষের স্ফুলিংগ ধূমায়িত হচ্ছিল তা এক শতাব্দী পরে প্রথম মহাযুদ্ধের অগ্নিকাণ্ডে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভের্সাই সন্ধি বৈঠকে ইটালি ও জার্মেনির প্রতি অনুদার ও অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছিল, ইটালি ও জার্মেনি দ্বিতীয় মহাসমরের আকারে সেই অন্যায়ের সুদে-আসলে প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হয়েছিল। অসহায় অবস্থায় মানুষ অবিচার নীরবে মাথা পেতে নেয় কিন্তু প্রতিহিংসার যে আগুন তার বুকে জ্বলে তা সহজে নির্বাপিত হয় না, সময় ও সুযোগের অনুকূল পরিবেশে তার উদ্গম হয়, সেই বহ্নিজ্বালায় দেশ ছারখার হয়ে যায়, তার তপ্ত নিশ্বাসে মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ে।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের উন্নতি উনবিংশ শতকের শেষভাগে যন্ত্রবিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবের সূচনা করে পাশ্চাত্য সমাজে এক অভিনব পরিস্থিতি সৃষ্টি

করেছিল। একদিকে যেমন বাষ্পীয়পোত রেলপথ তড়িৎ বার্তাবহ বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যবহার মোটরগাড়ি উড়োজাহাজ বেতার বার্তাবহ পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করে দূরকে নিকট করেছিল, যাতায়াতের সুবিধা ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করেছিল, অন্যদিকে তেমনি বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়েছিল।

ইংল্যাণ্ডের নৌশক্তি অজেয় এবং তার শিল্পোন্নতি অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তার দৃষ্টান্ত অনুকরণ করে যুক্তরাষ্ট্র শিল্পবিস্তারে মনোযোগী হয়েছিল এবং রেলপথ নির্মাণ করে প্রশান্ত মহাসাগরের তীরভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে এই বিরাট দেশে একটি মহাজাতি সৃষ্টি করেছিল। তারা যেমন ইয়োরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেনি, তেমনি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় ইয়োরোপের কোন শক্তিকে হস্তক্ষেপ করতে দেয়নি। স্পেন ও পর্তুগালের ঔপনিবেশিকগণ দক্ষিণ আমেরিকায় যে সকল রিপাব্লিক স্থাপন করে তাদের নাম লাটিন রিপাব্লিক। মনরো নীতির প্রয়োগে যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করেছিল। এজন্য কোন ইয়োরোপীয় শক্তি তাদের অধিকার করে নিতে সাহস করেনি।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতি যন্ত্রোৎপাদিত শিল্প দ্রব্যের উৎপাদনে ইউরোপের পশ্চাতে ছিল। সুতরাং তারা ইয়োরোপের যান্ত্রিক সভ্যতার সহিত প্রতিযোগিতা করতে সমর্থ হয়নি। যন্ত্র সাহায্যে কারখানায় বিপুল পরিমাণে দ্রব্য উৎপাদন করতে হলে কাঁচা মালের প্রয়োজন কিন্তু পশ্চিম ইয়োরোপে এর একান্ত অভাব ছিল। আবার উৎপাদিত দ্রব্যের কাটতির জন্য ক্রেতার আবশ্যক হয়ে উঠল। সুতরাং কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং উৎপাদিত দ্রব্যের বিক্রয়ের জন্য তারা অনুন্নত ও দুর্বল দেশে বাজার অন্বেষণ করতে লাগল। এশিয়া ও আফ্রিকা দুর্বল ও শিল্পে অনুন্নত ছিল। ইয়োরোপ শকুনির মতো তাদের মাংস ছিড়ে খেতে লাগল। দেশের পর দেশ অধিকার করে ইংল্যাণ্ড সাম্রাজ্য গঠনে প্রথম স্থান গ্রহণ করল। তার সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিল্পোন্নতি ও নৌশক্তি।

মশলা ও অন্যান্য দ্রব্য ক্রয় করার জন্য ইয়োরোপের বণিকগণ প্রথমে ভারতবর্ষে ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশে আবির্ভূত হয়েছিল। তারা বহু দ্রব্য ও হস্তচালিত তাঁতের কাপড় পাশ্চাত্য দেশে আমদানি করেছিল কিন্তু যন্ত্রবিপ্লবের

ফলে পশ্চিম ইয়োরোপের সস্তা জিনিষ ভারতবর্ষে আমদানী হল এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের কুটীর শিল্প ধ্বংস করে ইংল্যাণ্ডের মাল কাটতিতে সাহায্য করেছিল।

ইয়োরোপ এশিয়ার বুকের উপর চেপে বসল। উত্তরে অতিকায় রাশিয়া মুখ বিস্তার করে বসেছিল, দক্ষিণে ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষকে গলাধঃকরণ করল, পশ্চিমে ইয়োপের 'রুগ্ন ব্যক্তি' তুর্কীর ভাঙন ধরেছিল, পারস্য নামমাত্র স্বাধীন হলেও ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার শক্তিচক্রের অন্তর্গত ছিল, পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ ইণ্ডোচীন, মালয়, যবদ্বীপ, সুমাত্রা, ফিলিপাইন প্রভৃতি ইয়োরোপের কর্তৃত্বাধীন হয়েছিল এবং চীন ইয়োরোপীয় শক্তিপুঞ্জের ক্রীড়নক হয়ে দাঁড়াল। কেবল মাত্র জাপান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিরোধ করেছিল।

আফ্রিকাও দুর্বল ছিল। ইয়োরোপীয় জাতিগণ তার অংগ ব্যবচ্ছেদ করে নিজেদের ভিতর বণ্টন করে নিল। ইংল্যাণ্ড মিশর অধিকার করল এবং ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সুয়েজখাল কাটার পর ইংল্যাণ্ড থেকে ভারতবর্ষে যাতায়াতের সুবিধা হল। ভারতবর্ষের উপর ইংল্যাণ্ডের প্রভুত্ব কায়েম হয়ে গেল।

যন্ত্রবিপ্লবের ফলে শিল্পবিপ্লব, শিল্পবিপ্লবের ফলে পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিল। প্রাচীনকালে রোম চীন ও ভারতবর্ষের সাম্রাজ্য ছিল, আরব ও মোগলদেরও সাম্রাজ্য ছিল কিন্তু আধুনিক যুগের সাম্রাজ্যের সহিত এর প্রভেদ আছে। নূতন সাম্রাজ্যবাদ যন্ত্রশিল্পের সন্তান। সাম্রাজ্য-বাদের মূলসূত্র শোষণ। প্রাচীনকালে সাম্রাজ্য ছিল কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী নিজের কোলে ঝোল টানে। সে অক্টোপাশের মতো হাত বাড়িয়ে ছলে বলে ও কৌশলে শোষণ করে মানুষকে অন্তঃসারশূন্য করে দেয়।

সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ অধিকার অত্যাচার ও শোষণে দুর্বল ও সভ্য জাতিরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। তারা মুক্তির উপায় সন্ধান করতে লাগল। স্বাজাতিকতার উদ্ভব হল। স্বাজাতিকতা ও স্বদেশপ্রেম এক বস্তু নয়। স্বদেশপ্রেম মানুষের চরিত্রের মহৎ গুণ। এতে আছে দেশের প্রতি ভালবাসা, দেশবাসীর প্রতি মমত্ব বোধ। স্বাজাতিকতায় আছে বিদেশের প্রতি ঘৃণা, হিংসা ও দ্বেষ। ইয়োরোপে বিভিন্ন জাতির মধ্যে হিংসা দ্বেষ, পরস্পরকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিযোগিতা—জাতির সহিত প্রতি জাতির, মানুষের সহিত

মানুষের সংঘর্ষ চলতে লাগল। প্রাচ্যদেশ সকলে স্বাদেশিকতার জন্ম হল, বিদেশী আগন্তুকদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা হল।

পশ্চিমের সাম্রাজ্যবাদের তীব্রতা বৃদ্ধির সহিত এশিয়ায় জাতীয়তা শক্তিশালী হয়ে উঠল। জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয় জাপানকে এশিয়ার নেতৃত্বপদে স্থাপন করল। এশিয়ার আত্মশক্তিতে বিশ্বাস সৃষ্টি করল। জাপান পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টান্ত অনুকরণ করেছিল। এশিয়াকে পাশ্চাত্যজাতিদের হাত থেকে রক্ষা করার মহৎ উদ্দেশ্য তার ছিল না। এশিয়ার অন্য জাতিদের মোহ কেটে গেল। তারা আত্মশক্তির উদ্বোধনে চেষ্টিত হল। বিভিন্ন দেশে জাতীয়তার আন্দোলন চলতে লাগল। ভারতবর্ষেও জাতীয়তাবাদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। ভারতীয় কংগ্রেস জনমনের এই ভাবের প্রতীক।

আয়র্ল্যাণ্ড। ইয়োরোপের পশ্চিমে আটলাণ্টিক মহাসাগরে ভাসমান দ্বীপ আয়র্ল্যাণ্ড একটি মধুর দেশ। এই স্থানের শ্যামলক্ষেত্র প্রাণ জুড়িয়ে দেয়। এর সাহসী অধিবাসীগণ যুগযুগান্তর ধরে স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে।

উপদ্রুত জাতি অতীতের সুখ-স্বপ্নে বিভোর হয়। যাদের বর্তমান অন্ধকারময় তাদের কাছে অতীত উজ্জ্বল হয়ে দেখা দেয়, তারা অতীতকে আঁকড়ে ধরে। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে আয়র্ল্যাণ্ড বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ছিল। ভাণ্ডাল ও হুণদের আক্রমণে যখন রোমান সাম্রাজ্য ও রোমান সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায়, তখনও আয়র্ল্যাণ্ডে জ্ঞানের দীপশিখা নির্বাপিত হয়নি। তার ভক্ত সন্ন্যাসী প্যাট্রিক সেখানে খ্রীষ্টীয় ধর্ম প্রবর্তিত করেন। বহু মঠ ও আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সকল কেন্দ্র থেকে প্রচারকগণ বহির্গত হয়ে উত্তর ইয়োরোপে খ্রীষ্টানধর্মের অমূল্য শিক্ষা বিতরণ করেছিল।

ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে প্রায় তিন শত বৎসর—আয়র্ল্যাণ্ডের সুবর্ণ যুগ। সেই সময়ে গেলিক সংস্কৃতি উন্নতির উচ্চ সীমায় উঠেছিল। তারপর আয়র্ল্যাণ্ড নানা অংশে বিভক্ত হয় এবং প্রাধান্য লাভের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করতে থাকে। সুযোগ বুঝে দিনেমার ও নর্সগণ বহু স্থান দখল করে নেয়। একাদশ শতকের প্রথমভাগে ব্রিয়ান বরুমা নামে একজন রাজা দিনেমারদের পরাজিত করে আয়র্ল্যাণ্ডে একতা স্থাপন করেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর আয়র্ল্যাণ্ড পুনরায়

বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে অ্যাংগ্লো-নর্মান বিজয় আয়র্ল্যাণ্ডের গেলিক সভ্যতা বিনষ্ট করে দেয়।

আইরিশগণ বিজাতীয় শাসকদের ঘৃণা করত এবং সুযোগ পেলেই বিদ্রোহ করত। রাণী এলিজাবেথের আমলে বিদ্রোহী আয়র্ল্যাণ্ডকে সায়েস্তা করার জন্য ইংরেজ জমিদারদের নিয়ে সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করা হয়। উত্তর আয়র্ল্যাণ্ডে আলষ্টারে ছয়টি জেলায় সমস্ত জমি প্রথম জেমস্ বাজেয়াপ্ত করে নেন। প্রথম চার্লস্ এবং পার্লামেণ্টের মধ্যে যুদ্ধের সময় কাথলিক আয়র্ল্যাণ্ড রাজার পক্ষ অবলম্বন করে। ১৬৪১ সালে তারা বিদ্রোহী হয়ে প্রোটেষ্টাণ্টদের নির্মমভাবে হত্যা করে। ক্রমওয়েল সুদে-আসলে এই হত্যার প্রতিশোধ নিয়েছিলেন।

ফ্রান্স ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর আয়র্ল্যাণ্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাথলিকদের উপর অত্যাচার পূর্ববৎ চলতে থাকে। ডাবলিন পার্লামেণ্টের সদস্যগণ নিজেদের পার্লামেণ্টের অস্তিত্ব লোপ করে দিবার পক্ষে ভোট দিল। আয়র্ল্যাণ্ডকে ইংল্যাণ্ডের সহিত যুক্ত করা হল। আয়র্ল্যাণ্ডের কয়েকজন সভ্য লণ্ডনের পার্লামেণ্ট সভায় স্থান পেল। কিন্তু ক্যাথলিকদের নাগরিক হওয়ার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে সংস্কার আইনবলে ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডকে সমান অধিকার দেওয়া হল।

১৮৪৬ সালে আয়র্ল্যাণ্ডের কৃষকদের প্রধান খাদ্য আলুর চাষ নষ্ট হয়ে যায়। দেশময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বহু আইরিশ কৃষক দেশ ছেড়ে আমেরিকা প্রভৃতি দেশে চলে গেল। শস্যশ্যামল কৃষিক্ষেত্র মেষচারণ ভূমিতে রূপান্তরিত হল এবং পশম ইংল্যাণ্ডে রপ্তানি করা হল। আমেরিকায় আইরিশ প্রবাসীদের 'ফিনিয়ান' বলা হত। তাদের প্ররোচনায় আয়র্ল্যাণ্ডে বিদ্রোহ হতে লাগল। ফিনিয়ানদের দমন করা হল। তাদের আন্দোলন শেষ হয়ে গেল।

ঊনবিংশ শতাব্দীর স্থাপত্য চিত্রশিল্প সঙ্গীত ও সাহিত্য

ঊনবিংশ শতকের প্রথম পাদের চিত্রকলায় সমসাময়িক সামাজিক পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছিল। এই সময় মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ঐশ্বর্যে ও ক্ষমতায় সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। চিত্রাঙ্কন বৃহৎ ব্যবসায়ে পরিণত হল। ভদ্র সমাজে চিত্রশিল্পীদের মর্যাদা বেড়ে গেল। ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প জনপ্রিয় হয়ে উঠল।

ইংল্যাণ্ডে রাস্কিন (১৮৩৪—১৮৯৬) চিত্রশিল্পের সমালোচনায় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। প্রাক্ রাফিলাইটগণ মধ্যযুগের শিল্পাদর্শে আকৃষ্ট হলেন। ফ্রান্সে ডিগাস ম্যানেট ও রিনর্বয়াসের চিত্রশিল্পে রামব্রাণ্ট ও ভেলাকুইজের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছিল। আমেরিকায় হুইসটালের নাম উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতকের শেষভাগে চিত্রশিল্প থেকে বাস্তবতা অন্তর্হিত হল। গালিচা পর্দ্দা ও কাপড়ের উপর ফুল প্রভৃতির চিত্র আঁকার রীতি বাতিল হয়ে গেল। বস্তু-তান্ত্রিকতার পরিবর্তে ভাবতান্ত্রিকতা চিত্রের প্রধান বস্তু হয়ে উঠল।

ফ্রান্সে নেপোলিয়নের যুগে গৃহ নির্মাণ শিল্পে রোমান রীতি ব্রিটেনে গথিক রীতি এবং রাণী অ্যানের যুগে রেনেসাঁ রীতি অনুসৃত হয়েছিল।

উনিশ শতকের শেষভাগে নূতন মহাদেশের ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সহিত নির্মাণ কার্যে ইস্পাত কাঁচ ও সিমেণ্ট কনক্রিট ব্যবহৃত হতে আরম্ভ হয়। বিংশ শতকের প্রারম্ভে আমেরিকা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম স্থাপত্য শিল্পের গৌরবজনক স্থান অধিকার করে। অপরিমেয় ঐশ্বর্য, অদম্য উৎসাহ, অপূর্ব ওজস্বিতা ও মনের বিশালতা আমেরিকায় স্থাপত্যে ও চিত্রে অভিব্যক্ত হয়েছিল।

ভারতবর্ষে প্রাচীন কাল থেকে নির্মাণ শিল্পে হিন্দু আদর্শ প্রচলিত ছিল। ইংরেজ আমলে পাশ্চাত্যের অনুকরণে বহু গৃহ সৌধ প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল। জাপানে কিউটো ও ওজাকায় বহু শিল্পীর উদয় হয়। তাঁরা ওকিও গানকুর আদর্শ অনুসরণ করতেন। হোকুসাই কাঠের উপর খোদাই করে রঙীন চিত্র এঁকেছিলেন। তিনি নাগাসাকির ডাচ্ বণিকদের আমদানী চিত্রের পটভূমি ও শরীর বিজ্ঞানের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কিকুচি যোসাই-এর চিত্রে ইয়োরোপীয় ভাব প্রতিফলিত।

সঙ্গীতে বিথোভেনের রীতি উনবিংশ শতকে অনুসৃত হয়। পরে ওয়েবার স্কবার্ট মেণ্ডেলসন স্কুম্যান ও সিজার ফ্রাঙ্ক আবির্ভূত হন। সঙ্গীত রাজপ্রাসাদ ও ধনীর গৃহ থেকে মুক্তিলাভ করে শিক্ষিত জনসাধারণের মেলায় প্রবেশ করে। ঐ যুগের সুর ও কথাশিল্পীগণ উদারতর মনোভাবের প্রেরণায় পূর্ব ইয়োরোপের ও প্রতীচ্য জাতির গল্প ও কাহিনীর ভিতর নূতন বিষয়বস্তু ও নূতন ভাব সম্পদের অনুসন্ধান করেছিলেন। চোপিন, লিজট ও জোয়াকিম্ যথাক্রমে পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরি থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ওয়াগনার ওয়েবারের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অপেরার সনাতন রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়েছিলেন, যন্ত্রসংগীতের ক্ষেত্র বৃহত্তর করলেন, নূতন শক্তি ও ভাবের প্রেরণায় এক্কে

অনুপ্রাণিত করলেন। রাশিয়ায় চেকোভিস্কি মৌশরগস্কি ও রিমস্কি কর্সাকাকোভ সংগীতের ভিতর দিয়ে রঙীন ও আনন্দময় জগতের সন্ধান দিয়েছিলেন। জেক্ ভোরাক্, রিচার্ড ষ্ট্রাস্ ও ডেবুসি সংগীতে নূতন সৌন্দর্যের ভাব যোজনা করেছিলেন।

উনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে বহু ইংরেজ কবির অভ্যুদয় হয়েছিল। ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রকৃতির একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন। আদর্শবাদী শেলির কল্পনা অসীমে উঠেছিল, কীটসের কাব্যে সত্য শিব ও সুন্দরের উপাসনা পরিস্ফুট, বাইরনের জ্বালাময়ী কবিতা ইয়োরোপকে মোহিত করেছিল। মনীষী গ্যেটে জার্মেনির সাহিত্যাকাশে অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তিনি একাধারে বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সমালোচক ও কবি ছিলেন। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ পাঠ করে তিনি উচ্ছ্বসিত ভাষায় তার প্রশংসা করেছিলেন। সভাকবি টেনিসন মহারাণী ভিক্টোরিয়াব প্রশস্তি লিখে এবং ইংরেজ জাতির বীরত্বের অতিশয়োক্তি করে সাম্রাজ্যবাদের ইন্ধন জু'গিয়েছিলেন। এই বিষয়ে তিনি রাডিয়ার্ড কিপ্লিং-এর সমধর্মী। স্যার ওয়াল্টার স্কটের ওয়েভারলি উপন্যাসাবলী তাঁর সাহিত্য সাধনার অপূর্ব ফল। প্রথম জীবনে দুইখানি বৃহৎ কাব্য রচনা করে তিনি কবিযশ অর্জনে প্রয়াসী হয়েছিলেন। স্কটল্যাণ্ড ও সীমান্ত প্রদেশের খুটিনাটি ঘটনার সমাবেশে গ্রন্থদ্বয় ভারাক্রান্ত হলেও কবিকল্পনায় সাময়িক বিদ্যুৎ প্রবাহে তা উজ্জ্বল। উপন্যাসের মাধ্যমে তিনি মধ্য যুগের যোদ্ধা ও বীরত্বেব গুণগান করেছিলেন। লেখনীর মোহিনী শক্তির জন্য তাঁকে "উত্তরাঞ্চলের যাদুকর" বলা হয়েছে।

মহিলা লেখকদের ভিতর জেন আষ্টিন এবং জর্জ এলিয়ট উচ্চ স্থান অধিকার করেছেন। গার্হস্থ্য জীবনের স্বল্পপরিসর বেষ্টনীর মধ্যে স্ত্রীজাতি-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী ও ভাবপ্রকাশ করার ক্ষমতায় এদের সমকক্ষ লেখক বিরল। ষ্টিভেনসন (১৮০০-১৮৯৪) অতুল প্রতিভার অধিকারী হয়েও তার যথাযথ ব্যবহার করতে সমর্থ হন নি। চার্লস ডিকেন্সের চরিত্র সৃষ্টির বিপুল শক্তি আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করে। সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তি জীবনের আলেখ্য অংকনে তিনি সুনিপুণ। শিল্প বিপ্লবের ফলে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক জীবনে যে অনাচার প্রবেশ করেছিল তার উপর তিনি কশাঘাত করেছেন। তাঁর 'পিকুইক পেপারস্, নামক পুস্তক হাস্যরসের অফুরন্ত প্রস্রবণ। চরিত্র সৃষ্টির অসীম ক্ষমতা এবং সবহারাদের অন্তর্জীবনের নিখুত ছবি আঁকার

শিল্প-চাতুর্যের জন্য তাঁকে "লণ্ডনের রাস্তার শেক্সপীয়র" বলা হয়েছে। তাঁর সমসাময়িক থ্যাকারে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সমাজের মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন। তাঁর বিখ্যাত পুস্তকের নাম "ভ্যানিটি ফেয়ার"।

মনীষী কার্লাইলের 'ফরাসি বিদ্রোহ' এবং 'ফ্রেডরিক দি গ্রেট' সুখপাঠ্য। তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'সার্টার' চিন্তা ও মনের খোরাক যোগায়। ইংরেজি সাহিত্যের ক্লাসিক হিসাবে এর স্থান উচ্চে। সামাজিক অনাচার আভিজাত্যের গৌরব তথাকথিত অর্থনীতি আলোচনার প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাঁর অগ্নিগর্ভ প্রতিবাদ, তাঁর তাপস জীবন আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। লণ্ডনের চেলসিয়া নামক পল্লীতে তিনি বাস করতেন বলে লোকে তাঁকে 'চেলসিয়ার সাধু' বলত। ইতিহাস রচনায় বিউরী গ্রীণ ও মেকলে সুপরিচিত। চার্লস রিড এবং মেরিডিথ ঔপন্যাসিক হিসাবে ইংরেজি সাহিত্যে জীবিত থাকবেন। পদ-লালিত্যে ও ছন্দ মাধুর্যে টেনিসন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও প্রকাশ-ভঙ্গীর অস্পষ্টতা ব্রাউনিংএর বৈশিষ্ট্য। আগ্নেয় গিরিস্রাবের ন্যায় তাঁর চিন্তা ছন্দ ও ভাষার অনুশাসন উপেক্ষা করে প্রবল বেগে প্রবাহিত হয়েছে।

বার্ণার্ড শ' সমস্যাপ্রধান নাটক রচনায় সিদ্ধহস্ত। তাঁর এক একটি নায়ক ও নায়িকা এক একটি সমস্যার রক্তমাংসের দেহবান প্রতীক। প্রকাশভঙ্গীর স্পষ্টতায়, চরিত্র অংকনের নিপুণতায়, ভাষার লালিত্যে, মতপ্রকাশের বৈশিষ্ট্যে, সামাজিক প্রথা ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের যথার্থ রূপ উদ্ঘাটন করার ক্ষমতায়, সত্যকথনের অপূর্ব শক্তিতে এবং তীব্র বাক্যবিন্যাসে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর উক্তির অভিনবত্ব তাঁব ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক। টমাস হার্ডী উপন্যাসের গণ্ডী অতিক্রম করে নেপোলিয়নের কর্মময় জীবন-কাহিনীকে নাটকে পরিবর্তিত করেছেন। ইংরেজী সাহিত্যে ইহাই তাঁর শ্রেষ্ঠতম দান। নরওয়ের হেনরিক ইবসেন নাটকের সাহায্যে সমসাময়িক বাস্তব সমাজ-জীবনের নিপুণ আলেখ্য এঁকেছেন।

ফরাসি সাহিত্যে রোমা রোঁলার জিন ক্রেসতাঁ এই যুগের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। বর্তমান যুগে আদর্শবাদী রোমা রোঁলার বাণী শ্রদ্ধার সহিত গৃহীত হয়। আনাটোল ফ্রান্সের দান বিশ্বসাহিত্যে আদরের বস্তু। উপন্যাস যে শুধু একটি অলীক গল্প নয়, ইহা যে মানুষের বৃহত্তর জীবনের ব্যাখ্যা, এই নীতি বালজাকের সাহিত্য সাধনার মূলমন্ত্র ছিল। কয়েকখানি উপন্যাসে এমিলি জোলা একটি বৃহৎ ফরাসি পরিবারের বংশানুক্রমিক জীবনধারার চিত্র দেখিয়েছেন। ভিক্টর

হিউগোর বিরাট উপন্যাস 'লা মিজেরেবল' রোমা রোঁলার জিন ক্রিসতাঁর ন্যায় অপরিমেয় কল্পনা শক্তি ও প্রতিভার পরিচয় দেয়।

মানুষের জীবন ও তার সমস্যা সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করার কামনার প্রাবল্যে ইংরেজ সাহিত্যিকগণ ছন্দের বন্ধ ভেঙ্গে উপন্যাসের বৃহত্তর ও সহজতর উপায় গ্রহণ করেছিলেন। জার্মেনি রাশিয়া ও স্ক্যানডিনেভিয়ার সাহিত্যে এই একই ভাব পরিস্ফুট। এই যুগের বহু জার্মান কথা-সাহিত্যিকদের মধ্যে গস্টেভ্ ফ্রেট্যান অন্যতম। নরওয়ের জরনসন এবং রাশিয়ার গোগল ডস্টোভিস্কি টুর্গিনেভ ও চিকোভ্ এই যুগের প্রধান লেখক। ঋষিকল্প টলষ্টয় ছোট গল্প উপন্যাস ও প্রবন্ধের ভিতর দিয়ে রাশিয়ার সাধারণ মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য অত্যাচার ও নির্যাতনের যে করুণ কাহিনী রচনা করেছেন তাতে রাশিয়ার বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করেছিল। জার্মেনির জিন পল রিক্টর ইংরেজ মনীষী কার্লাইলের চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

প্রথমে আমেরিকার সাহিত্য প্রচেষ্টা নিউ ইংল্যাণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল। এমার্সনের প্রবন্ধাবলীতে আমেরিকার বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। প্রচলিত খ্রীষ্টান ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি ভারতীয় দর্শন গীতা বেদান্ত ও উপনিষদের প্রতি আকৃষ্ট হন। তাঁর চিন্তাধারা ভারতীয় ভাবে রঞ্জিত, তার কবিতা ও প্রবন্ধ ভারতীয় ভাবে অনুপ্রাণিত। জার্মান দার্শনিক সোপেনহউর বলেছিলেন, উপনিষদ আমার জীবনে সুখ, আমার মৃত্যুতে শান্তি। ভগবদ্গীতা এমার্সনের নিত্য সহচর ছিল। এমার্সন থরো ও হুইটম্যান আমেরিকায় নরনারীর মন ভারতীয়ভাবে অভিষিক্ত করেছিলেন। সম্ভবতঃ এইজন্যই আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচার সহজসাধ্য হয়েছিল। লঙ্-ফেলোর কবিতাবলী উচ্চভাবদ্যোতক না হলেও প্রসাদগুণসম্পন্ন। এড্গার অ্যালেন পো ইয়োরোপীয় নীতি অনুবর্তন করতেন। হথর্ণের সাহিত্যসাধনা টিউটনিক ভাবরঞ্জিত। হাউএলস্ (১৮৩৭—১৯২০) টমাস্ হার্ডির সমধর্মী। তাঁর উপন্যাসে ফরাসি ভাব পরিস্ফুট। হেন্‌রি জেমস্-এর (১৮৪৩ - ১৯১৬) উপন্যাসের পটভূমি ইয়োরোপ। প্রাচীন সভ্যতার সহিত সাধারণ আমেরিক জীবনের সংঘর্ষ তাঁর উপন্যাসের বিষয়বস্তু। মার্ক টোয়েনের গ্রন্থাবলী আমেরিকানভাবে ভরপুর।

ভারতবর্ষে বহু ভাষা প্রচলিত থাকলেও মাত্র কয়েকটি ভাষায় সাহিত্য আছে। হিন্দী সাহিত্যে তুলসীদাসের রামায়ণ ভক্ত জীবনের অপূর্ব অবদান।

ভারতীয় ভাষাসমূহের ভিতর বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্যে পরিণতিলাভ করেছে। সাগর-বেষ্টিত শ্বেতদ্বীপের ন্যায় সাগর-মেখলা কানন-কুন্তলা বাংলা দেশও বহু কবি ও মনীষীর জন্মভূমি। প্রাচীন বাংলার জয়দেবের কান্ত কোমল মধুর পদাবলী, চণ্ডীদাস-প্রমুখ বৈষ্ণবকবিদের সংগীত-লহরীর কথা ছেড়ে দিলেও আধুনিক বাংলায় কোনদিন সুকবির অভাব হয়নি।

ঊনবিংশ শতকের প্রথমভাগে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের মূলে রাজা রামমোহন রায়ের বিরাট ব্যক্তিত্ব ও অসাধারণ মনীষা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সমাজ সংস্কারে ধর্মসাধনায় সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব বিশ্লেষণে স্বাধীন চিন্তায় সাহিত্য সাধনায় রামমোহন সে যুগের আলোকবর্তিকা। গদ্য সাহিত্যে বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার, কাব্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও বিহারীলাল বঙ্গ-সাহিত্যের কৌস্তুভমণি। ছান্দসিক প্রতিভায় কল্পনার বিদ্যুৎখেলায় পাণ্ডিত্যে মধুসূদন মিণ্টনের সমধর্মী। 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে ঔপন্যাসিক কবি প্রবন্ধ লেখক সমালোচক ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ছিলেন। তাঁর রচনার একদিকে প্রকাশ হয়েছিল অপার মাধুর্য সুজলা-সুফলা মাতৃভূমির অনবদ্য স্তোত্রে, অন্যদিকে দেখা দিয়েছিল ক্ষুব্ধ আক্রোশ বিদ্রোহের রূপে। তাঁর কপালকুণ্ডলা উপন্যাস গদ্যকাব্য। কপালকুণ্ডলা চরিত্র বিশ্বসাহিত্যে অপূর্ব সৃষ্টি। প্রকৃতিতনয়া কপালকুণ্ডলার সাহিত তুলনা করলে সেকসপীয়রের দ্বীপনিবাসিনী মিরাণ্ডা, কালিদাসের কাননচারিণী শকুন্তলা এবং হোমরের সৈকতবিহারিণী নাসিকায়া হীনপ্রভ হয়ে যায়। তাঁর স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক বন্দে মাতরম্ সংগীতে দেশমাতৃকার যে মনোমোহিমী মূর্তি অংকিত হয়েছে তা কোন দেশের জাতীয় সংগীতে দেখা যায় না। সমসাময়িক রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি তাঁর কোন কোন উপন্যাসকে সমস্যা-প্রধান করেছে। নাটকেও বাংলা সাহিত্য নিতান্ত দরিদ্র নয়। মাইকেল, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রভৃতি নাট্যকার চিরস্মরণীয়। অধ্যাত্ম সাধনায় শ্রীরামকৃষ্ণ এবং বেদান্ত-প্রচারে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ, ধর্মপ্রচারে কেশবচন্দ্র ও দয়ানন্দ সরস্বতী, দার্শনিকতায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী।

সাম্রাজ্যবাদের শোচনীয় পরিণাম

প্রথম মহাসমরের প্রস্তুতি

ইংল্যাণ্ড। দুই হাজার বৎসর পূর্বে প্লেটো এবং আরিষ্টটল বলেছিলেন, শাসনকার্যে একমাত্র জ্ঞানীরই অধিকার। জ্ঞানীকে নির্বাচন করবে সাধারণ মানুষ। জ্ঞানী ব্যক্তিই জনসাধারণের নিঃস্বার্থপর প্রতিনিধি। ধর্ম সাম্প্রদায়িকতা ও অর্থ শাসনযন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করলে শাসনযন্ত্র নির্বিবেক পেষণযন্ত্র হয়ে দাঁড়ায়।

ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট পৃথিবীর নানা দেশের পার্লামেণ্টের জননী। প্রাচীনকাল থেকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট রাজার স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, অস্ত্রধারণ করেছে এবং জোর করে প্রজাসাধারণের জন্য রাষ্ট্রিক অধিকার আদায় করে নিয়েছে কিন্তু তথাপি ইংল্যাণ্ডে প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হয়নি। কেবলমাত্র ব্যাপক ভোটাধিকার গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য নয়। বিত্তশালী বণিক ও ব্যবসায়ীরা, পুঁজিওয়ালারা টাকার জোরে ভোট হস্তগত করে পার্লামেণ্টে একাধিপত্য করতে লাগল, নিজেদের সুবিধার জন্য আইন রচনা করল। পার্লামেণ্টরি শাসনব্যবস্থা গণতান্ত্রিক না হয়ে ধনতান্ত্রিক হয়ে উঠল।

পূর্বের হুইগ্ ও টোরি দল উনিশ শতকে উদারনৈতিক ও রক্ষণশীল দলে পর্যবসিত হয়েছিল। যখন দুইটি বৃহৎ ও সুগঠিত দলের বিত্তশালী ব্যক্তিগণ পার্লামেণ্টে প্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তখন স্বাধীনচেতা ও দরিদ্র ব্যক্তির পক্ষে পার্লামেণ্টে প্রবেশ করা সুকঠিন হয়ে উঠে। দলবিশেষের মনোনীত প্রতিনিধি স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে না, বিপক্ষ দলকে ভোটে পরাজিত করে শাসনক্ষমতা হস্তগত করাই একমাত্র কার্য হয়। দরিদ্র প্রজা সমাজের শ্রেষ্ঠতম ও বিচক্ষণ ব্যক্তিকে নির্বাচন করার সুযোগ পায় না। কী ভাবে সাধারণ মানুষ সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিদের নির্বাচন করে দেশের শাসনকার্যে নিযুক্ত করতে পারে, ইহাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান সমস্যা। ব্রিটিশ পার্লামেণ্টেরি শাসনপদ্ধতি এই সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতে পারেনি।

উনিশ শতকের শেষভাগে ডিস্‌রেলী ও গ্লাড্‌ষ্টোন বহুবার ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন। ডিস্‌রেলী ছিলেন রক্ষণশীল দলের প্রধান নেতা।

ইহুদী হলেও তিনি ধৈর্য ও প্রতিভাবলে ইংরেজ জাতির ইহুদী-বিরোধী মনোভাব জয় করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি খাঁটি সাম্রাজ্যবাদী ছিলেন। তাঁর কথায় ও কাজে লুকোচুরি ছিল না। উদারনৈতিক দলের নেতা গ্লাড্‌ষ্টোন খাঁটি ইংরেজ ছিলেন এবং তিনি খাঁটি ইংরেজের স্বভাবসিদ্ধ বাক্‌চাতুরী ও মনোজ্ঞ ভাষার আবরণে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ঢেকে রাখতেন।

দেশে শিল্পজাত দ্রব্যের প্রচুর উৎপাদন, বিদেশে উপনিবেশ এবং দুর্বল ও অনুন্নত জাতির শোষণ ইংল্যাণ্ডের জাতীয় সম্পদ সৃষ্টি ও বৃদ্ধি করেছিল। তুলা কয়লা লোহা এবং জাহাজ নিমাণ এই সম্পদের ভিত্তি। বিদেশ থেকে অর্থের স্রোত বইতে লাগল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আর্থিক অবস্থার উন্নতি হল, এমন কি শ্রমিকগণও সেই অর্থের কিছু অংশ ভাগ পেয়ে নিজেদের জীবনধারণ প্রণালীর উন্নতি করল। কিন্তু টাকা ঘরে বসিয়ে রেখে লাভ নেই। ইংল্যাণ্ড ও স্কট্‌ল্যাণ্ডে বহু কারখানা নির্মিত হল, নূতন রেল লাইন পাতা হল, প্রতিযোগিতার ফলে অল্পকালের ভিতর লাভ কমে গেল। পুঁজিওয়ালাগণ এক্ষণে বিদেশের দিকে লুব্ধনয়নে তাকাতে লাগল। তারা ইয়োরোপে আমেরিকায় আফ্রিকায় এবং ব্রিটিশ অধিকৃত দেশে শিল্প রেলওয়ে প্রভৃতি ব্যাপারে টাকা খাটাতে লাগল। কানাডা ও অষ্ট্রেলিয়া ব্রিটিশ মূলধন নিয়ে উন্নত হয়েছিল। চীনে ও ভারতবর্ষে ইংল্যাণ্ডেব টাকা খাটতে লাগল।

ইংল্যাণ্ড পৃথিবীর সকল দেশের মহাজন ও লণ্ডন টাকার বাজার হয়ে উঠল। সুদের দরুণ সোনা ও রূপা না নিয়ে সে কাঁচা মাল পাঠাতে লাগল। ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেল। অবসর ভোগী লোকের সংখ্যা বেড়ে গেল। কোন রেলওয়ে বা অন্য কোম্পানীর শেয়ার কিনে তারা পায়ের উপর পা রেখে নিশ্চেষ্ট বসে থাকল। গম চা কফি মাংস ফল মদ তুলা পশম প্রভৃতি দ্রব্য আসতে লাগল। পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভের আমলে প্রচুর পরিমাণে সোনা রূপা প্রভৃতি মূল্যবান ধাতু ইংল্যাণ্ডে আনা হল। ইংল্যাণ্ড খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন করতে ভুলে গেল. দেশ-বিদেশ থেকে শুধু কাঁচা মাল ও খাদ্যদ্রব্য আমদানী করতে লাগল। ফলে সে পরাধীন দেশের কাছে পরাধীন হয়ে গেল। এজন্য সে অবাধ বাণিজ্য নীতি অনুসরণ করছিল কিন্তু অন্যান্য দেশ পণ্যের উপর শুল্ক আদায় করে নিজেদের শিল্প রক্ষা করল। উদ্বৃত্ত টাকার

নাম ক্যাপিটাল বা পুঁজি এবং এর অধিকারীর নাম পুঁজিওয়ালা। পুঁজি সকল দোষের আকর, যদিও এর সদ্ব্যবহার সকল প্রকার উন্নতির জনক। যে ব্যক্তি পরিশ্রম না করে অপরের শ্রমলব্ধ অর্থ শোষণ করে সে দস্যুর ন্যায় সমাজের ক্ষতি করে। রাস্কিন বলেছিলেন, যে কাজ করে না সে হয় ভিক্ষুক, না হয় চোর। দেশের সমস্ত ভূমি সম্পত্তি ও শিল্পজাত দ্রব্য জনসাধারণের সম্পত্তি হলে পুঁজিওয়ালা সৃষ্টি হয় না এবং ভূমিসম্পত্তিহীন কপর্দকশূন্য ব্যক্তিকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিঃস্ব হতে হয় না।

ভিক্টোরীয় যুগের মধ্যবিত্তশ্রেণী শিল্পে ও ব্যবসায়ে শীর্ষস্থান অধিকার করল, প্রচুর অর্থের মালিক হল এবং গর্বে স্ফীত হয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠতম সভ্য জাতি বলে ভাবতে শিখল এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে ভগবৎ সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান বলে মনে করল। ডারউইনের 'শ্রেষ্ঠতমের উদ্বর্তন' নীতির সত্যতা সম্বন্ধে তাদের আর সন্দেহ রইল না। তারা ধর্ম ও নীতির আদর্শকে অগ্রাহ্য করল, উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠানকে নিম্নশ্রেণীর কার্য বলে মনে করল এবং ধর্মের দোহাই দিয়ে দরিদ্রদের সন্তুষ্ট রাখতে চেষ্টা করল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ধর্মবিষয়ে প্রজাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিল কিন্তু অন্য কোন বিষয়ে, বিশেষতঃ শাসন প্রতিষ্ঠানের সামান্য সমালোচনাও তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠল।

শিল্পপ্রধান জাতিদের ভিতর প্রতিযোগিতা সাম্রাজ্যবাদের জন্ম দিল। তারা দুর্বল ও অনুন্নত দেশের সন্ধানে বহির্গত হল, ভারতবর্ষ, চীন, পারস্য, আফ্রিকাকে খণ্ড খণ্ড করে গ্রাস করল। তারা পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ল, অনুন্নত দেশগুলিকে উন্নত করার দায়িত্ব শ্বেত জাতিদের অবশ্য প্রতিপাল্য কর্তব্য বিবেচনা করল। ইংল্যাণ্ড ভারতবর্ষকে মানুষ করার দায়িত্ব গ্রহণ করল। ফ্রান্স পৃথিবীতে সভ্যতা বিস্তারের জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠল। জার্মেনি 'কুলটুর' প্রচারে মনযোগী হল। অসভ্য জাতিদের সভ্য করে তোলার জন্য ইটালির চোখে ঘুম ছিল না।

কিন্তু পৃথিবীর আয়তন অল্প। এতগুলি স্বার্থপর জাতির সাম্রাজ্য ক্ষুধা মেটানর মতো স্থানের অভাব হয়ে উঠল। নূতন দেশ অধিকারের জন্য প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না। তারা অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র নির্মাণ করতে লাগল। ফ্রান্সের সংগে ইংল্যাণ্ডের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ল কিন্তু ইংল্যাণ্ড ও জার্মেনির মধ্যে প্রকৃত যুদ্ধের মহড়া চলতে লাগল।

জার্মেনি ইটালি এবং অষ্ট্রিয়া সংঘবদ্ধ হল। ফ্রান্সের সহিত রাশিয়া বন্ধুতা করল। ইংল্যাণ্ড তলে তলে তাদের দলে ভিড়ে গেল।

আমেরিকা—আমেরিকার প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ। আধুনিক যুগের শিল্পোন্নতির জন্য কয়লা লোহা ও তেলের বিশেষ প্রয়োজন। আমেরিকার এই কয়টি বস্তুর অভাব ছিল না। দেশের আয়তন বৃহৎ, লোকসংখ্যা অল্প। ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে শিল্পবিষয়ে আমেরিকা ইংল্যাণ্ডের সমকক্ষ হয়ে উঠল।

নানা দেশের জাতির লোক আমেরিকায় বাস করেছিল। জনবহুল ইয়োরোপ থেকে দলে দলে লোক জনবিরল আমেরিকায় এসেছিল। বিভিন্ন জাতির, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের, বিভিন্ন ভাষা ধর্ম ও রুচির লোক একত্র বসবাস করে মিশ্রিত হয়েছিল। ইয়োরোপের সমাজে তারা স্ব স্ব ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর বাস করত। তারা অভিজাতদের ঘৃণাব পাত্র ছিল। ধনী ও দরিদ্রের, উচ্চ ও নীচের প্রভেদ তাদের মধ্যে ঈর্ষা দ্বেষ ও ঘৃণা উদ্রেক করত কিন্তু নবাবিষ্কৃত মহাদেশের সংস্কার-বর্জিত সমাজে তারা স্বাধীন মানুষের মনোবৃত্তি নিয়ে নূতন জীবনের আনন্দ আস্বাদন করতে লাগল। এইরূপে আমেরিকায় এক অভিনব সমাজ গড়ে উঠল। কিন্তু মানুষ পুরাতন সংস্কারের এতদূর দাস হয়ে পড়ে যে বংশগর্ব তার রক্তমাংসে অস্থি-মজ্জায় ওতপ্রোত থাকে। সে আভিজাত্যের শূন্যগর্ভ গৌবব বিস্মৃত হয় না। যাদের শিরায় অ্যাংগ্লো-স্যাক্সন বংশের রক্ত ছিল তাবা নিজেদেব অভিজাত ভাবত, ইটালি প্রভৃতি দক্ষিণ ইয়োরোপের নবাগতদের প্রতি ঘৃণায় নাসিকাকুঞ্চন করত এবং তাদের 'ডগো' নামে অভিহিত করে নিজেদের বংশমর্যাদার ক্ষীণ পরিচয় দিতে কুন্ঠিত হত না। নিগ্রোগণ সমাজের নিম্নতম স্তরে ছিল এবং শ্বেতকায়দের সংগে মিশত না। পশ্চিম উপকূলে চীনা জাপানী ও ভারতীয়গণ বাস করছিল। উপনিবেশ স্থাপনের প্রারম্ভে নূতন দেশে তাদের পরিশ্রমের আবশ্যক ছিল কিন্তু কার্য উদ্ধার হয়ে যাওয়ার পর শ্বেতকায়গণ তাদের পৃথক করে রাখার ব্যবস্থা করেছিল।

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ বিভিন্ন জাতির লোককে সংযুক্ত করেছিল। এক রকম শিক্ষা ব্যবস্থায় তাদের মন মার্জিত হয়েছিল, পরস্পরের সান্নিধ্যে তাদের সংকীর্ণতা দূর হয়ে গেল, বিভিন্নজাতির বিভিন্ন রুচির লোক মার্জিত হয়ে একটি অখণ্ড মহাজাতিতে পরিণত হয়েছিল। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এক মহাজাতি গঠনের এরূপ দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নাই।

যুক্তরাষ্ট্র ইয়োরোপীয় রাজনীতি চক্রান্ত প্রভৃতি থেকে দূরে ছিল, ইয়োরোপের কোন রাজাকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে দেয়নি। যখন ইয়োরোপের শক্তিপুঞ্জ 'পবিত্র চুক্তির' দোহাই দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখতে চেষ্টা করেছিল, তখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট মনরোর নীতি সেখানকার নবগঠিত রিপাব্লিকগুলিকে ইয়োরোপের কবল থেকে রক্ষা করেছিল। যুক্তরাষ্ট্র প্রায় এক শতাব্দী এই নীতি অনুসরণ করেছিল।

মেক্সিকো উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত হলেও দক্ষিণ আমেরিকার লাটিন রিপাব্লিকগুলির অন্যতম। দুইটি ভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির লোক পাশাপাশি বাস করছে। মেক্সিকোর দক্ষিণে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার লোক স্প্যানিস ও পর্তুগীজ ভাষায় কথা বলে। ব্রেজিলে পর্তুগীজ ভাষা, অন্যত্র স্প্যানিশ ভাষা প্রচলিত। লাটিন আমেরিকার সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎস স্পেন। যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা রক্তের বিশুদ্ধতা রক্ষায় যত্নশীল কিন্তু লাটিন আমেরিকায় এই বিষয়ে শৈথিল্য যথেষ্ট আছে। সেখানে স্পেনীয়দের সহিত আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান এবং নিগ্রোদের বিবাহের কোন বাধা নাই। আর্জেণ্টিনা ব্রেজিল ও চিলি দক্ষিণ আমেরিকার তিনটি প্রধান দেশ। মেক্সিকো উত্তর আমেরিকায় প্রধান লাটিন দেশ।

প্রায় এক শতাব্দী কাল যুক্তরাষ্ট্র মনরো নীতি প্রয়োগ করে ইউরোপের কোন জাতিকে লাটিন আমেরিকায় প্রবেশ করতে দেয়নি। তার পক্ষপুটে আশ্রয় পেয়ে দক্ষিণ আমেরিকার রিপাব্লিকগুলি নিরাপত্তা ভোগ করেছিল। কিন্তু ঐশ্বর্য ও শক্তি বৃদ্ধির সহিত রক্ষক ভক্ষক হয়ে উঠল। বিস্তারের নূতন ক্ষেত্র অন্বেষণ করতে গিয়ে তার চক্ষু লাটিন আমেরিকার উপর পড়ল।

বাহুবলে দেশ জয় করে সে সাম্রাজ্য বিস্তারের চিরাচরিত পন্থা অবলম্বন করেনি। সে দক্ষিণ আমেরিকায় নিজের উৎপাদিত পণ্য আমদানী করল, রেলওয়ে খনি প্রভৃতিতে টাকা খাটাতে লাগল, বিভিন্ন রাজ্যকে টাকা ধার দিতে লাগল, এমন কি অন্তর্বিপ্লবের সময় দল বিশেষকে অর্থ সাহায্য করে অন্য দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে প্ররোচিত করল। যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিওয়ালাদের পশ্চাতে পার্লামেণ্টের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। কখনও বা শান্তিরক্ষার অজুহাতে সৈন্য প্রেরণ করে

কোন দলকে সাহায্য করতে লাগল। এইভাবে যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ আমেরিকায় সুকৌশলে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেছে। ইহাই অতীতের সাম্রাজ্যবাদের নবতম রূপ। সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য হলেও এর গতি অপ্রতিহত ও মারাত্মক। রাজনৈতিক প্রভুত্ব না থাকলেও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব থাকতে পারে। যে দেশ অর্থনীতির ক্ষেত্রে পরাধীন, রাজনৈতিক আত্মকর্তৃত্বসম্পন্ন হলেও সে দেশ কার্যতঃ পরাধীন, সে দেশ প্রকৃত স্বাধীন নয়।

আমেরিকার রাজনৈতিক সাম্রাজ্য ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে বিস্তৃত হয়েছিল। কিউবা নামে স্বাধীন। হাইতি ও কিউবা দ্বীপদ্বয়ের উপর আমেরিকার প্রভুত্ব বজায় আছে।

লিসপস্ পানামা খাল খননেব পরিকল্পনা করেন কিন্তু আমেরিকা প্রভুত অর্থব্যয়ে এই খাল কেটেছিল এবং প্রাণপণ চেষ্টায় এই স্থানকে রোগ বীজাণুমুক্ত করে স্বাস্থ্যকর করেছে। পানামা রাজ্যে অবস্থিত হলেও আমেরিকা খালটির উপর প্রভুত্ব করছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ঐশ্বর্য ও শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। বহু ধনকুবেরের অভ্যুদয় হল। অসংখ্য বহুতলবিশিষ্ট আকাশচুম্বী প্রাসাদ নির্মিত হল। শিল্পোৎপাদনে যুক্তরাষ্ট্র এক্ষণে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দেশ। আমেরিকার মাটিতে সাম্যবাদ প্রভৃতি বৈপ্লবিক মতবাদ শিকড় চালাতে পারেনি। যেখানে মানুষের অবস্থা সচ্ছল, যেখানে মানুষ পেট ভরে খেতে পায়, যে দেশে খরচের অনুপাতে আয়ের পরিমাণ অল্প নয়, যেখানে দারিদ্র্যের পেষণ নাই, সেখানকার মানুষ জীবনের আপাত সুখ সচ্ছলতা বিসর্জন দিয়ে একটা অনিশ্চিত ও' অনির্দিষ্ট সুখস্বর্গের আলেয়ার পেছনে ছোটে না। ইংল্যাণ্ডের রক্ষণশীল উদারনৈতিক দলের মতো আমেরিকার রাজনীতি ক্ষেত্রে রিপাব্লিকান ও ডিমোক্রেটিক নামে দুইটি দল আছে। ইংল্যাণ্ডের মতো এখানে তারাও ধনীসম্প্রদায়ের মুখপাত্র ও প্রতিনিধি।

আমেরিকার সভ্যতা।

এখানে উপাদানের বৈচিত্র্য কৃত্রিম সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে। যে সভ্যতার বীজ মাটির নীচে তা মাটির রসে পুষ্ট হয়ে বৃক্ষে পরিণত হয় এবং স্বাভাবিক ভাবে বর্ধিত হয় ও ডালপালা বিস্তার করে। যে সভ্যতার

বীজ মাটির উপর বিক্ষিপ্ত তাকে রক্ষা করার জন্য কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করতে হয়, নইলে সে বাইরের আঘাত সহ্য করতে পারে না। আমেরিকার সকল মানুষ যেন এক ছাঁচের পুতুল। এজন্য তারা কৃত্রিম উপায়ে বৈশিষ্ট্য অর্জনের চেষ্টায় যত্নশীল। তারা সকলে এক ধরণের পোষাক পরে, এক রকম গৃহে বাস করে, এক প্রকারের রীতি-নীতি ও প্রথা অনুসারে চলে। তারা সকলেই ডলার-রাজের উপাসক, প্রায় সকলেই উচ্চ চিন্তা ও শিল্পাদর্শের প্রতি উদাসীন। এখানকার সমাজ চারিদিকে চোহদ্দী আঁটা। যে শিক্ষা বা নীতি সংখ্যা গরিষ্ঠের অনভিপ্রেত তা আইন বিরুদ্ধ। সাম্যবাদী নিরীশ্বরবাদী ও অবাধ প্রেমের উপাসক কোন বৈদেশিক এ দেশের মাটিতে পদার্পণ করতে পারে না। যারা জন্মনিরোধ উপায় অনুমোদন করে, পুঁজিবাদীর সহিত শ্রমিকের সম্পর্ক সম্বন্ধে বৈপ্লবিক মত পোষণ করে, যারা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, তারা সমাজদ্রোহী ও অপরাধী, সুতরাং দণ্ডার্হ। মানুষ উন্নত শ্রেণীর বানর, তারা এই বৈজ্ঞানিক সত্য গ্রহণ করে না। তাদের মতে, মানুষ স্বর্গচ্যুত অধঃপতিত জীব। টেনেসি প্রদেশে ডারউইনের মতবাদ প্রচার বেআইনী। এদের মতে বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্ব একমাত্র সত্য এবং ক্রমবিকাশবাদ নির্জলা মিথ্যা। এখানে সর্বজন অনুমোদিত ও গৃহীত রীতি থেকে একচুল সরে গেলে গণদেবতা অসন্তুষ্ট হন। নিন্দা ও নির্যাতনের ভয়ে সকল মানুষ একটি মাত্র গুণ ধরে সমাজতরীখানিকে টেনে নিয়ে যায়।

আমেরিক সভ্যতায় পরিচ্ছন্নতা সৌন্দর্যের, যন্ত্র মানুষের এবং ভণ্ডামী নীতির স্থান গ্রহণ করেছে। জীবনকে ভোগ করার, সুখময় করে তোলার কৌশল সে জানে কিন্তু কী উপায়ে প্রকৃত জীবন যাপন করতে পারা যায় তা সে জানে না। সে ভুলে গিয়েছে যে প্রকৃত জীবন যন্ত্রপাতি পোষাক পরিচ্ছদে নয়, দ্রুতগামী যানবাহন, অপরিমিত ঐশ্বর্যে নয়—প্রকৃত জীবন ভাবুকতায়, সৌন্দর্যানুভূতিতে—আনন্দে, ত্যাগে।

জার্মেনি। ফ্রাঙ্কফোর্টের শান্তির পর জার্মেনি একতাবদ্ধ হয়ে ইয়োরোপে একটি প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে। ভের্সাই-এর রাজনৈতিক কারখানায় জটিল ও অদ্ভুত উপাদান সমবায়ে জার্মান জাতি গঠিত হয়। ফলিত বিজ্ঞানের চর্চা, নূতন বস্তু উৎপাদন, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, ফলিত রসায়ন

ও পদার্থ বিদ্যার আলোচর্না হয়েছিল। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি হল। বেকার সমস্যার সমাধান হল।

বৈজ্ঞানিক সংগঠন এবং হোহেনজোলার্ণ বংশের একনায়কত্ব—এই দুইটি বস্তুর সমবায়ে নবগঠিত জার্মান জাতি মেঘমুক্ত সূর্যের মতো ইয়োরোপের রাজনৈতিক আকাশে দীপ্তিমান হয়ে উঠল। এই জার্মান জাতির স্রষ্টা ছিলেন কূটনীতি বিশারদ বিস্‌মার্ক। তিনি এই যুগের মেকিয়াভেলি ছিলেন।

জার্মেনির শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হল। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ যুবকদের সুকুমার মনের উপর অহমিকার ছাপ লাগিয়ে দিল। তাদের শিক্ষা দেওয়া হল যে জার্মান জাতিই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। নৈতিক চরিত্রে বুদ্ধিতে শৌর্যে ও বীর্যে তাদের সংগে আর কোন জাতির তুলনা হয় না। পাঠ্য পুস্তকে বিদ্যালয়-গৃহে গির্জ্জায় উপাসনার সময় কথাসাহিত্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে জার্মান যুবক সেই এক কথাই শুনতে লাগল। তার ধারণা হল যে সকল জাতিই তার শত্রু, পৃথিবীতে তার কোন মিত্র নাই। বাহুবলের সাহায্যে তাকে পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে হবে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সৈনিক ও যোদ্ধা হতে হবে। জার্মান বিশ্বসাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা জার্মেনির আপামর জনসাধারণের মন অধিকার করে বসল।

কাউণ্ট মোণ্টকি বললেন, চির শান্তি স্বপ্নের মতো অলীক। ভগবানের সৃষ্টি-বিধানে যুদ্ধ অপরিহার্য নীতি। যুদ্ধই জাতির প্রগতি-রথের চক্রনেমী। যুদ্ধ না করলে জাতিব উন্নতিস্রোত আলস্যশৈবালে অবরুদ্ধ হয়ে যায়, জড়তার মধ্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে জাতির অকাল মৃত্যু ঘটে। জার্মেনির দার্শনিক নিটশেও সেনাপতির সহিত একমত হলেন—যুদ্ধ জাতির স্বাস্থ্য রক্ষা করে। যুদ্ধ জাতীয় জীবনের মৃতসঞ্জীবনী সুধা। যুদ্ধ বিশ্ববিধাতার অমোঘ বিধান। এইরূপ শিক্ষা জার্মেনির জাতীয় জীবন কলুষিত করল, ইয়োরোপে ভীতি ও শংকা উদ্রেক করল। বিভিন্ন জাতি আত্মরক্ষার জন্য সংঘবদ্ধ হতে লাগল, সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করল, সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা হল। জার্মেনির নূতন নৌবহর ফ্রান্স রাশিয়া ও ব্রিটেনের চোখ খুলে দিল, প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য তারা প্রস্তুত হতে লাগল। জার্মান জাতির নৈতিক চরিত্র সামাজিক ব্যবস্থা ও মনোভাব রক্তরঞ্জিত হয়ে গেল।

জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়মের দুর্নিবার সমরপিপাসা ধ্বংসের পথ পরিষ্কার করে দিল। তিনি মহারাণীর পৌত্র ছিলেন। স্যাক্সি-কো-বার্গ-গোথা

বংশের উদারায় মত তাঁর মধ্যে স্থান পায় নি। তিনি জার্মেনির সৈন্য চালনার ভার গ্রহণ করলেন। যুবরাজ পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন। অন্ধ স্বদেশ প্রেম এবং সর্বগ্রাসী মনোভাবে তিনি পিতাকে অতিক্রম করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাশিয়ার বাহুবল ক্ষয়িষ্ণু, ফ্রান্স অধঃপতিত, ইংল্যাণ্ড বিপন্ন। ` যুযুৎসু মনোবৃত্তি এই যুগের তরুণ জার্মেনির জীবন ধর্ম। তরুণ যোদ্ধার দল তুর্যধ্বনির অপেক্ষায় ছিল। বিশ্বমানবের যুগ যুগ সঞ্চিত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভেঙ্গে-চুরে পৃথিবীকে নূতন করে গঠন করতে তারা বদ্ধপরিকর হল।

একদিকে জার্মানগণ যেমন আপনাদের পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি বলে পৃথিবীর উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য আস্ফালন করছিল, অপরদিকে তেমনি ইংরেজগণ অ্যাংগ্লো-স্যাক্সন জাতির মাহাত্ম্য কীর্তনে শতমুখ হয়েছিল। আয়র্ল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষের উপর তাদের কঠোরতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠল। তাদের আচরণ উদ্ধত ও রূঢ় হয়ে উঠল। ফ্রান্সে সাম্রাজ্যবাদ ছিল না কিন্তু নানা অছিলায় ফ্রান্স সুদূর প্রাচ্যে ও আফ্রিকায় দেশ অধিকার ও রাজ্য বিস্তার করছিল। ইটালিতেও সাম্রাজ্যবাদেব ঢেউ লেগেছিল। ইটালির সাম্রাজ্যবাদীরা ম্যাজিনির স্বদেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আধ্যাত্মিক আদর্শ দূরে নিক্ষেপ করেছিল, জুলিয়াস সিজারের গুণগান করতে লাগল এবং লুপ্ত রোমান সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের কল্পনাআবেগে অস্থির হয়ে উঠল। সাম্রাজ্যবাদেব প্লাবনে বল্কান দেশগুলি ভেসে গেল। বুলগেরিয়াব রাজা ফার্ডিনাণ্ড 'জার' উপাধি গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের পরিচয় দিলেন। গ্রীসও ইয়োরোপে ও এশিয়ায় গ্রীক সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে লাগল।

একমাত্র রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদ সম্বন্ধে চিন্তাধারা অস্পষ্ট ছিল। 'জার' পূজা এবং অভিজাত সেবা তার নিরক্ষর কৃষকদেব জীবনের নীতি ও ধর্ম ছিল। জার্মেনি বা ইংল্যাণ্ডের ন্যায় জাতীয়তাবোধসংপৃক্ত সাম্রাজ্যবাদ তার বোধশক্তির অগোচর ছিল। তার সংস্কারজাত রাজভক্তি ও অভিজাত-প্রীতির অন্তরালে অসন্তুষ্টির স্রোত প্রবাহিত হচ্ছিল, নূতন ভাব সম্পদ ও সমাজ চেতনা নূতন জীবন-সমস্যাকে আশ্রয় করে নূতন যুগের রাষ্ট্রসাধনা আত্মপ্রকাশ করার জন্য সুযোগের অপেক্ষা করছিল। তার স্বল্প পরিসর জীবন-তটে বিশ্বজীবনের উত্তাল তরংগে যে তার পুরাতন সামাজিক ও পারিবারিক ব্যবস্থা বিধি-নিষেধ ও জীর্ণ রীতির বন্ধনকে ভেঙ্গে-চুরে তচনচ করে দেবে তা কেউ স্বপ্নেও ভাবে নি।

প্রথম মহাসমরের প্রাক্কালে বিভিন্ন দেশে জাতীয়তা আন্দোলন

আয়র্ল্যাণ্ড। আইরিশ জাতীয়তাবাদীগণ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হলেও আয়র্ল্যাণ্ডের লোক ক্রমে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সাধুতায় আস্থাহীন হয়ে উঠেছিল। স্বদেশে আত্মকর্তৃত্ব লাভের জন্য পরমুখাপেক্ষী না হয়ে তারা জাতির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করল। বিংশ শতকের প্রারম্ভে আইরিশ সংস্কৃতির পুনরুত্থানের জন্য জাতীয় আন্দোলনের জন্ম হল। এই আন্দোলন প্রাচীন গেলিক ভাষা ও সাহিত্য সাধনাকে আশ্রয় করে বর্ধিত হতে লাগল। গেলিক ভাষা পশ্চিমাঞ্চলের সুদূর পল্লীর পর্ণকুটিরে আশ্রয় নিয়ে প্রাণরক্ষা করছিল। কেল্টিক সাহিত্য ইংরেজ শাসনের আওতায় ক্লিষ্ট ও শীর্ণ হয়ে নগরের পরিশীলিত সমাজ থেকে নির্বাসিত হয়েছিল। জাতীয়তাবাদীগণ উপলব্ধি করেছিল যে একমাত্র মাতৃভাষার সাধনার ভিতর দিয়ে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি ও আত্মসম্বিৎ জাগ্রত হয়ে উঠবে, পল্লীর দরিদ্র কৃষকের কুটীর থেকে তাদের প্রাচীন সাহিত্য-রত্ন উদ্ধার করে তারা তাকে একটি জীবন্ত ভাষায় পরিণত করবে। এই উদ্দেশ্যে তারা 'গেলিক পরিষদ' নামে একটি সাহিত্য সংঘ প্রতিষ্ঠা করল। পরাধীন দেশের জাতীয় আন্দোলন মাতৃভাষাকে বাহন করে আত্মপ্রকাশ করে। বিদেশী ভাষা জাতীয় মানসকে স্পর্শ করে না। কারণ তা দেশের মাটিতে শিকড় চালাতে সমর্থ হয় না। জাতীয়তাবাদীগণ গেলিক ভাষাকে বিস্মৃতির অতল থেকে উদ্ধার করে, তাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সহিত নাড়ীর সম্পর্ক স্থাপন করতে ইচ্ছুক হয়েছিল। জাতীয় জাগরণ নানাদিকে নানাভাবে ও আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল। পল্লী উন্নয়ন ও কৃষকদের অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের চেষ্টা চলতে লাগল।

ভিক্ষা দ্বারা স্বাধীনতা অর্জন করা হয় না। আর্থার গ্রীফিথ্ নামে একজন যুবক সিন ফিন্ আন্দোলন আরম্ভ করেছিল। এই দুইটি শব্দের অর্থ 'আমরা স্বয়ং' অর্থাৎ রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা অর্জন করতে হলে আয়র্ল্যাণ্ডকে নিজের উপর নির্ভর করতে হবে, ইংল্যাণ্ডের দয়াভিক্ষা বা সাহায্য প্রার্থনা নিষ্ফল ও অনাবশ্যক। সিন ফিন্‌গণ জাতির অন্তর্লীন শক্তির উদ্বোধন করতে চেয়েছিল, বাহিরের সাহায্যের দিকে লক্ষ্য না করে জাতির অবচেতন মনে যে

আবেগ সংবেদনা ও আশা সঞ্চিত আছে তাকে পরিমূর্ত করে তুলতে চেয়েছিল। তারাও গেলিক সাহিত্য ও প্রাক্তন সংস্কৃতির উন্নয়ন অনুমোদন করেছিল, পার্লামেণ্টরি কর্মপন্থা ফলপ্রসূ নয় বলে ঘোষণা করল, সশস্ত্র বিদ্রোহ সম্ভব নয় বলে প্রচার করল এবং ব্রিটেনের সহিত অসহযোগিতা করে রাজনৈতিক অধিকার আদায় করতে চাইল।

আলষ্টার হোমরুলের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগল। রক্ষণশীল দলের নেতাগণ, ধনী অভিজাত ও সৈন্যদলের নেতাগণ আলষ্টারের পক্ষ অবলম্বন করল, এমন কি বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হয়েছিল এবং প্রয়োজন হলে বিদেশের সাহায্যে এর প্রতিরোধ করবে বলে প্রচার করল।

আলষ্টার বিদ্রোহ আধুনিক যুগের ডিমোক্রেসীর স্বরূপ উন্মোচন করেছিল। যতক্ষণ আইন ও শৃংখলার অর্থ শাসক শ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ ততক্ষণ ইহা প্রয়োজনীয়, যতক্ষণ ডিমোক্রেসী শাসক শ্রেণীর অধিকার ও স্বার্থের অনুকূল ততক্ষণ ডিমোক্রেসী গ্রহণযোগ্য—এই ছিল তার প্রকৃত রূপ। আয়র্ল্যাণ্ড দুইটি দলে বিভক্ত হয়ে গেল। দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য ও সুনিশ্চিত হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হল এবং তার সংগে সংগে অন্তর্যুদ্ধের অবসান হল।

মিশর। আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর মিশর টলেমির অধিকারভুক্ত হয়। টলেমি বংশের রাজারা মিশরীয় রীতি-নীতি গ্রহণ করে এবং প্রাচীনকালের ফেরোওদের বংশধর হিসাবে রাজত্ব করতে থাকে। ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর পর মিশর রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। রোমের খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণের পূর্বে মিশর এই ধর্ম গ্রহণ করে। রোমানদের অত্যাচারে মিশরের খ্রীষ্টানগণ মরুভূমির মধ্যে আশ্রয় নেয়। মরুভূমির তাপদগ্ধ বক্ষের অন্তরালে বহু মঠ বা আশ্রম স্থাপিত হয়। লোকলোচনের বহির্ভূত স্থানে এই সকল মঠে বহু খ্রীষ্টান সাধু বাস করত। তাদের তাপসজীবনের অলৌকিক কাহিনী মরুপ্রাচীর ভেদ করে খ্রীষ্টান জগতে প্রচারিত হত এবং ধর্মভীরু ব্যক্তিদের মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উৎপাদন করত। খ্রীষ্টান ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যে পরস্পর কলহ ও যুদ্ধে মিশরের লোক বিরক্ত ও বিব্রত হয়ে পড়ে। এইরূপ অবস্থায় সপ্তম শতাব্দীতে যখন আরবগণ নূতন ধর্মের বাণী বহন করে তথায় উপস্থিত হয় তখন তারা সাদর অভ্যর্থনা পায়। এজন্য মিশর ও উত্তর আফ্রিকায় আরবদের বিজয় সহজসাধ্য হয়ে ওঠে।

মিশর খলিফার সাম্রাজ্যভুক্ত হল। সেখানে আরবী ও আরব সংস্কৃতি দ্রুত বিস্তৃত হল, প্রাচীন মিশরীয় ভাষা অন্তর্হিত হল। নবম শতকে খলিফার শক্তি দুর্বল হয়ে যায়। তুর্কীদের শাসনে মিশর অর্ধ-স্বাধীন হয়ে পড়ে। এর তিনশত বৎসর পরে ক্রুজেডের মুসলিম বীর আলাডিন মিশরের সুলতান হন। তাঁর একজন বংশধর ককেসাস্ পর্বতের নিকটবর্তী স্থান থেকে বহু তুর্কী দাস এনে তাদের সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করে। মুসলমানগণ বিদ্রোহ করে তাদেরই একজনকে সুলতান করে। মিশর পাঁচশত বৎসর মামেলুকদের শাসনাধীন থাকে।

তারপর মিশর অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মহমেট আলি নামে আলবেনিয়ার একজন তুর্কী মিশরের 'খিদিভ্' বা প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তিনি তুর্কী সুলতানের কাছে নামমাত্র আনুগত্য স্বীকার করতেন। তিনি ইংরেজ সৈন্যদের পরাজিত করে সমস্ত দেশ অধিকার করেন। তিনি এক সৈন্যদল গঠন করেন, নূতন নূতন খাল কেটে তুলা চাষেব সুবিধা করে দেন। তাঁর বিলাসী দুর্বল বংশধবগণ ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মহাজনদের নিকট উচ্চহারে সুদ দিবার অঙ্গীকারে ঋণ গ্রহণ করে। খিদিভ যথাসময়ে সুদ দিতে অসমর্থ হল। মহাজনগণ এই বিষয়ে তাহাদের দেশের গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মিশরের মতো একটি উর্বর ও ঐশ্বর্যশালী দেশ, বিশেষতঃ ভারতবর্ষ ও দুর প্রাচ্যে যাতায়াতের এমন একটি স্থান অবজ্ঞার বস্তু নয়। ১৮৭৫ সালে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ডিস্‌রেলী খিদিভের নিকট সুয়েজ খালের অংশগুলি ক্রয় করেন। অবশিষ্ট অংশগুলি ফরাসিদের সম্পত্তি হলেও সুয়েজের উপর ইংল্যাণ্ডের প্রভুত্ব পূর্ণমাত্রায় স্থাপিত হল এবং ফরাসি ও ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট খালের প্রচুর আয় ভোগ করতে লাগল।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে লাগল। মিশরের লোক অসন্তুষ্ট হল। বিদেশীদের হাত থেকে স্বদেশকে মুক্ত করার জন্য আরবী পাশার নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী দলের উদ্ভব হল। তিনি ফরাসী ও ইংরাজদের আদেশ পালন করতে অস্বীকার করলেন। এর উত্তরস্বরূপ ১৮৮২ সালে ইংল্যাণ্ডের একখানি যুদ্ধ জাহাজ উপস্থিত হল এবং আলেকজান্দ্রিয়া নগরের উপর গোলাবর্ষণ করে পাশ্চাত্য সভ্যতার মহিমা জ্ঞাপন করল। তারপর স্থলযুদ্ধে মিশরীয় বাহিনীকে পরাস্ত করে ব্রিটিশগণ মিশরের উপর পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপন করল।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মিশর অধিকার এক অভিনব আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। মিশর তুর্কী রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তুর্কীর সহিত ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোন শত্রুতা না থাকলেও ইহা ধীরে ধীরে তুর্কী রাজ্যের একটি অংশ দখল করে নিল। সেখানকার ইংরেজ কর্মচারী বা এজেণ্ট আভ্যন্তরীণ সকল ব্যাপারে এতদূর ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে যে খিদিভ ও তাঁর মন্ত্রীগণের সমস্ত ক্ষমতা লোপ পেয়ে গেল। প্রথম ব্রিটিশ এজেণ্ট মেজর বারিং পঁচিশ বৎসর মিশরে ছিলেন। পরে তিনি লর্ড ক্রোমার নামে পরিচিত হয়েছিলেন। শিক্ষা প্রভৃতি জনহিতকর কার্য উপেক্ষা করে তিনি বিটিশ মহাজনদের প্রাপ্য সুদ আদায় করে দিতেন। এজন্য ইংল্যাণ্ডের লোক শতমুখে তাঁর প্রশংসা করত। দেশের সমস্ত রাজস্ব সুদ দিতেই নিঃশেষ হয়ে যেত। তাঁর শাসনকাল পঁচিশ বৎসর শেষ হলে দেখা গেল যে মিশরের. জাতীয় ঋণ আদৌ হ্রাস হয় নি। ফরাসিগণ লুণ্ঠনের অংশ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। এজন্য মিশরে ইংরেজ আধিপত্য তাদের মনঃপূত হয়নি। ইয়োরোপের অন্যান্য জাতি এবং মিশরের অধিবাসীগণও ইংরেজের উপর বিরক্ত হয়েছিল। ইংরেজরা তাদের এই বলে সান্ত্বনা দিত যে তারা শীঘ্রই মিশর ছেড়ে চলে' যাবে কিন্তু এইভাবে বৎসরের পর বৎসর কেটে গেল, তারা সে দেশ ছেড়ে যায়নি। তারা ফরাসিদেব মরোক্কোর কর্তৃত্ব ছেড়ে দিয়ে সন্তুষ্ট করল। ইংরেজদের জন্য পৃথক আদালত ছিল এবং অনেক বিষয়ে তাদের কর দিতে হত না।

এইভাবে ব্রিটেন মিশরকে শাসন ও শোষণ করতে লাগল। তার প্রতিনিধিগণ রাজকীয় জাঁকজমকশীলতার সহিত বাস করত। জাতীয়তা আন্দোলন আরম্ভ হল। জামালুদ্দীন আফ্‌ঘানি ইসলামের সংস্কার করে আধুনিক যুগের উপযোগী করলেন। তিনি বলেছিলেন, ইসলাম প্রগতি-বিরোধী নয়। বাণিজ্য বিস্তারের সহিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভ্যুদয় হল। তারা নবজাত জাতীয়তাবাদের পৃষ্ঠপোষক হয়েছিল। জগলুল পাশা মিশরে আধুনিক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা। মিশরের অধিকাংশ লোক মুসলমান। এখানে খ্রীষ্টান কপ্‌টগণও বাস করে। এদের ভিতর শত্রুতা ছিল না। ইংরাজেরা এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেছিল কিন্তু তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। তারা জাতীয়তাবাদীদের ভিতরেও বিভেদ সৃষ্টি করতে ছাড়েনি। কখন কখন তাদের সে চেষ্টা সফল হয়েছিল।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাসমরের পূর্বে মিশরের অবস্থা এইরূপ ছিল।

১৮৯৬ সালে আবিসিনিয়া ইটালির সাম্রাজ্য বিস্তারে বাধা দিয়েছিল। আফ্রিকার অধিকাংশ স্থানে ইংরেজ ও ফরাসিদের আধিপত্য ছিল। এর কোন কোন অংশে বেলজিয়ম ইটালি ও পর্তুগালের ক্ষমতা প্রবল ছিল, জার্মানরাও আফ্রিকার একটা অংশ অধিকার করেছিল। একমাত্র আবিসিনিয়া এবং লাইবিয়া স্বাধীন ছিল।

উনিশ শতকের শেষভাগেও মধ্য-আফ্রিকা সম্বন্ধে লোকের বিশেষ জ্ঞান ছিল না। এর দিগন্তপ্রসারী মরুভূমি, দুর্ভেদ্য শ্বাপদসংকুল বনানী, এর জলরাশিপূর্ণ বিপুলাকার নদনদী, রহস্যময় গিরিকান্তার বহির্জগতের সহিত আত্মীয়তা স্থাপনের পরিপন্থী হয়েছিল। পর্যটকদের অক্লান্ত পরিশ্রম, জ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকদের অনুসন্ধিৎসা যেমন এই মহাদেশের ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বার উন্মুক্ত করে মানবজাতির জ্ঞানবৃদ্ধি করেছে, তেমনি ইহা বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যবসায়ী পুঁজিওয়ালা ও সাম্রাজ্যবাদীদের লোভের ইন্ধন দিয়ে জগতে অশান্তি সৃষ্টি করেছে।

তুরস্ক। মধ্যযুগের অবসানে তুর্কীগণ নূতন যুগের নূতন পরিস্থিতির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়নি। এশিয়া ইয়োরোপ এবং আফ্রিকাকে আশ্রয় করে অটোমান সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল এবং এই তিনটি মহাদেশের ভিতর দিয়ে প্রাচীন কালেব বাণিজ্যপথ প্রসারিত ছিল। তাদের বাণিজ্যিক প্রতিভা ছিল না। এজন্য তারা বাণিজ্য ব্যাপারে মনযোগী হয়নি, বরং তারা বাণিজ্যপথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তাদের অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে ইয়োরোপীয় জাতিগণ প্রাচ্যের সহিত ব্যবসা করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথ আবিষ্কার করতে চেষ্টিত হয়। ফলে কলম্বস্ আমেরিকায় এবং ডিয়াজ্ ও ভাস্কো ডি গামা ভারতবর্ষে আসার পথ আবিষ্কার করেন।

অটোমান সাম্রাজ্যের শক্তির মূল উৎস ছিল 'জেনেসারি' নামে তুর্কীর সৈন্যবাহিনী। মিশরের মামেলুকদের মতো তারা শাসক সম্প্রদায়ে পরিণত হতে পারেনি। গ্রীস রুমেনিয়া সার্বিয়া বুল্‌গেরিয়া মন্টিনিগ্রো বস্‌নিয়া প্রভৃতি বলকান দেশগুলি অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার সাহায্যে ১৮৯২ সালে গ্রীস স্বাধীন হয়ে যায়। শক্তিশালী প্রতিবেশীদের কবলে তুরস্কের দুর্দশার সীমা ছিল না। তারা তার দেহকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নিতে চেয়েছিল।

তুরস্কের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্য বার্লিন নগরে যে আন্তর্জাতিক বৈঠক বসে সেই বৈঠকে দেশবিদেশের মহারথীগণ যোগ দেন। জার্মেনির কূটনীতি-বিশারদ বিস্‌মার্ক, ইংল্যাণ্ডের সাম্রাজ্যবাদীপ্রবর ডিস্‌রেলি এবং ইয়োরোপের বহু ধুরন্ধর এই বৈঠকে সমবেত হন। বল্কান দেশগুলি স্বাধীন হয়ে গেল, অষ্ট্রিয়া বস্‌নিয়া ও হার্জিগোভিনি অধিকার করল এবং ব্রিটেন সাইপ্রাস দ্বীপ লাভ করল।

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তুরস্কে শাসন সংস্কারের আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠল। সামরিক কর্মচারিগণের মধ্যে 'তরুণ তুর্কী' নামে একটি শক্তিশালী দল সৃষ্টি হল। তুরস্কের জাতীয় জীবনে একটি নূতন যুগের অবতারণা হল। তার বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের ভিতর দলাদলি ও শত্রুতা অন্তর্হিত হল। প্রথমে এন্‌ভারষে এবং তাঁর পরে মুস্তফা কামাল পাশা তুরস্কের উদ্ধারকর্তা ছিলেন।

অন্য দেশের মুসলমানদের সহানুভূতি প্রাপ্তির আশায় সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ্ বিশ্ব-ইস্‌লামিক আন্দোলন প্রবর্তন করেন কিন্তু তুরস্কের নব্য-জাতীয়তা বিশ্বমুসলিম সংঘের প্রতিরোধ করেছিল। তুরস্ককে ইয়োরোপ থেকে বিতাড়িত করার উদগ্র কামনা ও স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত হয়ে বল্কান জাতিরা সংঘবদ্ধ হল এবং ১৯১২ সালে তুরস্ককে আক্রমণ করল।

বল্কান যুদ্ধের পর তুরস্কের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়েছিল। ইয়োরোপে তার দাঁড়ানর একটুমাত্র স্থান ছিল, তার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়েছিল। মিশর নামমাত্র তার অধীন ছিল কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ইংল্যাণ্ডের হস্তগত হয়েছিল। তুরস্কের সমস্ত আশা ভরসা নির্মূল হয়ে গেল। নৈরাশ্যের ছায়া তার জাতীয় জীবনের উপর বিস্তৃত হয়েছিল। জার্মেনির লোলুপ দৃষ্টি প্রাচ্য দেশ সকলের উপর পড়েছিল এবং সে মধ্য প্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের স্বপ্ন দেখেছিল। এজন্য সে তুরস্কের দিকে সহানুভূতির হস্ত প্রসারিত করল। দুই দেশের ভিতর বন্ধুতা বৃদ্ধি পেল। এই সময়ে প্রথম মহাসমরের অগ্নি জ্বলে' উঠল।

রাশিয়া। আধুনিক যুগের রাশিয়া পৃথিবীকে একটি নূতন রাজনৈতিক আদর্শের সন্ধান দিয়েছে। জারের আমলে যে দেশ ছিল দারিদ্র্য অশিক্ষা ও কুসংস্কারের ভয়াবহ অন্ধকারে নিমগ্ন, মাত্র কুড়ি বৎসরের সাধনায় সে দেশের আশ্চর্য নবজন্ম হয়েছে। ফরাসি বিপ্লব এবং আমেরিকান বিদ্রোহের পরে মানুষের মুক্তির ইতিহাসে এত বড় ঘটনা আর দেখা যায় নি।

রাশিয়ায় সামাজিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিষ্ঠান সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। মুক্তির বাণী, সাম্যের বাণী যুগে যুগে কবির বীণার বজ্রস্বরে বেজেছে কিন্তু বিশ্বমানবের এই চিরন্তন সংগীত একমাত্র রাশিয়ার জনমনে ছন্দিত হয়ে উঠেছে।

রাশিয়ায় প্রতিক্রিয়াশীল জারতন্ত্র পশ্চিম ইয়োরোপে বিপ্লব ও পরিবর্তন সত্ত্বেও অপ্রতিহত ক্ষমতার নিরঙ্কুশ অধিকারী ছিল, এর ধর্ম প্রতিষ্ঠান জার-তন্ত্রের দক্ষিণ হস্তস্বরূপ সাধারণ মানুষের স্বাধীন চিত্তবৃত্তির উপর অনুশাসন বশ্যতা ও প্রভুত্বের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দিয়েছিল। 'পবিত্র রাশিয়া' এবং 'জার' সম্বন্ধে বহু গাথা ও গল্প প্রাকৃত মনে ইহজগতে রাজশক্তির এবং পরজগতে ধর্মের অলৌকিক ক্ষমতার কথা জাগ্রত রেখে তার হীন রাজনৈতিক অবস্থা ও শোচনীয় ব্যবস্থা ভুলিয়ে দিত। ইতিহাসে দেখা যায় যে পৌরোহিত্যপ্রধান ধর্ম স্বৈরাচার শাসনতন্ত্রের সহযাত্রী। পুরোহিতরা শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে রাজাকে পৃথিবীতে ভগবানের প্রতিনিধি অথবা অবতার, এমন কি স্বয়ং ভগবান বলে ভক্তি করতে শিক্ষা দিয়েছে, দরিদ্রকে পরজগতে সুখ ও শান্তি ভোগের আশ্বাস দিয়ে ইহজগতে আপন দুঃস্থ অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে উপদেশ দিয়েছে। ইহা একদিকে যেমন সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিপ্লব ও অশান্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে, অপর দিকে তেমনি মানুষের জিজ্ঞাসা-বৃত্তি দমন করেছে, বিচারবুদ্ধি লোপ করে দিয়েছে, তাকে পরাধীনতা ও দারিদ্র্যের গভীর পঙ্কে নিমজ্জিত রেখেছে। কৃষকের উপর নির্য্যাতন এবং ইয়ুদী হত্যা জারতন্ত্রেব দুইটি প্রধান স্তম্ভ ছিল।

রাজনৈতিক কারণে যাদের দণ্ড দেওয়া হত তাদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসন দেওয়া হত। সে দেশের নিবিড় অরণ্য হিংস্র জন্তু-অধ্যুষিত অবারিত প্রান্তর বরফাচ্ছাদিত কঠোর স্থান নির্বাসন ও নির্জন কারাবাসের নৈরাশ্যময় শ্মশানভূমি ছিল। জার-তন্ত্র-বিরোধী স্বাধীনতাপ্রয়াসী কত দেশ-প্রেমিক, স্বজাতির দুর্দশায় ব্যথিত কত মনীষী, আদর্শবাদী মহামানব এই জনবিরল স্থানে নির্বাসিত হয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় আত্মহত্যা করেছেন, তার আর ইয়ত্তা নাই। যখনই কোন ব্যক্তি জারের নির্বিবেক অত্যাচারের প্রতিবাদ করেছে, যখনই কেহ অন্যায়ের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করেছে, শৃংখলিত মানবতার বন্ধন শিথিল করতে সামান্যমাত্র চেষ্টা করেছে, তখনই তাকে সুদূর সাইবেরিয়ায় অনাহার কারাগার অত্যাচার ও মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে।

রাশিয়া বর্বর দেশ বলে পরিগণিত হত। পিটার দি গ্রেট রাশিয়ার মুখ পশ্চিম দিকে ফিরিয়ে দেন। তিনি ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ করে সে সকল স্থানের সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। তাদের আচার-ব্যবহার জীবন-ধারণ প্রণালী সামাজিক রীতি-নীতি অনুকরণ করেন এবং দেশের মূর্খ ও গোঁড়া অভিজাতদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করেন। কিন্তু দেশের অজ্ঞ ও অত্যাচারিত জনসাধারণের কথা পিটারের মনে স্থান পায় নি। তিনি রাশিয়ার নৌবল বৃদ্ধি করেন, সুইডেনকে পরাজিত করে বল্‌টিক সাগরের কর্তৃত্ব অধিকার করেন। পুরাতনের সহিত সম্পর্ক ছেদনের প্রতীকস্বরূপ সেণ্ট পিটার্সবার্গকে রাজধানী করে প্রাচীন স্মৃতি-মণ্ডিত মস্কো নগরের বৈশিষ্ট্য লোপ করেন।

রাণী দ্বিতীয় ক্যাথারিণও রাশিয়াকে পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর সকল প্রচেষ্টা ছিল লোকদেখানো বাহ্য আড়ম্বর, তাতে আন্তরিকতা ছিল না। পিটার ও ক্যাথারিণ পশ্চিম ইয়োরোপের সভ্যতার বাহ্যরূপ অনুকরণ করেছিলেন। তাতে বৃহত্তর সমাজের একটা অংশ কিছু উন্নত হয়েছিল কিন্তু জাতিসাধারণ যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেল।

ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর রাশিয়ায় শাসন বিষয়ে কিছু সংস্কার হয়েছিল। ইতিপূর্বেই জার-শাসন উচ্ছেদ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও শিক্ষিত ব্যক্তিরা বহু গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেছিল। সাধারণ অশিক্ষিত কৃষকগণ এদের সন্দেহের চক্ষে দেখত এবং তারা দুঃখকষ্টের নূতন শৃংখল রচনা করছে ভেবে তাদের গ্রেপ্তার করে পুলিশের হাতে সমর্পণ করত।

কৃষকদের ভিতর জাতীয়তা প্রচার কার্য বিফল হল দেখে যুবকদের হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ হয়ে উঠল। অগত্যা তারা সন্ত্রাস সৃষ্টি করতে লাগল। তারা বোমা ছুড়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারিদের হত্যা করতে লাগল। বহু ইহুদী ও অন্যান্য জাতির লোক জার-শাসনের কঠোরতায় বিরক্ত হয়ে সন্ত্রাসবাদীদের দল বৃদ্ধি করল। এরা নৈরাজ্যবাদী নামে পরিচিত। তাদের উপর কঠোর দমন চলতে লাগল, দলে দলে রাজনৈতিক বন্দীগণ সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হল। তাদের ভিতর বহু লোকের ফাঁসি হল। বিপ্লবীদের ভিতর পুলিশের বহু গুপ্তচর ছিল। তারা অপরকে বোমা নিক্ষেপ করতে প্ররোচনা দিত, এমন

কি নিজেরা বোমা ফেলে অন্যকে অপরাধী সাজিয়ে শাস্তির ব্যবস্থা করত। নিরীহ ব্যক্তিকে বিপদে ফেলার জন্য গোয়েন্দা বিভাগের বহু কর্মচারী বোমা নিক্ষেপ কার্যে নিযুক্ত ছিল।

রাশিয়ায় কৃষিই জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায় ছিল। সেন্ট পিটার্সবার্গ ও নিকটবর্তী স্থান এবং মস্কো শিল্পপ্রধান ছিল। এই সকল স্থানের কারখানা-গুলি ইংরেজদের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছিল, পুঁজিওয়ালাগণ শ্রমিকদের দিনরাত খাটিয়ে তহবিল স্ফীত করছিল। রাশিয়ার নবগঠিত কারখানাগুলির শ্রমিকগণের মনের উদারতা ও সজীবতা ছিল। তারা নূতন ভাবধারা সহজে গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিল।

মার্কস্ দর্শনের উপর ভিত্তি করে "সোস্থাল ডিমোক্রেটিক লেবার পার্টি" নামে একটি সমিতি গঠিত হল। ইহা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে মত ঘোষণা করল। মার্কস্ বলেছিলেন, শ্রমিকদের সচেতন করতে হলে তাদের সমবেত চেষ্টা চাই। সন্ত্রাস উৎপাদন করলেই শ্রমিকগণ নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে জাগ্রত হবে না। জার কিম্বা তাঁর কর্মচারীদের হত্যা করলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। জারের হত্যা নয়, জারতন্ত্রের উৎসাদন একমাত্র কাম্য।

লেনিন কৈশোর থেকেই বিপ্লববাদী ছিলেন। জারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে দোষী সাব্যস্ত হয়ে তাঁর ভাই আলেকজান্দারের ফাঁসি হয়। শোকে অভিভূত হলেও লেনিন মত পরিবর্তন করেন নি। মার্কস বলেছিলেন, যে দেশে শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ সেই দেশেই শ্রমিক বিপ্লব সম্ভব। জার্মেনি শিল্পপ্রধান দেশ। সুতরাং জার্মেনিতে শ্রমিক বিপ্লব সম্ভব, রাশিয়ার মতো অনুন্নত ও মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক দেশে সম্ভব নয়।

প্রাচীনকাল থেকে দুইটি মতবাদ প্রচলিত ছিল। বুদ্ধিবাদী বলেছিলেন, শিক্ষাবিস্তারের ফলে বর্তমান অবস্থার উন্নতির মধ্যেই মুক্তির সম্ভাবনা আছে। রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির পূজারীগণ রাষ্ট্রিক ক্ষমতার সম্প্রসারণে মানুষের কল্যাণের সন্ধান পেয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে তৃতীয় মতবাদ পৃথিবীর বহু মনীষীদের জীবন-দর্শনের ভিত্তিভূমি। তাঁরা বলেন, রাষ্ট্রের বিনাশে নৈরাজ্য এবং নৈরাজ্যের মধ্যে মানুষের স্বাধীনতা ও সমাজের কল্যাণ নিহিত।

পূর্বের কৃষক বিদ্রোহ, সন্ত্রাসবাদীর বোমা বিস্ফোরণ এবং উদারনৈতিক মধ্যপন্থী যে কার্যে কৃতকার্য হয় নি, শ্রমিকদের ব্যাপক ধর্মঘট সেই অসাধ্য-সাধন

করেছিল। সংঘবদ্ধ শ্রমিকগণ বিপ্লবে যোগ দিলেও নগর ও গ্রামের সাধারণ লোক এতে আকৃষ্ট হয় নি। কর্তৃপক্ষ ভেদনীতির সাহায্যে দেশের বিচ্ছিন্ন অংশে বিপ্লবের তীব্রতা হ্রাস করে দিয়ে পিটার্সবার্গ এবং মস্কো-এর সোভিয়েট ধ্বংস করতে অগ্রসর হল। সহস্র সহস্র লোক জেলে আবদ্ধ হয়েছিল। সহস্র সহস্র লোককে হত্যা করা হয়েছিল।

১৯০৫ সালের বিপ্লবের এইরূপ শোচনীয় পরিণতি হল। এক একটি বৃহৎ ঘটনার বিদ্যালয়ে জনসাধারণের শিক্ষা হয় এবং ১৯০৫ সালের বিপ্লব ও তার শোচনীয় পরিণতি এইরূপ একটি বিদ্যালয়।

এক্ষণে জারের ক্ষমতা অপ্রতিহত। তিনি ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারদের সন্তুষ্ট করে ক্ষুব্ধ জনসাধারণকে চেপে রাখতে চেয়েছিলেন। গণতন্ত্রী ফ্রান্স স্বৈরাচারী জারকে টাকা ধার দিয়ে রাশিয়ার প্রগতিবাদী ও বিপ্লবীদের গলা টিপে মারতে চেয়েছিলেন।

জাপানের কাছে রাশিয়ার পরাজয়ের পর ইংল্যাণ্ডের রাশিয়া-ভীতি অন্তর্হিত হল। ইংল্যাণ্ড এখন জার্মেনিকে ভয় করতে লাগল। জার্মান ভীতি রাশিয়ার প্রতি ফ্রান্সের উদার ব্যবহারের প্রধান কারণ। জার্মান ভীতি দুইটি পুরাতন শত্রুকে বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ করেছিল। ইংল্যাণ্ডের সহিত রাশিয়ার চুক্তি হল। পরে এই চুক্তি ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও রাশিয়ার মিলন-সন্ধিতে পরিণত হয়েছিল। বল্‌কানে অষ্ট্রিয়া রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী, অষ্ট্রিয়া ও ইটালি জার্মানির বন্ধু ছিল। একদিকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া, অন্যদিকে জার্মেনি, অষ্ট্রিয়া ও ইটালি দুইটি বিরোধী যুযুৎসু দলে সজ্জিত হয়ে শক্তি-পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করছিল। কিন্তু ইয়োরোপের সাধারণ মানুষ অবশ্যম্ভাবী বজ্রনির্ঘোষের ধারণায় সচেতন ছিল না। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রকর্ণধারগণ যখন মহাযুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল তখন তারা আপাত শান্তির ছায়ায় সুপ্তিমগ্ন থেকে নির্বিবাদে কাল কাটাচ্ছিল।

১৯০৫ সালের পর রাশিয়ায় প্রতিক্রিয়ার যুগ আরম্ভ হয়। জার শাসনের চক্রনেমীর চাপে সাম্যবাদ এবং অন্যান্য মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হল। লেনিন প্রভৃতি নির্বাসিত বিপ্লব-নেতাগণ অমানুষিক ধৈর্যের সহিত মন্ত্রের সাধনায় মগ্ন ছিলেন, পুস্তক ও প্রবন্ধাদি রচনা করে মার্কসীয় মতবাদকে পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতির উপযোগী করে প্রচার করতে ব্যাপৃত ছিলেন। সোস্যাল ডিমোক্রেটিক দল দুই ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এদের ন্যায়

বোলশেভিক অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মেনশেভিক অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ লেনিন বোলশেভিক দলের নেতা হলেন।

১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে প্রথম মহাসমর আরম্ভ হয়েছিল। লোকের মন যুদ্ধের দিকে আকৃষ্ট হল। বহু লোক সৈন্যশ্রেণীভুক্ত হল। বিপ্লবের রুদ্রবাণী মহাসমরের তূর্যনিনাদে ডুবে গেল।

জাপান। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকা উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করে এবং সেই সময় থেকে মার্কিন বৈদেশিক নীতি সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রসচিব উইলিয়ম সিওয়ার্ডের ঘোষণা অনুসারে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে কমডোর পেরি জাপানের সহিত আমেরিকার বাণিজ্যেব দাবী নিয়ে দশখানি রণতরী-সহ জাপানে উপস্থিত হন। এব ফলে জাপানের রাষ্ট্রিক জীবনে নূতন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং ইউরো-মার্কিন সভ্যতার স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ে। জাপানের বোনিন ও রিউকিউ দ্বীপ ফরমোসা শ্যাম কাম্বোডিয়া কোচিন-চীন সুমাত্রা ও বো।ণও মার্কিন বাণিজ্যেব স্থান বিবেচিত হয়। এই উদ্দেশ্যেই মার্কিন গভর্ণমেণ্ট ১৮৬৭ সালে এলুশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং আলাস্কা বাহাত্তর লক্ষ ডলার মূল্যে জারের রাশিয়ার নিকট ক্রয় করে। ক্রমে ফিলিপাইন এবং হাওয়াই প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জও আমেরিকার হস্তগত হয়। বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টার সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নৌঘাঁটি নির্মাণ এবং নৌ-আধিপত্য বিস্তার চলে।

ইউরোপ-আমেরিকার সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বিস্তার নীতি জাপানের মতো একটি 'ঘর কুণো' জাতিকেও তার চিরাচরিত পন্থা ত্যাগ করতে বাধ্য করল। জাপানের রুদ্ধদ্বার উন্মোচনের ফলে বিদেশী পণ্যে বাজার ছেয়ে গেল। দেশে অশান্তি ও অসন্তুষ্টি সৃষ্টি হল। বিদেশীর প্রতি ঘৃণা এতদূর বেড়ে উঠে যে ১৮৬২ সালে ইয়োকোহামায় একজন ইংরেজ হত্যা হল। এই হত্যার সুযোগ নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স হল্যাণ্ড এবং মার্কিন রাষ্ট্রের সম্মিলিত নৌবহর ১৮৬৪ সালে জাপানের নগরগুলির উপর গোলা বর্ষণ করল। সম্রাটের আজ্ঞায় শোগুন পদত্যাগ করেন। সম্রাটের মৃত্যুর পর মিজি পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করে ১৮৬৮ সালে জাতীয় পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। পর বৎসর দুইশত ছিয়াত্তর জন সামন্ত তাদের জমিদারী সম্রাটকে প্রত্যর্পণ করে। নূতন ধরণের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তিত হল। কুড়ি

বৎসর বয়সের যুবকদের সামরিক শিক্ষা দেওয়া হল। সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থা রাজস্ব আদায় যানবাহন মুদ্রা প্রচলন এবং শিল্পাদি সম্বন্ধে নূতন ব্যবস্থা হল। ১৮৮৫ সালে মন্ত্রীসভা, ১৮৮৯ সালে নূতন শাসনতন্ত্র এবং পর বৎসর পার্লামেণ্টরী শাসনপদ্ধতি প্রবর্তিত হল।

এদিকে আমেরিকার বহু পূর্বেই গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষ চীন প্রভৃতি দেশে প্রবেশ করেছিল। ইংরেজ এবং অন্যান্য বিদেশী বণিক কাণ্টনে উপস্থিত হল। চীন ব্যবসায় বাধা সৃষ্টি করছে, এই অভিযোগে এবং আফিং-এর চোরাই কারবার বন্ধ করার অছিলায় যুদ্ধ হয়। সন্ধিসূত্রে ইংরেজ হংকং এবং আরও চারিটি বন্দর পেয়েছিল। হংকং ইংরেজের প্রধান নৌঘাঁটি এবং পণ্য প্রবেশের প্রধান পথে পরিণত হল। সাংহাই আন্তর্জাতিক উপনিবেশ ব্যবসা ও শ্রমশিল্প বিস্তারের ও শোষণের প্রধান ঘাঁটি হয়ে দাঁড়াল। প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটেন সুদুর প্রাচ্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠল। চীনের সমগ্র আমদানী বাণিজ্যের অর্ধেক ব্রিটেন থেকে আসত। চীনের রেলপথ ব্যাঙ্ক কারবারি মূলধন ও টাকাকড়ির বিলিব্যবস্থা ব্রিটেনের হাতে ছিল। চীন বিদেশীদের লুটের স্থানে পরিণত হয়েছিল।

উনবিংশ শতকের শেষ দিকে আমেরিকা 'খোলা-দরজা' নীতির দাবী জানাল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জারের রাশিয়া এবং জার্মেনির প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে অবতীর্ণ হল। গত্যন্তর না দেখে ব্রিটেন অন্যান্য বিদেশী শক্তিকে প্রতিরোধ করার জন্য জাপানের সহিত চুক্তিবদ্ধ হল। ব্রিটেনের সাহায্যে জাপানের নৌবল ও নৌবহর গড়ে উঠল। নব বলে বলীয়ান জাপান চীনের বিরুদ্ধে অভিযান করল, কোরিয়াকে জোর করে আত্মসাৎ করল এবং লিওটাং দ্বীপ হস্তগত করল। ১৯০২ সালে ইঙ্গ-জাপানী সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল।

১৯০৪-৫ সালে জারের রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর ও লিওটাং অধিকার করল এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় প্রভাব বিস্তার করল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন জার্মেনি এবং ফ্রান্স চীনে ব্যাঙ্ক ও রেলপথ স্থাপন এবং বিস্তর মূলধন নিয়োগ করে চীনকে 'সাহায্য' করতে লাগল কিন্তু জাপান তাতে বাধা দিল। প্রথম মহাসমরের পূর্ব পর্যন্ত এইরূপ অবস্থা ছিল।

ভারতবর্ষ। ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্বেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ব্যবসা করতে আরম্ভ করে। ইংরেজ

সওদাগরগণ ব্যবসার সুবিধার জন্য কলকাতায় কুঠি নির্মাণের অনুমতি পেয়েছিল। আত্মরক্ষা ও ব্যবসা রক্ষার অজুহাতে দূরদর্শী ইংরেজ বণিক তাদের কুঠিকে দুর্গে পরিণত করে। বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা আপত্তি করলেন। ছদ্মবেশী সাম্রাজ্যবাদী বণিকরা নবাবকে আক্রমণের একটা ছল খুঁজছিল। দুরাত্মার কখনও ছলের অসদ্ভাব হয় না। হলওয়েল সাহেব অন্ধকূপ হত্যার কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেন, অন্যায় উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য আর একটা গুরুতর অন্যায়ের আশ্রয় নেওয়া হল। কী ভাবে চতুর ক্লাইভ কৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতার সাহায্যে বাংলা দেশকে পলাশীর প্রান্তরে জয় করে ভারতসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা সর্বজনবিদিত। যে ভাবে দুর্বৃত্ত পাইজারো পেরুর ইন্‌কাকে বন্দী করে ধনরত্ন লুণ্ঠন করেছিল, যে ভাবে কোর্টেজ মেক্সিকোর মন্‌টিজিউমাকে বন্দী করে রাজ্য অপহরণ করেছিল, বাংলা দেশে জালিয়াৎ ক্লাইভও ঠিক সেই ভাবে অভিনয় করেছিল। অন্যায়ভাবে রক্তপাতের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আমেরিকায় স্প্যানিশ সাম্রাজ্য ধূলিসাৎ হয়েছিল। ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যও তেমনিভাবে ধ্বসে পড়েছে।

পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ হয়ে উঠলেন কোম্পানীর প্রধান কর্মচারী। কোম্পানীর সম্পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হল। প্রধান ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির ব্যবসায়ে কোম্পানী একচেটিয়া অধিকারী হল। এদিকে নির্মমভাবে খাজনা আদায় চলতে লাগল। এর ফলে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে তিন কোটি বাঙালীর ভিতর এক কোটি বাঙালী প্রাণবিসর্জন দিল। ক্লাইভ কোটি কোটি টাকা নিয়ে বিলাতে চলে গেলেন। তারপর এল ওয়ারেন হেষ্টিংসের পালা। গর্হিত উপায়ে অজস্র টাকা বিলাতে পাঠান হল। তিনি নিজেও প্রচুর ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। এডমাণ্ড বার্ক ভারতবর্ষের উপর হেষ্টিংসের অকথ্য অত্যাচার ও নির্যাতনের উল্লেখ করে লর্ড সভায় যে বক্তৃতা দেন তাতে বিলাতে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সাত বছর বিচারের পর হেষ্টিংস মুক্তিলাভ করেন।

পলাশীর যুদ্ধের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের সিংহদ্বার বাংলা দেশ। এই দেশকে কেন্দ্র করে তারা ভারতবর্ষের নানা দিকে অভিযান চালায় এবং ক্রমে ক্রমে সমগ্র ভারতবর্ষ তাদের করায়ত্ত হয়ে পড়ে।

১৮০০ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়ে উঠেছিল। এই সময়ে যন্ত্রবিপ্লব ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রসাদে ভারতবর্ষ ও ব্রিটেনের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস হয়ে গেল। ১৮০৭ সালের পূর্বে ত্রিশ বছরে এ দেশ থেকে এক হাজার পাঁচাশী কোটি টাকা বিলাতে যায়। তখন ভারতবর্ষের অতি সামান্য অংশই ইংরেজদের অধীন ছিল। এ দেশে শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে কোম্পানী একেবারে উদাসীন ছিল।

দেশের শিল্পবাণিজ্যে কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কোম্পানীর কর্মচারীরা টাকা দাদন দিয়ে তাঁতীদের দিয়ে কাপড় বুনিয়ে নিত। কাপড়ের চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। কথিত আছে, উৎপীড়ন সহ্য করতে না পেরে তাঁতীরা নিজেরাই নিজেদের বুড়ো আঙুল কেটে ফেলেছিল। বিলাতে রপ্তানি ভারতীয় বস্ত্রের উপর উচ্চহারে শুল্ক বসানো হল। বাংলার বস্ত্রব্যবসা ধ্বংস হয়ে গেল। তারা এদেশ থেকে প্রচুর তুলা রপ্তানি করতে লাগল। ব্যাপকভাবে নীল চাষ চলতে লাগল।

এদেশে ইংরেজ এসেছিল সাম্রাজ্যবাদীর মনোবৃত্তি নিয়ে শোষণ ও শাসন চালাতে। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দিয়েছিল। ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ববোধ ও স্বজাতিপ্রীতি সুগভীর ছিল। ইংরেজকে এ দেশের আইন বুঝিয়ে দিবার জন্য পণ্ডিত ও মৌলভী সৃষ্টির প্রয়োজন হয়েছিল। এ জন্য তারা বারাণসীতে সংস্কৃত কলেজ ও কলিকাতায় মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিল। পাছে ভারতবাসী ইংরেজি সাহিত্যের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়, এই ভয়ে কোম্পানী ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিল না।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয়। উইলিয়ম কেরী ছিলেন বাংলা ও সংস্কৃতের অধ্যাপক। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি বহু পণ্ডিত তাঁর সহকারী ছিলেন। উইলকিন সাহেব হুগলীতে সীসার পাতে ছেনি কেটে বাংলা হরফে বই ছাপার সুবিধা করেন। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে ইংরজী ও সংস্কৃত উভয় ভাষা শেখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এদেশে ইয়োরোপীয় সাহিত্য ইতিহাস দর্শন বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রথম অনুভব করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরে ইংরেজি শিক্ষার ফল লোকে অনুভব করে। ডিরোজিওর শিক্ষার গুণে যুবকগণ স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে শিখেছিল।

নূতন শিক্ষার প্রেরণায় ছাত্রদল যেমন সমাজের ও ধর্মের প্রচলিত সকল বিধির উপর বীতশ্রদ্ধ হল তেমনি ইংরেজি সাহিত্য ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির নিরিখে স্বসমাজের হীন দশা যাচাই করে তার উন্নতি করতেও তৎপর হয়েছিল। ইংরেজী শিক্ষার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। ভারতবাসীর মনে আত্মকর্তৃত্ব লাভের বাসনা জাগ্রত হয়েছিল।

১৮৩৩ সালের সনদ অনুসারে কোম্পানীর হাতে ভারতবর্ষ শাসনের কর্তৃত্ব থাকল। ব্যবসার জন্য কোম্পানীর সমস্ত ঋণ ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপান হল, ইংরেজ সাধারণভাবে ব্যবসা বাণিজ্যে যোগ দিতে আরম্ভ করল, লবণ ও আফিমের ব্যবসা গভর্ণমেণ্টের হাতেই থাকল, লবণ উৎপাদন বেআইনী ঘোষিত হল। বেণ্টিক সতীদাহ প্রথা রহিত করেন। নানা শ্রেণীর বহু কাগজ প্রকাশিত হল। এই সময়ে দেশাত্মবোধের উন্মেষ হয়েছিল। ১৭৯৯ সালে লর্ড ওয়েলেসলী সর্বপ্রথম এ দেশে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছিলেন। ১৮৩৫ সালে মেটকাফ মুদ্রাযন্ত্রকে স্বাধীনতা দিলেন। এর পর থেকে ভারতবর্ষীয়দের রাষ্ট্রীয় আন্দোলন একটি নির্দিষ্ট ধারায় চলে।

১৮৩৩ সালের সনদের পর থেকে ইয়োরোপীয়রা অধিক সংখ্যায় এদেশে আসে। তারা জমিদারী এবং তালুকও কেনে। তাদের মধ্যে অনেকে জাহাজ কোম্পানী, ষ্টিমার কোম্পানী স্থাপন করে, চা-এর ব্যবসার দিকে ঝোঁক দেয়। মফস্বলের কোন ফৌজদারী আদালতে তাদের বিচার হত না। এজন্য তাদের অত্যাচার বেড়ে গিয়েছিল। তাদের সংযত করার জন্য নূতন আইনের প্রয়োজন হল। একটি খসড়া প্রস্তুত হল। ইয়োরোপীয়দের আন্দোলনের ফলে খসড়া আইনে পর্যবসিত হয় নি। এদিকে ভারতবাসীরাও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সংঘবদ্ধ হল। ফলে ১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের জন্ম হল। এই সংঘ নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত এবং সমগ্র ভারতের প্রতিনিধি সভা, এই কথা ঘোষিত হল। সমাজ সংস্কারে সাহিত্য রচনায় ও সভাসমিতি স্থাপনে এক নব যুগের সূচনা হল।

১৮৫৪ সালের এডুকেশন ডেস্‌প্যাচ-এর নির্দেশ অনুসারে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত হল। শিক্ষাকে উচ্চ মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরে বিভক্ত করা হল। ১৮৫৭ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব

হল। উচ্চ শিক্ষার বাহন ইংরেজি এবং নিম্ন শ্রেণীগুলিতে বাংলা ও অন্যান্য দেশীয় ভাষা শিক্ষার বাহন হল। বাংলা দেশে বহু আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপনের ভার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপর পড়ল। ইতিপূর্বেই তিনি বাংলা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। বাঙালীর মনে নূতন যুগের ছাপ পড়েছিল। কবি রঙ্গলালের 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায়' কবিতা তৎকালে জাতীয় মানসের দিক নির্ণয় করেছে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত বিদেশের ঠাকুর ফেলে দেশের কুকুরকে গ্রহণ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পর এক শত বৎসরের মধ্যে ইংরেজ সর্বত্র শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহীদের বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহ দমন করতে ইংরেজের সর্বশক্তি নিয়োজিত হয়েছিল। কেহ কেহ এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা লাভের জন্য জাতীয় সংগ্রাম বলেছেন। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আমেরিকান ঔপনিবেশিকদের মতো সিপাহীরা ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব অস্বীকার করার জন্য এই বিদ্রোহ করে নি। ফ্রান্সের অত্যাচারিত জনসাধারণের মতো তারা সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে কোন নূতন আদর্শ স্থাপনের জন্য রাজার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে নি। ভারতবর্ষে জনগণের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তারা এই সংগ্রামে লিপ্ত হয় নি। যে জাতীয়তা ও স্বাধীনতা স্পৃহা রাষ্ট্রীয় ঐক্যবোধ প্রভৃত, যে আদর্শ সিদ্ধির তাড়নায় পরবর্তী যুগে মহাত্মা গান্ধী অথবা নেতাজী সুভাষচন্দ্র ইংরেজ প্রভুত্বকে অস্বীকার করে নিখিল ভারতের দাসত্ব-শৃংখল ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন, সে আদর্শ সিপাহীদের মনে স্থান পায় নি। শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ সিদ্ধিই এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য ছিল। এতে সর্বভারতীয় জনগণের সমর্থন ছিল না। নব জাতীয়তা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ শিক্ষিত ভারতবাসী এতে যোগ দেয় নি। সুতরাং সদ্য প্রতিষ্ঠিত রেলপথ ও টেলিগ্রাফ সাহায্যে এবং বিদ্রোহে জনসাধারণের উদাসীনতার জন্য গভর্ণমেণ্ট সহজে এই বিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ হয়েছিল।

সিপাহী বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের নীতির পরিবর্তন হয়েছিল। দিল্লীর বাদশাহের প্রতি কোম্পানীর ব্যবহারে এক শ্রেণীর মুসলমান অসন্তুষ্ট হয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল বলে গভর্ণমেণ্ট

মুসলমানদের প্রতি বিরূপ হয়েছিল। ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় সমাজের ভিতর বিচ্ছেদ স্থায়ী হয়ে গেল। ইয়োরোপীয়রা ভারতীয়দের থেকে দূরে নিজেদের সমাজের গণ্ডীতে সীমাবদ্ধ হয়ে আত্মকেন্দ্রী হয়ে উঠল। স্বাজাত্যবোধ ও শ্রেষ্ঠত্বাবোধ প্রভু মনোভাব সৃষ্টি করল। তারা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলতে লাগল। ভারতবর্ষে বসবাস করে তারা ভারতীয় সমাজ আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থেকে গেল। তারা স্ত্রী পুত্র পরিবার এনে ভারতবর্ষে বাস করতে লাগল, ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশার প্রয়োজন অনুভব করল না।

বাংলায় জঙ্গী আইন প্রবর্তন হল, বাঙালিকে নিরস্ত্রীকরণ করা হল। কোম্পানীর হাত থেকে ভারত শাসনের ভার পার্লামেণ্টের হাতে গেল। রাণী ভিক্টোরীয়া ঘোষণা করলেন, এবার থেকে ভারতবাসীর ধর্মের উপর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। রাজ সরকারের দায়িত্বপূর্ণ পদে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্য ব্যক্তিকেই নিযুক্ত করা হবে। কয়েকটি বিশেষ শ্রেণী থেকে সৈন্য সংগ্রহ করা হতে লাগল। ফলে সমগ্র ভারতীয় জাতি যুদ্ধ-বিদ্যায় অজ্ঞ থেকে গেল এবং তাদের নিবস্ত্র করে রাখার ব্যবস্থা হল।

দেশে ঘন ঘন দুর্ভিক্ষ ও সরকারী কর্মচারীদের অকর্মণ্যতা শিক্ষিত ভাবতবাসীর চোথ খুলে দিল। তাদেব ভিতর একাত্মবোধ জন্ম হল। কেশবচন্দ্র সেনেব সমগ্র ভারতে ভ্রমণ, এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের 'যত মত তত পথ' শিক্ষা ভারতের নানা জাতির নানা ধর্মের লোকের মনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব দূব করতে সাহায্য করেছিল।

ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের সহিত বাঙালী মানসের উপর ইংরেজ সাংস্কৃতিক জয় প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। শিক্ষিত তরুণ সম্প্রদায় নিজেদের নিকৃষ্টতা বোধের তাড়ায় ইংরেজের আদর্শকে সম্মুখে রেখে শ্রেষ্ঠতা অর্জনে চেষ্টিত হল। রেলগাড়ী বৈদ্যুতিক বার্তা বাষ্পীয়পোত অশিক্ষিত জনমনে বিস্ময় ও কৌতুহল সৃষ্টি করল। মিশনারীগণ উদ্যমের সহিত খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচার করতে লাগল, দেশের ধর্ম সাহিত্য আচার-ব্যবহার পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির বিরুদ্ধে তরুণ মনে বিদ্রোহের বীজ রোপণ করল এবং ইংরেজের সভ্যতা সাহিত্য প্রভৃতির মহিমা ও শ্রেষ্ঠতা জাহির করতে লাগল। ফলে সহরের শিক্ষিত যুবকগণ পোষাকে আহারে-বিহারে দৈনন্দিন জীবনে ইয়োরোপীয়দের অন্ধ অনুকরণ করে 'নিজ বাসভূমে পরবাসী' হয়ে গেল। তারা নিজেদের

সমাজ ব্যবস্থায় গৌরবের কিছু দেখতে পেল না, পরাধীন জাতির যে সাহিত্য ধর্ম ও সভ্যতা থাকতে পারে তা তারা কল্পনা করতে পারল না। মেকলে সাহেব বলেছিলেন, আমি যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করছি তার ফলে ভারতবর্ষে এমন এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হবে যাদের গায়ের রঙ কালো হলেও, রক্ত ভারতীয় হলেও, তারা ভাবে-চিন্তায় কর্মে আদর্শে ইংরেজ বা ইয়োরোপীয় হয়ে যাবে। মেকলের উদ্দেশ্য প্রায় সফল হয়ে এসেছিল। ভারতের ভাগ্য-বিধাতার কৃপায় যথাসময়ে জাতীয়তা আন্দোলন বাঙালি তথা ভারতবাসীকে এই সংকট থেকে রক্ষা করেছে।

ইংরেজী শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে ইংরেজীয়ানা এত বেড়ে ওঠে যে একটি স্বাদেশিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন অনুভূত হল। এই প্রতিষ্ঠানের নাম চৈত্র বা হিন্দু মেলা (১৮৬৭)। শিক্ষা সাহিত্য শিল্প প্রভৃতি জীবনের সকল দিকের সংগঠন ও সংস্কার এই সভার কার্য ছিল। সকল ধর্মের লোক এই সভায় যোগ দিত। পরবশ্যতা দূর করা হিন্দু মেলার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বাংলার বহু মনীষী ভারতবাসীকে আত্মনির্ভর হওয়ার জন্য ডাক দিলেন। কারণ আত্মনির্ভর না হলে আত্মশক্তি আসে না এবং আত্মশক্তি জাগ্রত না হলে মানুষ রাষ্ট্রিক শক্তি অর্জন করতে সমর্থ হয় না। ভারতবর্ষীয় সভা ইতিমধ্যে জনস্বার্থের পরিবর্তে শ্রেণী বা জমিদারি স্বার্থের দিকে ঝুকে পড়ে।

চৈত্র মেলা থেকেই নব জাতীয়তার উন্মেষ হয়। বাঙালী মনে এক অখণ্ড স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন উদিত হল। এই ভাব সমসাময়িক সাহিত্যে পরিস্ফুট। হেমচন্দ্র প্রমুখ বহু কবি ও নাট্যকার কবিতায় গানে ছন্দে ও কথায় ভারতমাতার দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী লিপিবদ্ধ করলেন। সমগ্র ভারতে শিক্ষায় অগ্রসর বাঙালীর উপর রাজ-রোষ পতিত হল। উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থার সংকোচন করা হল। ওয়াহাবী নেতা আমীর খাঁর নির্বাসন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিল সার্বিস থেকে বিতাড়ন এবং গাইকোয়াড়ের রাজ্যচ্যুতির ফলে ভীষণ আন্দোলন আরম্ভ হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শন, কমলাকান্তের দপ্তর এবং আনন্দমঠ আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির মোহনিদ্রা ভেঙ্গে দিল।

শিশিরকুমারের ইণ্ডিয়ান লীগ স্থাপনের কিছু পরেই কলকাতায় ভারত-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। আনন্দমোহন বসু প্রতিষ্ঠিত ছাত্র সভাকে কেন্দ্র করে সুরেন্দ্রনাথ অপূর্ব বাগ্মিতার সহিত যে বক্তৃতা দেন তাতে ছাত্রসমাজের মনে দেশপ্রীতির উদ্রেক হয়। তাঁর ম্যাট্‌সিনী ও ইটালি সম্বন্ধে বক্তৃতা "আধুনিক

ইয়োরোপীয় ইতিহাসের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শকেও উজ্জ্বল করিয়া ধরে।” ঐক্যবদ্ধ ইটালিই সুরেন্দ্রনাথকে একটি অখণ্ড ভারতবর্ষের আদর্শে অনুপ্রাণিত করেছিল। একদিকে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে আবেদন-নিবেদন, অন্যদিকে জনমত গঠন, বিভিন্ন শ্রেণী ও জাতির মধ্যে একতার উল্লেখ এবং হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধ্যে প্রীতিসম্বন্ধ স্থাপন ভারত-সভার উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীকালে কংগ্রেস সমগ্র ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় শক্তিকে সংহত করতে যে চেষ্টা করেছিল, সুরেন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ভারত-সভাই তার অগ্রদূত।

আদালত অবমাননার দায়ে ১৮৮৩ সালে সুরেন্দ্রনাথের দুই মাসের জন্য দেওয়ানী জেলে কারাবাস দণ্ড হয়। এজন্য ভারতবর্ষব্যাপী তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে সুরেন্দ্রনাথ ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতীয় সংঘ স্থাপন করেন। ভারতেব বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় একশত প্রতিনিধি এতে যোগদান করেন।

১৮৮৫ সনে বোম্বাইয়ে ‘ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্রেস’ বা জাতীয় মহাসভার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। আলেন অক্টেভিয়ান হিউম ছিলেন কংগ্রেসের জনক। উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সভাপতিব আসন গ্রহণ করেন। পববর্তী একুশ বৎসর কংগ্রেস কতগুলি দাবী ও প্রস্তাব কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করেছেন। কংগ্রেসের মাধ্যমে শিক্ষিত ভাবতবাসীর স্বদেশ ও স্বজাতির উন্নতি কামনা সাধারণের নিকট প্রকাশ পেয়েছিল।

ভারতবর্ষে পূর্ণমাত্রায় আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এব সংগে দেশবাসীর কোন সম্পর্ক ছিল না। এ যেন একটা আগাছার মতো ভারতবর্ষের মাটিতে বসে তার অন্তরের রস শোষণ করছিল। আমলাতন্ত্রের নৈর্ব্যক্তিক ভাব দায়িত্ববোধশূন্যতা রাজভক্তিব দাবি পার্লামেণ্টে প্রশ্নোত্তর তাহাতে ভাবতীয় সমস্যার ক্ষীণ সমালোচনা, এই ছিল ভারতীয় শাসনপদ্ধতির চিরন্তন নীতি।

লর্ড কার্জন ১৮৯৮ সালের ডিসেম্বব মাসে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁর স্বৈরশাসনে কংগ্রেস নেতৃবর্গ অসন্তুষ্ট হল। তিনি বলেছিলেন ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের মূল উদ্দেশ্য দুইটি—ভারতে ব্রিটিশ শাসন সুদৃঢ় করা এবং ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার। গভর্ণমেণ্টের নীতি ভারতবাসীর উন্নতির পরিপন্থী ও প্রতিক্রিয়াশীল। কংগ্রেস নেতৃবর্গ ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের ন্যায়পরতায় আস্থা সম্পন্ন ছিলেন। এই সময়ে নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কংগ্রেসে একটি নবীন দলের উদ্ভব হয়। ১৯০২ সাল থেকে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর ‘নিউ ইণ্ডিয়া’

পত্রে নূতন মতের ব্যাখ্যা করতে থাকেন। নবীন দলের মতে ব্রিটিশের কাছে আবেদন-নিবেদন বৃথা। নিয়মানুগ পন্থা অবলম্বন করে ইংল্যাণ্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে না থেকে ভারতের ভিতরেই ভারতীয়দের মধ্যেই রাজনৈতিক কার্য চালানো কর্তব্য। প্রবীণ দল ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সম্পর্কের স্থায়িত্ব কামনা করেছিলেন এবং স্বৈরাচার দূর করলেই তা সম্ভব, এ কথা তাঁরা বিশ্বাস করতেন।

লর্ড কার্জনের দীর্ঘ সাত বৎসর কালব্যাপী স্বৈরশাসনে ভারতবাসী উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে তাঁর স্বৈরশাসন চরমে উঠেছিল। বাঙালী জাতি রাজনীতিতে ও শিক্ষায় অগ্রসর এবং সমগ্র ভারতের নেতা। এই জাতিকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলে তার নেতৃত্ব থাকবে না। ভারতবাসীর প্রগতিসূচক আন্দোলন চাপা পড়ে যাবে। তা ছাড়া হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হবে। কার্জন মুসলমানদের বুঝিয়েছিলেন, নূতন প্রদেশ গঠিত হলে পূর্ববঙ্গে তাদেরই সুবিধা হবে, পশ্চিমবঙ্গের সহিত সংযুক্ত থাকলে তারা সরকারে প্রতিপত্তি লাভ করতে পারবে না। ঢাকার নবাব—প্রমুখ মুসলমানরা কার্জনের মত গ্রহণ করেন। রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সংগে যুক্ত হয়ে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ এবং বাকী অংশ প্রেসিডেন্সি বিভাগ, বর্ধমান বিভাগ বিহার উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বাংলাদেশ, নামে পরিচিত হল। স্যার বামফিল্ড ফুলার নবগঠিত পূর্ববঙ্গের ছোট লাট নিযুক্ত হন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছিলেন—আমার হিন্দু-মুসলমান দুই স্ত্রী। হিন্দু দুয়ো রাণী অগ্রাহ্য ও অবহেলার পাত্রী, আর মুসলমান রাণী প্রেমময়ী ও অনুরাগিণী।

বঙ্গভঙ্গের বার্তা প্রচারিত হল। বাঙালীর প্রাণ উদ্বেলিত হয়ে উঠল। প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হল। বাঙালীর বহুকালের মোহনিদ্রা ভেঙ্গে গেল। বাঙালীর সমগ্র শক্তি বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধে নিয়োজিত হল। কলকাতায় ও সহরে, গ্রামে গ্রামে সভা সাধিত হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, একথা আমারা কোনমতেই স্বীকার করিব না * * *

এই পূর্ব পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায়, একই পুরাতন রক্তস্রোত সমস্ত বঙ্গদেশের শিরায় উপশিরায় প্রাণ বিধান করিয়া আসিয়াছে। জননীর বাম দক্ষিণ স্তনের ন্যায় চিরদিন বাঙালীর সন্তানকে পালন করিয়াছে।

আমরা প্রশ্রয় চাহি না—প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তি উদ্বেলিত হইবে।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বাঙালী জাতিকে দ্বিধা বিভক্ত করে সমগ্র বাঙালী জাতির উপর আঘাত হেনে তাকে হীনবল করে দিতে এবং হিন্দু ও মুসলমানের ভিতর বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল—এক ঢিলে দুইটি পাখী শিকার করতে চেয়েছিল। বণিকের জাতি ইংরেজকে হাতে না মেরে ভাতে মারার জন্য কৃষ্ণকুমার মিত্রের উপদেশ অনুসারে জনগণ সভাসমিতি করে বিলাতী দ্রব্য বর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করল। বক্তৃতায় গানে ও প্রবন্ধে বিলাতী বর্জন ও স্বদেশী গ্রহণের কথা সর্বত্র প্রচারিত হল। রবীন্দ্রনাথ রজনীকান্ত সেন কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি সংগীত রচনা করেন। রামেন্দ্রসুন্দর বিপিনচন্দ্র হীরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীগণের প্রবন্ধে, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি গীষ্পতি কাব্যতীর্থ প্রভৃতি বক্তার ওজস্বিনী বক্তৃতায় সারা বাংলা দেশ উন্মাদিত হল। বহু বিশিষ্ট মুসলমান দেশীয় খ্রীষ্টান জমিদার ও নারীগণ স্বদেশী মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর ক্ষোভ প্রকাশের জন্য বাঙালায় ঘরে ঘরে অরন্ধন পালন করা হল এবং উভয় বঙ্গের মিলনের চিহ্নস্বরূপ রাখীবন্ধনের ব্যবস্থা হল।

বাংলা দেশের সুদূর পল্লীর মাঠে পথে ঘাটে স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ লাগল। ব্যবসায় ও শিল্পে নবযুগের অবতারণা হল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় 'সন্ধ্যা' এবং মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা 'নবশক্তি' পত্রিকার মারফতে নবযুগের বার্তা প্রচার করলেন। ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন চরমপন্থীদলের অন্যতম স্রষ্টা। রাজদ্রোহ "অপরাধের জন্য বিচারের সময় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেননি। তিনি বাঙালীকে আত্মশক্তির উদ্বোধন করতে বলেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তি নিষ্ফল, তিনি এই কথা প্রচার করলেন।

স্বদেশী আন্দোলনে ছাত্রগণ প্রধান স্থান গ্রহণ করে। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে বিলাতী বর্জন সার্থক হয়ে ওঠে। ভারত সরকারের রিজলী সার্কুলার, বাংলা সরকারের কার্লাইল সার্কুলার এবং পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের লায়ন সার্কুলারে কিছু ফল হল না দেখে ছাত্র দলন আরম্ভ হল। নির্যাতিত ছাত্রদের শিক্ষার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সুবোধচন্দ্র মল্লিক একলক্ষ টাকা এবং ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও

সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী কয়েক লক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেন। অশ্বিনীকুমার দত্তের নেতৃত্বে বরিশালে স্বদেশী আন্দোলন সফল হয়ে উঠল। ১৯০৬ সালে বরিশালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন হয়। নেতৃবর্গ ও ছাত্ররা যখন বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করতে করতে শোভাযাত্রা করে যাচ্ছিল, তখন তাদের উপর পুলিশ লাঠি চালায়। সুরেন্দ্রনাথ গ্রেপ্তার হন। তাঁর দুই শত টাকা জরিমানা হয়।

১৯০৭ সাল থেকে নূতন ও পুরাতন দলের মধ্যে বিরোধ স্পষ্ট হয়ে উঠে। নূতন দলের নাম চরমপন্থী এবং পুরাতন দল নরমপন্থী নামে পরিচিত। নরমপন্থী আবেদন-নিবেদনে বিশ্বাসী। চরমপন্থী বললেন ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা কোন জাতি স্বাধীনতা লাভ করেনি। লাজপৎ রায় বালগঙ্গাধর তিলক ও বিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থীদের প্রধান নেতা ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষও এই দলে যোগ দিলেন।

গভর্ণমেন্ট নরম পন্থীদের তোয়াজ করলেন। চরম পন্থীদের উপর সরকারের কোপ দৃষ্টি পতিত হল। পাঞ্জাব বাংলা ও বোম্বাই প্রদেশে দমন কার্য আরম্ভ হল। হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের ভিতর বিভেদ সৃষ্টির ব্যবস্থা হল। চরম পন্থীদের অগ্রণী 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্র দত্ত কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডের বিচারে এক বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। 'বন্দেমাতরমের' সম্পাদক অরবিন্দ এবং 'সন্ধ্যা'র সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব গ্রেপ্তার হন। অরবিন্দের মোকদ্দমার সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার কবায় বিপিনচন্দ্রের ছয় মাসের কারাদণ্ড হয়। ১৯০৭ সালে রাজ-দ্রোহকর সভা বন্ধ, আইন দ্বারা প্রকাশ্য সভায় রাজনীতি আলোচনা বন্ধ করে দেওয়া হয়। সভাপতি নির্বাচন নিয়ে সুরাট কংগ্রেসে দুই দলের মধ্যে ভীষণ গণ্ডগোল সৃষ্টি হয়।

ইতিপূর্বেই বাংলা দেশের নানা স্থানে আমলাতন্ত্র যে দমন নীতি অনুসরণ করে তাতে বিপ্লববাদ সৃষ্টি হয়। বাংলার ছোট লাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেণ উড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা হয়। ১৯০৮ সালে কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের জন্য ক্ষুদিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী নামে দুইজন বিপ্লবী মজঃফরপুরে গমন করেন। তাঁদের গুলিতে কেনেডির স্ত্রী ও কন্যা নিহত হয়। প্রফুল্ল চাকী পুলিশের হাতে ধরা না দিয়ে আত্মহত্যা করেন। বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসী হয়। ঐ হত্যাকাণ্ডের পরেই পুলিশ কলকাতার মাণিকতলায় এক বোমা

তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করে। বারীন্দ্র ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র দাস, নরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, কানাইলাল ধর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি গ্রেপ্তার হন। অরবিন্দ ঘোষকেও গ্রেপ্তার করা হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলাল রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন। উভয়েরই ফাঁসী হয়। সরকারী পক্ষে বোমার মামলা পরিচালনা করেন আশুতোষ বিশ্বাস। বিপ্লবীরা তাঁকেও হত্যা করে। একজন দারোগা নিহত হয়। এণ্ড্রু ফ্রেজারের উপর দ্বিতীয়বার আক্রমণ হয়। চিত্তরঞ্জন দাস অরবিন্দের পক্ষে মোকদ্দমা পরিচালনা করেন। অরবিন্দ মুক্তিলাভ করেন। অন্য সকলের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়।

সরকারের নির্যাতন ও ধর্ষণ পূর্ণমাত্রায় চলে। বরিশালের স্বদেশ-বান্ধব সমিতি প্রভৃতি অনেকগুলি সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হয়। অশ্বিনীকুমার প্রমুখ বাংলার নয়জন কর্মীকে বন্দী করা হয়। মর্লি-মিণ্টো শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হল। আমলা-তন্ত্রের পরামর্শে মুসলমান নেতাগণ পৃথক নির্বাচনের আবেদন জানিয়েছিলেন। মুসলিম স্বার্থ রক্ষার জন্য একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রস্তাব হয়েছিল।

১৯১১ সালে রাজা ৫ম জর্জ ও রাণী মেরীর উপস্থিতিতে দিল্লীর দরবার অনুষ্ঠিত হয়। রাজকীয় ঘোষণায় তিনি বঙ্গভঙ্গ রদ করলেন। পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গের বাংলাভাষী অংশ সকল এক বঙ্গভুক্ত হল, কলকাতা থেকে দিল্লীতে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরিত হল। ১৯১২ সালে বড়লাট যখন আড়ম্বরের সহিত শোভাযাত্রা করে নূতন রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করেন ঠিক সেই সময়ে তাঁর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। তিনি আহত হন। দিল্লীতে ষড়যন্ত্রের মামলায় দুইজনের ফাঁসী আর দুইজনের সাত বৎসর করে সশ্রম কারাদণ্ড হয়। রাসবিহারী বসুর মৃত্যুদণ্ড হয় কিন্তু তিনি জাপানে চলে যান।

তুরস্কের প্রতি ইংরেজের ব্যবহার ভারতীয় মুসলমানদের অপ্রীতিকর হয়। তারা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে তার প্রতিকার করতে চেষ্টা করল। জিন্না হাসান ইমাম প্রভৃতি আগেই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন। আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমানগণ সম্মিলিত হয়ে ব্রিটেনের অধীনে স্বায়ত্তশাসন প্রাপ্তির আদর্শ গ্রহণ করেন। মোসলেম লীগের জাতীয়তাসূচক আদর্শ গ্রহণের জন্য কংগ্রেস লীগকে অভিনন্দিত করেন।

১৯০৭ সালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন আরম্ভ করেন। প্রতি ভারতবাসীর মাথা পিছু বার্ষিক তিন পাউণ্ড ট্যাক্স দিতে হত। ভারতবাসীদের ভারতীয়ত্ব প্রতিপন্ন করার জন্য একটি আইন হল। এজন্য প্রত্যেক ভারতবাসীকে একটি দলিলে টিপসহি দিতে বাধ্য করা হয়। এই অপমানকর ব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য গান্ধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করেন। এই আন্দোলনের সময় মহাত্মা গান্ধী সমেত সাড়ে তিন হাজার সত্যাগ্রহী কঠোর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় থেকে যে নিপীড়ন নীতি গৃহীত হয় তার ফলে বাংলায় ও পাঞ্জাবে গুপ্ত দল সৃষ্টি হয়। বাংলার ডাকাতি, পুলিশ কর্মচারী হত্যা, এদের প্রধান কর্ম হয়ে দাঁড়ায়। রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতি বহু মনীষী প্রবাসে থেকে বিপ্লবীদল পরিচালনা করতেন। আমেরিকার 'গদর পার্টি'র শাখা বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বার্লিনে ও কাবুলে বিপ্লবীদের কেন্দ্র ছিল। বিদেশ থেকে বহু বিপ্লবী অস্ত্রশস্ত্র সমেত পাঞ্জাবে আসে। বহু বিপ্লবীর কারাদণ্ড, প্রাণদণ্ড, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। বাংলা দেশে যতীন মুখোপাধ্যায় ও নরেন্দ্র ভট্টাচার্য জার্মেনির নেশনাল পার্টির সংগে যোগাযোগ স্থাপন করেন। সাংহাই-এর জার্মান কন্সাল অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই করে দুইখানা জাহাজ বাংলায় পাঠান। কিন্তু ভারত সরকার আগেই এই ব্যাপার জানতে পেরে জাহাজ দুইখানি হস্তগত করেন। বালেশ্বরে বিপ্লবী ও পুলিশের মধ্যে যে সংঘর্ষ হয় তাতে যতীন্দ্রনাথ নিহত হন। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ছদ্মবেশে বিদেশে চলে যান। তিনি এখন এম, এন, রায় নামে পরিচিত।

ভারত রক্ষা আইন পাশ করা হল। বাংলায় ও পাঞ্জাবে বহু লোক সন্দেহবশে কারারুদ্ধ হল। মৌলানা মহম্মদ আলী, মৌলানা সৌকৎ আলী, আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি বিখ্যাত মুসলমানগণ কারাগারে প্রেরিত হন। প্রথম মহাযুদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিলক ব্রিটেনকে সাহায্য করতে সকলকে আহ্বান করেন। মুসলীম লীগ ও কংগ্রেসের অধিবেশন এক সময়ে হতে লাগল। ১৯১৫ সালে কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের আদর্শ ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়মানুগ ভাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ।

প্রথম মহাসমর

(১৯১৪—১৯১৮)

১৯১৪ সালের ২৮শে জুন অষ্ট্রিয়া সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী আর্চ ডিউক ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ড বস্‌নিয়ার রাজধানী সিরাজিভো নগরে হত্যা হন। অষ্ট্রিয়ার তদন্ত কমিটি প্রমাণের অভাবে সার্বিয়াকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারল না। অষ্ট্রিয়া সন্তুষ্ট হল না। ২৮শে জুলাই অষ্ট্রিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করল। রাশিয়া জার্মেনির ভয়ে সৈন্য চালনা করল। জার্মেনিও সৈন্য চালনা করল এবং রাশিয়া ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বেলজিয়মের আপত্তিসত্ত্বেও তার উপর দিয়ে সৈন্য চালনা করল।

লিজ দুর্গ জার্মান সৈন্যের হস্তগত হল। তারা ব্রুসেলস্ নগরে উপস্থিত হল। জার্মান সৈন্য পূর্ব সীমান্তে চালিত হল, ইংল্যাণ্ড থেকে রসদ প্রেরণের অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য ইংলিশ চ্যানেলের বন্দরগুলি দখল করতে চেষ্টিত হল। ইপ্রেসের যুদ্ধে জার্মানগণ বিষবাষ্প ও দূর পাল্লার কামান ব্যবহার করল ও ভার্দুন যুদ্ধে অবাধে ভীষণ হত্যা চালিয়েছিল। ১৯১৫ সালে ইটালি মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগ দিল এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অষ্ট্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করতে লাগল। জার্মানগণ জেপ্‌লিন ও উড়ো জাহাজ থেকে প্যারিস ও ইংল্যাণ্ডের পূর্বাঞ্চলের জনবহুল স্থানের উপর নৃশংসভাবে বোমাবর্ষণ করতে লাগল এবং টর্পেডো দিয়ে ইংল্যাণ্ডের বাণিজ্যজাহাজ ও রণতরী ধ্বংস করে তার জাহাজী ব্যবসা বন্ধ করতে চেষ্টিত হল। এক দিনেই আবুকির হোগ্ এবং ক্রেসী নামক জাহাজ জলমগ্ন হল, লুসেটেনিয়া জাহাজের সলিল-সমাধি হল। ইংল্যাণ্ডকে শাস্তি দিতে গিয়ে জার্মেনি আমেরিকার অন্তর্দাহ সৃষ্টি করল।

তুরস্ক মিশরে অভিযান করল। মিত্রশক্তির গ্যালিপলি অভিযান শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। ভারতীয় সৈন্য টিসিফোনের যুদ্ধে জয়ী হলেও তারা কুট নামক স্থানে সেনাপতি টাউনসেণ্ড তুর্কী সৈন্যের হাতে আত্মসমর্পণ করলেন। বিভিন্ন দেশের অসংখ্য যুবক সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তের ফলে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যুদ্ধ করে তাদের তরুণ হৃদয়ের উষ্ণ শোণিত-ধারায় পৃথিবীর বক্ষ প্লাবিত করেছিল।

সাধারণ মানুষ বিশ্বব্যাপী মহাসমরের তিক্ততায় বিব্রত হয়ে উঠল, গমনাগমন অসম্ভব হয়ে উঠল, কৃষক ও শ্রমিকগণ সৈন্যদলে যোগ দিয়েছিল, ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হয়ে গেল, জ্ঞান-বিজ্ঞানচর্চা বন্ধ হয়ে গেল। ইয়োরোপ একটি বিরাট শিবিরে পরিণত হল। বিশ্বসভ্যতার বহুকাল বর্ধিত শিকড় শিথিল হয়ে গেল।

রাশিয়ার অবস্থা—রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রচারিত হয়েছিল। কৃষকরা বলেছিল, লাঙল যার জমি তার। পঁচিশ লক্ষ শ্রমিক নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ হয়েছিল। কৃষকদের দলে দলে যুদ্ধে পাঠিয়ে দেওয়া হল। দরিদ্র ও নিরক্ষর সৈন্যগণ শত্রুর অগ্নি বর্ষণের ভিতর পতঙ্গের মতো পুড়ে ছাই হয়ে গেল।

শীঘ্র ঝড় উঠল। খাদ্যের অভাবে এবং ধর্মঘটের ফলে পেট্রোগ্রাড্ নগরে ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে দাঙ্গা আরম্ভ হল। গুলি চলতে লাগল। সৈন্যগণ আদেশমত আর গুলি চালাতে অস্বীকার করল। তারা বিদ্রোহ করল। শ্রমিকগণ সোভিয়েট গঠন করল। জার নিকোলাস সিংহাসন ত্যাগ করলেন। রোমানভ্ রাজবংশ উচ্ছেদ হয়ে গেল।

দেশে বিপ্লবের স্রোত প্রবলবেগে প্রবাহিত হল। সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এল। তারা সেনাপতিদের আদেশ অগ্রাহ্য করল। লেনিন ও তাঁর সহকর্মীরা বিদেশ থেকে ফিরে এলেন। কিন্তু তাঁর মতের বিরুদ্ধে সহকর্মীগণ বিদ্রোহ করল। লেনিন পলায়ন করলেন। বলশেভিকরা বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হল। তারা ক্ষমতা হস্তগত করল। লেনিন দেশের শাসন ভার গ্রহণ করলেন। কৃষকদের জমি দেওয়া হল। দেশময় সোভিয়েট গঠন হল। সোভিয়েটগুলির হাতে শাসনভার অর্পণ করা হল। যুদ্ধ বন্ধ করা হল। অধীন জাতিগুলি মুক্তিলাভ করল।

এদিকে পশ্চিম রণক্ষেত্রে যুদ্ধের ভীষণতা ও বর্বরতা বৃদ্ধি পেল। মানুষ রক্তপাগল মত্ত পশুর মতো দাঁতে দাঁত ঘষে প্রতিহিংসার তাড়নায় অস্থির হয়ে উঠল। গোটে ও কাণ্টের দেশ—সেক্সপীয়র ও মিল্টনের জন্মভূমি, তাদের যুগ-যুগান্তের সভ্যতা ও সংস্কৃতি ভুলে গিয়ে পৃথিবীতে নরকের আগুন জেলে দিয়েছিল। যধ্যমান দেশগুলির পল্লীতে পল্লীতে, গৃহে গৃহে নর-নারীর হৃদয় দুঃখে শোকে প্রিয়জন-বিরহে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল—তাদের মর্মন্তুদ হাহাকার আকাশ-বাতাস প্রতিধ্বনিত করেছিল।

জার্মেনি ও অষ্ট্রিয়ায় দুর্ভিক্ষের করালমূর্তি দেখা দিল। জার্মেনির টর্পেডোর কাছে নিরপেক্ষ জাতির জাহাজও অব্যাহতি পেল না। অবশেষে ১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকা মিত্রপক্ষে যোগ দিল। তার অফুরন্ত রসদ বিরাট সৈন্যবাহিনী ও শক্তি বুভুক্ষু যুদ্ধ-ক্লান্ত জার্মেনির পরাজয় সুনিশ্চিত করে দিল।

১৯১৮ সালের ২রা মার্চ জার্মেনির সহিত রাশিয়ার সন্ধি হল। অষ্ট্রিয়া ইটালির হস্তে পরাজিত হল। চ্যাটু থিয়ারির যুদ্ধে আমেরিকার সৈন্যদল তাদের সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত করল। ব্রিটিশ আক্রমণে জার্মানগণ অস্থির হয়ে পড়ল। সেপ্টেম্বর মাসে হিণ্ডেনবার্গ রেখার উপর আক্রমণ মিত্রশক্তির সাফল্য ও জার্মেনির পরাজয় স্থির করে দিল। জার্মান সৈন্যের সামরিক শক্তি নিঃশেষ হয়ে গেল। বুলগেরিয়া সন্ধির প্রস্তাব করল। তুরস্ক ও অষ্ট্রো-হাঙ্গেরি তার পদাঙ্ক অনুসরণ করল। ইটালিতে অষ্ট্রিয়ান সৈন্য পশ্চাতে হটে যেতে বাধ্য হল। জার্মান নাগরিকগণ বিদ্রোহ করল। বেগতিক দেখে কাইজার ও তাঁর পুত্র হল্যাণ্ডে পলায়ন করলেন। ১১ই নভেম্বর চুক্তিপত্র স্বাক্ষরিত হল। মহাসমরের উপর যবনিকা পতন হল।

মহাসমর চার বৎসর তিন মাস স্থায়ী হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় সকল জাতিই এর প্রবল স্রোতের আবর্তে হাবুডুবু খেয়েছিল। এতে প্রায় চার কোটি ষাট হাজার লোক হতাহত হয়েছিল এবং সর্বশুদ্ধ ছাপ্পান্ন হাজার মিলিয়ন পাউণ্ড ব্যয় হয়েছিল। মহাসমরের মতো এত বড় শোচনীয় ও ভয়াবহ ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে অদৃষ্টপূর্ব। এই কয়েক বৎসরের আগ্নিবিস্ফোরণে পাশ্চাত্য সভ্যতা মরণোন্মুখ হয়েছিল। বহু জ্ঞানী কর্মী ও মনীষীর দানে যে সভ্যতা পরিপুষ্ট হয়েছিল তা ইয়োরোপীয় জাতিদের লোভ নির্বিবেক প্রতিযোগিতা ও স্বার্থসংঘাতে আত্মরক্ষা করতে পারল না। একদিকে আদর্শবাদী তরুণদল জার্মান সাম্রাজ্য-লিপ্সার বিরুদ্ধে প্রাণপণ করে যুদ্ধক্ষেত্রে শোণিত দান করেছিল এবং আত্মীয়স্বজনের মায়া কাটিয়ে স্বদেশ রক্ষার জন্য শত্রুর অগ্নিস্রাবী কামানের সম্মুখীন হয়েছিল, অন্যদিকে বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন পুঁজিওয়ালা ও ব্যবসায়ীর দল গোলমালের সুযোগ নিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করেছিল এবং দেশের শাসনক্ষমতা হস্তগত করে নিয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান ঘটানোর জন্য এই মহাসমর, ডিমোক্রেসীর নিরাপত্তার জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার কায়েম করার জন্য এই মহাসমর শেষ হয়ে গেল। ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স আমেরিকা ইটালি এবং মিত্রপক্ষের অন্যান্য

জাতিগণ কি ভাবে সাফল্য অর্জন করে এবং তাদের উচ্চ ও মহান আদর্শ কি ভাবে সার্থক হয়েছিল তা পরবর্তী কুড়ি বৎসর পরে দ্বিতীয় মহাসমরের বিশ্বব্যাপী ধ্বংসে পরিমূর্ত হয়েছিল।

যুদ্ধের সময় প্রত্যেক দেশে খাদ্য কাঁচা মাল বাসস্থান প্রভৃতি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বাধীনে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। এই অস্থায়ী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিতর স্থায়ী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগঠনের বীজ নিহিত ছিল। তরুণ মনে ভ্রাতৃভাব ও আত্মত্যাগের প্রেরণা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল। এজন্য তারা জীবন ও স্বার্থ বিসর্জন দিতে কৃপণতা প্রকাশ করেনি। প্রচলিত ও জীর্ণ সমাজ-ব্যবস্থায় উদারতর নীতির প্রয়োগ এবং কল্যাণকর কর্মতালিকা জনসাধারণের মনে নবজীবন লাভের আশা উদ্রেক করেছিল। কিন্তু যখন তারা দেখল যে যুদ্ধের সময় সংগঠনের আপাত মনোরম বাক্যজালের অন্তরালে তাদের পুরাতন চিরপরিচিত সমাজ ব্যবস্থার রুক্ষ অকরুণ মূর্তিখানি সমরোত্তর যুগে অধিকতর নির্মম আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে, তখন তারা মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল যে তাদের নূতন জগৎ নূতন সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনের আশা নির্মূল হয়েছে—তারা প্রতারিত হয়েছে।

১৯১৪ সালে যখন মহাসমরের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করেছিল তখন আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট উইলসন ইয়োরোপে শান্তি স্থাপনের প্রস্তাব করেন কিন্তু তা অরণ্যে রোদন হয়েছিল। আমেরিকা দূর থেকে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করতে থাকে। ১৯১৭ সালে যখন জার্মেনি অবাধ সাব-মেরিণ যুদ্ধ চালায় তখন আমেরিকা মনরো নীতির অজুহাতে নিরপেক্ষভাব রক্ষা করতে পারে নি। আমেরিকা যুদ্ধে যোগ দিল, মিত্র শক্তিকে সাহায্য করল, জার্মেনির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করল। যুক্তরাষ্ট্রের আদর্শে পৃথিবীর সমস্ত জাতির সমবায়ে একটি আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপন করে পৃথিবী থেকে যুদ্ধকে দূর করে দিবার জন্য প্রেসিডেণ্ট উইলসন ইয়োরোপে এলেন। ১৮১৯ সালের ৮ই জানুয়ারী কংগ্রেসের বৈঠকে বিজয়ী জাতিগণের প্রতি-নিধিদলের সম্মুখে উইলসন চৌদ্দ দফা প্রস্তাব পেশ করলেন এবং প্রতিনিধিগণ তা গ্রহণ করলেন।

রাষ্ট্রসংঘ। দশজন প্রতিনিধি নিয়ে শান্তি বৈঠক গঠিত হয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উইলসন ক্লিমেন্‌শ লয়েড জর্জ এবং অর্ল্যাণ্ডো তথাকথিত গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে শোষণ ও সাম্রাজ্যতন্ত্রের রথ চলার পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

গণতন্ত্রকে নিরাপদ করার উদ্দেশ্য ও আদর্শ উইলসনের মনে স্থান পেয়েছিল কিন্তু মিত্রপক্ষের রাজনীতিকদের কুচক্রে তা স্থায়ী ফল প্রসব করতে পারেনি। ক্রমে জাতিসংঘ একটি আত্মনিযুক্ত স্বার্থসেবী সংঘে পরিণত হল। ভের্সাই ব্যবস্থা একটা ব্যর্থতায় এবং রাষ্ট্রসংঘ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রহসনে পর্যবসিত হল।

ভের্সাই সন্ধির ব্যর্থতা। অন্যায় ও অবিচার করার সুবিধার জন্য আদর্শবাদের নৈতিক সমর্থন আবশ্যক। বিজয়ী শক্তিগুলি যুদ্ধ অবসান ও চিরশান্তির দোহাই দিয়ে গণতন্ত্র স্থাপন স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করার অজুহাতে জার্মেনিকে নিরস্ত্র করল, তার নৌবহরকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করল, তার উপনিবেশগুলি কেড়ে নিল, ও তাদের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করল এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ তাকে বিস্তর অর্থ দিতে বাধ্য করল। বিজিত জাতিগণ ভের্সাই-এর অন্যায় ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার জন্য কেবলমাত্র সময় ও সুযোগের প্রতীক্ষায় রইল। বিজিত জার্মেনি ও বঞ্চিত ইটালির অভ্যুদয়, হিটলার ও মুসোলিনীর একনায়কত্ব, জাপানের সাম্রাজ্য বিস্তার-পিপাসা—এক কথায় বিশ্বব্যাপী অধিকতর অশান্তির পুনরভিনয় ভের্সাই ব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল।

শান্তি স্থাপনের উপায়। বর্তমান যুগে যুদ্ধের ভয়াবহতা সাংঘাতিক। পৃথিবীতে এমন অনেক লোক আছেন যাঁরা যে কোন উপায়ে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে চান। নিছক শান্তিবাদীদের পলায়নী বৃত্তি যুদ্ধ দূর করার সুনিশ্চিত উপায় নয়। সাম্রাজ্য-পিপাসাই যুদ্ধের একমাত্র কারণ নয়। যুদ্ধের একটা অর্থনৈতিক কারণও আছে। প্রাচীন কালের সামন্ততন্ত্র পরবর্তী যুগের ধনতন্ত্রে পর্যবসিত হয়েছিল। বর্তমান যুগের সাম্যবাদ ধনতন্ত্রের সন্তান। রাষ্ট্রের হাতে ধনোৎপাদনের সমস্ত ক্ষমতা দিলে সংগত বিতরণের ব্যবস্থা হবে, ধনতন্ত্রের অপরিমিত সচ্ছলতা তিরোহিত হবে, ধনী ও দরিদ্রের মধ্যের ঈর্ষা-দ্বেষ অস্তমিত হবে, অসন্তোষ দূর হবে, পররাজ্য গ্রাস করার প্রবৃত্তি ও প্রয়োজনের মূলোৎপাটন হবে, শ্রেণীহীন একটিমাত্র জাতি সৃষ্টি হলে কলহ দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধ তিরোহিত হবে—রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এই আদর্শ। বার্ট্রাণ্ড রাসেল বলেন, যুদ্ধ যখন ভূমিকম্পের মতো দৈবদুর্বিপাক নয় এবং যখন এর উৎপত্তি মানুষের ইচ্ছায়, তখন মানুষের ইচ্ছায় এর নিবৃত্তি সম্ভব। তাঁর মতে যুদ্ধকে চিরকালের জন্য দূর করার উপায় তিনটি—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিক। অপরাজেয় বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে তার অনুশাসন মেনে

নেওয়ার জন্য প্রত্যেক রাষ্ট্রকে বাধ্য করতে পারলে রাজনৈতিক অন্তরায় দূর হবে। জমি ও কাঁচা মালের উপর বিশ্বরাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা থাকলে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে এবং অর্থনৈতিক বাধা অন্তর্হিত হবে। জনশিক্ষার ভিতর আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলে যুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক কারণ বিদূরিত হবে।

সাম্যবাদের দুর্বলতা। রাশিয়ার সাম্যবাদ ব্যক্তির আর্থিক স্বাধীনতার উপর জোর দিয়েছে, এমন কি অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সকল রোগের ঔষধ হিসাবে গ্রহণ করেছে। একমাত্র খাওয়া-পরার সচ্ছলতা পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য স্থাপন করবে। এজন্য দেশব্যাপী বিপ্লবের প্রয়োজন স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু বিপ্লবের পথ রক্তসিক্ত। বিপ্লব থেকে প্রতিবিপ্লবের জন্ম হয়। প্রতিবিপ্লবের সংঘাতে স্বাধীনতার ধ্বংসের সম্ভাবনা সর্বদা জাগ্রত। মার্কসের ডায়লেকটীক অনুসারে স্থায়ী শান্তি সম্ভব নয়।

যদি কখন অহিংস উপায়ে মানুষের হৃদয় বৃত্তির রূপান্তর হয় তাহলে অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তির উপর সমস্ত মানুষের আর্থিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব এবং সেই স্বাধীনতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক ও সামাজিক মুক্তিসাধনা সহজ। তাহলে যুদ্ধের কারণের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব। কর্ম ও আদর্শের পশ্চাতে সুদৃঢ় অধ্যাত্ম ভিত্তির অসদ্ভাব হলে তাতে আত্মবিরোধ থাকে—সেই কর্ম ও আদর্শ দুঃখ অশান্তি ও অমঙ্গলের জনক হয়।

সমরোত্তর যুগে বিশ্বসভ্যতার রূপ

ইয়োরোপ

১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর যখন কামানের সর্বশেষ গোলার মর্মভেদী শব্দ মহাসমরের প্রচণ্ড দৃশ্যের ভিতর বিলীন হয়ে গেল, তখন সারা বিশ্বের লোক ভেবেছিল যে অতীতের ভুলভ্রান্তি দূর হয়ে যাবে, দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার অন্তর্হিত হবে, সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্বীকৃত হবে, জাতির স্বাধীনতা ও ব্যক্তির নিরাপত্তা বাস্তবে পরিণত হবে এবং

সমরানলে পরিশুদ্ধ মানুষের মনে শুভবুদ্ধির উদয়ে হিংসা জুগুপ্সা ও যুদ্ধ অরুণোদয়ে অন্ধকারের মতো বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উড্রো উইলসন ন্যায় এবং ডিমোক্রেসির উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিধানের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সার্থক হতে চলেছে এবং স্বাধীন জাতিদের একত্রিত সহযোগিতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা লাভ করছে ভেবে সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। লর্ড কার্জন লর্ড মহাসভায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—বিশ্বের গৌরবময় যুগ নূতন ভাবে আরম্ভ হল, সুবর্ণ যুগ দেখা দিল। এমন কি বার্লিনের রাজপথে লোক চীৎকার করে বলেছিল—আর যুদ্ধ নয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি নরনারী বিশ্বাস করেছিল যে মনুষ্যজাতির ও বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হল। কিন্তু যে উদ্দীপনা ও আশা নূতন ও পুরাতন জগতের জনমন অধিকার করেছিল, বিশ্বমানবের অন্তরের কল্যাণদীপে বিশ্বশান্তির যে আলোকশিখা প্রজ্জলিত হয়েছিল তা উইলসনের চৌদ্দ দফা বিবৃতি ঘোষণার পর থেকে যুদ্ধবিরতির সময়ের মধ্যেই ম্লান হয়ে গেল। যাঁরা অনাগত কালের পূর্ণতর জীবন, বৃহত্তর ও নবীনতর সভ্যতা রচনা করার মন ও উদ্যম নিয়ে প্যারিসে সমবেত হয়েছিলেন, তাঁরা কূটবুদ্ধির গুপ্ত প্রেরণায় চতুর্দশ দফার বিধান থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিকে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের অন্তর্ভুক্ত করে জগতে মৈত্রী ও শান্তি স্থাপন করার প্রধান অন্তরায় সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ড। ব্রিটেন বহু দেশ গায়ের জোরে দখল করেছিল, অপর জাতিকে নিজের স্বার্থের জন্য শোষণের পৈশাচিক মনোবৃত্তি অর্জন করেছিল। ইংল্যাণ্ড ও মিত্রশক্তি সকল প্রকৃত রাষ্ট্র সংঘের সুদূরপ্রসারী প্রভাব উপলব্ধি করে যাতে তা আন্তর্জাতিক নীতি পরিচালনের কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত না হয় তার জন্য চেষ্টা করেছিল। কূটবুদ্ধি সাহায্যে তারা নিজেদের প্রভাব শক্তি ও আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। পাছে অন্য কোন জাতি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী সাম্রাজ্যে পরিণত হয়, এই ভয়ে তাদের দৃষ্টি সজাগ ছিল। নিজেদের প্রতি বিশ্বাস না থাকায় তারা অপরকে বিশ্বাস করতে সমর্থ হয়নি। তাদের জাতীয় গর্ব অহমিকা সন্দেহ ও ভয় বিশ্বসমস্যার প্রকৃত সমাধানে অনতিক্রমণীয় বাধা সৃষ্টি করেছিল। বিশ্বপ্রেম ও আন্তর্জাতিক প্রীতির অভাবে রাষ্ট্রসংঘ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা অর্জন করতে সমর্থ হয়নি। তাদের মধ্যে অল্প লোকই

আদর্শ রাষ্ট্রসংঘ স্থাপনের মনোভাব নিয়ে এসেছিল। সুতরাং তাদের প্রচেষ্টা যে একটা বিরাট ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

নবজাত রাষ্ট্রসংঘ অভিদানী বলীবর্দের মতো বলদৃপ্ত প্রার্থীদের ভিতর দুর্বল জাতি-অধ্যুষিত রাজ্যগুলিকে মুক্তহস্তে বিতরণ করেছিল। ইংল্যাণ্ড প্যালেষ্টাইন মেসোপোটেমিয়া এবং পূর্ব-আফ্রিকার, ফ্রান্স সিরিয়ার এবং ইটালি মিশরের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্বের বিশাল ভূমিখণ্ডের অভিভাবক সেজে বসল। অভিভাবক সেজে দেশের শাসন ব্যবস্থা হস্তগত করা সাম্রাজ্যবাদীদের নূতন 'চাল' নয়। দুর্বল জাতিদের রক্ষা করার অছিলায় এই অভিভাবকত্ব ধীরে ধীরে প্রভুত্বের আকার ধারণ করে পূর্ণ শাসন ও শোষণের উপায় হয়ে ওঠে। স্থান বিশেষে তারা স্বার্থসাধনের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করত। কোথাও তারা 'বর্বর' জাতিদের পারত্রিক কল্যাণ কামনায় সত্যধর্ম শিক্ষা দিবার জন্য প্রথমে পুরোহিত পাঠিয়ে দিত, কোথাও তারা বণিক বেশে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সুলভে জিনিষপত্র বিক্রয় করে দেশের কুটীরশিল্প ধ্বংস করত, কোথাও একেবারে কামান বন্দুক ও সুশিক্ষিত সৈন্য নিয়ে অসহায় দুর্বল অধিবাসীদের সংগে যুদ্ধ করে তাদের বনে-জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য করত, কোথাও তারা অসন্তুষ্ট দেশদ্রোহীদের সংগে ষড়যন্ত্র করে শাসনদণ্ড হস্তগত করে নিত, তারপর নিজেদের অন্যায় অবিচারকে বিধি-নির্দিষ্ট বিধান বলে প্রচার করত। বর্বর জাতিদের শিক্ষা দিবার, সভ্য ও উন্নত করার গুরুদায়িত্ব শ্বেতজাতিরা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করত এবং কর্তব্য বিচ্যুতির ভয়ে তারা দেশ ছেড়ে যেত না। অজ্ঞ অনুন্নত ও অসভ্য বা অর্ধ সভ্য জাতিদের কল্যাণ কামনা তাদের নিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাত এবং তাদের অধঃপতিত অবস্থা দেখে তাদের হৃদয় করুণায় বিগলিত হত।

রাষ্ট্রসংঘ গঠন ও পরিচালনায় কূটনীতির প্রাবল্য, তার অন্যায় ভৌগোলিক ভাগ-বাঁটোয়ারা, বিশেষতঃ জার্মেনির নিকট ক্ষতিপূরণের অসঙ্গত দাবী, তার অর্থনৈতিক দাসত্বের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত গুরুতর পরিস্থিতি উৎপাদনের সম্ভাবনা সূচনা করেছিল। যথাসময়ে ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে না পারলে যে কোন পাওনাদার তার উপর বলপ্রয়োগ করে আদায় করে নিতে পারবে, তার ব্যবস্থা হল। জার্মেনি যথাসময়ে টাকা দিতে পারল না। ১৯২৩ সালের জানুয়ারী মাসে ফ্রান্স রুর উপত্যকায় সৈন্য চালনা করল, ১৯২৫ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত সেখানকার খনিজ দ্রব্য আত্মসাৎ করতে লাগল, রেলপথ

হস্তগত করল এবং নানাপ্রকারে জার্মানদের উপর অত্যাচার করে অন্তর্দাহ সৃষ্টি করল। জাপানকে সন্তুষ্ট করার জন্য কৈ-চু থেকে জার্মানদের বিতাড়িত করে, ঐ স্থানটি তাকে দেওয়া হল, ডানজিগ্ পোল্যাণ্ডের অন্তর্গত হয়ে গেল, যুগোশ্লাভ বন্দর ফিউম ইটালির হাতে গেল, সার উপত্যকা ফ্রান্সের অধিকারে গেল এবং অষ্ট্রিয়াকে জার্মেনি থেকে পৃথক করে দেওয়া হল।

প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ করার নৈতিক দাবী আছে, এই নীতি রাষ্ট্রসংঘ মেনে নিয়েছিলেন এবং তদনুসারে কৃষ্টি ও ভাষাগত ঐক্যের উপর নির্ভর করে তাঁরা কতকগুলি স্বাধীন আত্মনিষ্ঠ রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছিলেন। ইয়োরোপের শিথিল ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অংশরূপে কতগুলি স্বাধীন আত্মচেতন জাতি সৃষ্টি হল; কিন্তু তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক অনির্দিষ্ট থেকে গেল। তারা পাশাপাশি অবস্থান করতে লাগল কিন্তু একত্রিত হয়ে একটি সাধারণ সংঘ গঠন করতে সমর্থ হয় নি। যাঁরা সমগ্র মানব-জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন তাঁরা পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র মহাদেশের ক্ষুদ্রতর অংশগুলির ঐক্য ধ্বংস না করে একটি সংহত রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়, তা ভেবে দেখার অবসর পাননি। ইয়ো-রোপের এই অনিশ্চিত সংকটজনক অবস্থা যুদ্ধের চেয়েও ভীষণ। এর কুড়ি বৎসর পরে ইয়োরোপ যে একটি জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছিল এবং তার উত্তাপে সমগ্র বিশ্বের সভ্যতা ও নিরাপত্তা ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল; বিভিন্ন মতবাদের সংঘর্ষ ও অর্থনৈতিক স্বার্থসংঘাতে বিভিন্ন জাতির স্বতন্ত্র জীবনের শান্তি ব্যাহত হয়েছিল তার জন্য রাষ্ট্রসংঘ প্রধানতঃ দায়ী।

রাশিয়াঃ ১৯১৮ সালের জুন থেকে ১৯২১ সালের আগষ্ট পর্যন্ত তিন বৎসর বলশেভিকদের অগ্নিপরীক্ষার যুগ। ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে বন্দী সম্রাট ও তাঁর পরিবারবর্গকে হত্যা করা হয়েছিল। ট্রট্স্কি লাল ফৌজ সৃষ্টি ও গঠন করলেন। বলশেভিক দলের অসাধারণ উৎসাহ কর্মকুশলতা এবং নেতাদের উপর অকুণ্ঠ বিশ্বাস তাদের বিজয়লাভের প্রধান কারণ। ১৯১৮-১৯ সালে শ্রমিক বিপ্লব বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ার বিশেষ সম্ভাবনা ছিল। বলশেভিক-গণ মার্কসের ব্যবহৃত সাম্যবাদী নাম গ্রহণ করল এবং তৃতীয় শ্রমিক আন্ত-র্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল। সর্বত্র বিপ্লবের প্রসার তার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ লেনিনের বাণী ও কর্মপন্থা গ্রহণ করল না। হাঙ্গেরিতে শ্রমিকগণ রুমেনিয়ার সৈন্য সাহায্যে বেলাকুনের বলশেভিক আধিপত্য

ধ্বংস করল। জার্মেনিতে বিপ্লবের পর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল। অসুবিধা দেখে রাশিয়া বিদেশ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করল। আন্তর্জাতিক ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি লেনিনের আমল থেকে এ পর্যন্ত সোভিয়েট ইউনিয়নের বিশেষত্ব। তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তানের সহিত রাশিয়ার সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হল। চীনের সহিত মিত্রতা হল। ১৯২৪ সালে ব্রিটিশ, ইটালি ও ফ্রান্সের সহিত তার রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। পর বৎসর জাপানও এদের পদাঙ্ক অনুসরণ করল।

রুষবিপ্লবের পর সাম্যবাদ সুপরিচিত হয়েছে। এই মতবাদ মার্কস এবং এঞ্জেলস্-এর মতের লেনিনকৃত ভাষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাম্যবাদ বলে, সশস্ত্র বিপ্লবের পর শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্যের ব্যবস্থা অপরিহার্য। নূতন রাশিয়ায় সাম্যবাদীগণ সর্বশক্তিমান।

সাম্যবাদের প্রকৃতি—সাম্যবাদ ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযান। সকল যুগে ও সকল দেশে সমাজের মধ্যে স্তরভেদ থাকে। এই স্তর বা অংশের নাম শ্রেণী। সমাজ থেকে অত্যাচার দ্বন্দ্ব এবং অশান্তি দূর করতে হলে শ্রেণীভেদ নির্মূল করা চাই। একটি বিরাট শ্রমিক সংঘ ভবিষ্যতের মানব-সমাজ। ভূমি মূলধন যন্ত্রপাতি খনিজ পদার্থ শক্তির উৎস যাতায়াতের ব্যবস্থা প্রভৃতি ধনসৃষ্টির সকল উপাদান সাধারণের সম্পত্তি। ভোগোপকরণের উৎপাদন ও ও বণ্টন রাষ্ট্রের হাতে, তার কেহ প্রতিযোগী থাকবে না। রাষ্ট্রের ক্ষমতা সর্বত্র নিরঙ্কুশ হবে। একটি বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের মতো রাষ্ট্র দেশের অশন-বসনের অভাব পূরণ করবে। সমস্ত ব্যক্তির সংহত প্রচেষ্টা রাষ্ট্রের নির্দেশে ধনসৃষ্টি করবে। মূলধন রাষ্ট্রের, শ্রম ব্যক্তির। রাষ্ট্রের নির্দেশ, ব্যক্তির মনীষা। পারিশ্রমিক বিভিন্ন, মূলধন সাধারণ। রাষ্ট্র দিবে কাজ, অন্ন—ব্যক্তি দিবে পরিশ্রম। কেহ না খেটে খেতে পাবে না, কেহ পারিশ্রমিককে মূলধনে পরিণত করে কারোকে খাটাতে পারবে না। দেশে দরিদ্র থাকবে না, উত্তরাধিকার প্রথার স্থান নাই। জনসাধারণ সমাজের আর্থিক জীবন নিয়ন্ত্রিত করবে। স্বাদেশিকতার মোহ দূর হবে, সমস্ত বিশ্ব স্বদেশে পরিণত হবে।

ডিমোক্রেসির প্রকৃতি। এই ব্যবস্থা ডিমোক্রেসির দ্বারাও হতে পারে কিন্তু তাতে বিলম্ব হবে। সাম্যবাদ নিরাবরণ একনায়কত্ব। এর একটি সুর, একটি বাণী। এর প্রতিবাদ নাই, এর সমালোচক নাই। এর যদি কোন বিপক্ষ থাকে সে হবে নির্বাসিত কারারুদ্ধ নিহত। দেশের সকল জমি

রাষ্ট্রের খাসে, সকল ব্যবসাই খাস ব্যবসা, সকল কারখানা খাস কারখানা। ডিমোক্রেসিতেও রাজার ক্ষমতা প্রজার হাতে এসেছে সত্য কিন্তু প্রজা সেখানে মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, পার্লামেণ্ট তার হাতে, সেখানে শ্রমিকের প্রবেশাধিকার নাই এবং প্রবেশাধিকার থাকলেও স্বার্থসিদ্ধির ভরসা নাই। শ্রমিক শ্রমের সম্পূর্ণ মূল্য পায় না, সম্পূর্ণ মূল্যের পরিবর্তে সে পায় যৎসামান্য। তার অধিকাংশই যায় পুঁজিওয়ালার হাতে, শ্রমিককে বঞ্চিত করে, সে হয় বড়লোক। পার্লামেণ্টে গিয়ে তার প্রতিবাদ করা বৃথা। সেখানে কেবল তর্ক বিতর্ক দলাদলি। যে দল প্রবল তার নেতা হয় রাষ্ট্রের কর্ণধার। আর একটি অপ্রধান দল সৃষ্টি হয়। একদল রাজার অংশ গ্রহণ করে, শাসন করে। অপর দল গ্রহণ করে প্রজার অংশ। দ্বিতীয় দলের প্রধান কাজ সমালোচনা। ডিমোক্রেসী দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে দলেব খেলা। যে দল যখন সংখ্যাভূয়িষ্ঠ সে দল তখন দেশের শাসন চালায়। বিপক্ষ দল পরাজিত হলে জেতার দল প্রাধান্য লাভ করে, বিজিতের দল সমালোচনা করে। বিপক্ষদলের সমালোচনা ডিমোক্রেসির প্রাণ। সমালোচনা করার অভাবই ডিক্টেটরশিপ বা একনায়কত্ব।

যুদ্ধের সময় ডিমোক্রেসি অচল, ডিমোক্রেসি তখন দলশাসন নয়, সর্ব দল-শাসন অর্থাৎ সকল দলের লোক নিয়ে জোড়া-তালি দিয়ে গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। তখন সমালোচনা করার কেহ থাকে না, সকলেই একমন ও এক ধ্যান হয়ে দাঁড়ায়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ডের মতো ব্যক্তিপ্রধান দেশও রাষ্ট্র-প্রধান হয়ে উঠেছিল অর্থাৎ ব্যক্তির অধিকার ও স্বাধীনতা সংকুচিত হয়েছিল। সংবাদ নিয়ন্ত্রণ আলো নির্বাণ সকল জিনিষের উপর খাজনা নির্ধারণ কারখানা উৎপাদন ও ব্যবসার উপর হস্তক্ষেপ, সকলকে সৈনিকদলে যোগ দিতে বাধ্য করে ব্যক্তিগত বিবেকের উপর নির্বিচারে হস্তক্ষেপ, এক কথায়, ব্যক্তি-স্বাধীনতার খর্বতাসাধন ডিমোক্রেসির দুর্বলতা ও অসম্পূর্ণতার সাক্ষ্য দেয়।

যুদ্ধের সময় ডিমোক্রেসির জন্মভূমি ইংল্যাণ্ডে তার মানসকন্যার উপর এইরূপ অত্যাচার ডিক্টেটরশিপের প্রভুত্ব প্রচারের সুযোগ দিয়েছিল। মার্কস-এর অশরীরী মানস-সৃষ্টি আকার ও রূপ গ্রহণ করে রাশিয়ায় জরাজীর্ণ জারতন্ত্রের শূন্য সিংহাসন অধিকার করেছিল।

সুতরাং ডিমোক্রেসির একনিষ্ঠ উপাসকরা এর দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে

বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ল। যারা একে সর্বদোষনিবারক, সকল রাজনৈতিক ব্যাধির মহৌষধ বলে ভাবত তারা এর দুর্বলতার পরিচয় পেয়ে এর উপকারিতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করতে লাগল। ডিমোক্রেসির চালক ও ভক্তগণ ডিক্টেটরশিপের পক্ষপাতীদের কারারুদ্ধ করে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ ও যুদ্ধপরিচালনা করতে লাগল এবং ডিমোক্রেসি যে একটা বিরাট প্রহসন তা প্রকৃত কর্মক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়ে গেল।

প্রথম মহাসমরের পর ইটালি ও জার্মেনি ডিমোক্রেসির রক্ষাকবচ ধারণ করে কমিউনিজমের খোলস গ্রহণ করল, দেশকে প্রথম শ্রেণীর শক্তির পর্যায়ে উন্নীত করার জন্য ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী ডিক্টেটরশিপ স্থাপন করল। ইটালিতে ফ্যাসিষ্টরা পার্লামেণ্ট বাতিল করল না, রাজসিংহাসন বেদখল করল না, চার্চেরও স্বার্থহানি করল না। জার্মেনিকে পুনরায় মহাশক্তির আসনে প্রতিষ্ঠা করতে কৃতসংকল্প হয়ে নাৎসীগণ বেকারসমস্যা সমাধানের দায়িত্ব গ্রহণ করল, বাণিজ্য সংবাদ মতামত ও আর্ট নিয়ন্ত্রণ করল, ইহুদীদের বিতাড়িত করে নর্ডিক জাতির মহিমা ঘোষণা করল। এরা সকলেই দলকে উদরস্থ করতে গিয়ে দলেরই প্রাধান্য স্বীকার করল, ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করে রাষ্ট্রের জয়গানে মুখর হয়ে উঠল। কার্যকালে ডিমোক্রেসির মতো ডিক্টেটরশিপের ভণ্ডামি ও দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ল। ডিক্টেটরশিপই হোক আর ডিমোক্রেসিই হোক, এরা শিব গড়তে গিয়ে বানর গড়ে বসল এবং মানুষের বুদ্ধি ও ক্ষমতার অপূর্ণতা প্রমাণ করে দিল।

সোভিয়েট শাসনপদ্ধতি। রাশিয়ার প্রতি নগরে ও প্রতি পল্লীতে বহু ক্ষুদ্র সোভিয়েট সমিতি আছে। তারা সোভিয়েট কংগ্রেস নির্বাচন করে। দেশ শাসনের ভার কংগ্রেসের হাতে। কংগ্রেসের অধিবেশন সাধারণতঃ দুই বৎসর অন্তর হয়। সোভিয়েট কংগ্রেস একটি কেন্দ্রীয় নির্বাচন করে তার হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে। এর একটি শাখা সম্মিলিত রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অনুপাতে গঠিত, অন্যটি বিভিন্ন জাতির প্রতিনিধির সমষ্টি। কেন্দ্রীয় সমিতি থেকে একটি ছোট চালক সমিতি গঠিত হয়। শাসনকার্য সম্পন্ন করার জন্য কেন্দ্রীয় সমিতি অন্য একটি মন্ত্রী-পরিষদ নিযুক্ত করে।

সোভিয়েটতন্ত্রে সকলের ভোট দিবার ক্ষমতা নাই। যারা মজুর খাটায়, সুদ খায়, স্বাধীন কারবার ও যাজকের কাজ করে তারা ভোট দিতে পারে না। জনসাধারণের ভোটাধিকার আছে, ধনীদের নাই।

পল্লীগ্রামে অধিবাসীরা সমবেত হয়ে সোভিয়েট রচনা করে। তাদের নির্বাচন-কেন্দ্র কারখানা। প্রতি জেলার অন্তর্গত গ্রামের ও নগরের সোভিয়েটগুলির প্রতিনিধি নিয়ে এক একটি জেলা সোভিয়েট গঠিত হয়। জেলা সোভিয়েট এবং নগর সোভিয়েটগুলির প্রতিনিধি নিয়ে প্রাদেশিক সোভিয়েট গঠিত হয়। সোভিয়েট কংগ্রেস গঠনের সময় প্রাদেশিক সোভিয়েটগুলি থেকে প্রতিনিধি আসার সহিত নগরগুলি তৃতীয়বার নির্বাচনের অধিকার পায়। সোভিয়েট কংগ্রেস নির্বাচনের সময় নগর সমুদয় থেকে প্রতি পঁচিশ হাজার নির্বাচক একজন প্রতিনিধি পাঠায় কিন্তু প্রাদেশিক সোভিয়েট থেকে একলক্ষ পঁচিশ হাজার অধিবাসীর জন্য মাত্র একজন প্রতিনিধি আসতে পারে।

এখন ভূমিসম্পত্তিতে কার্ল মার্কস্ অনুমোদিত রাষ্ট্রের অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে কিন্তু এখনও তা সম্পূর্ণ সুসিদ্ধ হয়নি। কতক জমি রাষ্ট্রের সম্পত্তি। এর প্রজারা সকলেই মজুর মাত্র। তারা সরকারের নিকট প্রয়োজনমত আবশ্যক পণ্য পায় এবং সরকার সমস্ত ফসল নিয়ে থাকেন। আর কতকটা জমি অত্যন্ত দরিদ্র চাষী প্রজাদের যৌথভাবে দেওয়া হয়েছে। এতে যে ফসল জন্মে তা থেকে সরকার নিজ ভাগ নিয়ে যান। অবশিষ্ট যা থাকে তা সকলে সমানভাবে বণ্টন করে নেয়। রাশিয়া এখন কৃষিসম্বল নয়। শ্রমশিল্পের কার্যে অধিক লোক আকৃষ্ট হওয়ায় জমির উপর লোকের চাপ কমে গেছে। শ্রমশিল্পের প্রতিষ্ঠানগুলি সমস্তই প্রথমে সরকারী সম্পত্তি করা হয়েছিল। এখন কিছু কিছু ক্ষুদ্র শিল্পপ্রতিষ্ঠানকে ব্যক্তিগত সম্পত্তি করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কর্মীরা মজুর, আর সরকার মনিব।

সোভিয়েট ইউনিয়ন সৃষ্টি সমরোত্তর যুগের সব চেয়ে বড় আশ্চর্য ঘটনা। রাশিয়া এখন একটি শ্রমিক রাষ্ট্র। রাশিয়ায় এখন সমাজতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে কিন্তু এখনও আদর্শ সাম্যতন্ত্রী সমাজ গঠিত হয়নি। প্রত্যেক ব্যক্তিকে শ্রম করতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তি শ্রমের উপযুক্ত মূল্য পাবে, সমাজতন্ত্রের মূলসূত্র এই। পূর্ণ-সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সকল দেশে বিপ্লব প্রসারের প্রয়োজন। শ্রমিক কর্তৃত্ব জগদ্ব্যাপী হলে নূতন শ্রেণীহীন সমাজের পুনর্গঠন হবে। প্রত্যেকে শক্তি অনুসারে শ্রম করবে। প্রয়োজন অনুসারে সমস্ত বস্তু পাবে, প্রয়োজনাতিরিক্ত বস্তু তাব ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকবে না।

লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর জিনোভিয়েভ্ কামেনেভ্ এবং ষ্ট্যালিন

শাসনভার গ্রহণ করেন। লেনিনের সহকর্মী ট্রট্স্কি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন। বাগ্মীতায় তিনি ছিলেন শীর্ষ স্থানীয়, এবং সাহিত্যিক প্রতিভায় অতুলনীয়। তাঁর লেখায় ডায়লেকটিক দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব ছিল। তাঁর মনোভাব রোমান্টিক ছিল। তিনি বিচরণ করতেন আদর্শের জগতে, মানুষের পৃথিবীতে নয়।

লেনিনের ব্যক্তিত্বে ধীশক্তি ও আদর্শবাদের সহিত রাজনৈতিক কলা-কৌশলের মিলন হয়েছিল। ট্রট্স্কি পেয়েছিলেন লেনিনের ধীশক্তি ও আদর্শবাদ আর ষ্ট্যালিন পেয়েছিলেন তাঁর রাজনৈতিক কলাকৌশল। ট্রট্স্কি আদৌ বাস্তব-বাদী ছিলেন না। তাঁর অলোকসামান্য প্রতিভা ও কর্মকুশলতায় মুগ্ধ হয়ে বহু শক্তিশালী লোক তাঁর দিকে আকৃষ্ট হন কিন্তু তাঁর হৃদয়হীন ও অসহিষ্ণু ব্যবহারে তাঁরা সরে যেতে বাধ্য হন। বিপ্লববিলাসী ও নৈরাজ্যতন্ত্রী ষ্ট্যালিন কমিউনিষ্ট দলের নেতৃত্ব করার উপযুক্ত ছিলেন না। বিপ্লবের বহুপূর্ব থেকে তিনি গুপ্ত প্রচার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, বিপ্লবের পর নির্দিষ্ট কাজ যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করতেন এবং লেনিনের মতবাদ সম্বন্ধে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ছিল। এজন্য তিনি কমিউনিষ্টদের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকৃষ্ট করেছিলেন।

কর্মপদ্ধতি নিয়ে মতভেদ আরম্ভ হল। ট্রট্স্কি বললেন, কেবলমাত্র রাশিয়ায় নূতন সমাজ গঠনের প্রচেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। প্রথমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রমিক বিপ্লব সংঘটিত হওয়া প্রয়োজন, শ্রমিক বিপ্লব জগৎব্যাপী না হলে নূতন সমাজ গঠিত হবে না। সুতরাং কমিণ্টার্ণের সাহায্যে সর্বত্র বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা করতে হবে। তিনি মার্কস্ তত্ত্বের জটিলতা আয়ত্ত করতে পারেননি। তাঁর মতবাদে অবাস্তবতা সুস্পষ্ট।

ষ্ট্যালিন বললেন, পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার সাম্যবাদীর প্রধান কর্তব্য, লক্ষ্য স্থির রেখে স্থান কাল পাত্র অনুসারে কর্মপদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। দেশে নিশ্চেষ্ট থেকে বিদেশে শক্তিক্ষয় করার চেয়ে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সংগঠন প্রধান কার্য। বিস্তর আলোচনার পর কমিউনিষ্টগণ ট্রট্স্কির চরম পন্থা ত্যাগ করে ষ্ট্যালিনের মত গ্রহণ করে। ট্রট্স্কি জিনোভিয়েভ্ কামেনেভ্ রাডেক্ বাকৃতঙ্কি দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। অন্য সকলে ভুল স্বীকার করে দলে ফিরে এলেন কিন্তু ট্রট্স্কি স্বীয় মতে অবিচলিত থাকায় তাঁর নির্বাসন হ'ল (১৯২৯)।

সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার চেষ্টা চলতে লাগল। এর প্রথম স্তর পঞ্চবার্ষিক

সংকল্প। ১৯২৮ সালের অক্টোবর থেকে ১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পাঁচ বৎসর কালব্যাপী বিপুল প্রচেষ্টায় উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হল। পৃথিবীর অন্যত্র এর অনুকরণ হয়েছে কিন্তু রাশিয়ার এই উদ্যমের পশ্চাতে একটা বিশিষ্ট মতবাদের সাধনা এবং এর সংগে সেই সাধনার অঙ্গাঙ্গী যোগ ছিল। জনসাধারণের উন্নতির জন্য এইরূপ পরিশ্রম উদ্যম ও চেষ্টা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল।

নব পদ্ধতি প্রবর্তনের ফলে রাশিয়ায় যন্ত্রশিল্পের বিপুল প্রসার হয়েছে। রাশিয়া এখন যন্ত্রপ্রধান দেশের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। একত্রিক কৃষিকর্মের উদ্ভব হয়েছে। কুলাক শ্রেণীর উচ্ছেদ হয়েছে। কোন এক স্থানের সকল কৃষকের জমি একত্র করে চাষের ভার তাদেরই সম্মিলিত সমিতির হস্তে সমর্পণ করার নাম একত্রিক কৃষিকর্ম।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক সঙ্কল্পের ফলে অপরিমিত উৎপাদিত দ্রব্যের মধ্যে নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের প্রাচুর্য ছিল। রাশিয়ার সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সহজতর ও সচ্ছলতর হয়ে গেল। কৃষক ও শ্রমিকদের বিশ্বাস হল যে রাষ্ট্রশক্তি তাদের নিজস্ব বস্তু; তাদের আর্থিক সুবিধা বিধান ষ্টেটের প্রধান কার্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য ও তাদের পরস্পরের সদ্ভাব সযত্নে রক্ষিত হয়েছে। ষ্ট্যালিনের প্রধান কীর্তি এই।

১৯৩৩ সালের পর বহির্জগতে পরিবর্তনের ফলে এক নূতন সমস্যা উপস্থিত হয়। জার্মেনি ও জাপানের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে ষ্ট্যালিন যখন ব্যস্ত তখন ট্রট্স্কিপন্থীগণ ফ্যাসিষ্টদের সাহায্যে ষ্ট্যালিনকে ধ্বংস করার জন্য ষড়যন্ত্র করে। মস্কোএর বিচারে রাষ্ট্রদ্রোহীদের দণ্ড হয়।

কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ এক্ষণে মৃত। প্রথম থেকেই রাশিয়া এতে যোগ দেয়নি, বিশেষতঃ এর কর্ণধারগণ কমিউনিষ্ট রাশিয়াকে ভীতির চক্ষে দেখতেন। এজন্য তাঁরা রাশিয়াকে বর্জন করেছিলেন। জগদ্ব্যাপী ফ্যাসিষ্টবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলাই সাম্যবাদীর প্রধান লক্ষ্য। সোভিয়েট রাশিয়া স্পেন ও চীনে ফ্যাসিষ্ট প্রগতিতে বাধা দিবার জন্য সাহায্য পাঠিয়েছিল। তার বিশ্বাস ফ্যাসিজমের অগ্রগতি বাধা পেলে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে তার পতন অবশ্যম্ভাবী। সম্মিলিত গণশক্তি গঠনের একমাত্র আদর্শ ফ্যাসিজমের প্রতিরোধ।

ইটালি।—মার্কস্ এবং এঞ্জেলস্ দার্শনিক চূড়ামণি হেগেলের

ডায়ালেকটিক্ দৃষ্টিভঙ্গীর উপর জড়বাদ প্রয়োগ করে তার নূতন রূপ দিয়েছিলেন। দর্শন ও ইতিহাস অপেক্ষা অর্থনীতি বা রাষ্ট্রচর্চায় মার্কসীয় নীতির প্রয়োগই বেশী পরিচিত। সমাজতন্ত্র চেয়েছে অতীতের সহিত বর্তমানের যোগসূত্র ছিন্ন করে মানুষকে নৈরাজ্যবাদের ঈপ্সিত অবস্থায় নিয়ে যেতে। ফ্যাসিজম্ চেয়েছে সমাজের অন্তর্নিহিত অর্থনৈতিক অবস্থার উপর হস্তক্ষেপ না করে তার রাজনৈতিক বাহ্যরূপের পরিবর্তন করতে। সমাজতন্ত্র মহামানবীয় ভাবে অনুপ্রাণিত। এতে জাতিগত ও রাষ্ট্রগত বৈষম্য নাই, দেশ ও জাতির প্রতীয়মান পার্থক্য নাই। সকল দেশের শ্রমিক একতাবদ্ধ হলে শ্রমিক বিপ্লব সংঘটিত হবে, ধনিক তন্ত্রের উচ্ছেদ এবং তারপর শ্রেণীবর্জিত সমাজ গঠিত হবে। সাম্যতন্ত্রে জাতীয়তা ও দেশ ভক্তির স্থান নাই। দেশভক্তি মানুষকে সংকীর্ণ করে দেয়, জাতীয়তা মানুষকে স্বার্থপর করে তোলে। শ্রেণীবর্জিত সমাজ সার্বভৌমিক। সকল দেশের সর্বহারার দল একই শ্রেণীর অন্তর্গত, কেবলমাত্র শাসনকার্যের সুবিধার জন্য তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত।

ফ্যাসিজমের উদ্ভব। পার্লামেণ্টরি শাসনপদ্ধতিতে আন্তর্জাতিকতা থাকলেও বিশ্ব-হিতৈষণার অভাব। কিন্তু ফ্যাসিজমের কোন দার্শনিক ভিত্তি নাই। প্রথম মহাসমরের অব্যবহিত পরে আশাভঙ্গ অবসাদ ও পরাজয়ের মানসিক অবস্থায় এর জন্ম। ইটালি বিজয়ী মিত্রশক্তিদের পক্ষে যোগ দিয়েছিল। ফ্রান্স, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু ইটালি ভের্সাই শান্তি বৈঠক থেকে পরাজয় ও অপমানের মনোভাব নিয়ে রিক্ত হস্তে ফিরে এল।

মহাযুদ্ধের পূর্বেই পার্লামেন্টিয় শাসনপদ্ধতি ও দুর্বল নেতৃত্বে ইটালির রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্বল ও অনুন্নত হয়েছিল। দেশের লোকের মনে অসন্তোষের আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল। উপনিবেশ ও সাম্রাজ্য অর্জন এবং ক্ষমতা লাভের লোভে ইটালি যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল ; কিন্তু যুদ্ধের পর তার সে আশা নির্মূল হয়ে গেল। ফলে জনমনে বিক্ষোভ, অশান্তি ও অসন্তোষ আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। ইটালির তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সমূলে উৎপাটিত হওয়ার উপক্রম হল। যন্ত্রশিল্পের স্থানগুলি সমাজতন্ত্রের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল কিন্তু ইটালির যন্ত্রশিল্প এমন উন্নত ছিল না যে সেখানে সাম্যবাদ বিকাশ লাভ করতে পারে। দেশব্যাপী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে ইটালির তরুণগণ একজন উপযুক্ত নেতার অপেক্ষায় ছিল। তারা এইরূপ একজন উপযুক্ত নেতার সন্ধান পেয়েছিল বেনিটো মুসোলিনীর ব্যক্তিত্বে।

মহাযুদ্ধের পূর্বে মুসোলিনী ছিলেন একজন বামপন্থী সাম্যবাদী নেতা। তিনি মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিয়ে যুদ্ধ করলেন এবং ১৯১৭ সালে আহত হওয়ার পরে একখানি সংবাদপত্রের সম্পাদক হলেন। এমন কি ক্যাপোরেটোর দুর্ঘটনার পরেও তিনি যুদ্ধ চালানোর পক্ষপাতী ছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর জিনিষ-পত্রের মূল্য ও বেকার-সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং শান্তি বৈঠকে গভর্ণমেণ্টের নীতি জনসাধারণের অসন্তুষ্টি সৃষ্টি করে। ফলে ইটালির অর্থনৈতিক জীবন বিশৃংখল হয়ে ওঠে। দেশের এই সংকটকালে মুসোলিনী যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত সৈনিকদের নিয়ে তাঁর ফ্যাসিষ্টদল গঠন করলেন (১৯১৯)। ১৯২১ সাল থেকে ফ্যাসিষ্টগণ একটি সুসংবদ্ধ দলে পরিণত হয়েছিল। ১৯২২ সাল ইটালির নবযুগের উষাকাল।

ফ্যাসিজমের মৌলিক অর্থ ও উদ্দেশ্য—প্রাচীন রোমে কতকগুলি দণ্ডকে একত্র বেঁধে রাজকীয় চিহ্নস্বরূপ ব্যবহার করা হত। তার লাটিন নাম থেকে ফাসিসমো শব্দের উৎপত্তি। রাজশক্তির এই প্রতীকের ভিতর ফ্যাসিষ্ট আন্দোলনের দুইটি মূলসূত্র নিহিত আছে—সংহতিরূপ বন্ধনের ভিতর দিয়ে জাতিব অখণ্ড-ঐক্য স্থাপনেব ইচ্ছা এবং রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ নেতার কর্তৃত্ব স্বীকার।

প্রথমে ফ্যাসিষ্টগণ পূর্ণমাত্রায় জাতীয়তাবাদী ছিল। ফ্যাসিষ্ট বৈদেশিক নীতির মূল কথা—আন্তর্জাতিক বাজনীতিক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতির সার্বভৌমত্ব স্বীকার। ক্রমে ফ্যাসিষ্টগণ শক্তিশালী হয় উঠল। তাদের সাহায্যে মুসোলিনী ইটালির শাসনযন্ত্র হস্তগত কবে নিলেন। আসন্ন শ্রমিক-বিপ্লবের বিপদ থেকে দেশবিদেশের ধনতন্ত্রকে রক্ষা করাব জন্য ফ্যাসিষ্ট-নীতি গৃহীত হল।

ফ্যাসিষ্টদের মতে রাষ্ট্র জাতিগত ও ব্যক্তিগত সমস্ত প্রতিষ্ঠানের একমাত্র প্রতিভূ। রাষ্ট্রশক্তি অব্যাহত ও নিরঙ্কুশ। একশত বৎসর পূর্বে দার্শনিক-প্রবর হেগেল বলেছিলেন, রাষ্ট্রই সমাজের পূর্ণ ও চরম অভিব্যক্তি। তাঁরই প্রতিধ্বনি করে মুসোলিনী বললেন, সমাজ জীবধর্মী, রাষ্ট্রই এর চরম পরিণতি। ফ্যাসিষ্টগণ বিশ্বরাষ্ট্রের সম্ভাব্যতা বা যৌক্তিকতা স্বীকার করে না। সাম্যবাদ আন্তর্জাতিক ভাবের পরিপোষক এবং জাতীয়তার দাবী অস্বীকার করে বলে ফ্যাসিজম তার বিরোধী।

ফ্যাসিজম্ ও সাম্রাজ্যবাদের পার্থক্য—মার্কস্ বলেন, দেশবিদেশের শ্রমিকরা একই দলের সভ্য। এইজন্যই তিনি সকল দেশের শ্রমিকদের

একদলভুক্ত হতে আহ্বান করেছিলেন। সে একীকরণের পরিণতি শ্রমিক-বিপ্লবে। শ্রমিকবিপ্লবে ধনিকদের উচ্ছেদ। ধনিকদের উচ্ছেদে শ্রেণীবর্জিত সমাজগঠন। শ্রেণীবর্জিত সমাজগঠনে ষ্টেটের নিষ্পেষণযন্ত্রের অস্তিত্ব লোপ। ষ্টেটের নিষ্পেষণ যন্ত্রের অস্তিত্ব লোপে পূর্ণ সাম্যতন্ত্র-প্রতিষ্ঠা। পূর্ণ সাম্যতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় নৈরাজ্যের ঈপ্সিত অবস্থা প্রাপ্তি।

ফ্যাসিজমের সংগে মার্কস্-প্রচারিত সাম্যবাদের প্রভেদ যথেষ্ট। ফ্যাসি মতে শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বাধীন নয়। জাতীয় রাষ্ট্রের অধীনে বিভিন্ন কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণী আছে। দেশের ভৌগোলিক সীমার বাইরে কোন শ্রেণীর সংগে সে দেশের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না, কারণ ষ্টেটের অন্তর্গত শ্রেণী ষ্টেটের জাতীয়ভাবের আংশিক অভিব্যক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়।

ফ্যাসিজমের পিছনে কোন সুসংবদ্ধ দার্শনিক অথবা রাজনৈতিক মতবাদের সাধনা নাই। মুসোলিনী স্বয়ং বলেছিলেন, আমার আন্দোলন কর্মপ্রধান। তার ভিতর কোন মতবাদ সন্ধান করা বৃথা। সমাজতন্ত্রের পটভূমি সমস্ত বিশ্ব। এর নায়ক-নায়িকা সকল দেশের সর্বহারা নর-নারী। এই মতবাদে আছে যেমন একটা ন্যায়ানুমোদিত বিশ্লেষণী শক্তির ক্ষুরধার, তেমনি আছে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। উদারতা ও বিশ্বজনীনতা এর প্রাণ। এজন্য এই মতবাদ প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি কর্তৃক আদৃত হয়েছে। এজন্য সমাজতন্ত্রী বলেন, ফ্যাসিজম সাম্রাজ্যতন্ত্রের নূতন সংস্করণ। ইটালি ও জার্মেনি চেয়েছিল তাদের জাতির অভ্যুদয় প্রতিষ্ঠা। তারা বলেছিল, শক্তিই জাতির শ্রেষ্ঠত্বের পরিচায়ক।

রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি। ইটালির জেন্‌টিলে, জার্মেনির নীটশে ও অ্যালবার্ট লিবার্ট রাষ্ট্রের আধ্যাত্মিক ভিত্তি রচনা করেছেন। জেন্‌টিলের মতে ফ্যাসিজম শুধু একটা দার্শনিক মতবাদ নয়, জীবনের একটা নবীন গতি। এর স্বরূপ ও প্রধান বিশেষত্ব আধ্যাত্মিকতা। সক্রিয় চৈতন্য বিশ্বের অন্তরালে বিরাজ করছেন। সৃষ্টি তাঁরই বিকাশ। চেতনার ধর্ম প্রকাশশীলতা স্বস্থতা ও ক্রিয়াশীলতা। আত্মপ্রকাশের অবিরাম গতি মানুষে মূর্ত। এই গতি মানুষ ও ঈশ্বরে এক গভীর সম্বন্ধ স্থাপন করেছে। যার ভিতর এর যত প্রকাশ তার অবস্থা তত উচ্চ। তখন সে মানুষ নয়, অতিমানুষ। অতিমানব অধ্যাত্ম শক্তি দ্বারা পরিচালিত। সুতরাং ফ্যাসিষ্ট দর্শন চেতনার স্বাধীন গতিতে আস্থাসম্পন্ন।

সাম্যবাদ ও ফ্যাসিজমের দার্শনিকতা। জার্মেনি হেগেলের বিজ্ঞানবাদ গ্রহণ করেনি, সোপেনহারের শক্তিবাদ গ্রহণ করেছে। নীট্‌শে বলেছিলেন, অতিমানব বিশ্বশক্তির প্রতীক, বীর্য ও শৌর্যের আধার, অমানুষিক শক্তিতে পূর্ণ। তাঁর দৃষ্টি ভোগ ও ঐশ্বর্যের দিকে, অনন্ত প্রসারিত প্রীতি ও শ্রদ্ধার দিকে নয়। অতি-মানবের বিশেষত্ব বিশ্বমানবের উপর কর্তৃত্ব করা, বিশ্ববিধানের নেতৃত্ব করা। ইটালি ও জার্মেনির ষ্টেট সমষ্টিবোধের প্রতীক নয়। ষ্টেট শক্তিমানের শক্তিব্যূহ। তারই ভিতর দিয়ে জাতীয় সমাজের পরিচালনা করতে হবে। ইটালি ও জার্মেনির আধ্যাত্মিক শক্তিবাদের স্থানে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। রাশিয়া শক্তির অধ্যাত্মরূপের স্থানে জড়রূপকেই গ্রহণ করেছে। হেগেল বলেছিলেন, বিশ্বসৃষ্টি চেতনার আত্মপ্রকাশ, সৃষ্টির প্রেরণা সহজ স্বতস্ফূর্ত। জড় জগতের সম্পর্কে মানুষের নানা প্রবৃত্তি উৎপাদিত হয়। যাকে আমরা জ্ঞান বলি তেমন কোন বস্তু বিশ্বের মূলে নাই। সত্ত্বা জ্ঞানের, জ্ঞান সত্ত্বার উদ্বোধক নয়। ফ্যাসিজমের বিশ্বাস-স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের অস্তিত্বে। জ্ঞান বিষয়-বস্তুব অপেক্ষা করে না। জ্ঞান আপনার প্রভায় উদ্ভাসিত। বলশেভিক বলে, বিষয় প্রধান জ্ঞান অপ্রধান, বিষয় ছাড়া জ্ঞানেব অস্তিত্ব নাই। এঙ্গেলস্‌ বলেছেন, বিশ্বের মূলে বিজ্ঞান শক্তি বা অধ্যাত্ম শক্তি নাই। ষ্ট্যালিনও বলেন, বিশ্বের স্ফূর্তির জন্য কোনও বিশ্বাত্মিকা অধ্যাত্মশক্তি প্রয়োজন হয় না। লেনিনের মতে চেতনা সত্ত্বারই অবভাস।

দার্শনিকতায় ফ্যাসিজম এবং বলশেভিজম সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী। এজন্য তাদের সামাজিক সংস্থিতিও ভিন্ন। ইটালি ও জার্মেনিতে অধ্যাত্মশক্তির দোহাই দিয়ে ফ্যাসিষ্ট ষ্টেট পূর্ণ শক্তির আধার হয়েছিল। রাশিয়ায় জাগতিক সুখ সম্পদের কথা বড় হয়েছে, আধ্যাত্মিক বিকাশের দিকে তার কোন লক্ষ্য ছিল না। রাশিয়া চেয়েছে সকল মানুষকে সমান অধিকার দিয়ে মানুষের সকল অভাব দূর করে এক অখণ্ড মানব সমাজ গড়তে। কাবণ সে বলে, সমাজ-ব্যাধির জনক অর্থনৈতিক বৈষম্য। প্রকৃত মানবতা সাম্যের রত্নবেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত। প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিষ্ট ও বলশেভিক ভাব-ধারার ভিতর জড়েরই স্থান প্রধান। জড়েব ভিতর যে চেতনার ক্রিয়া আছে তা অনস্বীকার্য কিন্তু চেতনার জনক জড় নয়। ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী অন্য রকমের। বেদান্ত বলেন, জড় বলে কিছু নাই। চেতনার বিকাশই বিশ্ব বিকাশের তারতম্য অনুসারে জড়ের জ্ঞান। যেখানে পূর্ণ চেতনা সেখানে জড় নাই।

চৈতন্যেরই বিকাশ হয়। বিকাশের তারতম্য আছে। চৈতন্যই জ্ঞান। জ্ঞান অখণ্ড। জ্ঞানে অন্য কোন বস্তুর স্থান নাই।

জার্মেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মেনির অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে। লোকক্ষয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় রাজনৈতিক বিপ্লব দুর্ভিক্ষ নৈরাশ্য বিজয়ী মিত্রশক্তিবর্গের নির্বিবেক কর্ম দুর্ব্যবহার জাতীয় ঋণভার সাম্রাজ্য হ্রাস প্রভৃতি দুর্ঘটনা জার্মেনির মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। জাতীর এই ঘোর দুর্দিনে নিরাশার অন্ধকারের ভিতর দিয়ে হের হিট্‌লারের অভ্যুদয় হল। হিট্‌লারের নাৎসী মতবাদ এবং মুসোলিনির ফ্যাসিষ্ট মতবাদ একই উৎস থেকে উদ্ভূত। মুসোলিনীর মতো হিট্‌লার প্রথম জীবনে সাম্যবাদী ছিলেন। মুসোলিনীর মতো তিনিও জাতীয়তার মূলে ধাক্কা দিয়ে দেশবাসীকে সচেতন করেছিলেন। মুসোলিনীর মতো তিনিও সাম্যবাদের রাষ্ট্রীকরণ এবং আন্তর্জাতিকতার প্রতিশ্রুত শত্রু। হিট্‌লারের মতে মার্কসবাদ শ্রমিকদের প্রতারণা করার জন্য ইহুদীদের ষড়যন্ত্র। আর্যামির অন্ধ অহংকার নর্ডিক মাহাত্ম্যকীর্তন ইহুদী বিদ্বেষের কারণ। ১৯১৮ সালে ব্যাভেরিয়ায় জার্মান বিপ্লবের সূচনা হয় এবং এখানেই প্রথম বিপ্লবী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩১ সালের পূর্বেই হিট্‌লার রাষ্ট্রে ডিকটেটারশিপ স্থাপন করেন। নাৎসীরা ভের্সাই সন্ধি নিরস্ত্রীকরণ ভৌগোলিক ভাগ বাঁটোয়ারা প্রভৃতি অগ্রাহ্য করে দেয়।

ফ্যাসিজম এবং নাৎসীজম। এই দুই মতবাদের মধ্যে সীমারেখা স্পষ্ট নয়। যখন কোন দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা লোপ পায় এবং কোন না কোন ডিক্টেটরি শাসন প্রবর্তিত হয়, তখন তার সাধারণ নাম ফ্যাসিষ্ট। ফ্যাসিষ্টদের কাছে মহাপুরুষদের শিক্ষার কোন মূল্য নাই। তারা যুদ্ধকেই জাতির আভিজাত্যের মাপকাঠি বলে গ্রহণ করে। তাদের কাছে তলোয়ারই আদর্শ মানব সমাজ গঠনের উপায়। সংঘর্ষই প্রকৃতির বিধান। পশুশক্তির উপর বিশ্বাস তাদের প্রকৃতিসিদ্ধ। তারা শান্তির বিরোধী। সাম্য ও মৈত্রীতে তাদের আস্থা নাই। লুণ্ঠন পররাজ্য অধিকার হত্যা তাদের বিবেকবিরুদ্ধ কাজ নয়। নীট্‌শের আদর্শ তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে। তাদের প্রধান কাজ সামরিক শক্তি অর্জন ও রাজ্য বিস্তার। তাদের দেশাত্মবোধ উৎকট, সুতরাং সংকীর্ণ। ফ্যাসিজম জাতীয়তাবাদের বিশিষ্ট রূপ। তাবা রাষ্ট্রের কাছে ব্যক্তিকে বলি দেয়। আদর্শ ফ্যাসিষ্ট রাষ্ট্র সমষ্টির কল্যাণের প্রতীক। এর স্থান শ্রেণীস্বার্থের উপরে। ফ্যাসিষ্টদের

কাছে ডিক্টেটরের আদেশ বেদবাক্য। তাদের স্বদেশপ্রেম অন্ধ। তার ভিতর বিবেকের স্থান নাই। তারা গণতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। তাদের কাছে লক্ষ্যই বড়। তারা পথের বিচার করে না। ফ্যাসিজম সাম্যবাদের প্রতিবাদ ধনতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। প্রকৃতপক্ষে ফ্যাসিজম্ মুমূর্ষু ধনতন্ত্রের বাঁচার শেষ প্রয়াস। ইংল্যাণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশের বণিক-শাসিত পুঁজিবাদ-প্রধান তথাকথিত গণতন্ত্রও এই সকল দোষ থেকে মুক্ত নয়।

আয়র্ল্যাণ্ড। ১৯১৪ সালে আয়র্ল্যাণ্ডও ইংল্যাণ্ডের মতো মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিল এবং যুদ্ধাবসানে সে একটি বিদ্রোহী দেশে পরিণত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের অপপ্রয়োগ সেখানে উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম দিয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করে আয়র্ল্যাণ্ড একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন আত্মশাসিত দেশে পরিণত হতে চেষ্টা করল। ১৯২০ সালে নূতন হোম রুল বিল আইরিশগণ গ্রহণ করল না। আয়র্ল্যাণ্ড বিদ্রোহ ও খণ্ডযুদ্ধের রঙ্গভূমিতে পরিণত হল। ব্ল্যাক ও ট্যান্ নামে পুলিশ বাহিনী কঠোর দমন ও স্বৈরাচারের তাণ্ডব আরম্ভ করল। একজন সৈন্য অথবা ব্ল্যাক ও ট্যান্ দলের একজন লোকের হত্যা হলে দোষী নির্দোষী নির্বিশেষে যে কোন একজন ব্যক্তিকে হত্যা করে প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যবস্থা হল। লুট-তরাজ চুরি ডাকাতি প্রকাশ্যে ও অবাধে চলতে লাগল। শান্তি নিরাপত্তা পারিবারিক জীবনের সুখ শান্তি গৃহের পবিত্রতা সমাজের কল্যাণ দেশ থেকে নির্বাসিত হল। ডাব্লিন নগরে ডেল আইরিয়ান নামে স্বাধীন আয়র্ল্যাণ্ডের একটি আত্মনিযুক্ত সভা আহূত হল। ডি. ভ্যালেরা এর সভাপতি নির্বাচিত হন। প্রোটেষ্টাণ্ট অলষ্টারকে বাদ দিয়ে আয়র্ল্যাণ্ড একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হল। এর নাম আইরিশ ফ্রি ষ্টেট।

আফ্রিকা ও এশিয়া

জাতীয়তার আদর্শ এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের দুর্দমনীয় কামনা মিশরের নরনারীর মনে স্থান পেয়েছিল কিন্তু তাদের কল্যাণকর কামনা বিনষ্ট করার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের উপর দমন ও নির্যাতন করতে ত্রুটী

করে নি। শেষে তারা পীড়ন ও অত্যাচারের অগ্নিপরীক্ষার ভিতর দিয়ে ব্রিটেনের বদ্ধ মুষ্টি থেকে আত্মশাসনের ক্ষমতা আদায় করতে সমর্থ হয়েছিল।

১৯১১ সালে মাঞ্চু বংশের পতন হয়েছিল। চীন তার প্রাচীন ও জীর্ণ রাজতন্ত্রের অকর্মণ্যতা সম্বন্ধে সচেতন হল। দেশের বিরাট জনসমুদ্র নির্বাত নিষ্কম্প জলরাশির মতো নিদ্রিত ছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই শিল্পপ্রাণ অশিক্ষিতপটু শান্তিপ্রিয় দরিদ্র ও রক্ষণশীল জাতির জীবনস্রোত গতানুগতিকের ঋজু সরল খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। এখনও ঠিক সেইভাবে বহির্জগতের প্রগতি-তরংগ থেকে দূরে অবস্থান ক'রে তারা আত্মতৃপ্ত জীবন অতিবাহিত করতে লাগল। সমাজ-পিরামিডের তুঙ্গস্থানে অবস্থিত মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি নূতন ধরণের শাসন পদ্ধতি স্থাপনে চেষ্টিত হয়েছিল।

দক্ষিণাঞ্চলে ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বে পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিকতার আদর্শ প্রভাব বিস্তার করছিল। পিকিং-এ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থ প্রতিষ্ঠিত হল। সামরিক শক্তি যাদের হাতে ছিল তারাই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল। অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল যে ইয়ান সি কাই এর সাহায্যে চীনে একটি নূতন রাজবংশ স্থাপিত হবে। ১৯১৫ সালে রাজতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলেও পর বৎসরই তার উচ্ছেদ হয়েছিল। ধূর্ত জাপান চীনের অন্তর্বিদ্রোহ ও গৃহকলহে ইন্ধন জুগিয়ে কূটনীতি প্রয়োগে কখন এক পক্ষে, আবার কখনও বা অপর পক্ষে যোগ দিয়ে নবজাগ্রত অথচ দুর্বল চীনের জাতীয় জীবন গঠনে অন্তরায় সৃষ্টি করছিল।

জাপানের চীন বিরোধী মনোভাব এবং জিগীষা থেকে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যেই চীন ১৯১৭ সালে জার্মেনির বিরুদ্ধে মিত্রশক্তিগণের সহিত যোগ দিল। ইয়ান সি কাই এর মৃত্যুর পর চীনের ইতিহাস জটিল হয়ে পড়ল। স্থানে স্থানে এক একজন নেতার আবির্ভাব হল। তারা দেশের এক একটা বৃহৎ অংশ অধিকার ক'রে একাধিপত্য অর্জনের জন্য পরস্পর যুদ্ধ করছিল। যুক্তরাষ্ট্র জাপান ও ইয়োরোপীয় প্রধান শক্তিগণের প্ররোচনায় ষড়যন্ত্র চলত। তারা নিজেদের সুবিধা অনুসারে এক এক সময় এক এক ব্যক্তির বা দলের পৃষ্ঠপোষক সেজে বসত।

চীনের সাধারণ মানুষের জীবন মান্ধাতা আমলের সনাতন রীতি অনুসারে চলেছিল। একদিকে চীনের উন্নত ও প্রগতিকামী দলের রাজনৈতিক

সংগঠনের সজ্ঞান প্রয়াস, বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যাঙ্কের উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা, জনশিক্ষার সময়োপযোগী সংস্কার ও বিস্তার, অপর দিকে জনমনের আড়ষ্টতা ও অজ্ঞানতা, এই দুই বিরুদ্ধস্রোতের ভিতর দিয়ে জাতীয় জীবন অগ্রসর হচ্ছিল। জটিল ও দুর্বোধ্য চীনা বর্ণমালার সংস্কার হল। জ্ঞান চর্চার পথ সহজ ও সরল হয়ে গেল। এই বিরাট সুপ্রাচীন রক্ষণশীল জাতির চিত্ত নবযুগের মহৎ আদর্শের অনুপ্রেরণায় গঙ্গোত্রীর গিরিগুহা বিদারিণী মুক্ত ধারার মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। প্রাচীন শাসন ব্যবস্থার কঠিন শৃংখল ভেঙ্গে গেল। সামাজিক সংগঠন এবং সামগ্রিক শক্তি বিকাশের সম্ভাব্যতা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বক্সার বিদ্রোহে বৈদেশিকদের উপর অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চীন প্রচুর অর্থ দিতে বাধ্য হয়েছিল। আমেরিকা তার অংশের প্রাপ্য টাকা চীনের যুবকদের শিক্ষার জন্য ছেড়ে দিয়ে মহানুভবতা দেখিয়েছিল। বহু চীনা যুবক আমেরিকার বিভিন্ন কলেজে শিক্ষার জন্য প্রেরিত হল। ফ্রান্স ব্যাঙ্ক স্থাপনে ও রেলপথ নির্মাণে, ব্রিটেন ও জাপান শিক্ষা স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সংগঠনের জন্য তাদের প্রাপ্য টাকা উৎসর্গ করেছিল। চীনের জাতি সংগঠনের শিক্ষাবিস্তার কার্যে আমেরিকা দীক্ষা গুরু কিন্তু চীনের অন্তর্জীবনে সাম্যবাদের প্রভাব তাকে আমেরিকার কবল থেকে রক্ষা করেছে।

১৯২৫ সালে একটি ঘটনায় শিক্ষিত ও জাতীয়তা বোধ সম্পন্ন চীনাদের মনে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ধূমায়মান অসন্তোষের আগুন প্রবল আকার ধারণ করে। সাংঘাই সহরে একটা জাপানী কারখানায় একজন চীনা শ্রমিকের হত্যা হয়। এর প্রতিবাদ স্বরূপ চীনাগণ ঐ সহরের বিদেশীদের বাসাঞ্চলে শোভাযাত্রা করে। একজন ব্রিটিশ পুলিশ কর্মচারী নিরস্ত্র জনতার উপর গুলি বর্ষণ করে। ছোট খাটো একটা জালিয়ানওয়ালা বাগের অভিনয় হয়ে গেল। শান্ত নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ ব্রিটিশদের প্রকৃতিগত দুর্বলতা। এইরূপ বর্বরতার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পতন হয়েছে।

রাজনীতি ও আত্মসম্মান জ্ঞানে অনভিজ্ঞ হলেও যাদের অন্তরে আদর্শের উদ্দীপনা আছে তাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হয় না। প্রতিকূলতা সংঘর্ষ সংগ্রাম ও অশান্তি জগতে সিদ্ধির সোপান। অভীষ্ট সাধনার পরম প্রয়াস যাত্রাপথের আলো। ঐকান্তিকতা সকল অন্তরায় দূরে ঠেলে দেয়। নিজের রাষ্ট্রিক সত্তার অনুভূতি আত্মকর্তৃত্ব লাভের অগ্রদূত।

পাশ্চাত্য ভাব ও শিক্ষার আবর্ত চীনের সুপ্রতিষ্ঠ ও সুপ্রাচীন সভ্যতার ভিত্তি শিথিল করে দিয়েছিল। মহাসমরের পরবর্তী কালে এই ভাঙ্গন প্রাচ্যখণ্ডের অন্যান্য স্থিতিশীল দেশেও আত্মপ্রকাশ করেছিল। এমন কি ইস্‌লামের আত্মনিষ্ঠ ও প্রগতি বিরোধী প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। সংবাদ-পত্র বার্তাবহ বেতার বার্তা আধুনিক শিক্ষা এবং প্রচার কার্য ইসলাম জগতে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার হয়েছিল। মহাযুদ্ধের অগ্নি-পরিশুদ্ধির পর তুরস্কের নবজীবন লাভ হয়েছিল, আরবদের ভিতর সাময়িক ঐক্য স্থাপিত হয়েছিল, পারস্যও পাশ্চত্য জাতিদের শোষণক্রিয়ার তীব্র প্রতিবাদ করেছিল।

মহাযুদ্ধের পূর্বে পারস্য ইয়োরোপীয় জাতিদের কূটনীতি পরিচালনার প্রশস্ত ক্ষেত্র ছিল। জীবন ধারণের জন্য এই স্থান সুখকর ছিল না। উত্তর দিক থেকে রাশিয়া একে চেপে ধরেছিল। পারস্য উপসাগরের রাস্তা দিয়ে ব্রিটেন প্রভাব বিস্তার করেছিল। এর তৈলের খনির লোভে আমেরিকার তৈলের পুঁজিওয়ালা মালিকগণ সূক্ষ্ম উপায়ে ঝগড়া বাধিয়ে স্বার্থসেবার পথ পরিষ্কার করেছিল। একজন শা'র অধীনে একটা ভুয়া পার্লামেণ্টরি শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য কয়েকজন সামন্তের ভিতর প্রতিযোগিতা হত্যা ও লুণ্ঠন চলেছিল। গভর্ণমেণ্টের শক্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার অজুহাতে রাশিয়া একদল কসাক্ সৈন্য প্রেরণ করে কর্তৃত্ব স্থাপনের চেষ্টা করছিল। রাশিয়ার গোপন উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দিবার জন্য ব্রিটেন একদল আন্তর্জাতিক বাহিনী গঠন করেছিল। ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়ার অভিসন্ধি বুঝে জার্মেনিও তুরস্কে ষড়যন্ত্র করছিল। ইয়োরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা এইভাবে পারস্যের পটভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে নানা ভাবে নানা প্রকারে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধির উপায় অবলম্বন করছিল। এজন্য পারস্যে একটি জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল।

মহাসমর পারস্যের ভাগ্যে বহু অনর্থ সৃষ্টি করেছিল। কসাক ও জার্মান, ব্রিটেন ও বিভিন্ন দেশী দল ও উপদলের সৈন্য লুট করতে লাগল, সৈন্যচালনা করতে লাগল, এমন কি কোন কোন স্থান দখল করে নিল। যখন বিজয় লক্ষ্মী একবার জার্মেনির আর একবার মিত্রশক্তির অংকশায়িনী হচ্ছিলেন, তখন পারাসিকেরা ব্রিটিশদের আক্রমণ করেছিল, আবার কখন বা তাদের সন্তুষ্ট করছিল। যুদ্ধের শেষে ব্রিটিশ শক্তি পারস্যে কিছুকালের জন্য প্রবল হয়ে উঠেছিল কিন্তু ১৯২০ সালে বলশেভিকদের পারস্য আক্রমণ তাতে বাধা সৃষ্টি

করেছিল। ইতিমধ্যে পারস্যের হৃদয় জাতীয়তার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। ফলে পাশ্চাত্যের প্রাধান্য লোপ পেতে বসেছিল। ১৯২২ সালে রেজা খাঁ নামে একজন শক্তিশালী জননায়ক আবির্ভূত হন। ইনি দেশের শাসন কার্য হস্তগত করলেন। শা নামমাত্র তার কর্ণধার ছিলেন। রেজা খাঁ সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত সন্ধি করে দেশের স্বাধীনতাকে কায়েম করে নিলেন। ১৯২৬ সালে তিনি একনায়কত্ব পরিত্যাগ করে শা'কেই সর্বেসর্বা করে দিলেন।

পূর্বদিকে পারস্য এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরের তীরভূমিস্থিত মরক্কো পর্যন্ত স্থানে সমরোত্তর যুগে ইসলামের সহিত ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের সংঘর্ষ চলেছিল। ইসলামের ঐক্যমত এবং সংগঠনী শক্তি ইউরোপীয় সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছিল। ইউরোপীয় শক্তি সকল ক্রমবর্ধমান বিপদের প্রতি অন্ধ হয়ে অতীত যুগের অনুসৃত পন্থায় আত্মঘাতী কলহে লিপ্ত ছিল। ফলে সর্বত্র ব্রিটিশ ফরাসি ও ইটালিয়ানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভাব ও অসন্তুষ্টি ব্যক্ত হয়ে পড়ল।

মরক্কোর সশস্ত্র বিদ্রোহে স্পেনের বিপুল শক্তিক্ষয় হয়েছিল। ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়েছিল। আবদেল ক্রীম নামে জনৈক ব্যক্তি রিফের অধিবাসীদের নেতৃত্ব করেন। ফরাসিগণ ফেজ অধিকার করে রিফের দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত প্রভাব ও অধিকার বিস্তার করেছিল। ১৯২৫ সালে আবদেব ক্রীম যখন তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় তখনই ফরাসিগণ স্পেনের সহযোগিতা করতে বাধ্য হয়। মরক্কোতে ফরাসি শক্তির প্রতিরোধ সিরিয়ার আশ্রিত রাজ্যসমূহে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। দ্রুসগণ ফরাসিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আরবগণ শত্রুতাচরণ করে বিপদের সূচনা করে। ফেজের সংকটে দামস্কও সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। দক্ষিণাঞ্চলে ওয়াহাবাইট আরবগণ ব্রিটেনের পক্ষপুটে আশ্রিত হেজদাদের রাজাকে সিংহাসন ত্যাগ করে (১৯২৩) নির্বাসন বরণ করতে বাধ্য করে। মক্কা অধিকার করে তারা ধীরে ধীরে ক্ষমতা বিস্তার করতে থাকে। ব্রিটিশ শাসনে মিশরবাসীগণ উত্যক্ত হয়ে উঠেছিল। ক্রমে ক্রমে ফ্রান্স ও ইটালির জাতীয়তাবাদীদের মনে ধারণা হল যে মুসলিম জগতের উপর ইয়োরোপের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে ইয়োরোপীয় জাতিদের মধ্যে সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। তারা বুঝেছিল যে প্রতিবেশী রাজ্যে গৃহকলহ সৃষ্টির জন্য

তারা পূর্বে যে ভেদনীতি অনুসরণ করত তা এখন কার্যকরী নয়, সেদিন আর নাই।

তুরস্কের সুলতান জার্মেনির পক্ষ অবলম্বন করে মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কামাল আতাতুর্ক একদল সৈন্য নিয়ে দার্দনেলিসের সংকীর্ণ ঘাঁটিতে মিত্রপক্ষের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাদের পরাজিত করে তাদের তুরস্ক অধিকারের আশা নির্মূল করেন। কামাল বিজয় গৌরবের সহিত রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন কিন্তু জার্মেনির পরাজয়ের সহিত তুরস্কের সৌভাগ্য-রবি অস্তমিত হল। সুলতান মিত্রপক্ষের বাহুবলের নিকট আত্মসমর্পণ করলেন এবং তাঁর সৈন্য ও সেনাপতিদের অস্ত্র ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। কামাল সুলতানকে মিত্রপক্ষের হীনতাজনক সর্ত্ত স্বীকার করতে নিষেধ করলেন কিন্তু সুলতান তাঁর কথায় কর্ণপাত করলেন না।

বিজয়ী মিত্রসৈন্য ইস্তাম্বুলে প্রবেশ করলেন। কামাল আনাটোলিয়ায় একটি জনবিরল নগরে স্বাধীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করলেন। এদিকে রাজধানী ইস্তাম্বুলে মিত্রপক্ষ তুরস্ককে খণ্ডিত করে নিজেদের ভিতর ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নিল। গ্রীস স্মার্না প্রদেশ অধিকার করল কিন্তু মুষ্টিমেয় সৈন্য নিয়ে কামাল অপূর্ব রণকৌশলের সহিত গ্রীকদের পরাজিত করলেন। পরে কামাল ইস্তাম্বুল অধিকার করলেন। কামাল পাশার মহাবিজয় 'তুরস্ক বিপ্লব' নামে অভিহিত। এই বিপ্লব কেবলমাত্র রাষ্ট্রিক ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল না। ধর্ম সমাজ ও সাহিত্যের উপর এর প্রভাব অল্প হয় নি। নব্য তুরস্কের অভ্যুদয় হল, তুরস্ক নূতনভাবে গড়ে উঠল। রাজতন্ত্র অন্তর্হিত হল। খলিফাতন্ত্র রহিত হল। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

কামালের প্রতিভা রাষ্ট্রে সমাজে ধর্মে ও সাহিত্যে অঘটন ঘটিয়ে দিল। সুলতানের পদ লুপ্ত হল। খিলাফৎ বলে কিছুই রইল না। ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে একেবারে পৃথক করে দেওয়া হল। শাসন ব্যবস্থায় এর কোন স্থান নাই। ধর্মবিশ্বাস ব্যক্তির বিবেকানুগত মতামতের উপর নির্ভর করে। তুরস্কে কোন রাষ্ট্রিক ধর্ম নাই। সভাপতি বা প্রধান মন্ত্রী যে কোন ধর্মের লোক হতে পারেন। অবরোধ প্রথা তুলে দেওয়া হল। নারী সমাজ সম্পূর্ণ মুক্ত হল। লাটিন বর্ণমালা প্রবর্তিত হল। হিজরী সন পরিত্যক্ত হল। ইয়োরোপীয় প্রণালী অনুসারে জানুয়ারী মাস থেকে বৎসর গণনা আরম্ভ হল। ওজন ও

মাপের জন্য মেট্রিক প্রথা প্রবর্তিত হল। বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর অর্থনীতি বিভাগ সুগঠিত হল। সকলের জন্য এক আইন প্রচলিত হল। দেশের সর্বত্র স্কুল-কলেজ স্থাপিত হল। শিক্ষার উন্নতি হল। এক কথায় দেশের সুশাসনে এবং আধুনিক সভ্য জগতের সহিত সমতালে চলার জন্য সকল বিষয়ে ইয়োরোপীয় প্রণালী গৃহীত হল।

একতা এবং একত্রিক কাজের উপকারিতা সম্বন্ধে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। চিন্তা ও ভাবের অবাধ আদান-প্রদান স্বাধীনতা ও শক্তির উৎস। বিভিন্ন দেশের মুসলমানদের ভিতর সম্পর্ক স্থাপন ও একত্ববোধ ইসলামের নবজাগরণ সূচনা করেছিল।

পথের দাবী

সমরোত্তর যুগে (১৯১৮-১৯৩৮) পৃথিবীর সবল ও দুর্বল সকল জাতিই মানুষের মতো জীবন ধাবণ কবার জন্য দাবী করেছিল, যারা সবল তারা চেয়েছিল বাহুবল অস্ত্রবল ও বুদ্ধিবল সাহায্যে সারা জগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করতে। যারা দুর্বল তারা চেয়েছিল মানুষের জন্মগত অধিকার স্বাধীনতা অর্জন করে স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ হতে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সকলের ভিতর মানবধর্ম বিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু পরাধীন বা দুর্বল জাতিগণ বাঁচিবাব জন্য মানুষ হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। এক দিকে সাম্রাজ্যবাদীর স্বার্থমূলক নীতি, অন্যকে শাসন ও শোষণ করার দুর্দমনীয় বাসনা, অপর দিকে দুর্বল অসহায় জাতিদের সুষ্ঠু জীবন ধারণ করার প্রয়াস, এই দুই মনোভাবের সংঘর্ষে পৃথিবীতে এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল, বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে একটি নূতন আদর্শ দেখা দিয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর তিনটি ফ্যাসিষ্ট জাতি, ইটালি জার্মেনি এবং জাপান প্রসারোন্মুখ হয়ে উঠল। বিশ্বে প্রাধান্য স্থাপন তাদেব জাতীয় জীবনের প্রধান লক্ষ্য হয়ে উঠল। পুঁজিবাদী আমেরিকা এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ড

সাম্যবাদী রাশিয়ার সহিত বন্ধুত্ব করতে বাধ্য হল। এখানে নীতিগত প্রশ্নের বালাই ছিল না। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য অক্ষশক্তির প্রাধান্য লোপ করে নিজেদের কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখা।

ইটালী। মুসোলিনীর আবির্ভাবের পূর্বে ইটালিতে কতগুলি ছোট ছোট দল নব জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে দেখা দিয়েছিল। মারিনোত্তির ফিউচারিষ্ট মণ্ডলী গণতন্ত্রের উচ্ছেদ করতে চেয়েছিল। মারিনোত্তি বলতেন জগতের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় যুদ্ধ বৃত্তি। জেণ্টিলের আদর্শবাদ ষ্টেটের নৈতিক সত্তার মহিমা সূচনা করে। কোরাডিনির জাতীয় দলের মূলমন্ত্র ছিল দেশের জন্য আত্মত্যাগ। রসোনি বলেছিলেন ইটালির স্থান বঞ্চিত জাতিদের মধ্যে। মুসোলিনীর আমলে দেশের ভিতর আত্মনির্ভরতার ভাব দেখা দিল। রাষ্ট্রের মর্যাদা ও আর্থিক ক্ষমতা বৃদ্ধি মুসোলিনীর বৈদেশিক নীতির লক্ষ্য ছিল। ইটালির প্রসার চেষ্টা এই নীতির অন্তর্গত। এজন্য প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনার আদর্শ ইটালিতে জনপ্রিয় হয়েছিল। বিষাক্ত বাষ্প বিমান বহর প্রভৃতির সাহায্যে ইটালি আবিসিনিয়া অধিকার করেছিল, আরবের উপকূলে নৌ-ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল। এইভাবে সে আত্মপ্রসারণের চেষ্টা করেছিল।

জার্মেণী। হিট্‌লারের আমলে পরাজিতের মনোভাব জার্মেণির ছিল না। আত্মরক্ষা রাজ্য বিস্তার এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা সে অর্জন করেছিল। বেকার শ্রমিকরা সংঘবদ্ধ হয়ে জাতির কাজে নিযুক্ত হয়েছিল। জার্মাণ জাতি নাৎসী প্রভুত্ব মেনে নিয়েছিল, সর্বগ্রাসী ষ্টেটের বন্দনায় পঞ্চমুখ হয়েছিল, নেতার প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্যের আধ্যাত্মিক মূল্য কীর্তন করেছিল। সাফল্যের গর্ব ও বিজয়ের নেশায় সে আত্মহারা—অন্য কোন জাতির অস্তিত্ব তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। বাহুবলে প্রতিদ্বন্দ্বীর বিনাশ তার একমাত্র উপায়, রাজ্য বিস্তার তার জাতীয় ধর্ম। কেবল মাত্র ১৯১৪ সালের সীমান্ত ফিরে পেলে, এবং প্রসারের উদ্দেশ্যে সকল জার্মাণভাষীকে একত্র করলে চলবে না, সমগ্র জার্মাণ জাতির আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পরিণতির পূর্ণতা সম্ভব করে তুলতে হবে। মধ্য ও পূর্ব ইয়োরোপে বিস্তৃতি জার্মেনির বিধিনির্দিষ্ট বিধান। সুতরাং ফ্রান্সকে একক সংগীহীন ও দুর্বল করে রাখতে হবে, রাশিয়ার অধিকারভুক্ত স্থানের কিয়দংশ কেড়ে নিতে হবে, ইটালির সংগে সখ্য স্থাপন করতে হবে, বিশ্বে শ্রেষ্ঠজাতি হিসাবে জার্মেণিকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে হবে।

মহাসমরের পূর্ববর্তী যুগের জার্মাণ উপনিবেশগুলির পুনরুদ্ধার ও নূতন দেশ জয় এবং নূতন উপনিবেশ স্থাপন তার বর্তমান নীতি। সাম্রাজ্যতন্ত্রের চালকশক্তি তার দুর্দম প্রসার প্রবৃত্তির পশ্চাতে বর্তমান ছিল। এজন্য জার্মেনি জাপানের মতো বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল।

জাপান। জার্মেণি ও ইটালির মতো জাপানও জগতের একটি প্রধান অতৃপ্ত শক্তি। জাপানীরা সম্রাটকে ভগবানের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি বলে মনে করত। তাঁর আদেশ পালন তাদের ধর্ম। তাদের তীর্থস্থানগুলির নাম এক একজন সৈনিকের নামে উৎসর্গীকৃত। চীনের অর্থনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি জাপানের নির্দেশেই চালিত হোক, এই তার ইচ্ছা। অন্যান্য বিদেশীদের প্রভাব বিলুপ্ত করে সে চীনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছিল। সে মাঞ্চুকুও অধিকার করেছিল। তথাপি তার প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উপযোগী উপনিবেশের অভাব ছিল। এই চাহিদা মেটানোর জন্য সে প্রশান্ত মহাসাগরের বহু দ্বীপ, চীনের পূর্ব উপকূল ও ব্রহ্মদেশ অধিকার করেছিল। জাপানী শিল্পের প্রধান উপকরণ তুলা, পশম, রবার, তৈল প্রভৃতির জন্য জাপানকে সম্পূর্ণরূপে পরমুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল। লোহা, সীসা প্রভৃতি ধাতুর খনিও জাপানের ছিল না। একদিকে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ, অন্যদিকে আবার কাঁচা মালের অভাব, এই দুইটি সংকটে অস্থির হয়ে জাপান পররাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করতে মনযোগী হয়েছিল। সুতরাং যে সকল জাতি পরস্বাপহরণ করে তাকে নিজ সম্পত্তি বলে জাহির করেছিল তাদের বিতাড়িত করে সেই সম্পত্তি জাপান দখল করতে উদ্যত হয়েছিল। যে অস্ত্র বলে তারা দুর্বল ও অনুন্নত দেশ অধিকার করেছিল এবং সেখানকার অধিবাসীদের চির দাসত্বে রেখে দিয়েছিল জাপান তাদের সেই অস্ত্র ব্যবহার করেছিল। সে এশিয়ার ত্রাণকর্তা সেজে এশিয়া থেকে শ্বেতজাতিদের উচ্ছেদ করতে মনস্থ করেছিল।

ইংল্যাণ্ড। নিয়মতান্ত্রিকতার জনক ইংল্যাণ্ড। এর প্রস্তুতি মধ্যযুগে, প্রতিষ্ঠা সতের শতকে এবং পরিণতি বিগত আড়াই শত বৎসরে। নিয়মতন্ত্রে রাষ্ট্রের চালকশক্তি নানারূপ বিধি বিধানে নিয়ন্ত্রিত। এখানে স্বেচ্ছাচারের ক্ষেত্র সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। এ দেশের জনমতের প্রতীক জাতীয় প্রতিনিধি সভা। এই সভাই দেশের ভাগ্যনিয়ন্তা। ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রশক্তি শৃংখলিত হয়েছিল এবং নিয়মতন্ত্রের বিজয় ঘোষিত হয়েছিল। পার্লামেণ্টরি-শাসন-পদ্ধতির প্রধান অঙ্গ দলের দ্বন্দ্ব। উদারপন্থী ও রক্ষণশীল

দলের প্রভেদ ও মতান্তর সত্ত্বেও তাদের মধ্যে মূলগত ঐক্য আছে। এরা উভয়েই সাম্রাজ্যবাদী। উভয়েরই উদ্দেশ্য বিজিত দেশ ও জাতিদের উপর কর্তৃত্ব করে কাঁচামাল ও খাদ্য আমদানী করা। এরা উভয়েই গণতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষক। সমাজের ভিত্তি সম্বন্ধে উভয়েই একমত। সোস্যালিজমের উদয়ে ভবিষ্যৎ সমাজ গঠনের স্বরূপ সম্বন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন মূর্ত হয়ে উঠেছে। ফ্যাসিষ্টদের প্রতিক্রিয়া এই প্রশ্নকে চেপে রাখার সাময়িক প্রচেষ্টা মাত্র। এরা উভয়েই প্রকৃতপক্ষে ধীরে ধীরে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একই ধনিকদলে পরিণত হয়েছিল। এদের বিরোধ শ্রমিকদলের সংগে, এদের আপত্তি সাম্যবাদের প্রসারে। শ্রমিকদল মনে করে যে দেশের অধিকাংশ ভোট সংগ্রহ করে পার্লামেন্টারি যন্ত্র-সাহায্যে এরা নির্বিবাদে নূতন সমাজ গড়ে তুলবে। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে মনে হয় সে ভরসা ক্ষীণ।

স্পেন। নূতন মহাদেশ লুণ্ঠন করে স্পেন অপরিমিত ধন সম্পদের অধিকারী হয়েছিল কিন্তু ধন বণ্টনের তারতম্যবশতঃ ধনী ও দরিদ্রের ব্যবধান বেড়ে গিয়েছিল। সুতরাং স্পেনে ভিতরে ভিতরে একটা অশান্তি ও অসন্তুষ্টি বর্তমান ছিল। রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাজা আলফানসোকে নির্বাসন ভোগ করতে হল। গণতান্ত্রিক শাসনে ধনীদের সমূহ ক্ষতি হয়েছিল। মজুররা নিজেদের দুরবস্থা উপলব্ধি করে সংঘবদ্ধ হল। শ্রমিক আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করল। অপর দিকে দেশের ধনীরা বিদেশের ধনীদের সাহায্যে দলবদ্ধ হল। তারা জার্মেনি ইটালী প্রভৃতি ধনতন্ত্রী দেশের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করল। ধনতন্ত্রবাদী ফ্যাসিস্টগণ স্পেনে রাশিয়ার প্রভাব রোধ করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। বিপ্লবী ধনী ষড়যন্ত্রকারীগণ গণতান্ত্রিক সরকারকে অমান্য করতে সাহসী হয়েছিল।

স্পেনের গৃহবিবাদ গৃহেই আবদ্ধ ছিল না। জার্মেনি ও ইটালি প্রথম থেকেই বিপ্লবীদের সাহায্য করে গোলযোগ বৃদ্ধি করেছিল। তারা স্পেনে রাশিয়ার প্রভাব বিনষ্ট করে ফ্যাসিজমের সাহায্যে বলশেভিজমের কণ্টক তুলে দিতে চেয়েছিল। ক্যাটালোনিয়া বাস্ক প্রভৃতি অঞ্চলের সুবিস্তৃত লোহার খনিগুলির উপর তারা লোলুপ দৃষ্টিপাত করছিল।

যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও উপকরণের অভাবে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স যুদ্ধের জন্য

প্রস্তুত ছিল না। সুতরাং তারা নিরপেক্ষতা ও শান্তির উপাসক হয়ে উঠেছিল। অন্যায়ের প্রতিরোধ করার সাহস তাদের ছিল না। সরকার পক্ষ অর্থাভাবে অস্ত্রাভাবে ও লোকাভাবে হীনবল হয়ে পড়েছিল। জেনারেল ফ্রাঙ্কো যুদ্ধে সাফল্য লাভ করলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন পূর্বের ফ্যাসিষ্ট-তোষণ নীতি পরিহার করে আক্রমণ-রোধ নীতি অবলম্বন করেছিলেন।

প্যালেষ্টাইন। খৃষ্টানদের পবিত্রদেশ প্যালেষ্টাইন কখনও একটি অখণ্ড রাষ্ট্র হয়নি। ভূমধ্যসাগরের তীরে এশিয়া মহাদেশের প্রান্তভাগে আরব ও মিশরের দ্বারপালরূপে এই স্থান অবস্থিত। এর পশ্চিম সীমানায় সাগরকূল দিয়ে ইতিহাস প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয় ও বাণিজ্যের রাস্তা।

খৃষ্ট পূর্ব আঠারো শতকের শেষে মিশরের রাজারা এই পথে এশিয়ায় অভিযান চালিয়েছিলেন। তাঁদের বিজয় পতাকা ইউফ্রেটিস্ নদের তীরে প্রাচ্যের অসুর দেশ পর্যন্ত পৌঁচেছিল। কোন সময়ে সেমিটিক জাতি এখানে প্রবল হয় তা জানা নাই। খৃষ্ট পূর্ব ১১১৫ সালে অসুররাজ টিগ্‌লাথ্ পিলেজর হিটাইট রাজ্য ধ্বংস করেন। তখন মিশরের প্রতাপ অস্তমিত। এই সময়েই ইস্রায়েল জাতিসকল ঐ দেশে ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। খৃষ্টপূর্ব দশম শতকেব প্রারম্ভে এখানে প্রথম ইয়ুদী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই রাজ্য জুড্‌হ এবং ইস্রায়েল নামে দুইটি রাজ্যে পরিণত হয়। বৈদেশিক আক্রমণ এবং অন্তর্বিপ্লবেব ফলে খৃষ্ট পূর্ব ষষ্ঠ শতকে জুড্‌হ রাজ্য ধ্বংস হয়। প্যালেষ্টাইনের কতকাংশে মাত্র চারিশত বৎসর ইয়ুদীদের স্বাতন্ত্র্য ছিল।

তারপর' বহু শত বৎসর এই দেশের উপর অনুকূল ও প্রতিকূল ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হওয়ার পর ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে এর শাসনভার তুর্কীদের হাতে আসে। উনিশ শতকের শেষভাগে সুলতান হামিদের অনুমতি অনুসারে প্যালেষ্টাইনে তুর্কীদের অধীনে ইয়ুদী রাজ্য স্থাপিত হয়। ক্রমে ইয়ুদীদের 'জাতীয় বাসস্থান" স্থাপনেব সংকল্প বাস্তবরূপ গ্রহণ করতে থাকে।

তুর্কী সম্রাটের নিকট ঐ স্থান ক্রয় করে ইংল্যাণ্ডের অভিভাবকত্বে ইয়ুদী রাষ্ট্র স্থাপনের চেষ্টা চলে কিন্তু ইতিমধ্যে নব্য তুরস্কের অভ্যুদয় হয়। নবীন তুরস্ক স্বদেশের কোন অংশ সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে ইংল্যাণ্ডের হাতে তুলে দিতে রাজী হয়নি। এজন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রয়াস বিফল

হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে প্যালেষ্টাইনে ইয়ুদীদের জাতীয় আবাস স্থাপনের আশ্বাস দিয়ে ব্রিটিশ মিত্রপক্ষ নিজেদের অর্থ সমস্যা সমাধানের বিশেষ সুবিধা করে নিয়েছিল। এদিকে আবার তুর্কীদের সৈন্যচালনা প্রভৃতি অসুবিধা সৃষ্টি করার জন্য আরব ইরাক ও সিরিয়ার যুদ্ধপ্রিয় আরব উপজাতিদের হাত করে নেওয়া হল। তাদের জানান হল যে মিত্রপক্ষ যুদ্ধে জয়ী হলে আরব রাষ্ট্র স্থাপনে সাহায্য করা হবে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একই সময়ে একই স্থানে দুইটি পরস্পর বিরোধী জাতিকে অধিকার দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।

যুদ্ধ শেষ হলে প্যালেষ্টাইনের আরবগণ দেখল যে ইংরেজ তাদের অভিভাবক হয়েছে এবং তাদের দেশে বিদেশীদের বসবাসের ব্যবস্থা হচ্ছে। আরবরা এই দুই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বৃথা প্রতিবাদ জানাল। এদিকে বন্যার স্রোতের মতো পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে ইয়ুদীরা প্যালেষ্টাইনে আসতে লাগল। অর্থশালী বিদেশীদের চাহিদায় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেল, গরীব আরববাসীদের জমিজমা বিক্রয় হয়ে গেল, হিব্রুভাষা আদালতের ও দরবারের ভাষা বলে গ্রাহ্য হল। ধনগর্বিত ইয়ুদীদের অবজ্ঞার অপমানে আরবগণ জ্বলে উঠল, অন্নকষ্ট ও অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল, দাঙ্গাহাঙ্গামা বিদ্রোহের আকার ধারণ করল। তাদের সন্তুষ্টির জন্য রাজকীয় কমিশন, পার্লামেন্টিয় অনুসন্ধান কমিটি এবং সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য বিশেষজ্ঞের আমদানী ব্রিটিশ পুলিশ বাহিনী গোরা পল্টন বিমানপোত সাঁজোয়া গাড়ী প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদের সকল রকম ঔষধ প্রয়োগ করা হল কিন্তু রোগের উপশম হল না। আরবরা স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বস্ব পণ করে যুদ্ধ করতে লাগল। জাতীয়তাবাদী আরবরা ইংরেজের বিধি ব্যবস্থায় কোনরূপ সম্মতি দিতে পারে নি।

বিচ্ছেদের রাজনীতি—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহ কৌশল। একটা জাতির মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেওয়ার সহজ উপায় সাম্প্রদায়িক বিভেদ সৃষ্টি এবং সেই বিভেদকে উপলক্ষ করে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করা। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা বাঙালি জাতির সংহতি ও ঐক্য নষ্ট করার জন্য বঙ্গভঙ্গ করেছিল। আইরিশ স্বাধীনতা আন্দোলনকে জব্দ করার জন্য আজও আয়র্ল্যাণ্ড ব্রিটিশ চক্রান্তের ফলে দুই খণ্ডে বিভক্ত—উত্তর আয়র্ল্যাণ্ড এখনও গ্রেট ব্রিটেনের অংশ—এখনও দক্ষিণ আয়র্ল্যাণ্ড থেকে স্বাধীনতার অক্লান্ত যোদ্ধা ডি ভ্যালেরা আইরিশ জাতির ঐক্যের জন্য চেষ্টা করছেন। তারপর

মিশর। মিশরের একটা মূল্যবান অংশ সুদান ব্রিটিশ তাঁবেদারির অধীন ছিল। মধ্যপ্রাচ্যেও সেই একই বিষদুষ্ট রাজনীতির খেলা চলেছিল। প্যালেষ্টাইনে ইহুদী উপনিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। প্যালেষ্টাইনে ইহুদী আরব দাঙ্গার রক্তাক্ত পটভূমির উপর নূতন ইস্রাইল রাষ্ট্রের অভ্যুদয় হয়েছিল।

কোরিয়াকে নিয়ে এই বিভেদের রাজনীতি মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। কোরিয়া উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিভক্ত হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন তাঁবেদারির এবং উত্তর কোরিয়া সোভিয়েট প্রভাবের অন্তর্গত। ফলে এই দুই অংশের জনসাধারণ একটি অখণ্ড রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারছে না—শত্রুতা বিরোধ ও রক্তপাত লেগে আছে। ইন্দোচীনেও একই অবস্থা। ডাঃ হো চি মিন্ ইন্দোচীনের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনের অবিসংবাদী নেতা। কিন্তু ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোচীন ছেড়ে যেতে চায় না। সুতরাং আমেরিকার সংগে জোট পাকিয়ে ইন্দোচীনকে বেসরকারী ভাবে দুই অংশে ভাগ করা হয়েছে। একাংশে আছেন ফরাসি তাঁবেদার ভূতপূর্ব 'আনাম সম্রাট' বাওদাই। তিনি ইঙ্গ-ফরাসি-মার্কিন শক্তির উপর নির্ভরশীল। অন্য আর এক অংশে আছেন হো চি মিন্। তিনি চীন-সোভিয়েট মৈত্রীর উপর নির্ভরশীল।

ওলন্দাজ সাম্রাজ্যবাদ ইন্দোনেসিয়াকে ভাগ করতে চেয়েছিল। ফেডারেল্ পন্থী ও রিপাব্লিকানপন্থীদের ভিতর বিভেদ্ রক্ষা করে ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট নিজেদের ক্ষমতা বজায় রাখতে চেয়েছিল। এখনও দেশের এক টুকরা অংশ ওলন্দাজদের হাতে আছে।

ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মের পূর্ণ স্বাধীনতা মেনে নিয়েছে। কিন্তু এই স্বীকৃতির অভ্যন্তরে এমন বিরোধ ও বিদ্রোহের কীলক প্রবিষ্ট করে রেখেছে যে এখানে কখনও যে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র গড়ে উঠবে তার সম্ভাবনা নেই। কারেন, কাচিন ও অন্যান্য উপজাতিদের উস্কানি দিয়ে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট ব্রহ্মকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। এমন কি ব্রিটিশ পুঁজিপতিগণ কারেনদের আর্থিক ও সামরিক অস্ত্রশস্ত্র জুগিয়ে পৃথক গভর্ণমেণ্ট স্থাপনে প্ররোচনা দিয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল দেশগুলির সর্বনাশ করেছে। দেশ বিভাগ কোন জাতিকে ধ্বংস করার একটা কৌশল। এই কৌশল মহাচীনেও অনুসৃত হয়েছে। আত্মকলহ গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত এই রাজনীতির অবশ্যম্ভাবী ফল।

ভারতবর্ষে বাংলা দেশ এবং পাঞ্জাবকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে। প্রত্যেক দেশেই দেশ বিভাগের ফলে গৃহবিবাদ রক্তপাত ও দাঙ্গা ঘটেছে। ভারতবর্ষও ইতিহাসের এই অনিবার্য পরিণাম থেকে রক্ষা পায়নি। ভারত এবং পাকিস্তান যুদ্ধের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাই ভারতের সমাজ জীবন অর্থনৈতিক জীবন এবং সাংস্কৃতিক জীবন বিপন্ন হতে বাধ্য।

মধ্য এশিয়া। জারতন্ত্রের আমলে রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতির মিলন অসম্ভব মনে হয়েছিল কিন্তু দুইটা মহাদেশ জুড়ে বিরাট সোভিয়েট রাশিয়ার এক শত পঞ্চাশটি ভাষাভাষী পাঁচশত সাতাত্তরটি জাতির মধ্যে এই মিলন এখন সম্ভব ও কার্যকরী হয়েছে। যে দেশের ইতিহাস বিজেতা ও ভাগ্যান্বেষী আক্রমণকারীদের অভিযান ও শোণিতপ্লাবনের কাহিনীতে কলঙ্কিত, যে দেশের রাজা ১৫০৫ সাল থেকে আরম্ভ করে প্রত্যহ পঞ্চাশ বর্গ মাইল স্থান অধিকার করতে করতে আট লক্ষ বর্গমাইল পরিমিত নিজ রাজ্যকে পঁচাশী লক্ষ বর্গ মাইল বিস্তৃত সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন, যে দেশ শত শত বৎসর বিজিত জাতিদের দাসত্বে ও দারিদ্র্যের পঙ্কে ডুবিয়ে রেখেছিল এবং তাদের জাতীয় ভাষা সংস্কৃতি সভ্যতা ও প্রতিষ্ঠানগুলির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করতে পশ্চাৎপদ হয়নি, সেই দেশ, সেই সাম্রাজ্য আজ বিভিন্ন রাজ্য ও জাতির আত্মকর্তৃত্ব বা স্বাধীনতা স্বীকার করে তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শক্তি বিকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছে। এজন্য মধ্য এশিয়ায় বোখারার প্রাচীন প্রতিদ্বন্দ্বী সমরকন্দ এক্ষণে উজ্‌বেক সোসালিষ্ট রিপাব্লিকের রাজধানী এবং তার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী টাস্‌কেণ্ট উজবেক শিল্প ও সভ্যতার কেন্দ্রস্থল।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতকে তাদ্‌জিক্‌ নামে ইরাণী জাতিরা ব্যাক্‌ট্রিয়ানা ট্রানস্যাক্সিয়ানা ও সোগ্‌ডিয়ানা নামে কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করে। তারা সমসাময়িক সভ্য জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কয়েকটি রাজপথ এই সকল স্থানের ভিতর দিয়ে ভারতের সহিত চীনের সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এই সকল পথ মনুষ্যদেহে রক্তবাহী শিরার ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের সুবিধা দিয়ে দেশবাসীর ঐশ্বর্য ও শক্তি বৃদ্ধি করত, যুগযুগান্ত ধরে নানা জাতির লোক এই পথে গমনাগমন করত, সুবিধা পেলে দেশ আক্রমণ করত, পুরাতন নগর ধ্বংস করে দিত ও নূতন নগর স্থাপন করত। মিডিয়ান, পারসিক, আেখড়, গ্রীক, পার্থিয়ান, হুণ, তুর্কোমান, চীনা, আরব, মোগল ও রুশ দলে দলে এক সময় না এক সময় এই সকল পথ দিয়ে

আসত। কখনও বা তারা স্থানীয় অধিবাসীদের সহিত মিশে যেত, আবার কখনও বা তারা পৃথকভাবে নিজ নিজ সত্তা রক্ষা করে চলত।

আলেকজাণ্ডার এই স্থানে অভিযান চালিয়েছিলেন, কয়েকটি নগরও স্থাপন করেছিলেন। সেখানে চৌদ্দ হাজার গ্রীক বাস করত। কালক্রমে তারা ব্যাকৃট্রিয়ানদের সঙ্গে মিশে গিয়ে দেশের সভ্যতার উপর ছাপ রেখে গেল। ৭ম ও ৮ম শতকে আরবরা সেখানে আসে এবং মাভের নামে একটি ঐশ্বর্যশালী রাজ্য স্থাপন করে। ধর্মপ্রচারের উন্মাদনায় তারা পারসিক ধর্ম বৌদ্ধধর্ম মেজদা ধর্ম নেষ্টোরিয়ান খ্রীষ্টান ধর্মের উচ্ছেদ সাধন করে। পরে গ্রীকদের মতো তারাও স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। তারপর কারলুকগণ দশম শতকে শক্তিশালী হয়ে উঠে কিন্তু তারাও প্রাচীন অধিবাসীদের মধ্যে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে ফেলে। এখানে জেঙ্গিস্ খাঁ ও তাইমুর অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। মঙ্গোলিয়া থেকে সিরিয়া পর্যন্ত তাইমুরের বিশাল সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষ ও রাশিয়া অন্তর্গত হয়েছিল। সমরকন্দ ও অন্যত্র বহু সুন্দর ও বিরাট সৌধ তাঁর স্মৃতি বহন করেছে সত্য কিন্তু এই সকল সৌধ অগণিত অনামীদের শোণিতস্রোতের উপর নির্মিত হয়েছিল।

সপ্তদশ শতকে যাযাবর উজবেকৃদের নিয়ে শেইহারি খান্ এই স্থান অধিকার করেন। উজ্‌বেকগণ মধ্যএশিয়ায় বাস স্থাপন করল এবং বোখারা তাদের রাজধানী হল। প্রাচীন মাভেরননাজের নগর অন্তর্হিত হল, বোখারায় উজবেকদের খান্ রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হল। খিভ্ কোকন্দ প্রভৃতি স্থানেও খান্ রাজ্য স্থাপিত হল।

যে তাদ্‌জিকগণ ইতিপূর্বে অন্যান্য বিজেতাদের আত্মস্থ করে নিয়েছিল তারা এক্ষণে সংখ্যাবহুল তুর্কো-মোগলদের কুক্ষিগত হয়ে গেল। নূতন প্রভাব জাতীয় জীবনে ও সভ্যতায় অভিনব পরিবর্তন এনে দিল। উজবেকগণ নগর ও জলসেচনের ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছিল। তুর্কো-মোগল অভিযানের নিষ্ঠুরতায় ভীত হয়ে তাদ্‌জিকগণ বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্বতে আত্মগোপন করল। উজবেকগণ উর্বর সমতল ভূমি অধিকার করে নিল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে তাদ্‌জিকদের সংস্কৃতি ধর্ম আচার ব্যবহার, এমন কি বোখারার খান্ রাজ্যে ও উজবেকদের পরিশীলিত সমাজে তাদ্‌জিকভাষা জীবন্ত রয়ে গেল।

এইভাবে সপ্তদশ শতকে মধ্যএশিয়ায় উজ্‌বেক খান্ ধর্মতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল। নসিরুল্লা খান্ খান্‌দের অন্যতম। কোকন্দ খিভের খান্‌গণ এই অঞ্চলের

বিজিত ও পদানত জাতিদের উপর অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতায় নসিরুল্লার সমধর্মী।

নসিরুল্লা খান্-এর রাজত্বকালে রাশিয়া যেরূপ নির্বিবেক অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার সহিত কোকন্দ বোখারা এবং খিভ্ নামে মধ্য এশিয়ার তিনটি মুসলমান খান্ রাজ্য এবং অর্ধ যাযাবর খিরগিজ তুর্কোমান ও উজবেক জাতিগুলিকে কবলিত করে, তার কলঙ্ক-কাহিনী জার সাম্রাজ্যবাদের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম পিটার মধ্যএশিয়ায় প্রাধান্য স্থাপনের দুরভিসন্ধির বশবর্তী হয়ে তথাকার মুসলিম রাজ্যগুলির পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে পক্ষ গ্রহণ করতে থাকেন। এর ফল ভাল হয়নি দেখে পরবর্তী জারগণ উত্তরে সাইবেরিয়া এবং ইউরল এবং পশ্চিমে কাস্পিয়ন অঞ্চল থেকে ধীরে ধীরে সতর্ক পদবিক্ষেপে অগ্রসর হতে থাকেন এবং এই সকল "অর্ধসভ্য যাযাবর বেদুইন ধর্মাবলম্বী এশিয়াবাসীদের নৈরাজ্য" অবস্থা উচ্ছেদ করে তাদের মধ্যে "সভ্যতার আলো" বিস্তারের মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

প্রথমে খিরগীজগণ পরাভূত হল। কয়েক বৎসর পরে জার সৈন্যসহ সির-দরিয়ার তীরে উপস্থিত হলেন। তারপর খান্ রাজ্যগুলি অধিকৃত হতে লাগল। ১৮৬০-৭০ সালের মধ্যে কোকন্দ আক্রান্ত হল। এর দুটি প্রধান স্থান, তুর্কীস্তান ও টাস্কেন্ট অধিকার করে নেওয়া হল। এই বিষয়ে ইংল্যাণ্ড রাশিয়ার গুরুস্থানীয়। যুদ্ধে জয়ী হয়েও সাম্রাজ্যবাদী ইংল্যাণ্ড পররাজ্য অধিকারের আড়ম্বর ত্যাগ করে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যাতে বিজিত দেশ নিঃশব্দে তার কবলে এসে পড়ে। উপায়ন্তর না দেখে কোকন্দের খান্ নিজেকে রাশিয়ার কাছে দাসত্বে বিক্রয় করলেন। প্রজারা রাশিয়ার অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ১৮৭৩-৭৪ সালে বিদ্রোহ করে। পর বৎসর খান্-এর দুইপুত্র প্রজাদের সংগে যোগ দিয়ে বিদ্রোহী হয়। জারের সৈন্য বিদ্রোহ দমন করল এবং কোকন্দ রোমানভ্ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল।

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বোখারার আমীর জারের অধীনে সামন্তরাজ হয়ে গেলেন। ১৮৭৩ সালে খিভের খান্ও জারের অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন। ইত্যবসরে জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার টাস্কেণ্টে তুর্কীস্তানের শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেন। সম্রাটের স্থলাভিষিক্ত একজন শাসনকর্তা নিযুক্ত হল। সম্রাট-প্রতিনিধির জাঁকজমকশীলতা ও আড়ম্বর দরিদ্র দেশবাসীর মনে প্রকৃত সম্রাটের শক্তি ও বিরাটত্বের কুহেলিকা সৃষ্টি করে তাদের ক্ষুদ্রতা ও দুর্বলতার

কথা স্মরণ করিয়ে দিল। একশত পঞ্চাশ বৎসর পরে মধ্য এশিয়া রোমানভদের পদতলে লুটিয়ে পড়ল।

আলজিরিয়ার ফরাসীদের মতো রাশিয়ানগণ দেশবাসীদের পৃথক রেখে দিল এবং তাদের চিরন্তন জীবনধারণ প্রণালীর উপর হস্তক্ষেপ করল না। অনুন্নত জাতিদের মধ্যে সভ্যতা প্রচারের মহান্ আদর্শ স্থানীয় শাসকদের সাহায্যে অর্থশোষণের ব্যবস্থায় পর্যবসিত হল। বোখারা ও খিভ্ থেকে কাঁচা মাল বিশেষতঃ তুলা পুরাদমে রাশিয়ায় চালান যেত লাগল, দেশের বস্ত্রশিল্প বন্ধ করে দেওয়া হল। রাশিয়ার বণিকরা দরিদ্র কৃষাণদের উচ্চহার সুদে টাকা ধার দিয়ে তুলা চাষ করিয়ে নিল। তারা ঋণভারে পিষ্ট হতে লাগল। বোখারায় কৃষকগণ কারখানার কৃষকদের মতো অগত্যা দস্যুবৃত্তি গ্রহণ করল। কাজাক খিরগিজ্ এবং তুর্কোমান জাতিদের পশুচারণভূমি রাশিয়ানদের উপনিবেশে পর্যবসিত হল। তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায় অন্তর্হিত হল। তারা পূর্বাঞ্চলের উষর ভূমির দিকে কোণঠেশা হয়ে মৃত্যুবরণ করে নিল।

যুগ যুগ ধরে জার ও আমীরদের আমলে দেশের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হয়েছিল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের বিপ্লব সামন্তরাজতন্ত্র উচ্ছেদ করল। বলশেভিক বিপ্লবের (অক্টোবর) ফলস্বরূপ মধ্য এশিয়ার কৃষকগণ ১৯১৭ সালে টাস্কেন্টে, ১৯১৯ সালে খিভে, ১৯২০ সালে বোখারায় সোভিয়েট শাসনপদ্ধতি প্রবর্তন করে তাদের জাতীয় জীবনের দুঃখ দারিদ্র্যময় অবস্থার উপর যবনিকা টেনে দিল।

লেনিন বলেছেন, মনুষ্যজাতিকে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত করে জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সোস্যালিজম্ বা সাম্যবাদের উদ্দেশ্য নয়। এর উদ্দেশ্য বিভিন্ন জাতিকে পরস্পরের সান্নিধ্যে এনে তাদের এক সাধারণ সত্তায় উদ্বুদ্ধ করা, এর উদ্দেশ্য সমস্ত উপদ্রুত ও অত্যাচারিত জাতিদের পূর্ণ-স্বাধীনতা দান করা, অর্থাৎ তাদেব পৃথক্ জাতি হিসাবে অবস্থান করার স্বাধীনতা স্বীকার করা।

স্বাধীনতার মায়াকাঠিস্পর্শে জাতির চৈতন্য কি ভাবে জাগ্রত হয় তা তাদ্‌জিকদের গল্প কাহিনী নাটক ছড়া ও সাহিত্যের ভিতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়েছে—আমীরদের আমলে তাদ্‌জিক উজ্‌বেক খিরগিজ তুর্কোমান প্রভৃতি কবিদের গানে, কৃষক মেষপালক ও স্ত্রীলোকদের ছড়ায় ও গীতিকায় অভিব্যক্ত হয়েছে। বেদনাবিধুর পরাধীন হৃদয়ের দুঃখময় অবস্থা পামীরের বরফ নদীয়

মতো, উচ্চ মালভূমির কঙ্করময় রুক্ষতার অপরিবর্তনীয় দৃশ্যের মতো তাদের জীবন নিস্তরঙ্গ ও বৈচিত্র্যহীন ছিল। তাদ্‌জিক কবি আইনি বলেছেন, আল্লাহ্ ও তাঁর বার্তাবহ মহাপুরুষদের কৃপায় জাতির মুক্তি হয় নি। জাতির মুক্তি এসেছে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত সমাজতন্ত্রীদের নেতৃত্বে ও সাধনায়। বঞ্চিত ও নির্যাতিত তাদ্‌জিক শ্রমিকদের বিপ্লব যে মুক্তির অভাবনীয় বার্তা বহন করে এনেছে তা নানা ভাষায় কাব্যে ও ছড়ায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তাদের কাব্য ও সাহিত্য লেনিনের জীবনচরিতকে আশ্রয় করে বিকশিত হয়েছে। এই মহাপুরুষের চরিত্র-মহিমা জনসমাজের হৃদয়কে সম্পূর্ণরূপে অধিকার করে কাব্যের শতদলরূপে ফুটে উঠেছে। তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার নূতন জাতির উদ্ধারকর্তারূপে কল্পিত হয়েছেন। সুদূর বাকু তৈলখনির শ্রমিক, ইউক্রেনের কৃষক, আর্কএঞ্জেলের ধীবর, সাইবেরিয়ার যাযাবর, ককেশাসের পর্বত আরোহণকারী, মধ্য এশিয়ার মেষপালক লেনিনের গৌরবকীর্তনে শতমুখ।

ভারতবর্ষ। প্রথম মহাসমরের সময় একদিকে ইয়োরোপে ব্রিটিশ রাজনীতিকগণ ও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট উইলসন পরাধীন জাতিদের আত্ম-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতাদানের কথা ঘোষণা করেন, অন্যদিকে ভারতবর্ষে ইস্‌লিংটন কমিশন ব্রিটিশের চির-প্রভুত্ব ও ভারতবাসীর চির-অধীনতার ব্যবস্থা করেছিলেন। আমলাতন্ত্রের প্রতিকূল আচরণ ভারতবর্ষে অসন্তোষ সৃষ্টি করল। লোকমান্য তিলক ও মিসেস্ বেসান্টের 'হোমরুল' আন্দোলন দেশময় ছড়িয়ে পড়ছে দেখে বেসান্টকে অন্তরীণ করা হল। এই সময় মহাসমরের সঙ্কটপূর্ণ অবস্থা। রাশিয়ায় বিপ্লব হয়ে গেছে। সেখান থেকে সাহায্য পাওয়ার কোন আশা ছিল না। তবে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দিয়েছিল। জার্মেনির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হলে ভারতবর্ষের ধনবল ও জনবল একত্রে আবশ্যক দেখে ১৯১৭ সালে ২০শে আগষ্ট তারিখে মণ্টেগু ঘোষণা করলেন, শাসনব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে ভারতবাসীদের সহযোগিতা করবার সুযোগ দেওয়া হবে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে ভারতবর্ষকে ক্রমে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দান করা হবে। বেসেণ্ট ও তাঁর দুইজন সঙ্গীকে মুক্তিদান করা হল।

ভারত রক্ষা আইন যুদ্ধকালের জন্যই রচিত হয়েছিল। এই আইন বলে ষোল শত ভারতবাসীকে অন্তরীণ করা হল। রৌলট কমিটি তাঁদের রিপোর্টে এই আইনকে স্থায়ী করার নির্দেশ দিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর

রাষ্ট্রীয় আশা আকাঙ্ক্ষা দমন করা। কংগ্রেস বললেন মণ্টেগু-প্রস্তাবিত শাসন-সংস্কার নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও অনাবশ্যক। ভারতবর্ষকে অন্যতম প্রগতিশীল রাষ্ট্র বলে স্বীকার করতে এবং তার প্রতি আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতি প্রয়োগ করতে অনুরোধ করা হল। ১৯১৮ সালের ১১ই ডিসেম্বর মিত্রশক্তি ও শত্রুপক্ষের মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয় এবং শান্তি সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব হয়। যুদ্ধের সময় ভারতবর্ষ ধন জন ও সম্পদ দিয়ে ব্রিটেনকে সাহায্য করেছিল। পনের লক্ষ ভারতবাসী মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধ করেছিল এবং এক লক্ষের উপর প্রাণ দিয়েছিল। নগদে ও জিনিষপত্রে ভারতবাসী হাজার কোটি টাকার উপর ব্রিটেনকে দিয়েছিল। তা ছাড়া প্রাচ্যে শান্তিরক্ষার জন্য যত খরচ হয় তার একটা মোটা অংশ ভারত সরকার দিয়েছিলেন। কিন্তু শান্তি সম্মেলনে ভারতের জনগণের প্রতিনিধির পরিবর্তে ভারত সরকারের নির্বাচিত প্রতিনিধি সত্যেন্দ্র প্রসন্ন সিংহকে পাঠান হল।

বিজয়ী মিত্রশক্তি বিজিত জার্মেনি ও ইটালির প্রতি অবিচার করেছিল। এজন্য তারা ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ইয়োরোপের 'রুগ্ন মানুষ' তুরস্ককে ইয়োরোপ থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টার জন্য ভারতীয় মুসলমানগণ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। যুদ্ধের সময় নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অত্যধিক মূল্য বৃদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের লোকের দুঃখকষ্টের অবধি ছিল না। এর উপর বর্ধিত করভার তাদের জীবনকে একেবারে দুর্বিসহ করে তুলল। ঠিক এই সময়ে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাব দেবতার আশীর্বাদের মতো প্রতীয়মান হয়েছিল।

দক্ষিণ-আফ্রিকায় তিনি কুড়ি বছর সত্যাগ্রহ ও নিরুপদ্রব আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যা সমাধানে তিনি কতকটা সফল হন। ১৯১৬ সাল থেকে প্রতি বৎসর তিনি কংগ্রেসে উপস্থিত থাকতেন এবং প্রবাসী ভারতীয়দের সমস্যা সম্বন্ধে নেতৃবর্গকে পরামর্শ দিতেন। ১৯১৭ সালে তিনি চম্পারণ জেলায় কৃষকদের উপর নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে তাদের অত্যাচার নিবারণ করেন। পর বৎসর তিনি সত্যাগ্রহ আন্দোলন করে গুজরাটের খেড়া জেলার প্রজাদের খাজনা মুকুব করার ব্যবস্থা করতে সরকারকে বাধ্য করেন। তারপর প্রায়োপবেশন করে আমেদাবাদের কল-মালিকদের কাছে কলমজুরদের নায্য দাবি-দাওয়া আদায় করেন। বিপ্লবীদের দমন করার অজুহাতে ভারতময় প্রতিবাদ সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে রৌলট আইন পাশ করে সরকার ভারতবাসীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক

আন্দোলন করার অধিকার খর্ব করে দেন। গান্ধীজী বোম্বাইয়ে সত্যাগ্রহ সভা গঠন করে, সত্যাগ্রহের সূচনা স্বরূপ সর্বত্র হরতাল প্রতিপালনের আবেদন জানান। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবাসী তাঁর ডাক শুনল। দিল্লীতে জনতার উপর গুলি চালনা হল। পঞ্জাবের অধিবাসীগণ হরতাল প্রতিপালন করল। ডাঃ সত্যপাল ও ডাঃ সফিউদ্দিন কিচলুকে গ্রেপ্তার করার জন্য অমৃতসহরে হরতাল হয়। জনগণের শোভাযাত্রার উপর পুলিশ দুই বার গুলি বর্ষণ করে। উত্তেজিত জনতা কতকগুলি সরকারি অফিস ও ব্যাঙ্ক পুড়িয়ে দেয় ও ইংরেজদের আক্রমণ করে। কয়েকজন ইংরেজ নিহত হয়। সহরে সৈন্য মোতায়েন হল। শান্তিরক্ষার ভার জেনেরেল ডায়ারের উপর ন্যস্ত হল। সভাসমিতি বন্ধ করে এক বিজ্ঞপ্তি ঘোষণা হয়। এ বিষয় সাধারণে যথাসময়ে জানতে পারেনি। অন্ততঃ দশ হাজার হিন্দু মুসলমান ও শিখ জালিয়ানওয়ালা বাগে সমবেত হয়েছিল।

জেনারেল ডায়ার সৈন্য ও কামান বন্দুক নিয়ে সভাস্থলে উপনীত হয়ে নিরস্ত্র ও শান্ত জনতাকে গুলি করতে আদেশ দিলেন। জালিয়ানওয়ালা বাগের একটি মাত্র ফটক, চারদিকে বড় বড় বাড়ি। রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। প্রায় হাজার জন নিহত হল। গুরুতর রূপে আহতদের সংখ্যা প্রায় দেড় হাজার ছিল। হতাহতের তত্ত্বাবধানের কোন ব্যবস্থা না করে ডায়ার বিজয়ী বীরের মতো ছাউনিতে চলে গেলেন।

পঞ্জাবের অন্যত্র দাঙ্গা-হাঙ্গামা হল। ধরপাকড় চলতে লাগল। লালা হরকিষণ ও রামভুজ দত্তচৌধুরী নির্বাসিত হলেন। কয়েকটি জেলায় সামরিক আইন জারি হল। সার শঙ্করণ নায়ার শাসন পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন। বাইরের কোন নেতাকে পঞ্জাবে প্রবেশ করতে দেওয়া হল না। সি, এফ. এণ্ড্রুজ পঞ্জাবে প্রবেশ করায় গ্রেপ্তার হন। মদনমোহন মালবীয় পঞ্জাব গমনের চেষ্টায় ব্যর্থকাম হলেন। সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল। নেতাদের নির্বাসন, ছাত্র ও শিক্ষকদের কারাগারে প্রেরণ, রাস্তায় লোকজনদের হামাগুড়ি দিতে বাধ্য করা, জনগণকে বেত্র প্রহার, ছোট ছেলেদের দিয়ে ব্রিটিশ কর্তাকে অভিবাদন করান, হাতে শিকল ও কোমরে দড়ি বেঁধে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোকদের দাঁড় করিয়ে রাখা ইত্যাদি নানা প্রকারের অত্যাচার চলতে লাগল। রবীন্দ্রনাথ অপমানের প্রতিবাদ স্বরূপ 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করলেন। দিল্লী যাওয়ার পথে মহাত্মা

গান্ধীকে গ্রেপ্তার করা হল। ভারতবর্ষে এইরূপ প্রবল বিক্ষোভের মধ্যে ১৯১৯ সালে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কার আইন বিধিবদ্ধ হল। এই শাসন-সংস্কারের নাম ডায়ার্কি। শাসন বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ অংশ সরকার নিজের হাতে রাখলেন। এর নাম সংরক্ষিত অংশ। অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ অংশ নির্বাচিত সদস্যদের মধ্য থেকে নিযুক্ত মন্ত্রীদের হাতে ছিল। এর নাম হস্তান্তরিত অংশ। পৃথক নির্বাচন প্রথা আরও ব্যাপক হল। হিন্দু মুসলমান শিখ ইয়োরোপীয় ফিরিঙ্গি ও ভারতীয় খৃষ্টানরা পৃথক নির্বাচনের অধিকার লাভ করেন। জমিদার বিশ্ববিদ্যালয় বণিক-সভা প্রভৃতি নিয়ে বিশেষ নির্বাচক মণ্ডলী গঠিত হল। রাজবন্দী ও দণ্ডিত ব্যক্তিদের মুক্তি দেওয়া হল।

১৯২৩ সালে কংগ্রেস মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষে একটি নূতন যুগের অবতারণা হল। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ নিরস্ত্র পরাধীন জাতির শ্রেষ্ঠ উপায়। সত্যাগ্রহের মূল কথা অহিংসা ও প্রেম। শত্রুর কার্যের প্রতিরোধ করতে গিয়ে যত রকমের দুঃখ আসুক না কেন সবই সহ্য করতে হবে। তার প্রতি কার্যে বাক্যে ও চিন্তায় হিংসা করা চলবে না, বরং তাকে আত্মীয় জ্ঞানে ভালবাসতে হবে। হিংসার চেয়ে অহিংসা বড়। দণ্ডের চেয়ে ক্ষমা অধিকতর পুরুষোচিত। ক্ষমা বীরের ভূষণ। হিংসা পশুর ধর্ম। অহিংসা সাধুদের ধর্ম। অহিংসা শুধু সাধুদের পালনীয় নয়, সাধারণ লোকও অহিংস হতে পারে।

তিনি বলেছিলেন, যে-সব ঋষি হিংসার প্রাবল্যের ভিতর অহিংসার সন্ধান পেয়েছিলেন তাঁরা নিউটনের চেয়ে বড় আবিষ্কর্তা, তাঁরা ওয়েলিংটনের চেয়ে বড় যোদ্ধা। * * আমি সুতরাং ভারতবর্ষ দুর্বল বলে তাকে অহিংস-নীতি গ্রহণ করতে বলি না। তার শক্তি সামর্থ্যের বিষয় জেনেই আমি তাকে অহিংস-নীতি গ্রহণ করতে বলি। আমি চাই যে, ভারতবর্ষ জানুক—তার আত্মা অমর, দৈহিক দুর্বলতা-সত্ত্বেও সে চিরজয়ী।

মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ ও কর্ম-প্রণালী অভিনব। অনেকে তাঁর পন্থা গ্রহণে দ্বিধা প্রকাশ করলেন কিন্তু জনমত এর বিশেষ পক্ষপাতী হয়ে উঠল। স্বদেশী যুগে বাঙ্গালীরাও আত্মশক্তির উপর নির্ভর করার নীতি গ্রহণ করেছিল। এক্ষণে ভারতবাসীর রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষা যে স্বরাজ তা অসহযোগের উদ্দেশ্য বলে পরিগণিত হল। অত্যাচার অনাচার দূর করার একমাত্র উপায় স্বরাজ লাভ। এই কথা ভারতবাসী ভাবতে শিক্ষা করল।

সমগ্র জাতি একটি নূতন আদর্শ ও পথের সন্ধান পেল। আসমুদ্র হিমাচল ভারতের সকল শ্রেণীর ও সকল স্তরের লোকের ভিতর গান্ধীর অহিংস অসহযোগের বার্তা পৌঁছল। উপাধি বর্জন দরবার সরকারী বা আধা সরকারী সর্ববিধ অনুষ্ঠান, স্কুল-কলেজ আদালত, সৈন্য ও কেরাণীর কর্ম বর্জন ও ব্যবস্থা পরিষদে সদস্য পদ প্রার্থীদের নির্বাচন-পত্র প্রত্যাহার প্রভৃতি জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই নীতি প্রযুক্ত হল। বিদেশী দ্রব্য বয়কট করে সর্বসাধারণকে স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হল। মহাত্মা গান্ধী ভারতের সর্বত্র পরিভ্রমণ করে স্বরাজের বার্তা প্রচার করলেন এবং স্বরাজের প্রধান বাধা স্বরূপ হিন্দু-মুসলমান ঐক্য, চরকা গ্রহণ, মাদক দ্রব্য সেবন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন করতে উদ্বুদ্ধ করলেন।

আন্দোলন সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার সাহস ও দুঃখ সহ্য করার শিক্ষা পেল। সরকার অর্ডিন্যান্স জারি করলেন। কলকাতার রাস্তায় খদ্দর ফেরী করার অপরাধে চিত্তরঞ্জনের সহধর্মিণী বাসন্তী দেবী, ভগ্নী উর্মিলা ও সুনীতি দেবী ধৃত হলেন। চিত্তরঞ্জন দাশ, আবুল কালাম আজাদ বীরেন্দ্র শাসমল সুভাষচন্দ্র ও ষোল হাজারের বেশী স্বেচ্ছাসেবক কারারুদ্ধ হলেন। এলাহাবাদে মতিলাল ও জহরলাল, পাঞ্জাবে লাজপৎ রায় প্রভৃতি নেতাগণ ধৃত হলেন। কিন্তু চৌরীচৌরায় হত্যাকাণ্ড ও বোম্বাইয়ের দাঙ্গার সংবাদ পেয়ে মহাত্মা বিচলিত হয়ে পড়েন। আইন অমান্য আন্দোলন প্রচেষ্টাকে একটি "হিমালয় প্রমাণ ভুল" বলে, তা বন্ধ করে দিলেন। আইন-অমান্য স্থগিত রেখে গঠন মূলক কর্ম তালিকা অনুসরণ করতে বললেন। এর নাম 'বারডৌলি প্রস্তাব'। এক কোটি কংগ্রেস সদস্য সংগ্রহ, চরকা প্রচার, জাতীয় বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা, সুরাপান নিবারণ, পঞ্চায়েৎ প্রবর্তন, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা, এই কর্ম পদ্ধতির অন্তর্গত হল।

আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়ায় জন্য দেশে অসন্তুটি সৃষ্টি হল। ব্যক্তিগত আইন-অমান্যের অনুমতি বাদে 'বারডৌলি প্রস্তাব' কংগ্রেস গ্রহণ করলেন। গান্ধীজীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে ভেবে গান্ধীজী ও শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার ধৃত হলেন। গান্ধীর ছয় বৎসর বিনাশ্রম কারাদণ্ড হল। আবার ধর-পাকড়ের হিড়িক পড়ে গেল।

১৯২২ সালে গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন একটি নূতন কর্ম-পদ্ধতি

উপস্থাপিত করলেন। তখন কামাল পাশার নেতৃত্বে তুরস্ক স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিল। সমগ্র এশিয়ার রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে চিত্তরঞ্জন নিখিল এশিয়াটিক ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা ও অহিংস অসহযোগের পরিবর্তে কৌন্সিল প্রবেশ করার প্রস্তাব করেন। পরিবর্ত্তনের বিরোধী একদল সংখ্যাধিক্যের জোরে দেশবন্ধুর প্রস্তাব বাতিল করে দিল। তিনি পদত্যাগ-পত্র দাখিল করে স্বরাজ্য দল নামে এক নূতন দল গঠন করলেন। কারামুক্তির পর মহাত্মা গান্ধী স্বরাজ্যদলকে কংগ্রেসের একটি বিশেষ অঙ্গ বলে স্বীকার করে নিলেন। চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল স্বরাজ্যদলের প্রধান নেতা বলে গৃহীত হলেন। ১৯২৪ সালে চিত্তরঞ্জন তাঁর সমস্ত সম্পত্তি জনসেবার জন্য দান করেছিলেন এবং এই বৎসর তাঁর মৃত্যু জাতির পক্ষে মর্মান্তিক হয়েছিল।

১৯২৩ সালে মিত্রশক্তি তুরস্কের স্বাধীনতা স্বীকার করেন। কামাল সুলতানের এক নিকট আত্মীয়কে খলিফা পদ দান করলেন। খিলাফৎ সমস্যা সমাধানের পর হিন্দু-মুসলমানে বিচ্ছেদ ঘটাবার চেষ্টা চলে। মুলতানে প্রথম হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। পরে বঙ্গে ও পঞ্জাবের দাঙ্গায় উভয় পক্ষের বিস্তর লোকের প্রাণহানি হয়। ১৯২৪ সালে গোপীনাথ সাহা কলকাতার পুলিশ কমিশনার চার্লস্ টেগার্ট ভ্রমে ডে নামে এক ইয়োরোপীয়কে হত্যা করে। এরূপ কার্য অহিংস অসহযোগ নীতির ঘোর বিরোধী এবং দেশকে আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত করার পক্ষে ভীষণ বিঘ্ন বলে গান্ধীজীর প্রস্তাব গৃহীত হল। এদিকে সরকারের দমন নীতি পুরাদমে চলতে লাগল। গান্ধীজী সম্পূর্ণরূপে হিংসা নীতি বর্জনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করলেন এবং স্বরাজ লাভের তিনটি পন্থার উপর জোর দিলেন—চরকা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও অস্পৃশ্যতা বর্জন। হিন্দুদের ভিতর শুদ্ধি ও সংগঠন আন্দোলন প্রবর্তন করে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ বহু বিধর্মীকে হিন্দুধর্মে দীক্ষিত করেন এবং হিন্দুধর্ম বর্জনকারীদের পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়ে আনেন। এজন্য তিনি মুসলমান আততায়ীর হস্তে নিহত হন।

ভারতবাসীদের স্বায়ত্ত শাসনের যোগ্যতা বিচারের জন্য শ্বেতাঙ্গ সদস্য নিয়ে গঠিত সাইমন কমিশন ১৯২৮ সালে ভারতে পদার্পণ করলে সর্বত্র হরতাল হয়। কমিশন লাহোরে পৌঁছলে মদনমোহন মালবীয় ও লালা লাজপৎ রায় বিক্ষোভকারীদের নেতৃত্ব করেন। জনতার উপর

লাঠি চলে, লাজপতের উপর বহুবার লাঠির আঘাত হয়। এর অল্পদিন পরেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

অহিংস আন্দোলনের সময় থেকে জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগ্রত হয়। কৃষক ও শ্রমিকদের ভিতরও এর স্পর্শ লেগেছিল। ভারতের শ্রমিকদের নিয়ে ১৯২১ সালে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রমিক নেতাদের ভিতরও নরমপন্থী ও চরমপন্থী, দুইটি দল দেখা দিল। নরম দল শ্রমিকদের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার উন্নতি করতে চেয়েছিলেন। চরম দলের মতে সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে শ্রমিক সমাজের উন্নতি অসম্ভব। রাশিয়ার কমিউনিষ্ট-তন্ত্র তাঁদের আদর্শ ছিল। ১৯২৯ সালে ব্যাপক খানাতল্লাসী হল। বহু লোক গ্রেপ্তার হল। এর ভিতর যে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আটজন সদস্য ছিলেন তাঁদের ও আরও অনেক বন্দী নিয়ে বিখ্যাত মীরাট মোকদ্দমা রুজু হল। লাহোরের পুলিশ কমিশনার সণ্ডার্স গুলির আঘাতে নিহত হন। ভগৎ সিং, বি, কে, দত্ত, শুকদেব, যতীন্দ্র দাস প্রভৃতিকে হত্যাকারী সন্দেহে গ্রেপ্তার করা হয়। হাজতে ও বিচারালয়ে তাদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা হয়। ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আসামীরা অনশন আরম্ভ করে। যতীন্দ্রনাথ দাস একাদিক্রমে চৌষট্টি দিন অনশনের পর মারা যান। যতীন্দ্রনাথের মৃত্যুতে ভারতবর্ষে ও বিশেষতঃ বাংলা দেশে বিক্ষোভ চরমে উঠে।

বড়লাট লর্ড আরউইন বিবৃতি দিলেন যে ভারত শাসনের আদর্শ ডমিনিয়ন ষ্টেটাস্, এবং ভাবী শাসনতন্ত্রে ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্য ভারতের মধ্যে সংযোগ সাধন করা হবে। ওয়েজউড বেন বললেন, ১৯১৭ সালে ভারত শাসনের যে নীতি অনুসৃত হয়েছিল তা বলবৎ আছে। ভারতবর্ষকে ধাপে ধাপে দায়িত্বপূর্ণ শাসন দেওয়া হবে আর পার্লামেণ্টই এই ধাপ নির্ণয় করবেন। ভারতের জনসাধারণ ও নেতৃবর্গের ভ্রম ঘুচে গেল। কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সভাপতির অভিভাষণে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে ভারতবর্ষে উপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনের মতো কোন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলেই আমরা সত্যকার ক্ষমতা লাভ করব। ভারতে অবস্থিত বিদেশী সৈন্য ও ভারতীয় অর্থব্যবস্থায় বিদেশীর কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে অপসারিত করার জন্য আমাদের সকল শক্তি নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা বা স্বরাজ লাভ ভারতবাসীর লক্ষ্য ও আদর্শ।

আধুনিক সাহিত্য। কলোসাসের বিরাট মূর্তি যেমন ভূমধ্যসাগরে ভাসমান সাইপ্রাস ও রোডস্ দ্বীপ দুটির উপর দু'খানি পা স্থাপন করে তাদের সংযুক্ত করেছিল, রোমান দেবতা জেনাস-এর দৃষ্টি যেমন পেছনে ও সামনে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তেমনি ইংল্যাণ্ডে বার্ণার্ডশ এবং ভারতবর্ষে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সাধনা উনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রহর এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম প্রহরকে আশ্রয় করে সুমধুর ফল প্রসব করেছে। সমসাময়িক ইংল্যাণ্ডের সুসভ্য সমাজ-জীবনের অন্তরালে যে দুর্নীতি ও অনাচার তাকে কীটদষ্ট কুসুমের বাহ্য সৌন্দর্য আপাত মধুর করে তুলেছে, বার্ণার্ডশ তার অসারতা অনবদ্য ভাষায় প্রকাশ করে দেশ-বিদেশের সাহিত্য-সেবীদের আনন্দ বিধান করেছেন। তাঁর নাটকগুলি সমস্যাপ্রধান। তাঁর নায়ক-নায়িকা সকল আধুনিক সমাজের রক্তমাংসের মানুষ। তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী অভিনব। তাঁর ভাষা জ্বালাময়ী। তাঁব হাস্যে করুণার স্নিগ্ধতা নাই, এ যেন বর্শার তীক্ষ্ণ ফলকের ন্যায় মর্মভেদী। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সর্বতোমুখী। কাব্যে সঙ্গীতে গল্পে নাট্যে উপন্যাসে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্ম প্রচেষ্টায় শিক্ষাদান ও প্রচারে রবীন্দ্রনাথের মনীষা ও ব্যক্তিত্ব উত্তুঙ্গ গৌরীশঙ্করের সূর্যকরোজ্জ্বল শুভ্র শিখরের মতো দণ্ডায়মান। তিনি বাংলা দেশের ঋজু ও শীর্ণ জীবন ধারার সহিত বৃহত্তব পৃথিবীর জীবনস্রোতের সংযোগ স্থাপন করেছেন। তিনি বাংলা ভাষা-সরস্বতীর লজ্জা ও জড়তা দুর করে তার মধ্যে সুনিপুণ নৃত্যের গতিবেগ ও শক্তি সঞ্চয় করেছেন এবং বাংলা সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে উপস্থিত করে মর্যাদা দান করেছেন—(ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়)। কবিকুলগুরু রবীন্দ্রনাথ "বর্তমান জগতের চিন্তাবীর ও জ্ঞানী শ্রেষ্ঠদের অন্যতম, বিশ্বমানবের সুদীর্ঘ যাত্রাপথে যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহাদের তিনি অন্যতম।"

সাহিত্য মানুষের মনের প্রতিচ্ছবি। ইংল্যাণ্ডে বুর্জোয়া শক্তির অভ্যুত্থানের সহিত উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল। রাজশক্তির হ্রাস ও বণিক শ্রেণীর আধিপত্যের ফলে এলিজাবেথীয় নাটকশিল্প লুপ্ত হয়। সমাজ-জীবন সাধারণের উন্মুক্ত স্থান ছেড়ে ধনীর গৃহকোণ আশ্রয় করে। সাম্রাজ্য স্থাপনের সূত্রপাতে এবং পিউরিটান প্রভাবে নাগরিকগণ রঙ্গমঞ্চে নাটক উপভোগ করার আনন্দ পরিহার করে শান্তিময় গৃহে আরাম-কেদারায় বসে বৃহৎ আকারের কল্পিত কাহিনী পাঠ করতে লেগেছিল।

মুদ্রাযন্ত্রের বিস্তৃত ব্যবহার এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উপর ঝোঁক পড়ার জন্য কথাসাহিত্য প্রধানতম শিল্পরূপ হয়ে ওঠে। এজন্য বিগত একশত বৎসরের ভিতর সাহিত্যের গতি ভিন্নমুখী হয়েছে। পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা আধুনিক সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। পরিবার ও সমাজের কৃত্রিম বন্ধন ভেঙ্গেচুরে আত্মপ্রসারের চেষ্টা কথাসাহিত্য বা নাকরটে নায়ক-নায়িকাদের চরিত্রে পরিস্ফুট। যারা যুক্তির কষ্টিপাথরে প্রচলিত ধারণাকে যাচাই করে নিতে চায় তাদের মধ্যে এই বিদ্রোহ প্রকাশ পায়।

যারা দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থাকে মেনে আসে তাদের বিশ্বাস যে এইরূপ সমাজ-ব্যবস্থা ঈশ্বরের অভিপ্রেত। একে তারা নির্বিচারে গ্রহণ করে, নিজেদের ব্যক্তিত্ব বলে তাদের কিছুই থাকে না, কল্যাণের পথ খুজে নেওয়ার শক্তি তাদের নাই। বুদ্ধির জড়তা ও সাহসের অভাব দাসত্বের মূলে। মানুষের ভীরুতার উপরই ঐশ্বর্য ও শক্তির সৌধ রচিত। যতদিন পারে মানুষ সহ্য করে দারিদ্র্যের দুঃসহ যন্ত্রণা, সংস্কার ও শাস্ত্রের অনুশাসন। সমাজনীতি বা অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিজেদের ন্যায্য অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সমাজ বা রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষ অনিবার্য। ইবসেনের নোরা শাস্ত্র ও সমাজের অনুশাসন অগ্রাহ্য করে, বিধি ও কর্তব্যের অন্যায় দাবী উপেক্ষা করে নবজীবনের পথে যাত্রা করেছিল। প্রাচীন সাহিত্যের নায়ক ও নায়িকারা সমাজ ও শাস্ত্রের আধিপত্য স্বীকার করে নিয়েছিল। আজন্ম-দুঃখিনী পতিপ্রাণা সীতা ধর্মপ্রাণ স্বামীর নির্বিবেক কার্যের প্রতিবাদ করেন নি। নিজের দুঃখকষ্টকে নিয়তির বিধান বলে মেনে নিয়ে তিনি জন্মজন্মান্তরে শ্রীরামচন্দ্রের মতো স্বামী লাভ করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন।

নূতন সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্য সর্বহারা মানুষের উপর দরদ। প্রাচীন সাহিত্যের নায়ক-নায়িকাগণ অভিজাত বংশের সন্তান অথবা তারা কল্পলোকের অধিবাসী। শেক্সপীয়রের অমর বীণায় ঝংকৃত হয়ে উঠেছিল রাজপুত্র পিতৃভক্ত হ্যামলেটের বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, বৃদ্ধ লীঅরের মর্মন্তুদ হাহাকার। মিল্টন বা হোমারের কবিহৃদয় মন্দ্রিত হয়ে উঠেছিল দিব্যদ্যুতি-সম্পন্ন উদ্ধত শয়তানের স্বর্গচ্যুতির বর্ণনায় অথবা অপরিসীম শক্তির আধার বীর ইউলিসিসের কীর্তি-ঘোষণায়। কালিদাসের মধুস্রাবী কাব্য ছন্দিত হয়ে উঠেছিল অলকাপুরীনিবাসী বিরহী যক্ষের বিলাপগুঞ্জনে, মহাবীর রঘুর দিগ্বিজয়ের কীর্তি-কাহিনীতে অথবা মহারাজ দুষ্মন্ত ও

শকুন্তলার বিরহ প্রেম অভিসারের মাধুর্যে কিন্তু নবযুগের অগ্রদূত সর্বহারাদের মুক্তিপ্রয়াসী মার্কসের কোমল হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠেছিল দরিদ্র মানবতার উপর ঐশ্বর্যের আধিপত্য দর্শনে। টলষ্টয় চিকোভ ডষ্টয়ভিস্কি গোর্কি প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ তাঁদের নিপুণ তুলিকায় চিত্রিত করেছেন মানুষের উপর মানুষের আধিপত্যের কলঙ্ক কালিমালিপ্ত আলেখ্য—সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে দাসত্বের, অর্থনৈতিক জীবনে দারিদ্র্যের ও দৈন্যের মর্মন্তুদ দাবী। ইহকালের দুঃখ দৈন্যেব বেদনাকে ধৈর্যের সহিত সহ্য করার শক্তি দিয়ে এসেছিল পরকালেব যে আশা তার মূল শিথিল হয়ে গেল অসন্তোষের দাবাগ্নি-শিখায়। সংসাবরূপ বিষবৃক্ষের অন্যতম অমৃত ফল কাব্য বা সাহিত্য। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর মানুষ সাহিত্য বা কাব্যরস আস্বাদনের আনন্দে বাস্তবের দুঃখ-বেদনাকে ডুবিয়ে দিতে পারেনি। এই সাহিত্য-মুকুরে প্রতিফলিত হয়েছে বাস্তবের রূঢ়তা, দুঃখদৈন্যভরা নৈবাশ্যময় সংসার-মরুর তীব্র জ্বালা। আধুনিক সাহিত্য মনভুলানোর বস্তু নয়, শ্রান্তিহরা কল্পনার রাজ্য নয়, প্রাণ জুড়ানোর দ্বিতীয় জগৎ নয়। এই সাহিত্য সমস্যা-প্রধান। এর ব্রত পতিত মানুষকে মুক্তির পথ দেখিয়ে দেওয়া। নরওয়ের ইবসেন, ইংল্যাণ্ডের বার্ণার্ডশ ও লরেন্স, রাশিয়ার গোর্কি, বাংলার শরৎচন্দ্র প্রচলিত সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মূর্ত প্রতীক।

সাহিত্যিকের সাধনা প্রধানতঃ মানুষকে নিয়ে, মানুষের সুখদুঃখ বেদনা আনন্দেব প্রকাশে তার সার্থকতা। দেশের প্রাণের সংগে, দেশের মাটির সংগে পরিচয়, দেশের সত্যকার রূপ ও জীবনের সন্ধান, জনগণের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে বাস্তব অভিজ্ঞতা অভিব্যক্ত হয় প্রকৃত সাহিত্যে। তাই আধুনিক যুগের সাহিত্য-লক্ষ্মী অতীন্দ্রিয় জগতের মায়ালোকের সীমা উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের এই চিরপরিচিত চিরপুরাতন পৃথিবীর আলো-আঁধারভরা হাসিকান্নামুখর প্রাঙ্গণে মানুষীর বেশে দাঁড়িয়েছেন। এজন্য আধুনিক সাহিত্যে ফুটে উঠেছে ভিখারিণীর জীবনকাহিনী, কলকারখানার মজুরদের দুর্বিসহ জীবনের আলেখ্য, রিক্সাওয়ালার জীবনের করুণ দৃশ্য সহর থেকে দূরে পল্লীর নিরালা কুঞ্জে দুর্দশাগ্রস্ত কৃষকের অভাব-দারিদ্র্য-রোগপীড়িত জীবনের রুক্ষ কাহিনী—এজন্য আধুনিক কবিতায় কোকিলের সুরের মূর্ছনা, প্রজাপতির পাখার বর্ণবৈচিত্র্য, সদ্যবর্ষাধৌত আকাশের গায়ে রামধনুর রঙের খেলার পরিবর্তে ব্যাঙ্‌ গাঙচিল শকুনির কুশ্রীতা ও কর্কশতা স্থান পেয়েছে।

তবে শুধু বিদ্রোহী সাহিত্য হিসাবে এই সাহিত্য বিশ্বমানবের চিত্ত অধিকার করেনি, রূপ সৃষ্টিতেও স্বধর্মসাধনায় উন্মুখ হয়ে উঠেছে বলে এই সাহিত্য সাহিত্য-রসিক ও কাব্যামোদীর আদরের বস্তু। মানবচিত্তের গভীরে মুহূর্তের জন্য যে বিশ্বাতীত জ্যোতি ফুটে ওঠে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরাট পটভূমির উপর, বার্ণাড শ'-এর তীব্র কশাঘাতের জ্বালায়, গোর্কির নবজীবনের আলেখ্য রচনায়।

মাক্সিম গোর্কি সাহিত্যিকদের উদ্দেশে একটি মূল্যবান সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, সাহিত্যকে যেন আমরা সেবাদাসীর দৃষ্টিতে না দেখি। সাহিত্য কেবল বড়লোকের অবসরের আনন্দ নয়, উত্তেজনা ও বিলাসের বস্তু নয়। প্রকৃত সাহিত্যে থাকবে আনন্দের সঙ্গে কল্যাণ, যে কল্যাণ দীন দরিদ্র হতভাগ্য ও লাঞ্ছিত মানুষের আঙিনা পর্যন্ত প্রসারিত। সে সাহিত্য সেবাদাসীর বৃত্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। প্রকৃত সাহিত্য শ্রেণী-সংগ্রাম অথবা সাম্রাজ্যবাদের মহিমা ঘোষণা করতে ব্যস্ত থাকে না, যুগের বা প্রয়োজনের অথবা শ্রেণীস্বার্থের দাবি নিয়ে কারবার করে না। প্রকৃত সাহিত্য সাময়িক অথবা যুগোচিত সমস্যাকে অতিক্রম করে কিন্তু তাকে অস্বীকার করে না। সাহিত্যের আরম্ভ মানুষের স্বার্থে ও প্রয়োজনে হলেও এর রত্নবেদী মানবাত্মার গভীরতর অন্তর্লোকে। দেশের অনন্যসাধারণ সাহিত্যিক প্রতিভার মূলে সে দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ-সমস্যা রস যোগায় কিন্তু যিনি সাধনা ও তপস্যা বলে সমগ্র জাতীর জীবনকে স্বীকার করেছেন, সৌন্দর্য আনন্দ ও বেদনা সঞ্চার করে জাতীয় জীবনে প্রেরণা সঞ্চার করেছেন, তিনিই প্রকৃত সাহিত্যিক।

দ্বিতীয় মহাসমরের পটভূমি রচনা

(১৯৩০—১৯৩৯)

প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইয়োরোপের অর্থনীতির এমন বিপ্লবকর পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল যে তার তুলনায় ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সের সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা অতি তুচ্ছ বলে মনে হয়। আঠারো শতকের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত সরল ও সহজ ছিল। এর

পরিধি সংকীর্ণ ছিল। আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে একদিকে যেমন দেশ-বিদেশে যাতায়াত, বাণিজ্যিক আমদানি-রপ্তানির সুবিধা প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ স্থাপনের সুযোগ ও সুবিধা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি স্বয়ংসিদ্ধ আত্মনিষ্ঠ রাষ্ট্রের কল্পনা 'ভগবান রাজা ও দেশের সেবা' করার সংকীর্ণ মনোবৃত্তির অভ্যুদয়ে বহু অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক রাষ্ট্রই একান্ত স্বাধীনভাবে তার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করবে, ব্যবসা-বাণিজ্যকে স্বাধীনভাবে পরিচালনা করবে, নিজ ভৌগলিক সীমার ভিতর বৈদেশিকদের গমনাগমন নিয়ন্ত্রণ করবে, শুল্ক-প্রাচীর উত্তোলন করে আমদানি বাণিজ্যের পথ রুদ্ধ করবে, নিজের অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধি করে সমধর্মী প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকবে, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করবে, মিথ্যা ইতিহাস শিক্ষা দিয়ে শূন্যগর্ভ অহংকার ও আত্মম্ভরিতার ইন্ধন যোগাবে এবং অন্য দেশের লোকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে তার অস্তিত্বের চরম সার্থকতা প্রমাণিত করবে, এই ধারণা ইয়োরোপীয় জাতিদের মনে স্থান লাভ করেছিল।

ইয়োরোপের এতগুলি স্বাধীন ও স্ব স্ব প্রধান রাষ্ট্রের ভিতর মিলনের কোন বাঁধন না থাকায় তারা এক একটি মল্লবীরের মতো বাহুবল ও সামরিক শক্তি সঞ্চয় করতে লাগল। ফলে তারা প্রকৃতপক্ষে দরিদ্র হয়ে গেল, অস্ত্রসম্ভার বৃদ্ধির ব্যয় চালানোর জন্য ঋণ করতে লাগল, পরাজিত জাতির উপর ক্ষতি পূরণের বোঝা চাপিয়ে দিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্রশস্ত্র উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করে প্রচুর লাভ করতে লাগল। সমগ্র ইয়োরোপ ঋণজালে জড়িত হয়ে গেল। ইয়োরোপে অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন কোন নেতা ছিল না, কোন বিচক্ষণ রাজনীতিক ছিল না। সংকীর্ণমনা রাজা, অল্পবুদ্ধি রাজনীতিক, শুল্কপ্রাচীর-রক্ষিত আত্মসর্বস্ব ব্যবসায়ী, অসংযতভাষী সংবাদপত্র, রাজানুগৃহীত শিক্ষক, তথাকথিত স্বদেশভক্ত পুঁজিওয়ালা যুক্ত ইয়োরোপ গঠন করতে চায়নি। তারা ইয়োরোপের জনসাধারণের স্বার্থ বিনিময়ে নিজেদের উদরপূর্তি করছিল।

রাশিয়ার পশ্চিমে ইয়োরোপের সকল দেশে অবসাদ ও যুদ্ধ ক্লান্তির সহিত অর্থ-সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, ক্রমে তা পৃথিবীব্যাপী হয়ে পড়ল এবং এজন্য জার্মেনিকে বেশী কষ্ট ভোগ করতে হল। মার্কের দাম বেড়ে গেল, অন্যদিকে আবার কোটি কোটি টাকা ক্ষতিপূরণের দাবি তাকে মেটাতে হল। পণ্য বিনিময়ে ঋণ শোধেও মিত্রপক্ষের আপত্তি ছিল। সুতরাং বিদেশে টাকা ধার করে

জার্মেনিকে বিদেশীর ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে হল। ফলে তার আন্তর্জাতিক ঋণ বেড়ে গেল। ইংল্যাণ্ডেও অর্থসংকটের ধাক্কা লেগেছিল। তার বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রচুর অর্থসম্ভার, বিশ্বব্যাপী ব্যবসা-বাণিজ্য স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি প্রভৃতি দ্বারা ইংল্যাণ্ড কোনরূপে আত্মরক্ষা করল। পৃথিবীর সকল দেশের চেয়ে বড় ধনী হয়েও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারের প্রান্তদেশে এসে উপস্থিত হল। একমাত্র রাশিয়া ব্যক্তিগত মুনাফাকে উপেক্ষা করে সমাজসেবাকেই সমাজ সংগঠনের ভিত্তি বলে গ্রহণ করেছিল।

জার্মেনির বিক্ষোভ ও সঞ্চিত দারিদ্র্যের পটভূমির উপর হিট্‌লারের অভ্যুদয় হল। বেকারসমস্যা সমাধান ও নূতন ধন উৎপাদনের জন্য চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনার উদ্ভব হল। বেকার সমস্যা সমাধানের আশ্বাস এবং ভের্সাই-এর পরে জার্মেনির উপর যে অত্যাচার হয়েছিল তা দুর করার প্রতিজ্ঞা, এই যুগ্ম মনোভাবের ভিতর নাজিবাদের বিকাশ অনিবার্য হয়ে পড়ল। এর ওপর ইহুদীদলনের মনোবৃত্তি হিট্‌লারকে জার্মেনির সর্বময় প্রভু করে তুলল। পিরামিডেলবাও অর্থাৎ মিশরীয় পিরামিডের অর্থনৈতিক সার্থকতা যেমন প্রায় শূন্য তেমনি ধরনের কাজে জার্মেনি হস্তক্ষেপ করল। দ্বিতীয় চতুর্বার্ষিক পরিকল্পনার ফলে যুদ্ধব্যবসা এবং পিরামিডেলবাও প্রভৃতির পরিবর্তে ব্যবহার্য দ্রব্যের ব্যবসার দিকে ঝোঁক পড়ল। যাতে কাঁচামালের জন্য জার্মেনিকে কাহারও মুখাপেক্ষী হতে না হয় তারও ব্যবস্থা চলতে লাগল। নূতন জার্মান অর্থনীতির নাম 'অটার্টি' বা অর্থনৈতিক স্বাতন্ত্র্য। এইভাবে জার্মেনি আবার শক্তিশালী হয়ে উঠল। প্রাক্ হিটলারী যুগে পাপেনের গবর্ণমেণ্টও জার্মেনির অর্থসংকট দূর করতে চেষ্টা করেছিল। সে সাধনায় ফললাভ করে হিট্‌লার জার্মেনির অবস্থার উন্নতি করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯৩০ সাল থেকে পৃথিবীব্যাপী অর্থসংকট আরম্ভ হয়। এর ফলে সকল দেশেই আমদানি রপ্তানির পরিমাণ কমে যায়। যে সকল দেশ থেকে কাঁচামাল রপ্তানি হত তারাই বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। ১৯৩১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ড স্বর্ণমান পরিত্যাগ করে অর্থাৎ নোটের পরিবর্তে নির্দিষ্ট পরিমাণ সোনা দেওয়ার যে নিয়ম এতদিন ধরে চলে এসেছিল তা উঠিয়ে দেওয়া হয়। অন্যান্য দেশ ইংল্যাণ্ডকে অনুসরণ করল। সকল দেশে স্বর্ণবুভুক্ষা উগ্রভাবে দেখা দিল। সোনার দাম বেড়ে গেল।

১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর যখন কামানের শেষ গোলার মর্মভেদী শব্দ মহাসমরের প্রচণ্ড দৃশ্যের উপর যবনিকা টেনে দিয়েছিল তখন সারা বিশ্বের লোক ভেবেছিল যে অতীতের ভুল সাহসের সহিত সংশোধিত হবে, দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচারের অবসান ঘটবে, সকল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি স্বীকৃত হবে, জাতির স্বাধীনতা ও ব্যক্তির নিরাপত্তা বাস্তবে পরিণত হবে এবং শুভবুদ্ধির উদয়ে হিংসা জুগুপ্সা ও যুদ্ধ অরুণোদয়ে অন্ধকারের মতো অন্তর্হিত হবে। উড্রো উইলসন ন্যায় ও গণতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিধানের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সার্থক হতে চলেছে ভেবে স্বাধীন জাতিবর্গের একত্রিক সহযোগিতার আদর্শ-গৌরবে মানুষের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছিল। লর্ড কার্জন লর্ড মহাসভায় উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেছিলেন—বিশ্বের গৌরবময় যুগ নূতনভাবে আরম্ভ হল, সুবর্ণ যুগ দেখা দিল। শুধু মিত্রশক্তিবর্গের মধ্যে নয়, এমন কি বার্লিনের রাজপথে দলে দলে লোক চিৎকার করে বলেছিল—আর যুদ্ধ নয়। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত কোটি কোটি নরনারী বিশ্বাস করেছিল যে মনুষ্যজাতির জীবনে একটি নূতন যুগ ও বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায় আরম্ভ হল। কিন্তু যে উদ্দীপনা ও আশা নূতন ও পুরাতন জগতের জনমন অধিকার করেছিল, বিশ্বমানবের অন্তরের কল্যাণদীপে বিশ্বশান্তির যে আলোকশিখা বিদ্যুতের মতো জ্বলে উঠেছিল তা উইলসনের চোদ্দ দফা বিবৃতি ঘোষণার পর থেকে যুদ্ধ বিরতির সময়ের মধ্যেই ম্লান হয়ে গেল। ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে যারা অনাগত কালের পূর্ণতর জীবন, বৃহত্তর ও নবীনতর সভ্যতা রচনা করার মানস ও উদ্যম নিয়ে প্যারিসে সমবেত হয়েছিল তারা তাদের শাসকগোষ্ঠীর কূটবুদ্ধির গুপ্ত প্ররোচনায় উইলসনের সুনির্দিষ্ট বিধান থেকে দূরে সরে গিয়েছিল।

মুসোলিনীর উত্থান—১৯১৯ সাল থেকে ইটালির আভ্যন্তরীণ অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। দেশের শাসন-ব্যবস্থায় এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রে ইটালি দুঃখদুর্দশার চরম সীমায় উপনীত হয়েছিল। সুযোগ বুঝে মুসোলিনী ইটালির ত্রাণকর্তারূপে অবতীর্ণ হলেন (১৯২২)। লোক অকূলে কূল পেল। তারা তাঁকে জাতির ত্রাণকর্তা হিসাবে বরণ করে নিল। পরবর্তী বাইশ বছর ধরে ইটালি মুসোলিনীর একনায়কত্ব মেনে নিতে বাধ্য হল। জনমতের অস্তিত্ব লোপ পেল, আত্মিক শাসনতন্ত্রের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হল, প্রতিকূল মতাবলম্বীদের হত্যা ও নির্বাসন অবাধে চলতে লাগল।

দাসমনোভাব প্রসূত হৃদয় দৌর্বল্য, অন্তর্দৈন্য ও হীনতার জন্য ইটালির জনসাধারণ ফ্যাসিজমের সর্বনাশা নীতি মেনে নিতে বাধ্য হল।

ডিক্‌টেটরি শাসনের নীতি—ডিক্‌টেটরী শাসন দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে লৌহশৃঙ্খল রচনা করে। তার কঠিন বন্ধনে যখন জাতির নাভিশ্বাস উপস্থিত হওয়ার উপক্রম হয় তখন পরিত্রাণ কামনা স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় ডিক্‌টেটর দেশের বাহিরে গৌরব অর্জনের পথ খুলে দিয়ে জনমনের রুদ্ধ স্বদেশ প্রেম প্রকাশের কৃত্রিম উপায় অন্বেষণ করতে থাকে। মুসোলিনীও সেই পথ অবলম্বন করলেন। তিনি ইটালির তরুণ মনে সিজারের লুপ্ত রোমান সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করাব উদগ্র কামনা জাগিয়ে তুললেন। ভূমধ্যসাগরেব তীরবর্তী দেশসমূহে, বিশেষতঃ গ্রীসে, উত্তর আফ্রিকায় ও মিশবে রোমান সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা তাঁর মনে স্থান পেয়েছিল। স্পেনের প্রাইমো ডি রাইভেরা ফ্যাসিজমেব সন্তান। পরে ফ্রাঙ্কো মুসোলিনীর মন্ত্রশিষ্য হয়ে গৌরবান্বিত বোধ করলেন। ইয়োরোপের পূর্বাংশের ছোট ছোট দেশগুলি ফ্যাসিবাদ গ্রহণ করল। অনুন্নত ও দুর্বল আবিসিনিয়াকে বিষবাষ্প সাহায্যে অন্যায়ভাবে অধিকার করে মুসোলিনী ইটালির জনসাধারণকে তাক লাগিয়ে দিলেন। আবিসিনীয়ার সম্রাট বিতাড়িত হলেন। তিনি ইয়োরোপের সুসভ্য জাতিদের সাহায্য প্রার্থনা করে দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন। কেউ তাঁর কথায় কর্ণপাত করল না। স্বাধীনতার উপাসক আমেরিকা ইথিওপিয়ার দুঃখে সমবেদনা জ্ঞাপন করে নিষ্ক্রিয় থাকল। দরদী গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্স প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা বরং হোর-ল্যাভেল চুক্তি দ্বারা মুসোলিনীকে সন্তুষ্ট করল। মার্কিন রাজদূত মুসোলিনীকে সভ্য জগতের নূতন গৌরবময় যুগের অগ্রদূত বলে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করলেন।

হিটলারের অভ্যুদয়—১৯২৯ সালে জার্মেনিতে ন্যাশনাল সোস্যালিজম্ মতবাদ স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৩৩ সালের ৩০শে জানুয়ারী হের হিট্‌লারের চ্যান্সলার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের রাজনৈতিক আকাশে একটি প্রথম শ্রেণীর উল্কার অভ্যুদয় হল!

জার্মেনির দুঃখদুর্দশা ভের্সাই সন্ধির কুফল, জার্মেনির ধ্বংস ও জার্মান জাতির দাসত্ব গ্রেট ব্রিটেন ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের একমাত্র কামনা, নাজিদলের প্রধান পুরোহিত এবং নাজিজমের উদ্‌গাতা হিট্‌লারই জার্মান জাতিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে স্থাপন করতে সক্ষম, এই ধারণা ও বিশ্বাস জার্মান জাতির মনে

বদ্ধমূল হয়ে গেল। কিন্তু এরই সঙ্গে সঙ্গে যে জার্মান রিপাব্লিকের অস্তিত্ব লোপ পেল, তা কেউ লক্ষ্য করল না। যথা সময়ে হিট্‌লারের প্রতিরোধ করতে না পারলে তিনি যে জার্মান জাতির স্বাভাবিক শক্তিমত্তা সমর নিপুণতা ও প্রতিভার সুযোগ নিয়ে ধূমকেতুর মতো বিশ্বসভ্যতা ও বিশ্ব শান্তির ব্যাঘাত জন্মাবেন, অতি অল্প লোকই এই ধারণা করতে পেরেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিম ইয়োরোপের জাতিগণ হিট্‌লারীয় নীতিকে সাম্যবাদের প্রতিষেধক-রূপে আনন্দের সহিত বরণ করে নিল, যাজক সম্প্রদায় হিট্‌লারের প্রশংসায় শতমুখ হল।

শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার ছয় মাসের মধ্যেই হিট্‌লার শ্রমিক-সংঘের অস্তিত্ব লোপ করে দিলেন, ইহুদীদের উপর উৎকট ও অমানুষিক নির্যাতন আরম্ভ করলেন, ব্যক্তি-স্বাধীনতা, এমন কি, ধর্ম বিষয়ে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লুপ্ত হয়ে গেল, ধীরে ধীরে জার্মান জাতি দাসত্বে আত্মবিক্রয় করে দিল, এবং হিট্‌লারের একান্ত অনুরক্ত অন্ধ স্তাবক হয়ে উঠল। কিন্তু তখনও পাশ্চাত্য জাতিদের চক্ষু খোলেনি। তারপর হিট্‌লার লীগ থেকে সরে দাঁড়ালেন। তখনও কেউ তা লক্ষ্য করল না। ইটালি ও জার্মেনির তরুণ দল বুঝে নিল যে লীগ অকর্মণ্য ও দুর্বল হয়ে গেছে।

বৃহত্তর জার্মেনি গঠনের পরিকল্পনা—সোভিয়েট ইউনিয়নের শক্তির প্রতিরোধ করে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে হিট্‌লার পোল্যাণ্ডের মার্শাল পিল্‌সুডিস্কি গবর্ণমেণ্টের সহিত দশ বছরের জন্য নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করলেন। ভোট সংখ্যার জোরে সারা প্রদেশ জার্মেনির অন্তর্ভুক্ত হল (১৯৩৫) এবং রাইনল্যাণ্ড অধিকৃত হল (১৯৩৬)। তখনও ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেন নির্লিপ্ত দ্রষ্টার মতো দাঁড়িয়ে রইল। পূর্ব-আফ্রিকা এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী স্থানে ইটালীর রাজ্যবিস্তৃতিতে হিট্‌লার সাহায্য করবেন এবং অষ্ট্রিয়ায় হিট্‌লারের প্রাধান্য স্থাপনে মুসোলিনী সাহায্য করবেন, এই চুক্তিতে ১৯৩৭ সালে রোম-বার্লিন অক্ষশক্তি গঠিত হল।

এইভাবে হিট্‌লার মেইন কেম্প পুস্তকে বহু প্রচারিত আদর্শ সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হতে লাগলেন। জার্মেনির প্রচার-বিভাগ ঘোষণা করল, লোকসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য জার্মেনিতে বাসস্থানের সংকুলান হচ্ছে না; এজন্য প্রথম মহাযুদ্ধে জার্মেনির হস্তচ্যুত উপনিবেশগুলি ফিরে পেলে সে সন্তুষ্ট হয়ে অন্যান্য জাতির সহিত সখ্যতা ও সহযোগিতা করবে।

তখন কেউ বুঝতে পারেনি যে একটির পর একটি দাবি মিটিয়ে দিলেও হিটলার সন্তুষ্ট হলেন না। শান্তির পথে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব ছিলেন না। তাঁর উচ্চ আকাঙ্ক্ষার অন্ত ছিল না। তিনি জানতেন, তাঁর অভিলাষ সিদ্ধির বিরুদ্ধে কোন শক্তি ক্ষীণ প্রতিবাদ করতেও সমর্থ নয়।

পৃথিবীর সকল স্থানে জার্মেনির প্রভুত্ব স্থাপিত হবে, জার্মান জাতিই সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও বুদ্ধিমান জাতি বলে আদৃত হবে, জার্মেনি বিশ্ব সাম্রাজ্যের অধিশ্বরী হবে, এই সুখ কামনায় তাঁর মন অধীর হয়ে উঠেছিল। তিনি কঠিন বাস্তব ও রূঢ় সত্যকে অগ্রাহ্য করলেন। বিশ্বজয়ের স্বপ্ন সিদ্ধির প্রথম সোপানস্বরূপ তিনি ১৯৩৮ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে অষ্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে তাকে জার্মেনির অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন।

মিউনিক চুক্তি—হিট্‌লারকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ ও ফরাসি গবর্নমেণ্টের চাপে জেকোশ্লোভেকিয়া জার্মান অধ্যুসিত অংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। কিন্তু আগুনে ঘি যতই ঢালা হয়, আগুন ততই বাড়তে থাকে। ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেনের মধ্যস্থতায় মিউনিক চুক্তি অনুসারে হিট্‌লারকে সুদেতানল্যাণ্ড অর্পণ করা হল। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স উভয়েই ভেবেছিল যে ইয়োরোপে রাশিয়ার প্রভাব বৃদ্ধি হতে দেওয়া অপেক্ষা জার্মেনির কর্তৃত্ব বাঞ্ছনীয়। ব্রিটিশ গবর্নমেণ্ট কিছু সময় পেয়ে সমরোকরণ নির্মাণের কার্যে মন দিল। কিন্তু হিট্‌লার বিদ্যুৎবেগে অগ্রসর হলেন। লিথুয়ানিয়া তাঁকে মেমেল সমর্পণ করতে বাধ্য হল।

মিউনিক চুক্তির অব্যবহিত পূর্বে গ্রেট ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী প্রেসিডেণ্ট বেনিস্ এবং হিট্‌লারের নিকট প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট যে লিপি প্রেরণ করেন তাতে তিনি বলেন—পাশবিক শক্তি প্রয়োগের পরিবর্তে আপোস মীমাংসা দ্বারা শান্তির পথে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা উচিত। শত্রুতা আরম্ভ হলে প্রত্যেক দেশের লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশুর জীবন নির্দয়ভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে। প্রত্যেক দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। সকল জাতিই বিশ্বব্যাপী ধ্বংসের ফল ভোগ করবে। যুদ্ধের পরে শান্তির চেয়ে যুদ্ধের আগে শান্তি শ্রেয়। কিন্তু রুজভেল্টের কথায় হিট্‌লার কান দিলেন না।

১৯৩৪ সাল থেকে জাপানের আক্রমণাত্মক নীতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কর্ণধারদের মনে শঙ্কা উৎপাদন করেছিল। ১৯৩৬ সালে জাপান জার্মেনি ও

ইটালি সোভিয়েট-বিরোধী সন্ধি-সর্তে আবদ্ধ হল। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে জাপান চীনে নূতন পর্যায়ের অভিযান আরম্ভ করে দিল। ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হওয়ায় জাপানের সুযোগ ও সুবিধা উপস্থিত হল।

ফ্রান্স ব্রিটেনকে রাশিয়ার সহিত বন্ধুতা করতে অনিচ্ছুক দেখে হিটলার সোভিয়েটের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণাসত্ত্বেও রাশিয়ার সহিত চুক্তি স্বাক্ষর করে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করলেন এবং ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তিনি পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে সৈন্যচালনা করলেন। ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মেনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। দ্বিতীয় মহাসমরের আগুন জ্বলে উঠল।

দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্ববর্তী সময়ে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ নীতি

স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা ভারতবর্ষের আদর্শ ঘোষিত হওয়ার পর ২৬শে জানুয়ারী 'স্বাধীনতা দিবস' পালন করা হল। যে কোন জাতির মতো ভারতবাসীরও স্বাধীনতা লাভের সম্পূর্ণ অধিকার আছে এবং ভারতবর্ষের আর্থিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধঃপতনের জন্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টই দায়ী, এই প্রতিজ্ঞাপত্র সর্বত্র পাঠ করা হল।

সরকারের দমন কার্য বহুদিন পূর্ব থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। মীরাট মামলায় একজন বাদে সকল আসামী দায়রায় সোপর্দ হল। সুভাষচন্দ্র এগারজন সঙ্গীসহ নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। যতীন্দ্রমোহন, জহরলাল এবং সর্দার বল্লভভাই পেটেল ধৃত ও দণ্ডিত হলেন। লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য উনাশী জন আশ্রমিকসহ সবরমতী আশ্রম থেকে মহাত্মা গান্ধী পদব্রজে দণ্ডী রওনা হলেন। লবণ নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তু। সমুদ্র জলে লবণ প্রচুর পাওয়া যায়। অথচ এই অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক অধিকার থেকে ভারতবাসী দীর্ঘকাল বঞ্চিত ছিল। গান্ধীজীর উদ্দেশ্য সকলেই সহজে বুঝল। বিভিন্ন প্রদেশে সাড়া পড়ে গেল। লবণ আইন ভঙ্গ করে তিনি ধরশনায় লবণের গোলা অধিকার করতে মনস্থ করলেন। তার পূর্বেই

সরকার গান্ধীজীকে গ্রেপ্তার করলেন। একজনের পর একজন নেতা ধৃত ও বন্দী হলেন। সে কি বিপুল উন্মাদনা! কি উৎসাহ! স্বেচ্ছাসেবক ও নারী দলে দলে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হল। জরুরী আইন অনুসারে ১৩১ খানা সংবাদপত্রের নিকট থেকে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা জামিন আদায় হয়েছিল। প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি, ওয়ার্কিং কমিটি বে-আইনী সাব্যস্ত হল। মতিলাল নেহ্রু কারারুদ্ধ হলেন। বহু স্থানে পুলিশের লাঠিবর্ষণ ও গোলাগুলি বর্ষণে শত শত লোক হত ও আহত হল। কর বন্ধ আন্দোলন আরম্ভ হল। গুজরাট, কর্ণাটক এবং বাংলা দেশের কাঁথি ও বিক্রমপুরে হাজার হাজার লোক হাসিমুখে অশেষ দুঃখ বরণ করল। আইন ভঙ্গ করে বহু জনসভা ও শোভাযাত্রা হল। সর্বত্র পুলিশের লাঠিবর্ষণে বহু লোক জখম হল। শ্রীমতী হংস মেহ্তা, পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়, জয়রাম দাস দৌলতরাম ও কমলা নেহেরু প্রভৃতি গ্রেপ্তার হলেন। পেশোয়ারের খাঁ আবদুল গফ্ফর খাঁ ও তাঁর খোদা-ই-খিদমতগার নামে স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী অহিংস মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেন।

মতিলাল তাঁর প্রাসাদতুল্য 'আনন্দ ভবন' কংগ্রেসকে দান করেন। এর নাম হল স্বরাজ ভবন। গান্ধী আরউইন চুক্তি অনুসারে সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রত্যাহৃত হল, সত্যাগ্রহী বন্দীদের মুক্তিদানের ব্যবস্থা হল, নিজ প্রয়োজনে লোক লবণ উৎপাদনের অধিকার লাভ করল, মদের ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানে শান্তিপূর্ণ ধর্ণা-দানও আইনসঙ্গত বলে বিবেচিত হল।

তারপর গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হল। সরকারের মনোমত লোক বাছাই করে নিয়ে গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন হল। এই সকল লোক নিজ স্বার্থ শ্রেণী বা সম্প্রদায় স্বার্থ ছাড়া জাতীয় স্বার্থের কথা কোন দিন চিন্তাও করেনি। কংগ্রেস তরফ থেকে একমাত্র গান্ধী বৈঠকে যোগদান করেন। ভারতীয় নারী সমাজের মুখপাত্র শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু এবং হিন্দু স্বার্থের উপর লক্ষ্য রাখার জন্য মালবীয়জী বৈঠকে যোগ দেন। কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি, দেশ রক্ষা পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি নানা বিষয় গান্ধীজীর বক্তৃতার বিষয়ীভূত হয়। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই সব বিষয় বিবেচনা করে দেখবেন বলে আশ্বাস দিলেন মাত্র। সুতরাং গোলটেবিলরূপ পর্বত একটি মূষিক প্রসব করল। ভের্সাই সন্ধির মতো এখানেও ইয়োরোপীয় কূটনীতির চরম প্রয়োগ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

গোলটেবিল বৈঠক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দমন-নীতি পুনরায় ব্যাপকভাবে অনুসৃত হল। বাংলা দেশে বিপ্লবী সন্ত্রাসক দল ১৯৩০ সালে তাদের কার্য আরম্ভ করে। চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়। হিজলী বন্দীশালায় গুলিবর্ষণের ফলে দুই জন রাজবন্দী নিহত হয়। সন্ত্রাসবাদ দমনের জন্য একটি অর্ডিন্যান্স জারি হয়। আর একটি অর্ডিন্যান্স জারি করে' কৃষক আন্দোলন ও করবন্ধ প্রচেষ্টা বে-আইনী ঘোষণা করা হল। জবাহর লাল ও সেরওয়ানী ধৃত হন এবং দুই বৎসর ছয় মাস করে তাঁদের কারাদণ্ড হয়। আব্দুল গফ্ফর খাঁ এবং তাঁর ভ্রাতা ডাঃ খাঁ সাহেব কারারুদ্ধ হন এবং খোদা-ই-খিদমতগার বাহিনী বে-আইনী ঘোষিত হয়।

গোলটেবিল বৈঠক থেকে আসার পরেই মহাত্মা গান্ধী কারারুদ্ধ হন। অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেস নেতৃবর্গ একে একে ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, ওয়ার্কিং কমিটি, প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি, জেলা মহকুমা তালুক থানা ও গ্রামের কংগ্রেস কমিটি, জাতীয় বিদ্যালয়, কংগ্রেসের অন্তর্গত সকল প্রতিষ্ঠান বে-আইনী ঘোষিত হল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের গৃহ, কংগ্রেস ফণ্ড ও সমুদয় টাকাকড়ি সরকার হস্তগত করলেন। জরিমানা, পিটুনী পুলিশ ও সৈন্য স্থাপনের ব্যয় প্রজার কাছ থেকে আদায়ের ব্যবস্থা হল। কর বন্ধের প্ররোচনা, প্ররোচক নাবালক হইলে তার পিতা-মাতা বা অভিভাবক শাস্তি পাওয়ার উপযুক্ত বিবেচিত হল। যে কোন লোককে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দায়ী করার ক্ষমতা সরকারের হাতে গেল। সন্ত্রাসবাদ ও সত্যাগ্রহ এ-দুয়ের ভিতর কোন পার্থক্য ছিল না। সাতাশ শত বাঙালী যুবককে অন্তরীণ করা হল। ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনে ত্রিশ হাজার, ১৯৩০—৩১ সালে প্রথম সত্যাগ্রহের সময় নব্বই হাজার ও ১৯৩২—৩৪ সালের মধ্যে দ্বিতীয় বারে প্রায় দুই লক্ষ অহিংস কংগ্রেস-কর্মী কারারুদ্ধ হয়। কারাদণ্ড-ভোগীদের সংখ্যা থেকেই বোঝা যায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন কিরূপ ব্যাপক হয়েছিল। বুলেটিন পুস্তিকা বা রিপোর্ট প্রচার করার জন্য, লবণ আইন ও বন আইন ভঙ্গ, চৌকিদারী ট্যাক্স ও ভূমি কর দান বন্ধ করা ও তার প্ররোচনার অপরাধে বিভিন্ন প্রদেশে হাজার হাজার লোক কারাবরণ করে।

১৯৩২ সালের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আনসারী প্রভৃতি নেতাগণ একে

এঁকে কংগ্রেসের সভাপতি হয়ে কারারুদ্ধ হন। কলকাতা কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতি বে-আইনী ঘোষিত হল। ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে যে সকল প্রতিনিধি আসেন তাঁদের মধ্যে অনেকে পথিমধ্যে গ্রেপ্তার হন। কলকাতার সকল পার্ক পুলিশ অধিকার করল। চৌরঙ্গীতে ও ধর্মতলার মোড়ে উন্মুক্ত স্থানে শ্রীমতী নেলী সেনগুপ্তার সভাপতিত্বে কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশন হয় এবং দ্রুত কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

কর্তৃপক্ষ কংগ্রেসকে বাদ দিয়েই শাসন সংস্কার কার্যে অগ্রসর হন। ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট ভাবী শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব রচনা করে' ১৯৩৩ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একটি 'হোয়াইট পেপার' বা শ্বেত পত্র প্রকাশ করেন। এই সকল প্রস্তাবের অত্যন্ত বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল।

হোয়াইট পেপারের প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য লর্ডস্ ও কমন্স সভার যে যুগ্ম-কমিটি বসে তার রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনের খসড়া রচিত হয় এবং পার্লামেণ্টে যথারীতি আইনরূপে বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনটির নাম "ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫"। এই আইন অনুসারে ১৯৩৭, ১লা এপ্রিল প্রদেশ সমূহে নূতন শাসনবিধি প্রবর্তিত হ'ল।

ভারত শাসন আইন দুই ভাগে বিভক্ত—নিখিল ভারতীয় বা ফেডারেল এবং প্রাদেশিক। প্রথম অংশে ব্রিটিশ ভারত ও রাজন্য ভারত, এই দুই খণ্ড জোড়া দিয়ে একটি অখণ্ড সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠনের আয়োজন হয়। ফেডারেশন অংশে পার্লামেণ্ট দুই ভাগে বিভক্ত—রাষ্ট্রীয় পরিষদ এবং সম্মিলিত ব্যবস্থা পরিষদ। প্রথমটিতে ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে সদস্য ১৫৬, রাজন্য ভারতের পক্ষে ১০৪। দ্বিতীয়টিতে ব্রিটিশ ভারতের পক্ষে সদস্য থাকবেন ২৫০ জন ও রাজন্য ভারতের পক্ষে ১২৫ জন। এর আয়ুষ্কাল পাঁচ বছর। পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ ভারতীয় প্রতিনিধি নির্বাচিত হবেন, আর মোটের উপর এক-তৃতীয়াংশ হবে মুসলমান।

রাজস্বের আশি ভাগ সংরক্ষিত। বড়লাট তাঁর পরামর্শদাতাদের মত নিয়ে নিজ দায়িত্বে এই অংশ ব্যয় করবেন। দেশ-রক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি প্রভৃতি তিনি নিজ হাতে রাখবেন। এ সবের ব্যয়, সিবিল সার্বিসের বেতন, রেলওয়ে ব্যয় সংরক্ষিত বিষয়। স্বতন্ত্র রেলওয়ে-বোর্ড রেলওয়ে-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে সর্বেসর্বা। কেন্দ্রীয় রাজস্বের কুড়ি ভাগ মাত্র মন্ত্রীদের হস্তে অর্পিত হল। প্রাদেশিক অংশে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ এগারটি গবর্ণর-শাসিত প্রদেশে বিভক্ত

হল। এডেন ও ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ থেকে স্বতন্ত্র হল। নির্বাচক-সংখ্যা হল মোট লোক-সংখ্যার শতকরা চৌদ্দ জন। ছয় আনা চৌকিদারী ট্যাক্স দিলেই ভোটাধিকার ক্ষমতা জন্মাবে। প্রবেশিকা পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিমাত্রেই ভোটাধিকার লাভ করল। বিভিন্ন শ্রেণী ও ধর্ম সম্প্রদায়ের পৃথক-নির্বাচন ব্যবস্থা হল।

ইটালির আবিসিনিয়া অভিযান ও অধিকার এবং হিটলার ও মুসোলিনীর মিলন ইউরোপে যে প্রলয় কাণ্ড সৃষ্টি করেছিল তাতে পৃথিবীর দুর্বল ও অনুন্নত জাতিগুলি ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিল। উচ্চ আদর্শ ও স্বার্থের দিক থেকে কংগ্রেস ইটালির আবিসিনিয়া অভিযানের প্রতিবাদ করে। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্মৌ কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জবাহর লাল নেহরু তাঁর অভিভাষণে সাম্রাজ্যবাদের কঠোর সমালোচনা করেন। সাম্রাজ্যবাদ ভারত-বর্ষকে দরিদ্র ও পরাধীন করেছে। সমাজতন্ত্রবাদই এর একমাত্র প্রতিষেধক। কৃষক ও শ্রমিকদের উন্নতির জন্য কংগ্রেস তাদের যোগসাধন করবেন। ভারতবর্ষকে পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করতে হবে। শাসন-সংস্কারের পরিবর্তে ভারতবাসীদের ভেতর থেকে প্রতিনিধি নিয়ে গণ-পরিষদ গঠন করতে হবে। গণ-পরিষদই গণতন্ত্রমূলক শাসন-কাঠামো রচনা করবে।

কংগ্রেস আবিসিনিয়ার বিপদে সহানুভূতি প্রকাশ করল। অর্ডিনান্স-শাসনের ফলে সংবাদপত্র প্রকাশ ও প্রচার, স্বাধীন মতামত প্রকাশ, সভা-সমিতির প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি আধুনিক সভ্য মানুষের অতি-প্রয়োজনীয় কর্মে যে অন্তরায় সৃষ্টি হয়েছে তা দূর করার জন্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংঘ প্রতিষ্ঠা করা হল। মোসলেম লীগ শাসনতন্ত্রের তীব্র নিন্দা করল। লীগের আদর্শ হল ভারতে পূর্ণ-দায়িত্বশীল শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। কর্মাদর্শে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না।

নূতন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচনের ফলে এগারটি প্রদেশের মধ্যে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী সদস্যরা সংখ্যাধিক্য লাভ করলেন। প্রাদেশিক লাটগণ তাঁদের বিশেষক্ষমতা প্রয়োগ করবেন না এবং আইনানুগ শাসন সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করবেন না, কংগ্রেসী দলের এই সর্ত পূরণে অসম্মত হওয়ায় ছয়টি প্রদেশে সংখ্যালঘু দল থেকে 'ঠিকা' মন্ত্রী-সভা গঠন করা হল।

বঙ্গভঙ্গ রদ করার পর বাংলা দেশে হিন্দুদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ে পরিণত

করা হয়েছিল। সুতরাং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় আড়াই শত সদস্য পদের মধ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে হিন্দুদের মাত্র আশীটি পদ। পুণা-চুক্তি দ্বারা এই আশীটি পদের মধ্যে ত্রিশটি অনুন্নতদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। সুতরাং বঙ্গের স-বর্ণ হিন্দুরা মাত্র পঞ্চাশটি পদ পেয়ে কোনঠেসা হয়ে গেল।

এদিকে ফজলুল হকের কৃষক-প্রজাদল এবং মোসলেম লীগ আপস করে' পরিষদে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলে গণ্য হল। বড়লাট লর্ড লিন্‌লিথগো এক বিবৃতিতে বলেন যে, প্রাদেশিক লাটগণ মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ করতে আইনতঃ বাধ্য এবং বিশেষ দায়িত্ব সম্বন্ধেও মন্ত্রীদের পরামর্শ গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। এর পরে বোম্বাই, মাদ্রাজ. বিহার, যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ ও বেরার, উড়িষ্যা এবং কিছু পরে সীমান্ত-প্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভা গঠিত হল। কংগ্রেস দীর্ঘকাল গবর্ণমেন্টের বিরোধী দল হিসাবে কার্য করে, এবার দেশ-সেবার নূতন পথ অবলম্বন করল।

কংগ্রেসী গবর্ণমেণ্ট অবিলম্বে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিল। বাংলাদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত না থাকায় সেখানকার হক্ মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে মহাত্মা গান্ধী রাজবন্দী ও রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির পথ সহজ করে দিলেন।

বহু জ্ঞানী কর্ম্মীদের আত্মদানের ফলে কংগ্রেস একমাত্র শক্তিশালী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। জিন্না এই মত গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তাঁর মতে কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান। মোসলেম লীগই সমগ্র ভারতের মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান। লীগ ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হল। জিন্নার মতে হিন্দু ও মুসলমান দুইটি আলাদা জাতি। যে সব অঞ্চলে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী তাদের নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। যে ভারতবর্ষে ভৌগলিক, সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক একত্ব সূচিত হয়েছে—যে দেশে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায় বাস করে যুগযুগান্ত ধরে এক দেশমাতা বলে গ্রহণ করে এসেছে, সে দেশকে জিন্না সাম্রাজ্যবাদীদের কুচক্রে বিভক্ত করেছেন এবং ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস এই আত্মঘাতী ব্যবস্থায় মত দিয়ে বহু অনর্থের সৃষ্টি করেছেন।

১৯৩৮ সালে বিনায়ক দামোদর রাও সভারকর আহ্‌মদাবাদ শহরে নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন। হিন্দু মহাসভার উদ্ভব হিন্দু স্বার্থরক্ষার

উদ্দেশ্যে। মোসলেম লীগের মতো হিন্দু মহাসভাও একটি সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। অখণ্ড স্বাধীন-ভারত প্রতিষ্ঠা এর আদর্শ।

কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষে ফেডারেশন চালু করতে চেষ্টিত হন। সুভাষচন্দ্র বসু এর বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীরা তাঁকে পূর্ণ সমর্থন করলেন।

হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। ভাবী যুক্তরাষ্ট্র বর্জনের পক্ষে প্রস্তাব গৃহীত হল। সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন, সমগ্র ইয়োরোপ আগ্নেয়গিরির মতো বিস্ফোরণের জন্য অপেক্ষা করছে। তিনি ইয়োরোপে দীর্ঘকাল বাস করতে বাধ্য হন। সুতরাং ইয়োরোপীয় রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতা ছিল। কর্তৃপক্ষ যখন ফেডাবেশন চালু করতে চেষ্টা করেন তখন সুভাষচন্দ্র এর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন চালান। কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রীরা তাঁর পূর্ণ সমর্থন করেন। তাঁর সহযোগী ওয়ার্কিং কমিটিও ফেডারেশনের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। কেন্দ্রে বড়লাটের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ সম্পর্কে সীমা নির্দেশের আশ্বাস পেলে তাঁরা ফেডারেশন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করবেন তা অস্পষ্ট ছিল। সুভাষচন্দ্র সন্দেহবশেই স্বাধীনভাবে নির্বাচন-প্রার্থী হন। সুভাষচন্দ্র ও পট্টভি সীতারামিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। সুভাষচন্দ্রের জয় হল। গান্ধী বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্রের জয় তারই পরাজয়। ত্রিপুরা কংগ্রেসের পর সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করেন, ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করেন এবং ফেডাবেশন প্রতিষ্ঠাব বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান। শৃংখলা-ভঙ্গের অপরাধে সুভাষচন্দ্র তিন বছরের জন্য কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন।

হিট্‌লারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মেনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। বিভিন্ন ডোমিনিয়ন একে একে ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিল। ব্রিটেন মহাসমরে যোগ দেওয়াব সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষও যুদ্ধরত দেশ বলে ভারত সরকার ঘোষণা করলেন, কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের মতামত গ্রহণ করা প্রয়োজন বলে মনে করলেন না।

কংগ্রেস ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী-নীতিব বিরোধী এবং গণতন্ত্রনীতির পক্ষপাতী। হিট্‌লার ও মুসোলিনী গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে সমরে অবতীর্ণ। ইংল্যাণ্ডও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। আদর্শ ও নীতির দিক থেকে ব্রিটেনকে সাহায্য করা ভারতবর্ষের অবশ্যকর্তব্য। কিন্তু ব্রিটেনের কাছে

এই যুদ্ধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ভারতবর্ষ স্পষ্ট বিবৃতি দাবী করেছিল। বড়লাট তাঁর শাসন-পরিষদ বর্ধিত করে জন প্রতিনিধি গ্রহণের প্রস্তাব করেন। তবে কংগ্রেসকে এই সদস্যসংখ্যা ও প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে জিন্নার সহিত একমত হয়ে কায করতে হবে, এই ব্যবস্থা হল। কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে মন্ত্রীসভাগুলি পদত্যাগ করে। সাতটি প্রদেশের গবর্ণরগণ বিশেষ ক্ষমতাবলে শাসনভার নিজ হস্তে গ্রহণ করলেন।

মহাত্মা গান্ধী পোল্যাণ্ডের এই আকস্মিক ভাগ্যবিপর্যয়ে দুঃখ ও সমবেদনা প্রকাশ করেন। গণতন্ত্র নীতির প্রতিষ্ঠার জন্য ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, এজন্য তিনি আনন্দ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেছিলেন, জগতে হিংসার পথ মুক্তির পথ নয়। হিংসার প্রতিক্রিয়ায় হিংসা প্রযুক্ত হয়। অহিংসাই জগতকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করতে পারে।

গান্ধীজীর অহিংসনীতি জগতে নূতন নয়। দুই হাজার বৎসর পূর্বে গৌতম বুদ্ধ ও যিশুখৃষ্ট মানুষকে হিংসা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বুদ্ধ ও যিশুখৃষ্টের অহিংসা লোকোত্তর। মানুষ তাতে অধ্যাত্ম কল্যাণ লাভে সমর্থ হয়। কিন্তু গান্ধীজীর রাষ্ট্রনীতি, সমাজচিন্তা, ধনতন্ত্র, শিক্ষাতন্ত্র ও শিক্ষাতত্ত্বে মানুষের চরিত্র প্রধান স্থান পেয়েছে। তাঁর সকল কর্মের লক্ষ্য মানুষ। যে ব্যবস্থায় মানুষের চরিত্র ক্ষুণ্ণ হয় তা অবাঞ্ছনীয়, তিনি তাকে বর্জন করেছেন। বিজ্ঞান জীবনকে সুখময় করতে চেয়েছে কিন্তু তার প্রয়োগে মানুষের চারিত্রিক অবনতি ঘটে। এজন্য তিনি বিজ্ঞানের ঘোর বিরোধী। তাঁর শিক্ষা-ব্যবস্থায় তিনি মানুষকে এমন পরিবেশে রাখতে চেয়েছেন যার প্রভাবে তার চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিকশিত হয়ে উঠবে।

সকল দেশের সকল যুগের ধর্মোপদেষ্টারা মানুষের চরিত্রের উন্নতি সাধনে ব্যস্ত। তাঁরা ধর্মপ্রচার করেছেন, মানুষ তা গ্রহণ করেছে। তাঁরা নীতিশিক্ষা দিয়েছেন মানুষ তা শ্রবণ করেছে। তাঁদের আদর্শে, তাঁদের শিক্ষায় তারা জীবন গঠন করতে চেষ্টা করেছে। তাঁদের শিক্ষার ফল কখন গভীর ও সুদূর-প্রসারী, কখন বাহ্যিক ও অল্পস্থায়ী। তাঁদের আদর্শ সমগ্র জীবন নয়, জীবনের অংশ মাত্র। এই আদর্শ ঐহিক ও আধ্যাত্মিক, লৌকিক ও লোকাতীতের মধ্যে একটা সীমা রেখে টেনেছে। কোন আদর্শ সাংসারিক জীবনকে অস্বীকার না করে আধ্যাত্মিক প্রেরণা দিয়েছে। কোন আদর্শ পলায়নী মুক্তির মহিমা কীর্তন করেছে এবং প্রলোভন জয় করতে শিক্ষা দিয়েছে।

যিশু বলেছিলেন, বিষয়-সম্পত্তি বিক্রয় করে আমাকে অনুসরণ কর। শঙ্করাচার্য বলেছেন, কৌপিনবান ভাগ্যবান। আবার কেউ বলেছেন, কাদায় বাস কর কিন্তু কাদা মেখো না। তাঁরা সমসাময়িক আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পরিবেশকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, তার গলদ চোখে পড়লেও তার ভিতরেও পবিত্র জীবন যাপনের জন্য উপদেশ দিয়েছেন।

রোমান চার্চের মতে ধর্ম সকলের উপর তলায়, রাষ্ট্র ও সমাজ তার নীচে। সে সংঘের মোহন্তরা রাজাদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছে, কূটনীতির আশ্রয় নিয়েছে, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে হস্তক্ষেপ করেছে। আসিসির ফ্রান্সিসের মতো দু'একজন লোক ধর্মসংঘের বাইরে আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেছিলেন। ধর্মের ভিত্তির উপর রাষ্ট্র গঠন করতে ক্যাথলিক চার্চের চেষ্টা সফল হয়নি। সে চেয়েছিল রাজাকে মোহন্তের অধীন রাখতে। ইস্‌লাম ধর্মে রাজা ও মোহন্ত একব্যক্তি। যিশু চেয়েছিলেন পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য স্থাপন করতে। ইস্‌লাম ধর্ম চেয়েছে সত্যধর্মের জন্য দিগ্বীজয় করতে। মহম্মদ একাধারে ইস্‌লামের ধর্মগুরু সেনাপতি ও ইস্‌লাম রাষ্ট্রের রাজা। যেখানে ধর্মের বেড়াজালে সমাজ, রাষ্ট্র ও ব্যক্তি বাঁধা সেখানে মানবতা শ্বাসরুদ্ধ। ইস্‌লাম সর্বমানবীয় সভ্যতায় কিছু দান করেছে সত্য কিন্তু সেযুগে রাষ্ট্র ও ধর্মের একাঙ্গত্ব শিথিল ছিল।

গান্ধীজীর রামরাজ্য— খ্রীষ্টান বা ইস্‌লাম মতে ধর্ম কতকগুলি আচার ও বিশেষ বিশ্বাস। যারা সে আচারে ও বিশ্বাসে আস্থাহীন তারা রাষ্ট্রে বাস করেও বাইরের লোক—তারা নিজ বাসভূমিতে পরবাসী। মুক্ত উদার মানবতা এখানে স্থান পায় না। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে গান্ধীজী ধর্মের কথা বলেছেন। সে ধর্ম ধর্মবিশ্বাস-নিরপেক্ষ। তাঁর ধর্ম চারিত্রিক আধ্যাত্মিকতা। এজন্য তিনি সকল ধর্ম-বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা করতে বলেছেন। ধর্মের মধ্যে আধ্যাত্মিকতা আছে কিন্তু ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা এক বস্তু নয়।

আধ্যাত্মিকতার অর্থ সাধকের আত্মোপলব্ধি কিন্তু গান্ধীজীর রামরাজ্যে তেমন আধ্যাত্মিকতা নাই। তিনি যে সমাজের কথা বলেছেন সে সমাজ আমাদের পরিচিত সমাজ। তাঁর লক্ষ্য সাধারণ মানুষ। সমাজে মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে, রাষ্ট্রে, ধন উৎপাদনে ও বণ্টনে, শিক্ষা-ব্যবস্থায়, সকল কর্মে ও ব্যবস্থায়, সাধনায় একমাত্র উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন।

গান্ধীজীর আদর্শ মানুষ—গান্ধীজীর আদর্শ মানুষ অহিংস ও অক্রোধ। তার জীবনযাত্রা সরল, উপকরণ বাহুল্যবর্জিত, অন্যের শ্রমের উপর যতদূর-সম্ভব

কম নির্ভরশীল। সে নিজের প্রয়োজন নিজেই মেটায়। এজন্য সে নিরলস। সে সত্যাগ্রহী। নিজের বা দলের স্বার্থে সে অসত্য ও অন্যায় আশ্রয় করে না। অন্যের অসত্য ও অন্যায় সহ্য করে না, নির্ভীক শক্তিতে তার প্রতিরোধ করে। সে অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগ করে। সে মৈত্রী দ্বারা ক্রোধ, অলোভ দ্বারা লোভ জয় করে, প্রয়োজন হলে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়। এমন লোক নিয়ে যে সমাজ গঠিত হবে তাতে প্রকৃত সাম্য আসবে। কারণ সে সমাজে হিংসা নাই, ঈর্ষা নাই, ক্রোধ নাই।

সাধারণ মানুষের প্রকৃতিতে মহত্ব অন্তর্নিহিত আছে কিন্তু সে মহত্ব স্বার্থের আবিলতায়, ঈর্ষা-দ্বেষের কালিমায় আবৃত। যখন সে ডাকের মতো ডাক শোনে তখন শতদলের পাপড়ির মতো তাব মহত্ব বিকশিত হয়ে ওঠে। তিনি সে ডাক অনেকবার দিয়েছেন এবং তাঁর সে ডাক শুনে তারা সাড়া দিয়েছে, তাঁর সাথী হয়েছে, তাঁর পতাকা বহন করে কর্মেব দুর্গম পথে যাত্রা করেছে। যখন তাঁর ডাকে সে সাড়া দেয়নি তখন তিনি নিজেকে দোষী সাব্যস্ত কবেছেন কিন্তু মানুষের মহত্বে বিশ্বাস হাবাননি। তিনি যে আদর্শ কল্পনা করেছিলেন তা নূতন নয়, কিন্তু চরিত্র পরিবর্তনের যে উপায় তিনি গ্রহণ করেছিলেন তা অভিনব। নিজেব জীবনে সে আদর্শ চবিত্রকে মূর্ত করে তোলাই সে উপায়। এজন্য ভারতবর্ষেব লোক তাদের জাতীয় জীবনের সংকটকালে তাঁকে অবিসংবাদী নেতা বলে গ্রহণ কবেছে এবং ক্ষুবধার সদৃশ যাত্রাপথের সহযাত্রী হয়েছে।

বহুকাল পূর্বে প্লেটো বলেছিলেন, জ্ঞানী-শাসিত বাষ্ট্রই প্রকৃত রাষ্ট্র, একমাত্র জ্ঞানীই বাষ্ট্রশাসনের অধিকারী। ক্যাথলিক সংঘের ধর্মগুরু বলেছিলেন, ধর্ম অর্থাৎ ধর্মগুরুই রাষ্ট্রতরণীব একমাত্র কর্ণধার। ইসলাম একমাত্র ধর্মের ভিত্তির উপর রাষ্ট্র গড়তে সমর্থ হয়েছে কিন্তু এতে উদার মানবিকতা স্থান পায়নি। ফ্যাসি ও নাজি রাষ্ট্রে ধর্মের স্থান নাই। আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র একেবারে ধর্মনিরপেক্ষ। প্রকৃত গণতন্ত্রে মানুষের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে কিন্তু রাষ্ট্রের কোন ধর্ম নাই। গান্ধীজীর রাষ্ট্রে বা রামবাজ্যে ধনিক ও শ্রমিক, জমিদার ও প্রজা থাকবে কিন্তু ব্যক্তিগত চারিত্রিক উন্নতির ফলে পরস্পরের মধ্যে হিংসা দ্বেষ অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা দূর হয়ে প্রকৃত সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। চারিত্রিক উন্নতি ছাড়া কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সাম্য স্থায়ী ও ঘাতসহ হয় না।

গান্ধীবাদ রাজনীতিকে ধর্মের স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছে। এখানে সত্য রাজনীতির কৌশল এবং অহিংসা জাতীয়তার ও নবযুগের যুদ্ধনীতি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গান্ধীবাদের মূলমন্ত্র ক্ষমা ও মননশীলতা। কিন্তু বর্তমান বাস্তবজগতের কূটনীতিকে নির্জলা সত্যে এবং রণনীতিকে অহিংসায় পরিণত করার চেষ্টা সফল হইবে কিনা একমাত্র ভবিতব্যই জানেন। যতদিন না মানুষের দৃষ্টিভঙ্গী বদলায়, যতদিন সাধারণ মানুষের অর্থ নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক উন্নতি সাধিত না হয়, ততদিন এই আদর্শকে আধুনিক জগতে কার্যে পরিণত করা অত্যন্ত কঠিন।

১৯৩৯ সাল—রাশিয়ায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব—শিক্ষা সভ্যতার মাপকাঠি। নিরক্ষরতা দূর না হলে কোন দেশ প্রকৃত উন্নত ও সভ্য হয় না। সুতরাং নিরক্ষরতা দূরীকরণ সোভিয়েটতন্ত্রের প্রথম ও প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল। জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ, অতীন্দ্রিয়তা ও ধর্মান্ধতার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি প্রসারের চেষ্টায় রাশিয়ায় সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটেছিল। মার্ক্‌স্ ইতিহাসের যে বাস্তব ব্যাখ্যা করেছেন তাতে অতীন্দ্রিয়তার স্থান নাই। তাঁর দর্শনে ধর্ম ও বিজ্ঞান দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন বস্তু বলে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং সোভিয়েট রাশিয়া ধর্মের মোহ কাটিয়ে বিজ্ঞানকে তার ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রগঠনে প্রথম স্থান দিয়েছে। কৃষিবিষয়ে গবেষণার জন্য পাঁচশত পরীক্ষাগার, চৌত্রিশটি মানমন্দির, দুই শতের বেশী মিউজিয়ম ও বৈজ্ঞানিক গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একাডেমি অব্ সায়েন্সের অন্তর্গত নয় শত পরীক্ষাগার ছিল। ১৯৩৯ সালে ১৫০০০ ব্যক্তি ফেলো নির্বাচিত হয়েছিলেন।

জার-অধিকৃত এশিয়ায় শতকরা আটানব্বই এবং কোন কোন স্থানে নিরানব্বই জন নিরক্ষর ছিল। ১৯১৭ সালে ইয়োরোপীয় রাশিয়ায় শতকরা ৬৭ জন লেখাপড়া জানত না। জারের আমলে শিক্ষকের অবস্থা ভারতবর্ষের শিক্ষকদের অবস্থার মতো অতি শোচনীয় ছিল। সোভিয়েট রাশিয়ায় শিক্ষক সমাজ-জীবনে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত। বিপ্লব, গৃহযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের দুর্দশার সময়েও রাশিয়ায় শিক্ষকরা সাংস্কৃতিক উন্নয়নের পুরোধা ছিলেন। বিপ্লবের পূর্বে চল্লিশটি জাতির বর্ণমালা ও লেখ্য ভাষা ছিল না, রুষ ভাষার মাধ্যমে তাদের শিক্ষা দেওয়া হত। সোভিয়েট পণ্ডিতরা অক্লান্ত পরিশ্রম ও গবেষণার সহিত ভাষাতত্ত্বের জটিলতা ভেদ করে বিভিন্ন জাতির ভাষা গঠন

করেছেন। তারা এখন মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ ও সাহিত্য রচনা করে আত্মপ্রসাদ ও নিজেদের প্রতি শ্রদ্ধা অনুভব করছে।

জাতীয় মত গঠনে মুদ্রাযন্ত্রের উপযোগিতা অবিসংবাদী। মুদ্রাযন্ত্র ব্যক্তিগত বা সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত না হ'য়ে জাতি সাধারণের উপকারের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ায় শিল্পকলা সমগ্র জাতির সম্পত্তি। সোভিয়েট সংস্কৃতি বিস্তারের আর একটি উপায় নাটক, চলচ্চিত্র ও অভিনয়। সঙ্গীত, কলাশিল্প, নৃত্য, নাটক জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক বিপ্লব সংঘটিত করেছে। কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সৃষ্টি করেছে। মানুষই এর উদ্দেশ্য, এর প্রাণ ও আত্মা। এখানে সংস্কৃতি ব্যক্তি, সম্প্রদায় বা দল বিশেষের সম্পত্তি নয়, ব্যক্তি নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্পত্তি। লেনিন বলেছেন, কেহ জানে না প্রোলিটেরিয়েট সংস্কৃতির উৎপত্তি কোথায়। ইহা বিশেষজ্ঞদের সৃষ্টি নয়। পুঁজিবাদী সামন্ততান্ত্রিক ও আমলাতান্ত্রিক সমাজের অধীনে মানবজাতি যে জ্ঞানসম্ভার সঞ্চয় করে রেখেছে তা যখন জাতিসাধারণের সম্পত্তিরূপে পরিমূর্ত হ'য়ে ওঠে তার নাম প্রোলিটেরিয়েট্ সংস্কৃতি। এর প্রকৃতি বর্জন নয়, গ্রহণ। সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রয়োজন ও কামনা এর সঙ্গে অনুস্যূত গ্রথিত ও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

যুগযুগান্তের সাধনা বলে মানবজাতি যে সভ্যতা ও কৃষ্টির অধিকারী হয়েছে, সোভিয়েট রাশিয়া তাকে বর্জন করে নি। জারতন্ত্রের কঠোর বন্ধন থেকে অব্যাহতি পাওয়ার এক শত বৎসর পূর্ব থেকে রাশিয়া মুক্তি পথের অভিযাত্রী। ১৮২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে ডিসেম্ব্রিষ্টগণ অথবা বিপ্লবী অভিজাতগণ সামন্ত-তান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়ে যে বিদ্রোহ করে তার উদ্‌গাতা ছিলেন দার্শনিক হারজেন। চিন্তার গভীরতায় ও ব্যাপকতায় তিনি কার্ল্ মার্ক্‌সের নিকটবর্তী। বিনিভিত্ এবং ওডোয়েভিস্কি ছিলেন ঐ যুগের শ্রেষ্ঠ লেখক। তাঁরা রাশিয়ার প্রধান কবি এবং রুশ সাহিত্যের জনক পুস্কিনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য যে আন্দোলন হয় তার পুরোহিত ছিলেন বেলিন্স্কি, ডোব্রোলিওলোভ্ এবং চেরনিশেভিস্কি। উনবিংশ শতকে টুর্গিনেভ্, টলষ্টয় এবং ডস্টোভিস্কির দরদী হৃদয় পৃথিবীর অত্যাচারিত ও অবহেলিত মানুষের জন্য ব্যথিত হয়েছিল। তাঁরা তাদের "মূঢ় ম্লান মূক মুখে" ভাষা দিয়েছিলেন, মনে আশা ও উদ্যম সঞ্চার করেছিলেন। তাঁরা এবং তাঁদের সহকর্মী বুদ্ধিজীবীরা সাহিত্যের মায়াকাঠি স্পর্শে উপক্রত জনমনের

রুদ্ধ ভাব খুলে দিয়ে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিদ্রোহের পথ পরিষ্কার করেছিলেন। প্রাক্-বিদ্রোহের যুগে স্বাধীনতার যে সকল একনিষ্ঠ পূজারী তাঁর রত্ন মন্দিরের অর্গলবদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে লেনিন, ট্রট্স্কি, গোর্কি, প্লেখানোভ্ ষ্ট্যালিন প্রভৃতি মনীষী অন্যতম। তাঁরা, কেবলমাত্র জন-আন্দোলনের ভিতর শক্তি সঞ্চার করেননি। তাঁরা বিরাট সোভিয়েট্ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে বিশ্ব-সভ্যতার নূতন যুগের অবতারণা করেছিলেন। পঁচিশ বছরের মধ্যে যে অগণিত বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, সাঙ্গীতিক, শিল্পী-ভাস্করের আবির্ভাব ঘটেছে তাতে সমগ্র জাতির উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

জাতির অন্তর্হৃদয়ে যে ভাবধারা জারশাসনতন্ত্রের শৈবালে আচ্ছাদিত ও অবলুপ্ত হ'তে বসেছিল তা অক্টোবর বিপ্লবের প্রবল স্রোতে ভেসে গেল। রাশিয়ায় শ্রমিক ও কৃষকদের বহুকালের নিদ্রা ও জড়তা দূর হয়ে গেল। তারা সোভিয়েট রিপাব্লিক স্থাপন করল, মানুষের পরিবেশে মানুষকে স্থাপন করার প্রথম সোপান সৃষ্টি হল। এই নূতন কৃষ্টি পুরাতনের সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন করে সৃষ্টি হয়নি, এর জন্ম প্রাচীনের মধ্যে।

মানুষের প্রয়োজনে উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি ও প্রসারে যা সহযতা করে, মার্ক্‌সের মতে প্রগতি তাই। বিজ্ঞানের উন্নতি ও প্রসার এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি অঙ্গাঙ্গী। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সমান্তরাল রেখার মতো পৃথক নয়, এরা অর্থনীতির ক্ষেত্রে মিলিত হয়। সোভিয়েট রিপাব্লিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্য জাতির দান উপেক্ষা করে না—সেখানে টলষ্টয় ও টুর্গিনেভের সহিত শেকস্পীয়র ও রবীন্দ্রনাথ সম্মানের অর্ঘ পেয়ে থাকেন।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সকল সুবিধা, মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি জাগ্রত করার সকল সুযোগ সকল মানুষ সমানভাবে ভোগ করবে, এই দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে রাশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

দ্বিতীয় মহাসমর

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিট্‌লারের পোল্যাণ্ড আক্রমণ দ্বিতীয় মহাসমরের প্রারম্ভ। শহরের পর শহর অধিকৃত হল। কাটোউইস্‌ এবং ক্রেকো জার্মেনির হস্তগত হল। পোল্যাণ্ডের সমস্ত পশ্চিমাঞ্চল দখল হ'য়ে গেল। ওয়ার্স'র যুদ্ধ বিশ্বের সামরিক ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। ভিস্‌চুলা নদের দিকে পিছন ফিরিয়ে পোলগণ অসীম বীরত্ব ও অতুলনীয় সাহসের সহিত দুর্দ্ধর্ষ জার্মান বাহিনীর অগ্রগতি কিছু কালের জন্য প্রতিহত করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের রাজধানী জার্মেনির কবলে পতিত হল। সমগ্র পোল্যাণ্ড জার্মেনির পদতলে লুন্ঠিত হল। এর পূর্বাংশ ইতিপূর্বেই রাশিয়ার করতলগত হয়েছিল।

রাইনল্যাণ্ডে সিগ্‌ফ্রিড্‌ ব্যূহের পশ্চাতে সাত আট লক্ষ জার্মান সৈন্য মিত্রপক্ষের সেনাদলকে আক্রমণ করল। মিত্রপক্ষের সৈন্য পশ্চাতে হটে গেল। এদিকে রাশিয়া বল্‌টিক সাগরের তীরবর্তী ইস্টোনিয়া, লাট্‌ভিয়া এবং লিথুয়ানিয়ার সহিত পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্পাদন করল। কানাডা, আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি ডোমিনিয়ানগুলি এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ ব্রিটেনের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। হেলসিঙ্কি ও ফিনল্যাণ্ডের অন্যান্য শহরের উপর রাশিয়া বোমা নিক্ষেপ করতে থাকে। ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার সহিত সন্ধি করল।

১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে ইংল্যাণ্ডের উপর ব্যাপকভাবে বোমা বর্ষণ হতে লাগল। জার্মান সাঁজোয়া বাহিনী ডেনমার্ক ও নরওয়ে অধিকার করল। নারভিকের নৌযুদ্ধে জার্মেনি বহু ব্রিটিশ জাহাজ ধ্বংস করেছিল। নাজি সৈন্য বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড ও লক্সেমবার্গ আক্রমণ করল। জার্মান বাহিনী প্যারিস প্রবেশ করল। মার্শাল পেঁতে জার্মেনির সহিত সন্ধি করে একটি তাঁবেদারি শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করলেন।

ফ্রান্সের পতনে ইংল্যাণ্ড একাকী জার্মেনির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে লাগল। বোমারু পোত থেকে প্রবল বেগে গোলা বর্ষণ করে জার্মেনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের হৃৎপিণ্ড লণ্ডন মহানগরীকে বিব্রত করে তুলল। ইটালি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। ইঙ্গ-মার্কিন নৌচুক্তি অনুসারে ঋণ ও ইজারা আইন বলে যুক্তরাষ্ট্র পঞ্চাশখানি ডিষ্ট্রয়ার হস্তান্তর করল, জাপান ইণ্ডো-চীনকে চরম পত্র দাখিল করল, ফ্রান্স ইণ্ডো-চীন সম্বন্ধে টোকিওর দাবি মেনে নিল, জার্মেনি, ইটালি ও জাপানের মধ্যে ত্রিশক্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী চেম্বারলেন পদত্যাগ করলেন, ইটালি গ্রীস আক্রমণ করল এবং জার্মেনি লোরেন দখল করে নিল। ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে লণ্ডন ও তৎসংলগ্ন স্থানের উপর প্রচণ্ড বেগে বোমা বর্ষণ চলতে লাগল।

১৯৪১ সাল থেকে ব্রিটেন জার্মেনির উপর ভীষণভাবে বিমান আক্রমণ আরম্ভ করল। ব্রিটেন তবরুক ও বেনগাজি দখল করল কিন্তু ব্রিটিশ সৈন্য শীঘ্রই বেনগাজি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। জার্মেনরা গ্রীস ও জুগোস্লাভিয়া আক্রমণ করল, সেখানে হিট্‌লার একটি স্বাধীন ক্রোট রাজ্য স্থাপন করলেন। রাশিয়ার সহিত জাপানের অনাক্রমণ চুক্তি হল। ব্রিটিশদের সাহায্যে গ্রীকরা জার্মানদের সঙ্গে থার্মাপিলিতে ভীষণ যুদ্ধ করল। এই সময় লণ্ডনের মহাসভা গৃহ এবং ওয়েষ্টমিনিষ্টার অ্যাবি বোমা বর্ষণে বিধ্বস্ত হয়।

এদিকে জাপানি সৈন্য মালয়ে অবতরণ করল, সাংঘাই, ফিলিপাইন, দ্বীপপুঞ্জ, সুমাত্রা, বর্নিও, যবদ্বীপ প্রভৃতি প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলি অধিকার করল। সিংগাপুরের পতন হল। ব্রহ্মদেশ জাপহস্তে পতিত হল এবং সেখানকার প্রায় পাঁচ লক্ষ ব্রিটিশ ও ভারতীয়গণ পায়ে হেঁটে পলায়ন করতে বাধ্য হল। পিপাসায় ও খাদ্যাভাবে বহু ভারতীয় নরনারী ও শিশু পথিমধ্যে মৃত্যু বরণ করল।

মালয় এবং ব্রহ্মদেশ জাপানীদের হস্তে পতিত হওয়ার সময় থেকে হংকং মালয় এবং ব্রহ্ম যুদ্ধে ধৃত ভারতীয় বন্দী এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় অধিবাসীদের মধ্য থেকে লোক নিয়ে ইংরেজদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার জন্য 'ভারতের জাতীয় সৈন্যদল' নাম দিয়ে একটি সৈন্যদল গঠিত হয়। নেতাজী সুভাষচন্দ্র "স্বাধীন ভারত" নামে একটি অস্থায়ী শাসন প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক ছিলেন স্বয়ং নেতাজী। এই সৈন্যদলের কর্মচারীরা ভারতীয় ছিল। তাদের মধ্যে জাতিবিচার ও সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তাদের শিক্ষার জন্য হিন্দুস্থানী ভাষা ব্যবহৃত হ'ত। 'জয় হিন্দ্' তাদের জাতীয় সঙ্গীত ছিল। "ঝান্সীর রাণী সেনাদল" নামে স্ত্রীলোকদের একটি

সৈন্যদল গঠিত হয়েছিল। এর অধিনায়িকার নাম ডাঃ মিসেস্ লক্ষ্মী স্বামীনাথন।

আজাদ হিন্দ ফৌজ ভারতব্রহ্ম সীমান্তে প্রাণপণে যুদ্ধ করেছিল। তারা মণিপুর ও ইম্ফলের পর্বত ও অরণ্য সমাবৃত অঞ্চলে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেও যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিল। জাপানের মতো একটি বিবেকহীন জাতির উপর নির্ভর করতে গিয়ে তারা বিফল মনোরথ হয়েছিল।

জার্মেনি রাশিয়া আক্রমণ করল। ষ্ট্যালিনগ্রাডের লোমহর্ষণকর যুদ্ধ, উত্তর-আফ্রিকায় জার্মানদের পরাজয়, রোমেলের সৈন্যদলের পলায়ন, ওয়াশিংটনে ছাব্বিশটি জাতির অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে চুক্তি স্বাক্ষর, রাশিয়ার পাণ্টা আক্রমণ এবং ইণ্ডো চীনে জাপসৈন্যের অবতরণ পর বৎসরের প্রধান ঘটনাবলী।

উত্তর-আফ্রিকায় জার্মানদের পরাজয় মিত্রশক্তির পক্ষে প্রথম অনুকূল ঘটনা। মধ্যপ্রাচ্যে সেনাপতি মণ্টগোমারি ও কেসির কর্মকুশলতা ব্রিটিশ সাফল্যের প্রধান কারণ। মাকিন সেনাপতি ম্যাক্ আর্থার প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে জাপদের বিরুদ্ধে জলে ও স্থলে যুদ্ধ জয় করেন।

মুসোলিনীর পরাজয়, মিত্রশক্তির ইটালি আক্রমণ, জামান প্যারাসুট কর্তৃক মুসোলিনীর উদ্ধার, রাশিযার সাফল্য, উত্তর ব্রহ্মে সেনাপতি ষ্টীলওয়েল এবং মাউণ্ট ব্যাটেনের সৈন্যদের কৃতিত্ব ১৯৪৩ সালের প্রসিদ্ধ ঘটনা।

আমেরিকান, ব্রিটিশ, ফরাসি ও কানাডীয়-সৈন্য বাহিনী কর্তৃক নরম্যাণ্ডির উপকূলে জার্মেনির দুর্ভেদ্য দুর্গ ও দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণ, সাঁড়াশী সৈন্যদলের অগ্রগতি, প্যারিস উদ্ধার, পোল্যাণ্ডে ও বল্কানে লাল ফৌজের তীব্রগতি, প্রশান্ত মহাসাগরে যুদ্ধের সাফল্য, উত্তর ব্রহ্মে মিট্‌কিনার পতন এবং মণিপুর থেকে জাপ বিতাড়ন ১৯৪৪ সালের উল্লেখযোগ্য কার্য। মস্কো, কাইরো এবং টিহারাণে নেতৃবর্গের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পরামর্শ এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সম্মিলিত জাতিসমূহের একযোগে সমর পরিচালনা কার্যে সহায়তা করে জার্মেনি ও তার সাহায্যকারী শক্তিদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিল।

১৯৪৫ সালে পশ্চিম দিকে মিত্রপক্ষের সৈন্য জার্মেনির সীমা ভেদ করেছিল। ফ্রান্স, হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম মুক্তিলাভ করল। পূর্বদিকে রাশিয়ার সৈন্য পূর্ব প্রুশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং কার্পেথিয়ান পর্বতমালা পার হ'য়ে অগ্রসর

হয়েছিল। মার্শাল জুকোভের সৈন্য বার্লিন থেকে চল্লিশ মাইল স্থানের ভিতর এসে পড়ল। পূর্ব প্রুশিয়ায় মার্শল রোকোসোভোস্কির সৈন্যগণ ডানৃজিগ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। মিত্রপক্ষের এবং রাশিয়ার সৈন্য যুগপৎ দুই দিক থেকে প্রচণ্ড আক্রমণ চালিয়েছিল। তাদের সামনে জার্মানরা কোথাও দাঁড়াতে পারল না। বুদাপেশতের পতন হ'ল। ক্রাইমিয়ার ইয়াল্টা প্রাসাদে ত্রিনেতৃ সম্মিলনে স্থির হল যে জার্মেনিকে বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে এবং সমগ্র দেশটিকে বিভক্ত করে এক একটি অংশ এক একটি বিজেতা শক্তির হস্তে সমর্পণ করতে হবে।

ইয়াল্টা সম্মিলনের দুই মাসের মধ্যে ডানজিগ্ ডিনিয়া এবং কনিগস্‌বার্গের পতন হল, সমগ্র পূর্ব প্রুশিয়া ও বাল্টিক্ তীরভূমি রাশিয়ার হস্তগত হল, মার্শেল কনিয়েভ্ ও মার্শেল টলবুখিন যথাক্রমে অষ্ট্রিয়ার মধ্যস্থলে ও অভ্যন্তরে ভিয়েনার দিকে ভীমবেগে অগ্রসর হলেন। পশ্চিম দিকে মণ্টগোমারির ব্রিটিশ সৈন্যদল এবং সেনাপতি হজের আমেরিকান বাহিনী রাইন নদী পার হয়ে যেন রাশিয়ার সৈন্যদের সহিত প্রতিযোগিতা করে প্রচণ্ড বেগে বার্লিনের দিকে অগ্রসর হ'ল। রুর অঞ্চল এবং সাইলিসিয়ার ব্রেস্‌লাউ অঞ্চল যুদ্ধের আবর্তের মধ্যে এসে গেল। ফলে জার্মেনির যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণের কেন্দ্রগুলির বৃহত্তম অংশ অকেজো হয়ে পড়ল। জার্মান সৈন্যের অস্ত্রবল ক্ষীণ হয়ে গেল।

ইয়োরোপে যুদ্ধের এই অবস্থার সহিত প্রশান্ত মহাসাগরের এবং পূর্ব এশিয়ার যুদ্ধের সংগতি ছিল। ব্রিটিশ সৈন্য মান্দালয় অধিকার করল এবং ব্রহ্মদেশের বহুস্থান পুনরুদ্ধার করল। মার্কিন সৈন্য ফিলিপাইনের প্রধান নগর ম্যানিলা দখল করল এবং জাপানের অনতিদূরে ওকিনাওয়ায়, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে এবং অন্যান্য দ্বীপে জাপদের পরাজিত করল। তারা কয়েকটি নৌযুদ্ধে জাপদের বিধ্বস্ত করে দিল। তারা লুজান অঞ্চলে, মিলডানিও এবং নিগ্রোম দ্বীপে অবতরণ করেছিল। ব্রিটিশ সৈন্য প্রোম ও রেঙ্গুণ অধিকার করল।

জুকোভের সৈন্যদল জার্মান ট্যাঙ্কবাহিনীকে পরাস্ত করে' কোনিয়েভের সৈন্যদলের সহিত সংযোগ স্থাপন করে' বার্লিন অধিকারের জন্য অগ্রসর হল। বার্লিনের যুদ্ধে মার্শাল ষ্ট্যালিন রুশবাহিনী এবং হের্ হিট্‌লার জার্মান সৈন্য পরিচালনা করেছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলে আমেরিকান, কানাডিয়ান, ব্রিটিশ ও

ফরাসি সৈন্য একটির পর একটি স্থান অধিকার করে লাল ফৌজের সহিত যোগ স্থাপন করল। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ সৈন্য উত্তরে হামবার্গের উপকণ্ঠে উপস্থিত হল। আমেরিকান সৈন্য জেকোশ্লাভোকিয়ায় এবং অষ্ট্রিয়ায় প্রবেশ করল, সেনাপতি আইসেন হাউয়ারের সৈন্যগণ বার্লিনকে বেষ্টন করে আক্রমণকারী রুষসৈন্যের সহিত মিলিত হল। রুশ সৈন্য ফ্রাঙ্কফোর্ট নগর এবং ষ্টেটিন নামে বল্টিক সাগরের প্রধান বন্দর অধিকার করল।

কয়েক দিনের মধ্যে জার্মান সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পচর্চার কেন্দ্র স্থল বার্লিন সম্পূর্ণরূপে লাল ফৌজের হস্তে পতিত হল। দিনের পর দিন ক্রমাগত বোমা বর্ষণে এই মহানগরী ধ্বংসস্তুপে পরিণত হ'ল। বার্লিন পতনের সময় হিট্‌লারের আত্মহত্যার গুজব এবং উত্তর ইটালির দেশপ্রেমিক বিপ্লবীগণ কর্তৃক মুসোলিনীর নিষ্ঠুর হত্যার সংবাদ প্রচারিত হল। ৭ই মে ডোনিট্‌জের আদেশে সমগ্র জার্মান সৈন্য বিজেতার হস্তে আত্মসমর্পণ করল। নাৎসী ও ফ্যাসী উপদ্রব থেকে ইয়োরোপের উপদ্রুত জাতিগণ মুক্তিলাভ করল।

দ্বিতীয় মহাসমরে ভারতীয় সৈন্যদের সাহস ও বীরত্ব প্রশংসনীয়। উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির তপ্ত বায়ু, উত্তর ইটালীয় হিমশীতল কান্তার, উত্তর ব্রহ্মের বনানী সমাকীর্ণ পার্বত্যস্থান ভারতীয় সৈনিকের গতি প্রতিহত করতে পারেনি। তাদের অদম্য উৎসাহ ও চরিত্রের দৃঢ়তা সকলের প্রশংসা অর্জন করেছিল।

জার্মেনি ও অক্ষশক্তির পতনের কারণ—প্রথম মহাসমরে পরাজয় ও অপমানের প্রতিষোধ নেওয়ার জন্য জার্মান জাতি অধীর হয়ে ওঠে। নাৎসীবাদের উদ্গাতা ছিলেন রোজেন বার্গ এবং এর হোতা হের হিট্‌লার। সাম্যবাদের প্রতিষেধক স্বরূপ নাৎসীবাদ আগ্রহের সহিত গৃহীত ও প্রচারিত হয়। নাজিরা ভেবেছিল, ইংল্যাণ্ডের সাম্যবাদ বিরোধী রক্ষণশীল মন্ত্রীসভা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধূর্তমনোবৃত্তি তাদের সাম্যবাদ উৎসাদন কার্য অনুমোদন করবে। তাদের অনুমান সত্য কি না তা চিন্তা না করে তারা সমরাগ্নিতে ঝাঁপ দিয়েছিল এবং দেশবাসীদের সেই কার্যে প্ররোচিত করেছিল। ভবিষ্যতের চিন্তা না করে এবং উপযুক্ত পরিমাণে প্রস্তুত না হয়ে তারা বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। জার্মেনির পরাজয়ের প্রথম কারণ এই।

১৯৪০ সাল পর্যন্ত জার্মেনি একটির পর একটি দেশকে পরাজিত করে পদানত করেছিল, তাদের রাজনৈতিক সত্ত্বা লোপ করে দিল। সে সকল

দেশের অধিবাসীদের সমরোপকরণ নির্মাণ কার্যে নিযুক্ত করে তাদের উপর অত্যাচার ও শোষণ চালিয়েছিল, তাদের ক্রীতদাসের অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিল। তারা নাৎসী আক্রমণ ও বিজয়কে ভগবানের অভিশাপের মতো গ্রহণ করে রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হয়েছিল। তারা নাজীবাদকে বাহ্যতঃ স্বীকার করে নিলেও তার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় খুঁজেছিল। জার্মানদের প্রতি বিজিত জাতিদের অপ্রীতি, অশ্রদ্ধা ও ঈর্ষা জার্মেনির পতনের দ্বিতীয় কারণ।

১৯৪০ সালে জার্মেনির আকাশ শক্তি প্রবল ছিল। ইংল্যাণ্ডকে আক্রমণ করতে হলে হয়তো রাশিয়া তার পশ্চাতে আঘাত করবে, সম্ভবতঃ এই ভয়ে জার্মেনি ব্রিটেনের সমুদ্র পরিখা পার হতে সাহস করেনি। ইউ-বোট আক্রমণ সত্ত্বেও ইংলণ্ডের নৌবল অব্যাহত ছিল। জার্মেনির নৌশক্তির দুর্বলতা ইংলণ্ড আক্রমণের অন্তরায় হয়েছিল। ব্রিটেনকে আক্রমণের ব্যর্থতা জার্মেনির পরাজয়ের তৃতীয় কারণ।

ইংল্যাণ্ডকে ছেড়ে দিয়ে জার্মেনি রাশিয়াকে আক্রমণ করতে গেল। রাশিয়ার প্রকৃত শক্তি সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল না। তার রুষ অভিযান ব্রিটেনকে প্রস্তুত হওয়ার সুযোগ দিয়েছিল এবং তার নিজের সমাধি রচনা করতে সাহায্য করেছিল। রুষ অভিযানে তার নিজ শক্তিক্ষয় তার পরাজয়ের চতুর্থ কারণ।

মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রের 'উড়ন্ত কেল্লা'র অতি উচ্চ বায়ুস্তর থেকে বৃহৎ বোমা ক্ষেপণ, সুশিক্ষিত আকাশ সেনা আমদানী, সমরোপকরণ সংগ্রহে ও সরবরাহে সম্মিলিত জাতির বিপুল শক্তি, অফুরন্ত জনবল এবং মার্কিন যন্ত্রশিল্পের আশ্চর্য উৎপাদনী শক্তি জার্মেনির পরাজয়ের পঞ্চম কারণ।

জার্মেনির সহিত ইটালির যোগদান জার্মেনির সর্বনাশের কারণ। ইটালির সামরিক শক্তি পর্যাপ্ত ছিল না, তার নৌবল একটা ধাপ্পাবাজী। ইটালিকে সাহায্য করতে গিয়ে জার্মান সৈন্য বিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ইটালিকে স্কন্ধে নিয়ে জার্মেনিকে শিকার করতে হয়েছিল। অক্ষশক্তি যখন মিত্রপক্ষের সম্মুখীন হয়েছিল তখন সোভিয়েট বা চীনের মতো অসীম ক্ষতি স্বীকার করে অন্যের অবসর যোগানোর মতো কেহ ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট ও ব্রিটেনের সমবেত উৎপাদন ক্ষমতার সহিত একা জার্মেনি প্রতিযোগিতা করতে পারল না। তার পরাজয়ের ষষ্ঠ কারণ এই।

মধ্য প্রাচ্যে সেনাপতি রোমেল উত্তর আফ্রিকার এল এলামিন পর্যন্ত অগ্রসর হন। মিত্রপক্ষের পরাজয় অনিবার্য হয়ে পড়ল। বিজয়ী জার্মান সৈন্য আলেকজান্দ্রিয়া অভিমুখে অগ্রসর হল, কিন্তু জার্মান সৈন্য ষ্ট্যালিনগ্রাডে নিযুক্ত থাকায় এবং ইটালির নৌবাহিনীর সাহায্য করতে অসমর্থ হওয়ায় রোমেল পরাজিত হয়ে হটে এলেন। যুগপৎ দুইটি বিরাট যুদ্ধে উপযুক্ত পরিমাণে সমরোপকরণ ও সৈন্য সরবরাহে অকৃতকার্যতা জার্মেনির পরাজয়েব সপ্তম কারণ।

রাশিয়া ও মিত্রশক্তিব মধ্যে মনোমালিন্য ও বিচ্ছেদ ঘটার সম্ভাবনায় হিটলার সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করে মিত্রবাহিনীকে বাধা দিতে ত্রুটি করেছিলেন। তাঁর এই ভুল তাঁর পবাজয়ের অষ্টম কারণ।

যুদ্ধ চলার সময় হিট্লার মাঝে মাঝে অজানা অস্ত্রের ভয় দেখাতেন। জার্মান বৈজ্ঞানিকেরা সেই অস্ত্র আবিষ্কাবে নিযুক্ত ছিলেন। পৃথিবীর বুক থেকে পাঁচ হাজার মাইল উর্ধে যেখানে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি নিষ্ক্রিয়, সেখানে দুই মাইল দীর্ঘ ও দুই মাইল প্রস্থ একখানি আয়নার উপর সূর্যের ঘনীভূত বিপুল উত্তাপ পৃথিবীর দিকে ধাবিত হলে সকল বস্তু পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এই অনাবিষ্কৃত প্রলয়ংকর মারণ অস্ত্রের উপর অত্যন্ত বেশী নির্ভব করে পরিচিত অস্ত্রাদি নির্মাণে তাঁব শিথিলতা এসেছিল। এই শিথিলতা তাঁব পবাজয়েব গৌণ কারণ।

দ্বিতীয় মহাসমরের সময় রাষ্ট্রনায়কদের উক্তি ও তার সার্থকতা। প্রথম মহাসমরের সময় রাষ্ট্রনায়কগণ তাব উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলেছিলেন, যুদ্ধের পর পৃথিবীর সকল দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে, আর যুদ্ধ প্রয়োজন হবে না এবং চিরশান্তি স্থাপিত হবে। তাঁরা যুদ্ধ শেষ করার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু পৃথিবী থেকে কী ভাবে যুদ্ধ হিংসা ও লোভ দূর হয়েছে তা সর্বজনবিদিত। উইলসনের চৌদ্দ দফা বিবৃতিব মতো রুজ্ভেল্ট এবারও স্বাধীনতা চতুষ্টয়ের কথা বলেছিলেন। তিনি এবং চার্চিল আট্লাণ্টিক সনদ নাম দিয়ে একটি যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেছিলেন। রুজভেল্ট বলেছিলেন, পৃথিবীর সকল মানুষের নির্ভয়ে জীবন ধারণ করার স্বাধীনতা আছে, দেশ-বিদেশের সংবাদ জানার স্বাধীনতা আছে, ব্যক্তিগত মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আছে। জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষ এই চার রকমের স্বাধীনতা ভোগ করার দাবি করতে পারে এবং দ্বিতীয় মহাসমরের ফলস্বরূপ এই স্বাধীনতা চতুষ্টয় ভোগ করতে পারবে।

বিশ্বসভ্যতার প্রগতিতে দ্বিতীয় মহাসমরের দান।

বর্ত্তমান যুগে যুদ্ধ যে কিরূপ ভয়াবহ ও প্রলয়ংকর তা আমরা সকলে জানি। পৃথিবীতে কোন বস্তু নিছক ভাল বা মন্দ নয়। যুদ্ধের সময় বিজ্ঞান যে সমস্ত আবিষ্কার করেছে তা মানব জাতির কল্যাণের দিক থেকে বিরাট সম্ভাবনায় পূর্ণ, কিন্তু মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংশের তুলনায় বিশ্বসভ্যতার প্রগতির দিক দিয়ে বিজ্ঞানের দান নগণ্য। টোকিওর উপর একদিন বোমা বর্ষণের খরচ এক শত দশ কোটি টাকা। যুদ্ধমান জাতিরা প্রতিদিন কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি ও যুগ যুগ সঞ্চিত সভ্যতার শ্রেষ্ঠ অবদানগুলিকে ধ্বংশ করেছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ হতাহত হয়েছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ অকর্মণ্য হয়ে গেছে। সুতরাং জীবন ও অর্থনৈতিক ক্ষতি অঙ্কের বাইরে চলে গেছে। কয়েকটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন এত বিপুল ক্ষতি ধ্বংস রক্তপাত হিংসা দ্বেষ লোভ নির্দয়তা ও নৃশংসতার ক্ষতিপূরণ করতে পারে না।

সভ্যতা ও মনুষ্যধর্ম ধ্বংশের কার্যে বিজ্ঞানের অপব্যবহার হয়েছে, আবার যুদ্ধের প্রেরণায় বিজ্ঞান বুদ্ধি মানুষের ভবিষ্যৎ সুখশান্তি বিধানের পরোক্ষ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়েছে। রাডার, পলিথিন, শিলিকোন, ডি. ডি. টি, গায়োসেন, ফেনকসিটল, পেলিসিলিন, কেনবাক্টন প্রভৃতি ঔষধ মানুষের জীবনকে নিরাময় ও আনন্দময় করতে সক্ষম হয়েছে। বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম দান মানুষের সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গী।

সাম্রাজ্যবাদের প্রতিক্রিয়ায় নূতন মতবাদের জন্ম। প্রথম মহাসমরের পর জাতীয় সংস্কৃতির প্রতি স্বাভাবিক টান প্রায় সকল দেশেই দেখা গিয়েছিল. নিজেদের পূর্ব পুরুষ সম্বন্ধে ও অতীত গৌরবের চেতনা, নিজেদের সভ্যতা, সাহিত্য শিল্পকলা ইতিহাস ইত্যাদির আলোচনা পূর্ণমাত্রায় চলেছিল। উগ্র জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়েছিল। প্রথম মহাসমরের সাম্রাজ্যবাদের শোচনীয় পরিণতি কিন্তু জার্মেনির পরাজয়ে সাম্রাজ্যবাদী জাতিদের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একদিকে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদ, এবং অপর

দিকে সাম্যবাদের অভ্যুদয় হল। নাৎসীবাদ ফ্যাসিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ সাম্যবাদের সাধারণ শত্রু হলেও দ্বিতীয় মহাসমরে সাম্রাজ্যবাদ কৌশলে সাম্যবাদের বন্ধুতা ও সাহায্য লাভ করে নাৎসীবাদ ও ফ্যাসিবাদ ধ্বংস করল এবং নিজের জীবন অন্ততঃ কিছুকালের জন্য রক্ষা করল। নর্ডিক নীলরক্তের আভিজাত্য গৌরব এবং সাম্রাজ্যবাদীর অভিভাবকত্বের ভ্রমাত্মক ধারণার কলুষ থেকে সোভিয়েট নীতি মুক্ত। অর্থনৈতিক উন্নয়ন সোভিয়েট পদ্ধতির মূলকথা। বুর্জোয়া শ্রেণীর সহিত মিলিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদী অসহায় অজ্ঞ ও দরিদ্র কৃষকদের উপর শোষণ চালায়। প্রাচ্যের যে সকল জাতি পাশ্চাত্য ও জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্রের রথচক্রের তলায় পিষ্ট, তাদের কৃষি ও শিল্পের উন্নতি সেখানকার অধিবাসীদের জন্য নয়। যে ব্যবস্থা তাদের মুক্তির অনুকূল ও মানবিকতার উদ্বোধক, তাকে তারা আনন্দের সহিত গ্রহণ করবে। এজন্য সোভিয়েট নীতি বঞ্চিত ও সর্বহারাদের মুক্তির উপায়। ইয়োরোপ ও আমেরিকার চেয়ে এশিয়ার প্রতি রাশিয়ার দরদ বেশী। বিশেষতঃ চীনে সাম্যবাদের প্রচলন হয়েছে এবং এর প্রভাব ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রাচ্যে সুস্পষ্ট।

রাশিয়ার নেতৃত্ব। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফলে রাশিয়া জাপান বা জার্মান ভীতি থেকে মুক্ত। সোভিয়েট রাশিয়া সকল দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকার করে। এজন্য এশিয়ার দুর্বল ও অনুন্নত জাতিরা রাশিয়ার নেতৃত্বের দিকে চেয়ে থাকতে বাধ্য। প্রথম মহাসমরের অগ্নিক্রীড়ার মধ্যে রাশিয়ার মানুষের মনে যে নবচেতনার জন্ম, তা দ্বিতীয় মহাসমরের ধ্বংসলীলার ভিতর দিয়ে পৃথিবীর উপদ্রুত মানুষের মন অধিকার করেছে।

বিশ্বব্যাপী সমরের অবসানের সংগে নির্জিত পরাধীন জাতিগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী হয়নি এবং শোষণেরও অবসান ঘটেনি। এর ফলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রের মর্যাদা, শান্তি-বৈঠকে বিশ্বের জনশক্তির নেতৃত্ব তার হাতে আপনা আপনি এসে পড়েছে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র রণক্লান্ত, যেহেতু তার ভিতরে শ্রেণীগত অন্তর্বিরোধ বর্তমান। সোভিয়েট রাষ্ট্রের উৎপাদন শক্তি বিস্ময়কর বেগে বেড়ে চলেছে। তার কৃতিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সংক্রামক হয়ে দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়েছে।

বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জার্মান জাতি দুটি মহাসমরের অগ্নি জ্বালিয়ে দিয়েছে। জার্মান চরিত্র ও মনোবৃত্তি সর্বগ্রাসী। ইতিহাসের উষাকাল

থেকে এই দুর্দ্ধর্ষ জাতি প্রতিবেশী রাজ্যগুলির উপর চড়াও হয়ে আক্রমণ চালাতে অভ্যস্ত। ৩৬৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেড় হাজার বছরের মধ্যে এরা তেত্রিশ বার, অর্থাৎ গড়গড়তা প্রতি পঞ্চাশ বছরে একবার করে প্রতিবেশী রাজ্য আক্রমণ করেছে। এর ফলে মানুষের দুঃখ দুর্দ্দশা সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয় মহাসমরের শেষে জার্মেনি বিভক্ত হয়েছে, দেশের তিনটি খণ্ডিত অংশে বিদেশীদের কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়েছে, তার সহযোগী ইটালি দুর্দ্দশা গ্রস্ত হয়েছে এবং জাপানের উপর আমেরিকা অক্টোপাসের মতো চেপে বসে রক্তপান করছে।

দ্বিতীয় মহাসমরের দুটি নিতান্ত বিরোধী মতবাদের একটা সাময়িক মিলন হয়েছিল। ধূর্ত বৈশ্য-প্রধান পুঁজিবাদ কৃষক-শ্রমিক-রাজ প্রতিষ্ঠাতা মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সংগে হাত ধরাধরি করে ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করেছে। ক্যাপিটালিজম্ ব্যস্ত হয়েছিল অপহৃত পরস্বকে রক্ষা করতে। এর নীতি শোষণ, মানুষকে তিলে তিলে মেরে তাকে অমানুষ করা। ফ্যাসিজম্ চেয়েছিল এর উপর ভাগ বসাতে। এজন্য ফ্যাসিজম্ ক্যাপিটালিজমের চক্ষুশূল হয়েছিল। একে ধ্বংশ করতে না পারলে একচ্ছত্র শাসন ও শোষণের সুবিধা হবে না দেখে ক্যাপিটালিজম্ মূল নীতির পার্থক্য সত্ত্বেও চিরশত্রু সমাজতন্ত্রের সংগে বন্ধুতা করতে বাধ্য হয়েছিল।

আবার ডিমোক্রেটিক সোশ্যালিজমের লক্ষ্য ধনতন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রেখে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় শ্রমিকদের উন্নতি সাধন। এজন্য এর অস্ত্র ট্রেড ইউনিয়ন ও ধর্মঘট। রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হলে যে সাহস ও নিঃস্বার্থ বুদ্ধির প্রয়োজন তা ডিমোক্রেটিক সোসালিষ্টদের নাই। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের প্রসাদে রাশিয়ায় কৃষক-শ্রমিক রাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল এবং কৃষক-শ্রমিকদের অর্থনৈতিক সমসুযোগ ও নিরাপত্তা লাভ হয়েছিল। কিন্তু সেখানেও একনায়কাধীন দলের চাপে রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিস্বাধীনতা শ্বাসরুদ্ধ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্বে রাশিয়ার যে আন্তর্জাতিক আদর্শ ছিল, তা পরিত্যক্ত হ'য়েছে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে সে সাম্রাজ্যবাদীদের সংগে সখ্যতা স্থাপন করেছিল। বিজয়ী মিত্রশক্তির মধ্যে আন্তরিক অবিশ্বাস ও অস্ত্রনির্ভরতার জন্য রাশিয়ার আত্মরক্ষা সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। রাশিয়াও প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যবাদী হয়ে উঠছে। রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র মার্কা সাম্রাজ্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

রাশিয়ার আদর্শ। রাশিয়ার আদর্শ ছিল সকল দেশে শ্রেণীহীন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা। এর ভিত্তি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যক্তিস্বাধীনতা, এর উপায় বিশ্বজনীন সহযোগিতা, এর মূলমন্ত্র প্রত্যেক জাতির সার্বভৌম স্বাতন্ত্র্যস্বীকার। যতকাল অ্যাংলো-আমেরিক সাম্রাজ্যবাদ বর্তমান থাকবে, ততকাল রাশিয়াকে আত্মরক্ষার জন্য সচেতন ও সচেষ্ট থাকতে হবে। আবার যতকাল রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রবাদ বর্তমান থাকবে, ততকাল সাম্রাজ্যবাদী রাজ্য সকলের নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নাই। হয় রাশিয়াকে সাহসের সহিত যুদ্ধ করে সাম্রাজ্যবাদকে একেবারে নির্মূল করে দিতে হবে, নতুবা তাকে সাম্রাজ্যবাদীদের দলে ভিড়ে যেতে হবে।

পৃথিবীর দেশগুলি এখন দুটি শীতল যুদ্ধ শিবিরে বিভক্ত। দুই পক্ষই পরোক্ষভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি রচনায় অর্থ ও বুদ্ধি প্রয়োগে নিযুক্ত, কেউ বা অ্যাটম বোমা, আবার কেউ বা হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণে শক্তি ও সামর্থের অপচয় করছে। পরোক্ষ ও অপরোক্ষ উপায়ে রাশিয়া স্বীয় আদর্শ প্রচার করে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শোষিত জনমনে তার প্রভাব বিস্তারে সচেতন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইংল্যাণ্ড নূতন রাষ্ট্রসংঘের মাধ্যমে দলপুষ্টি করছে।

বিশ্বসভ্যতার এই সংকট-কালে হয়তো মানুষের শুভবুদ্ধি আমাদের সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করবে, নইলে একপথবর্তী দুটি বিপরীতমুখী রেলগাড়ীর পরস্পর সংঘাতে যেমন সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তেমনি হয়তো জাতিগুলির বিপরীত মতবাদ ও স্বার্থসংঘাতে বিশ্বসভ্যতা নিদারুণ অপঘাত মৃত্যু বরণ করবে।

বিশ্বসভ্যতা রক্ষাকল্পে ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ। যখন পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি দুটি বিরাট দলে বিভক্ত হয়ে অগ্নিগর্ভ গিরির মতো বাষ্প উদ্গীরণের জন্য অপেক্ষা করছে, যখন তার দুটি বিষধর সর্পের মতো পরস্পরকে আক্রমণের জন্য ফুঁসছে, তখন ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ জগতে প্রচার করার প্রয়োজন আছে। পাশ্চাত্য দেশগুলি বর্তমানে সভ্যতাকে অত্যন্ত জটিল করে প্রচণ্ড সংগ্রাম বাধিয়ে দিয়েছে, নূতন নূতন অভাব সৃষ্টি করে দরিদ্রের দারিদ্র্য বাড়িয়ে দিয়েছে, কর্মকে জীবনের শ্রেষ্ঠ বস্তু বলে উত্তেজনা ও উন্মাদনায় গা ঢেলে দিয়েছে, আমোদের মত্ততায় ও জীবনের রণক্ষেত্রে মেতে উঠেছে—তারা অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে, অনেক কিছু পেয়েছে কিন্তু সুখ পায়নি। দু হাজার বছর আগে ভারতের তপোবনবাসিনী এক নারী

বলেছিল বিষয় সম্পত্তি নিয়ে আমি কী করবো ? এতে অমৃতত্ব আসবে কী ? ভারতবর্ষ বিশ্বসংসারকে মায়া বলে বসে আছে। পাশ্চত্য তাকে ধ্রুব সত্য বলে অবিশ্রাম কর্মে লিপ্ত হয়েছে। হাজার হাজার বৎসরের সাধনায় ভারতবর্ষ যে মহান তত্ত্ব আবিষ্কার করেছে তার মূল কথা—সুখের প্রকৃত উপায় সন্তোষ।

পাশ্চাত্য অভাব সৃষ্টি করাকেই বলে সভ্যতা। যে জাতি বা ব্যক্তির যত অভাব, সে তত সভ্য। কিন্তু সে ভুলে গেছে অভাব যত বাড়ে, জীবন সংগ্রাম তত কঠোর হয়, সভ্যতা যত জটিল, মানব মনে বিচিত্র বৃত্তির আলোড়ন ততই বেশী'। মানুষেব জীবনে সুখের প্রযোজন আছে, কিন্তু সুখেব চেযে সোয়াস্তি ভাল। ভাবতীয সভ্যতার আদর্শ ত্যাগ। যে মানুষ নিজের সুখ যত বিসর্জন দিযেছে সে মানুষ তত মহৎ, সে তত উচ্চ।

সুদূর প্রাচীনকাল থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত ভাবতীয সভ্যতাব যে বাণী অবিছিন্ন ভাবে প্রবাহিত হযে এসেছে,তা যে দিন বিশ্বসভ্যতাব ক্ষেত্রে পূতসলিলা গঙ্গাব স্রোতেব মতো মানুষেব চিত্তভূমিকে সরস ও শ্যামল কবে তুলতে সমর্থ হবে, সে দিন প্রকৃত সার্বভৌম সভ্যতা সৃষ্টি হবে– যে দিন সেই বাণী ক্রম বিবর্তনেব মধ্যে দিযে বর্তমান কালেব সীমা অতিক্রম করবে নিত্যকালেব বস্তু হয়ে দাঁড়াবে, সে দিন সত্যকার মানব সভ্যতা সৃষ্টি হবে, সে দিন নানা মতবাদ-দীর্ণ জগৎ, বহু স্বার্থ বিভেদ হিংসায বিভক্ত জাতি সকল এক সুমহান্ স্বার্থকতার দিকে অগ্রসর হবে।

সকল দেশের সাধাবণ মানুষেব প্রকৃতির স্থাযী পবিবর্তন না হলে বাষ্ট্র ও সমাজের মঙ্গল সুদূরপরাহত। এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন যুগের বাষ্ট্রপরিচালকগণ নিজেদের উন্নতি ও প্রভাবকে প্রধান লক্ষ্য রেখে রাষ্ট্রের হিতসাধনে আত্ম নিযোগ কবেছেন। তার ফল যে ভাল হয়নি তা বলা যায় না। ভাবের উত্তেজনায় বা প্রযোজনেব তাগিদে মানুষের চরিত্রের উন্নতি হযেছে, কিন্তু সে উন্নতি বা পবিবর্তন সামযিক। উত্তেজনাব পর আসে অবসাদ এবং সেই অবসাদে সে সাধারণ স্তব থেকে কিছুকালের জন্য নেমে যায একটু বেশী নীচে।

আবার রাজা বা পলিটিশিযান এবং চরিত্র সংস্কাবকের কাজ যুগপৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে। তার ফলও যে ভাল হযনি ইতিহাস তার সাক্ষ্য দিয়েছে।

সোভিয়েট রাশিযা ভরসা রাখে যে অধিক সংখ্যক লোকের চরিত্রের শ্রেষ্ঠ অংশগুলি বিকাশের পথে যে সকল আর্থিক রাষ্ট্রীক ও সামাজিক বাধা আছে,

তা অপসারিত হলে মানুষের চরিত্রে যে স্থায়ী পরিবর্তন আসবে, তাতে পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবে। তার মতে পারিপার্শ্বিকের উন্নতি সাধনে মানুষের চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বিকশিত হয়ে উঠবে। উন্নত পরিবেশ প্রভাবিত চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্থায়ী হওয়ার সম্ভাবনার চেয়ে বিকশিত চরিত্রের মানুষ নিজের চেষ্টায় যে পরিবর্তন আনবে তার স্থায়ীত্ব বেশী।

রাষ্ট্র কি? প্রকৃত রাষ্ট্রের কর্তব্য। রাষ্ট্র একটি সাময়িক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান, কিন্তু মনীষা ও উচ্চতর নীতির দিক দিয়ে বিচার করে দেখলে রাষ্ট্রের ধারণা এখনও পূর্ণ বিকাশ লাভ করেনি। মানুষের মানসিক ও মানবিক বিকাশের সুবিধার জন্য যে ব্যবস্থা তার নাম রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কাঠামো রাষ্ট্রের কঙ্কাল। কঙ্কাল দেহ নয়। সুদৃঢ় কঙ্কালের উপর সুঠাম দেহের মতো যখন রাষ্ট্রের কল্যাণ মূর্তি তার কাঠামের উপর সন্নিবেশিত হয়, তখনই রাষ্ট্র একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রের দ্বৈতরূপ—আভ্যন্তরীন ও আন্তর্জাতিক। আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এখনও অর্ধসভ্য এবং আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় রাষ্ট্র এখনও বর্বরোচিত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করাই রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হয়ে উঠেছে। অতিমাত্র বিধিবদ্ধ জীবন প্রসারশীলতা ও মানবিক বিকাশের পরিপন্থী এবং স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক। যে অনুপাতে নিয়ম স্বাধীনতার পরিপোষক সেই অনুপাতে মানুষ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়। সত্তার ধর্ম অনুসরণ করার অবাধ অধিকারের নাম স্বাধীনতা। ব্যক্তির সমাজের ও জাতির স্বাধীনতার ভিত্তি স্বাভাবিক আত্মবিকাশ। প্লেটো ও ভারতীয় ঋষিরা বলেছিলেন, একমাত্র জ্ঞানীই রাষ্ট্রের কর্ণধার হওয়ার অধিকারী। সক্রেটিস বলেছেন, প্রকৃত জ্ঞানী কখনও অন্যায় করেন না। তাঁর আদর্শ রাষ্ট্রসেবা। স্বৈরাচার ও সদাচারের মধ্যরেখা সম্বন্ধে জ্ঞান কেবলমাত্র তাঁরই আছে। কেবলমাত্র তিনিই রাষ্ট্রসেবার ভিতর দিয়ে জনসেবার সুখ আস্বাদন করেন। তাঁর হাতে দণ্ড শাসনের প্রতীক নয়—কল্যাণের জনক, স্বার্থের বাহক নয়—কল্যাণের ধারক, মানবতার দ্যোতক।

রাষ্ট্রের চরম সার্থকতা। যদি রাষ্ট্র মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি বিকাশে সাহায্য না করে তাকে আত্মসাৎ করে, তাহলে রাষ্ট্র একটি হিতকর প্রতিষ্ঠান না হয়ে যন্ত্রে পরিণত হয়। রাষ্ট্রের এইরূপ অবাঞ্ছিত পরিণতি ব্যক্তি স্বাধীনতা খর্ব করে, জাতির প্রকৃত উন্নতির অন্তরায় হয়ে ওঠে। সমাজে সকল ব্যক্তির

সমবেত কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা অর্জনের ব্যবস্থা করতে পারলে, সমবেত কর্মের অন্তরায় অপসারিত করতে সমর্থ হলে, রাষ্ট্রের প্রকৃত উপযোগিতা প্রমাণিত হয় কিন্তু সমবেত কর্ম প্রচেষ্টার সুবিধাদানের দোহাই দিয়ে যখন রাষ্ট্র ব্যক্তি স্বাধীনতার পেষণ যন্ত্র হয়ে ওঠে, তখনই মানুষের বিচিত্র বিকাশ ব্যাহত হয়, তখনই রাষ্ট্রের সার্থকতা থাকে না। রাষ্ট্র যতদিন মানসিক জীবন-বিকাশের সাহায্যকারী বস্তু থাকে, যতদিন রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার সামর্থ্য ও প্রকৃতির বিশিষ্ট ধারা অনুসারে আত্মবিকাশের ও ভোগের যথোচিত ও সমান সুযোগ দেয়, ততদিন রাষ্ট্র একটি শ্রেষ্ঠ কল্যাণকর প্রতিষ্ঠানরূপে আদৃত হয। রাষ্ট্র যে কোন রূপ গ্রহণ করুক না কেন, তা রাজতান্ত্রিক হোক, অথবা গণতান্ত্রিক হোক বা সমাজতান্ত্রিক হোক্‌, মানুষের স্বাভাবিক শক্তি বিকাশের স্বাধীনতায় ইহা যতখানি অনাবশ্যক হস্তক্ষেপ করে ইহা ততখানি অনিষ্টকর।

বর্তমানে পৃথিবীর সকল জাতির পররাষ্ট্র নীতির গালভরা নাম 'ডিপ্লোমেসি'। এর বাস্তব রূপ রাষ্ট্র-নেতাদেব বাচনিক চালবাজী, মৌখিক সৌজন্য, অপ্রিয় সত্যের অকথন, প্রিয় অসত্যেব বাঞ্জনা, ঐকান্তিকতা বর্জিত ঘন ঘন চুক্তি সম্পাদন, দ্ব্যর্থ সূচক শব্দ ব্যবহার, বড় বড় কথার ফেনরাশির তলায় প্রকৃত মনাভাবের অব্যক্ত প্রকাশ। আধনিক রাষ্ট্রপরিচালনায় একদল স্বার্থসেবী কূটনীতিব আশ্রয় নিয়েছে। তাদেব কথায় ও কাজে সামঞ্জস্য নাই। অন্য রাষ্ট্রের সংগে ব্যবহারে তাদের না আছে উদার মানবতা, না আছে মৈত্রী সত্যনিষ্ঠা ও আদর্শের বালাই। তাদের দৃষ্টিকোণ সংকীর্ণ, মনোভাব সীমাবদ্ধ ও অনুদার, কর্মপন্থা জটিল। স্বজাতি-প্রীতির দোহাই দিয়ে তাঁরা বহু অনর্থ সৃষ্টি করেছে, ধনিকদের প্রতিভূ হয়ে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জাগিয়ে তুলেছে। ফলে মনুষ্য সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের পথ সংকীর্ণ ও রুদ্ধ হয়ে গেছে, বিশ্বব্যাপী সমর ও দুঃখদুর্দশা সৃষ্টি হয়েছে।

বিশ্বরাষ্ট্র সংঘ স্থাপন। কয়েক শতাব্দী ধরে সভ্য মানুষ যুদ্ধ নিবৃত্তির পথ অন্বেষণ করছে। কি উপায়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি পরস্পরের সহযোগিতায় ঈর্ষা দ্বেষ বৈরভাব ও হিংসা ত্যাগ করে সুমহান মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হতে পারে এবং এমন একটি সভ্যতা স্থাপন করতে পারে, যে সভ্যতা জাতি বিশেষের দানে সমৃদ্ধ ও উচ্চ মানবধর্মে গরীয়ান, যার ভিতর সাম্য ও মৈত্রী প্রধান স্থান লাভ করে বিশ্বে একটি আনন্দময় সমাজ গড়ে তুলবে, এই

চিন্তা মনীষীদের মন আলোড়িত করেছে। ১৬৯৩ সালে উইলিয়ম পেন ইয়োরোপের বিভিন্ন জাতিকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেন। ১৭৯৫ সালে ইমান্যুয়েল কান্টের পরিকল্পনায় সমস্ত স্বাধীন ও প্রজাতন্ত্র শাসিত দেশগুলি একরাজ্যভুক্ত হওয়ার পন্থা উদ্ভাবিত হয়েছিল। ওয়াটালুর যুদ্ধের সহিত ফরাসি বিপ্লবের বিভীষিকা ও রক্তপাত সমাপ্ত হলে ভিয়েনা কংগ্রেস পবিত্র চুক্তির ব্যবস্থা উদ্ভাবন করে যুদ্ধকে নির্বাসন দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু ১৮৪০ সালের জনবিপ্লব এই চুক্তির অসারতা প্রমাণ করেছিল। ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালের হেগ্ সম্মিলনে যে ব্যবস্থা হয় তাতে আন্তর্জাতিক মনোমালিন্য আপোষে মিটমাট করার বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু জার্মান পার্লামেন্টের বিরোধিতায় তা সফল হয়নি। ১৯০০ হইতে ১৯১৪ সালের মধ্যে ইয়োরোপ এবং আমেরিকায় লোকের মন যুদ্ধ নিবারণের চেষ্টায় আচ্ছন্ন ছিল। ১৯১৫ সালে শান্তি স্থাপনের জন্য এক হাজার নেতৃস্থানীয় আমেরিকার অধিবাসী নিয়ে ফিলাডেলফিয়ায় একটি সংঘ স্থাপিত হয় এবং এর অনুকরণে প্রেসিডেন্ট উইলসন প্রথম মহাসমরের অবসানে বিশ্বশান্তি সংঘ স্থাপন করেন। কিন্তু এর পরিচালকদের অদূরদর্শিতা ও অবিমৃশ্যকারিতার জন্য এই সংঘের অকাল মৃত্যু ঘটে। দ্বিতীয় মহাসমরের অবসানে আর একটি সংঘের জন্ম হয়েছে। কিন্তু ইতিমধ্যেই এই সংঘের অন্তর্ভুক্ত পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলি দুটি দলে বিভক্ত হয়েছে। একটির নাম অ্যাংগ্লো আমেরিকান ব্লক, অন্যটি রাশিয়ান ব্লক। এই দুইটি ব্লকের মধ্যে স্নায়ু যুদ্ধ ইতিপূর্বেই আরম্ভ হয়ে গেছে। দুই দলের মধ্যে নীতিগত পার্থক্য তাদের দুটি যুদ্ধ শিবিরে পরিণত করেছে।

পুঁজিবাদী অ্যাংলো-আমেরিকান-ব্লক সমাজতন্ত্রবাদী রাশিয়ার · চিরশত্রু। প্রথম মহাযুদ্ধের পর পুঁজিবাদীরা উক্ত আদর্শের দোহাই দিয়েছে এবং ম্যাণ্ডেটের অর্থাৎ অভিভাকত্বের ব্যবস্থা করে দুর্বল জাতিদের উপর প্রভুত্ব কায়েম করতে চেষ্টা করেছে। এশিয়া মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার কোটি কোটি লোকের মনে স্বাধীনতা লাভের ইচ্ছা বলবতী হয়েছে দেখে ইংরেজ আপোষ মীমাংসা দ্বারা মিশর ও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা স্বীকার করেছে, সাম্রাজ্যবাদীদের দেশ বিভাগ ও সাম্প্রদায়িকতা নীতি অনুসারে ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করেছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অধিবাসীদের বিদ্রোহের ফলে ডাচ্ ও ফরাসী গবর্ণমেণ্ট তাদের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে।

এদিকে মহাচীনের গণশক্তি রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ব্রিটেন ও আমেরিকার তাঁবেদার চিয়াং কাইশেককে বিতাড়িত করে চীনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে।

প্রকৃত সমাজ গড়ে ওঠার আগে মানুষ ব্যষ্টিভাবে অবস্থান করত। মানুষের আভ্যন্তরীন প্রয়োজন ও আদর্শের প্রেরণায় সামাজিক ঐক্য সম্ভব হয়েছিল। তেমনি ক্রমবর্দ্ধমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের তাগিদে আন্তর্জাতিক ঐক্য গড়ে উঠবে। ইক্ষু রস তরল। আগুনের উত্তাপে সেই রস ঘন হয়, দানা বাঁধে। একটির পর একটি দানা সংযুক্ত হয়ে কঠিন আকার ধারণ করে। সমষ্টিতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আদর্শ এখনও এমন ব্যাপক হয়ে উঠেনি যে এর প্রভাবে সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা চিন্তা-ভাব নূতন রূপ ধারণ করতে পারে।

ব্যষ্টি পরিবার গোষ্ঠী সমাজ জাতি মানুষের প্রগতির ক্রম বা স্তর। প্রকৃতির রাজ্যে ক্রমবিকাশের ধারায় এমিবা মানুষে পরিণত হয়েছে, প্রগতির স্তরবিন্যাসের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু একটি স্তরের প্রাণী উচ্চতর স্তরে উন্নীত হলেও নিম্নস্তরের প্রাণীর আত্যন্তিক বিনাশ হয়নি। বৃহত্তর বিকাশের সহিত নিম্নতর বিকাশ লোপ পায়নি। বৃহত্তর সংঘ গঠনের সহিত নিম্নতর সংঘের অস্তিত্ব লোপ পায় না। বৈচিত্র্য ও বহুত্ব নিয়েই প্রকৃতি, কিন্তু বৈচিত্র্য বৃহত্তর ঐক্যসৃষ্টির অন্তরায় নয়। সমাজে সকল ব্যক্তির বিকাশ যুগপৎ নয়। সকল ব্যক্তি সমান তালে সমগতিতে অগ্রসর হয না। জাতির ভিতর সাময়িকভাবে তার প্রগতির জন্য যে গুণটির প্রয়োজন অনুভূত হয়, তারই বিকাশ হয় এবং যে সমাজ বা জাতির ভিতর সেই গুণের বিকাশ সম্ভব, তা প্রাধান্য লাভ করে। কিন্তু এই শ্রেষ্ঠতা একটা সাময়িক প্রয়োজন মাত্র, চিরস্থায়ী ব্যবস্থা নয়।

জটিলতার ভিতর সরলতা, বৈচিত্র্যের ভিতর ঐক্য প্রকৃতির নিয়ম। জগৎ প্রপঞ্চ একত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐক্যতান সঙ্গীতের সুর বৈচিত্র্যের মধ্যেই বিকাশ পায়। এতেই তার সৌন্দর্য ও মহিমা। বীণা মৃদঙ্গ প্রভৃতি এক একটি যন্ত্রের এক একটি বিশিষ্ট সুর আছে। কিন্তু বিভিন্ন যন্ত্রের নানা সুরের সমবায়ে সেই সঙ্গীত সৃষ্টি হয়। বৈচিত্র্যকে বাদ দিয়ে ঐক্য সম্ভব নয়। আবার ঐক্য স্থাপন না হলে বৈচিত্র্য একটা কোলাহল বা শব্দ মাত্র। মানবজাতির পূর্ণতার জন্য যেমন ঐক্য আবশ্যক, তেমনি বৈচিত্র্যেরও প্রয়োজন

আছে। জীবন সমগ্রতায় এক, এর খেলা বহুমুখী। জীবনের শক্তি বৈচিত্র্যে, তার শৃঙ্খলা ঐক্যে। এজন্য ঐক্য আত্যন্তিক প্রয়োজন কিন্তু বৈচিত্র্যের সমাধির উপর প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষ একটা প্রাণহীন, চেতনাহীন মৃত্তিকা পিণ্ড নয় যে তাকে ভেঙে-চুরে তার স্বাতন্ত্র্য লোপ করে দেওয়া যেতে পারে। সকল মানুষের, সকল জাতির প্রকৃতিও এক নয় যে তাদের অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক শক্তি লোপ করে তাদের সমানভাবে গঠন করা যেতে পারে।

প্রকৃত জাতিসংঘ গঠন—এমন একদিন আসবে যখন বিভিন্ন জাতির স্বাভাবিক অন্তর প্রেরণা তাদের একটি বিরাট জাতি-সংঘ গঠনে এবং একটি সাধারণ সভ্যতা স্থাপনে পরিচালিত করবে। তাদের ভিতরের প্রয়োজন এবং বাইরের চাপ এখনও এমন শক্তিশালী হয়নি যে তাদের মধ্যে একটা বাস্তব ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। উপযুক্ত শিক্ষা গুণে তাদের হৃদয় বৃত্তি সকলের স্ফুরণ ও বিকাশ এবং বুদ্ধির পরিপক্কতাই এই ভিতরের প্রয়োজন। তাদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিধানের নাম বাইরের চাপ। কিন্তু এদের কোনটিই এখনও এমন অবস্থায় এসে পৌঁছয়নি যে তাতে একটি স্থায়ী বিশ্বরাষ্ট্র স্থাপন এবং একটি সাধারণ সভ্যতার জন্ম সম্ভব হয়ে উঠতে পারে।

এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে বহুবার চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে কিন্তু তার ভিতর উদারতা ও মানবতা স্থান পায়নি, তার ভিতর প্রতিক্রিয়াশীল মতলববাজদের হস্ত সুস্পষ্ট। সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি পার্লামেণ্ট এবং সমগ্র পৃথিবী নিয়ে একটিমাত্র যুক্তরাষ্ট্র স্থাপন করার চেষ্টা বহুবার ব্যর্থ হয়েছে। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে এখনও আধুনিক শিক্ষা সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুশীলনের সুব্যবস্থা হয়নি। সে সকল দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখে না। জনসাধারণের বৈষয়িক সাংস্কৃতিক ও আত্মিক উন্নতি উন্নত রাষ্ট্রের ও সমাজের লক্ষণ। রাষ্ট্রব্যবস্থায় এখনও মানুষের জীবন গঠন এবং জীবন বিকাশের সুযোগ নাই। যে দিন সকল মানুষের প্রতি সমান ব্যবহারের ভিত্তিতে ও সমান অধিকারের দাবীতে প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয়ে এই ধরণের সুযোগ সৃষ্টি হবে, যখন রাষ্ট্র ও সমাজের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন ঘটবে, তখনই প্রকৃত বিশ্বরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে।

নামসূচী

দ

ধ

ন

প

য